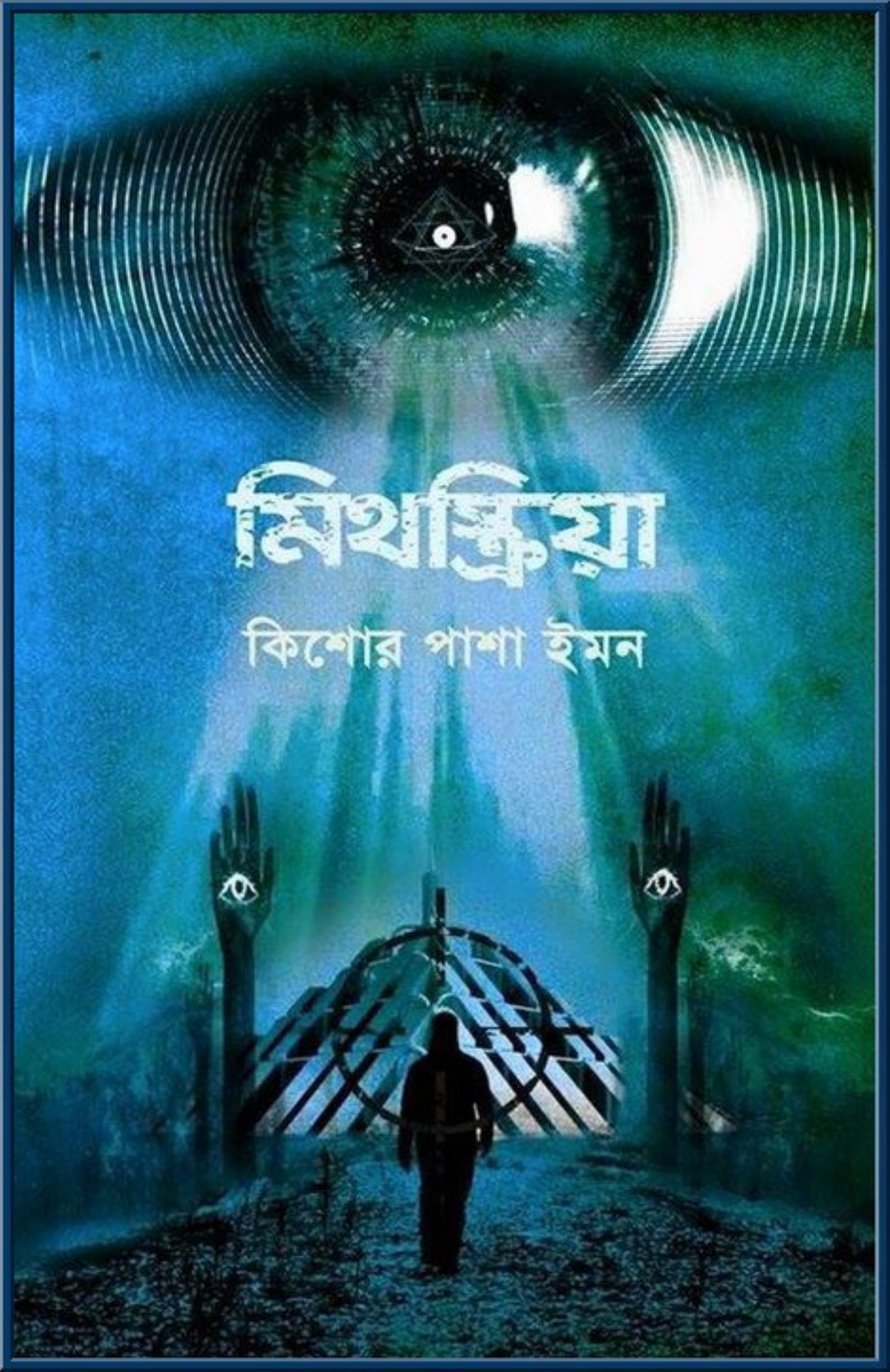




# মিথস্ক্রিয়া

কিশোর পাশা ইমন



খ্যাতনামা এক বাংলাদেশি বিজ্ঞানীকে তার বাড়িতে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেলো। ডাক পড়লো ডিটেক্টিভ আসিফ আহমেদ ও তার দলের। অনিশ্চয়তার সঙ্গে মুক্ত হলো একটি ফিডব্যাক কেন্দ্র। তদন্ত শুরু হতেই খুব দ্রুত পাশ্চিমে গেলো ঘটনা প্রবাহ—রসায়ন থেকে অ্যালকোহল, খিচুরি জানুর চার হাজার বছর এবং বর্তমান বাংলাদেশে—কল্‌কাত্তীতভাবে বিস্তৃত এই ব্রহ্মসেনা সমাধান লুকিয়ে আছে সামনে থাকা তথ্যগুলোর একটিমাত্র অংশে, আর সেটাই খুঁজে বের করতে হবে। অদৃশ্য কোন ওভারসিক্সের ইশারায় নেমে এলো বাধা-বিপত্তি। প্রধান সাসপেক্টকে হাতের নাগালে পেয়েও কেসটার মিমামসা করা গেলো না। মুহূর্তে ঘটনার মোড় ঘুরে যাচ্ছে। কোটি কোটি মানুষের চোখের সামনে থাকা সত্যটা খুঁজে বের করতে গিয়েও গলদঘর্ম হয়ে উঠলো ডিটেক্টিভ। কিন্তু কারও ধারণা নেই, সত্যটা কাঁপিয়ে দিতে পারে গোটা বাংলাদেশকে।

কিশোর পাশা ইমরের প্রথম মৌলিক পুন্নার উপন্যাস 'মিথস্ট্রিয়া' পাঠককে পরিচয় করিয়ে দেবে ব্রহ্মসেনা এক অতীত আর অজানা বাস্তবতাকে।



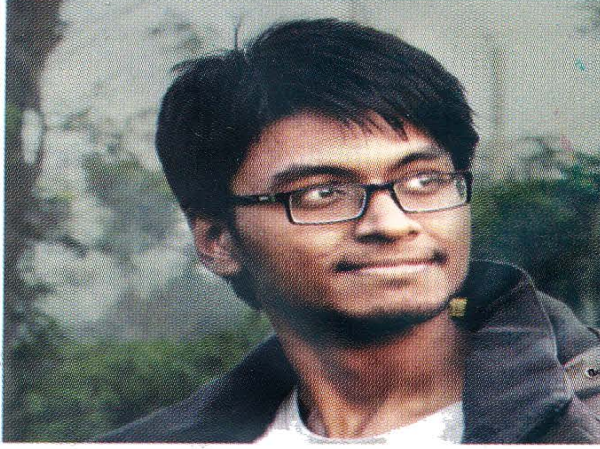
বইয়ের আলোর আলোকিত হোন

<http://www.facebook.com/pages/hatighar-prokashoni>

ISBN 964872984-4



964872984729847



কিশোর পাশা ইমনের জন্ম রাজশাহীতে। বর্তমানে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে যন্ত্রকৌশল বিভাগে অধ্যয়নরত আছেন। মৌলিক ছোটোগল্প ও উপন্যাস রচনায় বিশেষ আগ্রহ আছে তার। পত্রিকা, সঞ্চলন ও অনলাইন মাধ্যমে যেমন অসংখ্য মানসম্মত ছোটোগল্প লিখেছেন, সেই সঙ্গে প্রকাশিত মৌলিক উপন্যাসের তালিকায় রয়েছে *মিথস্ক্রিয়া* এবং *আগুনের দিন শেষ হয়নি*। তার মৌলিক ছোটোগল্প অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে নাটক। চিত্রনাট্য রচনায়ও হাতেখড়ি হয়েছে। এর পাশাপাশি *দ্য গার্ল অন দি ট্রেন*, *হিট ওয়েভ*, *অরফান এক্স* এবং *ফলেনসহ* বেশ কিছু বিশ্বমানের উপন্যাস অনুবাদ করেছেন। *মৃগতৃষা* তার তৃতীয় মৌলিক গ্রন্থ।

# মিথাক্রিয়া

কিশোর পাশা ইমন

The Online Library of Bangla Books  
**BANGLA BOOK**.ORG





বাতিঘর প্রকাশনী

মিথস্ক্রিয়া

কিশোর পাশা ইমন

**Mithoskria**

Copyright©2016 by Kishor Pasha Imon

গ্রন্থস্বত্ব © কিশোর পাশা ইমন

প্রচ্ছদ : ডিলান

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ : একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, কম্পোজ : লেখক

মূল্য : তিনশত বিশ টাকা মাত্র

The Online Library of Bangla Books  
**BANGLA BOOK**.ORG

## লেখকের কথা :

ছোটগল্প লেখা ছিলো আমার শখ। পরবর্তিতে কাজটা নেশায় পরিণত হলো। অদ্ভুত, ব্যাখ্যাহীন বিষয়ের প্রতি ছোটবেলা থেকেই আমার আগ্রহ। এরকম এক কৌতুহলোদ্দীপক বিষয় পেয়ে গেলাম একদিন। ইন্টারনেট থেকে পাওয়া তথ্যকে কখনই সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করা চলে না, আমিও করলাম না। শত শত লিংক ঘাঁটতে হয়, এক জায়গাতে পাওয়া তথ্য আরেক জায়গায় পাওয়া তথ্যের সাথে ক্রস রেফারেন্স করতে হয়, তারপর যেটুকু তথ্য অবশিষ্ট থাকে তার সাথে নিজের বিচারবুদ্ধিকে মেলাতে হয়। এরপর পাওয়া যায় সত্যের সবচেয়ে কাছাকাছি কোন তথ্য। ধাপগুলো মেনে চলেও সেই বিষয়টির যতটুকু জানলাম, তাতে আশ্চর্য না-হয়ে পারলাম না। বিভিন্ন গবেষকের পরিশ্রমের ফসল বেশ কিছু ভিডিও দেখলাম। তাদের আলোচনা শুনলাম। এরপর বিষয়টির ওপর ছোটগল্প লিখলাম একটা, কিন্তু সম্বুট হতে পারিনি।

বাংলাদেশে সমসাময়িক বিষয়বস্তুর এত বেশি মিল পেলাম, ‘কাকতাল’ বলে চালিয়ে দেয়া অসম্ভব হয়ে গেলো। আরও পড়াশোনা করতে থাকলাম বিষয়টি নিয়ে, অদ্ভুত ব্যাপার-যতই পড়লাম, ততই চমকলাম। মনে হলো, বাংলাদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা এই রহস্যের ওপর না লেখাটা বড্ড অন্যায় হবে। সেখান থেকেই জন্ম নিলো এই উপন্যাস।

ভেতরে যেসব বর্ণনা দেয়া হয়েছে সে-ব্যাপারে আমি কোন মন্তব্য করবো না। আশি শতাংশ সত্যিকারের তথ্যের সাথে বিশ শতাংশ অনুমান মেশাতে হয়েছে আমাকে। পাঠকের যদি কোন তথ্যের ব্যাপারে সংশয় থেকে থাকে তিনি হাতের কাছেই ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিনগুলো ঘেঁটে দেখতে পারেন।

আর বিশ্বাসের প্রশ্ন?

পাঠক ইন্টারনেট বা বইপুস্তক ঘেঁটে যদি মনে করেন, ফ্যাক্টসের সাথে আমার কল্পনাপ্রসূত ব্যাখ্যা অদ্ভুতভাবে মিলে যাচ্ছে, তবে তাকে বিশ্বাস করতে আমি নিষেধ করবো না। নয়তো বইটিকে স্রেফ একটি ফিকশন হিসেবেই পড়ার জন্য অনুরোধ করবো।

রহস্যময় এই পার্থিব জগতের অমীমাংসিত কিছু রহস্য চিরকাল গোপনই থাকুক।

কিশোর পাশা ইমন

০১.০২.২০১৬ ইং



উৎসর্গ :

যারা না থাকলে বইয়ের প্রতি আত্মহ জন্মতো না ,  
যে না থাকলে পাঠকের লেখকরূপ বোঝা সম্ভব হত না  
এবং যে না থাকলে এই উপন্যাসটি লেখাই হত না...

আব্দুল মান্নান শেখ ও আসমা মান্নান, ইব্রাহীম  
আহমেদ এবং আফরা আজমাইনকে

## সূচনা

যুগলটির বয়স বেশি না। ছেলেটির ঠেলেঠেলে উনিশ, মেয়েটির সতের।

বিল্ডিংয়ের পেছনে কোন মানুষ নেই। তিনটি গাড়ি সুন্দর করে পার্ক করা। পার্কিংলট হিসেবে বাড়ির পেছনের জায়গাটুকু ব্যবহারের উদাহরণ ঢাকায় বিরল। ব্যাকডোরটা হা-করে খোলা থাকে রাত এগারোটা পর্যন্ত। বাসিন্দারা গাড়ি পার্ক করে ওপথে সুন্দর করে ঢুকে যেতে পারে।

রাত এগারটার পর আধঘণ্টা অতিবাহিত হয়েছে। দরজা বন্ধ থাকায় পার্কিংলটে এখন কেউ নেই। গাড়ি থেকে আস্তে করে বের হয়ে সাবধানে দরজা লাগাল রুহান। ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই তার, তবে গাড়ি ভালই চালায়। আজকে ছোটখাটো একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে অবশ্য। এ মুহূর্তে ফ্রন্ট বাম্পারের নড়বড়ে অবস্থা দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করলো সে। বাবা যখন দেখবে খবর হয়ে যাবে!

অন্যপাশে এসে প্যাসেঞ্জার সিটের দরজা খুলে দিল। আপাতত দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই, সময়েরটা সময়ে দেখা যাবে। রুহান চিত্তার ছাপ সরিয়ে মুখে চমৎকার হাসিটা ফুটিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল প্রেমিকার দিকে। কাঁধ পর্যন্ত কাটা চকচকে চুল দুলিয়ে ওর দিকে ঘুরে তাকালো অরনী, তারপর হাত ধরে গাড়ি থেকে বের হয়ে এলো।

বের হয়েও হাতটা ছাড়লো না মেয়েটি। রুহান ওকে দেওয়ালের দিকে নিয়ে গেলো। চোখ বন্ধ করে ফেললো অরনী। ঠোঁটের কাছে রুহানের ঠোঁটের স্পর্শ পেতে চুপচাপ গ্রহন করলো আদরটুকু।

অরনীর ঘন ভ্রুর দিকে তাকায় রুহান। “ভেবে দেখ, বাসায় কেউ নেই। এখন কি তোমার যাওয়াটা খুবই দরকার?”

রুহানের গলা জড়িয়ে ধরে অরনী। “আম্মু মেরে ফেলবে...আরেকদিন। এখন একটু ধরে থাকো।”

বিকট অথচ ভোঁতা শব্দটার সাথে ছিটকে এলো কাঁচ। ভারি জ্যাকেটের কারণে রুহানের পিঠের কোন ক্ষতি হলো না অবশ্য। ছিটকে দেওয়ালের দিকে সরে গেছে অরনী, দুই চোখ বিস্ফারিত। রুহানের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে আছে আতঙ্কিত চোখে। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালো রুহান। এক নজর দেখেই বুঝতে পারলো, বাম্পার নিয়ে চিন্তা করার আর কোন কারণ নেই। বাবার চোখ ওদিকে পড়ার কথা নয় আর।

গাড়িটার ছাদের ওপর এসে পড়েছে একটি মানবদেহ। সাততলা বিল্ডিংয়ের ছাদের ওপর থেকে এই পতন। দেখামাত্রই বুঝতে পারলো রুহান। ঝট করে তাকালো ওপরের দিকে।

বিশালদেহের কেউ দাঁড়িয়ে ছিলো ওখানে, তাকানোমাত্রই নিমেষে উধাও হয়ে গেলো সে।

কাঁপা পায়ে সামনে এলো রুহান, গাড়ির ছাদ তুবড়ে দিয়ে পড়ে থাকা মানুষটির মাথা থেকে ঘিলু বেরিয়ে এসেছে, রক্তের ধারা গড়িয়ে উইন্ডশিল্ডের ওপর দিয়ে নেমে এসেছে বনেটের ওপর। ছড়িয়ে গেছে অনেকটা। পেছনের কাঁচ ভাঙলেও উইন্ডশিল্ডটা টিকে গেলো কিভাবে সেটা একটা বিস্ময়। পড়ে থাকা দেহটার মুখের অবশিষ্টাংশ দেখে আঁতকে উঠলো।

“মাই গড!” বিড় বিড় করে বলে রুহান।

ওপর থেকে পড়া দেহটির মাথা সামনের কাঁচের ওপর দিয়ে ঝুলে গেছে। উন্মুক্ত গলায় মানুষের দাঁতের কামড়ের চিহ্নটা চোখ এড়ায়নি ওর।

The Online Library of Bangla Books  
**BANGLA BOOK**.ORG

## অধ্যায় ১

হাতে চাবি দোলাতে দোলাতে লিফটের দিকে হেটে যাচ্ছে ডিটেক্টিভ আসিফ আহমেদ। অকারণেই ভাল হয়ে আছে তার মনটা।

উইকএন্ডে ঢাকার বাইরে ট্যুর দিয়ে এসে নিরবিচ্ছিন্ন লম্বা ঘুমের পর কর্মক্ষেত্রে আসার আনন্দের সাথে কোন কিছুর তুলনা হয় না। গত পরশু সমাধান করা কেসটি এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের সফলতম একটি কেস। শুধু হোমিসাইড নয়, ডিটেক্টিভ ব্রাথের আর কোন শাখায় এত জটিল কেস আগে কখনও আসেনি।

রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডগুলো সাধারণত অমীমাংসিত হয়ে থাকে। এপক্ষ বা ওপক্ষের বাঁধা এসে পড়ে ঘন ঘন। বাঁধা দেওয়া হয়েছিলো আসিফকেও। গত তিন মাস ধরে ওকে শুধু ছোট্টাছুটি করতে হয়েছে। নিজের বাসায় ঘুমানোর সময় বালিশের নিচে রাখতে হয়েছে পিস্তল। সরকারি দলের এমপির দিকে সব ইঙ্গিত সরে গেলেও থামেনি আসিফ। হাইপোথিসিস নয়, প্রমাণ জোগাড় করে তবেই ক্ষান্ত দিয়েছে।

এমপিসাহেব আপাতত হিয়ারিংয়ের জন্য অপেক্ষা করছেন। তবে সংবাদপত্রগুলো সেই হিয়ারিং পর্যন্ত অপেক্ষা করার মতো ধৈর্য রাখে না। আসিফ জানতো, বাসা পর্যন্ত ধেয়ে আসবে তারা। কাজেই ঢাকা থেকে একরকম পালিয়েই গেছিলো, বান্দরবানের পাহাড়ি এলাকায় আড়াই দিন হাইকিং করে হাসিমুখে ফিরে এসেছে কর্মক্ষেত্রে।

লিফটের দরজা খুলে যাওয়ার সাথে সাথে সেই হাসিটা মুছে গেলো। আসিফকে দেখে ভেতরে দাঁড়ানো মানুষটির মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠেছে।

“গুড মর্নিং, আসিফ। সেলিব্রেটি অফ দ্য মোমেন্ট!” তিক্ততার সাথে বলল ডিটেক্টিভ রেজা।

কাঁধ ঝাঁকালো আসিফ। “গুড মর্নিং।”

রেজাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে লিফটে ঢুকে যায় ও। এই লোকের মাথায় ভাল রকমের সমস্যা আছে। একই পদমর্যাদায় কাজ করলেও সব সময় আসিফকে প্রতিদ্বন্দ্বি ভাবে সে। হোমিসাইডে যোগ দেওয়ার পর থেকেই এসব ফালতু রেযারেশির সূচনা ঘটিয়েছে ডিটেক্টিভ রেজা। প্রতিদ্বন্দ্বির বড় রকমের সাফল্য দেখে এখন হিংসায় জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে।

মাথা থেকে রেজাকে বিদায় করে দিয়ে লিফট থেকে বের হয়ে এলো আসিফ। দু-পাশের বেশ কয়েকটা কিউবিকলের মাঝখানের লম্বা পথ ধরে এগিয়ে গেলো। সিনিয়র আর জুনিয়র অফিসারদের ব্যস্ততা চলছেই। বাংলাদেশ এমন একটা দেশ যেখানে মার্ডার কেসের কোন অভাব নেই! যতবার এই চিন্তাটি আসে তিক্ত এক অনুভূতি হয় তার।

ডেকের কাছে আসতেই আচমকা সামনে পড়ে গেলো মেয়েটি! কফি হাতে



উল্টোদিক থেকে আসা তৃণার সাথে আরেকটু হলেই ধাক্কা লেগে যাচ্ছিলো। একটু সরে দাঁড়ালো আসিফ।

“কেমন যাচ্ছে সব, মিস তৃণা?” ভদ্রতা করে প্রশ্নটা করলো সে।

সুন্দর একটা হাসি উপহার দেয় তৃণা। “এভরিথিংস গ্রেট! আপনার জন্য দিনটা আরও চমকৎকার হতে যাচ্ছে সম্ভবত।”

ষড়যন্ত্রকারীদের মতো করে চোখ টিপ দেয় মেয়েটি।

“মানে?” ক্র কুঁচকে গেলো আসিফের।

“হিটলার আপনাকে খুঁজছে। ডিপার্টমেন্টে ঢুকে প্রথমেই আপনাকে তলব করেছে আজ।”

এইমাত্র তৃণা যাকে ‘হিটলার’ বলে সম্বোধন করেছে তিনি হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের প্রধান, কমিশনার শাহেদ জামান। আর্মিতে ছিলেন লম্বা একটা সময়, এখন পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে এসে সামলাচ্ছেন হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট। আর্মির মানুষ হলেও বেশ হাসিখুশি ব্যক্তিত্ব তার। কাজের সময় ওই হাসি অবশ্য ধমকে পাল্টে যায়, তবুও কোনমতেই তাকে হিটলার বলে ডাকার যৌক্তিকতা নেই।

তবে এই সম্বোধন তিনি অধীনস্থদের কাছ থেকে অহরহ পেয়ে থাকেন কেন, সেটা আসিফ আজও বের করতে পারেনি। শ্রদ্ধা আর ভালবাসার মিশেল একটা অনুভূতি এরজন্যে দায়ি থাকতে পারে। দায়ি থাকতে পারে প্রতাপের তুলনায় তার দৈর্ঘ্যের স্বল্পতাও! তবে ‘হিটলার’ তাকে খুঁজছে শুনে আসিফের ক্র কুঁচকে গেলো। চাবিটা ডেস্কের ওপর ছুঁড়ে ফেলে নিজের চেম্বার থেকে দ্রুত বের হয়ে এলো সে। হিটলারের তলব অগ্রাহ্য করার মতো নয়।

কমিশনারের দরজায় প্রথমে টোকা, তারপর হালকা ফাঁক করে মাথা ঢুকিয়ে দিল আসিফ। “স্যার?”

চওড়া হাসি ফুটে উঠলো শাহেদ জামানের মুখে। “কাম ইন, আসিফ...কাম ইন!”

ধীরপায়ে ঢুকে পড়ল সে। হোমিসাইড মানে প্রায় প্রতিদিন মরদেহ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি। মনের মাঝে বড় ধরনের চাপ পড়ার কথা। অথচ ডিপার্টমেন্টে এসে তেমন কোন চাপ আজতক অনুভব করেনি সে। উপন্যাস কিংবা মুভিগুলোতে হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের কমিশনার চরিত্রগুলোকে গম্ভীর টাইপের মানুষ হিসেবে দেখানো হয়, কিন্তু শাহেদ জামান তাদের কাতারেই পড়েন না। তার সদহৃদয় মুখ কাজের চাপ অর্ধেকটা কমিয়ে দেয়। ডিপার্টমেন্টের প্রত্যেকে এ কারণেই হয়তো তাকে এত ভালবাসে।

চেয়ার টেনে বসে পড়ল আসিফ। “ডেকেছিলেন, স্যার?”

জবাব না দিয়ে তার দিকে আজকের পত্রিকাটি ঠেলে দেন শাহেদ জামান। বড় করে ওখানে ছাপা হয়েছে বিরোধিদলীয় নেতার হত্যারহস্য সমাধানের কেচ্ছা, একেবারে প্রথম পাতায়! আসিফের ছবি বা বক্তব্য কোথাও নেই। সকালেই খবরটি প

ছে সে। ও দুটোর কোনটি থাকার কথা ছিলো তা-ও নয়। সাংবাদিকেরা তার নাগাল পায়নি। অর্ধেক সত্য ঘটনার সাথে বাকি অর্ধেক কল্পনা মিশিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে লেখা হয়েছে রিপোর্টটাতে। তাতে আসিফের আপত্তি নেই, যতক্ষণ প্রেস থেকে দূরে থাকতে পারছে ততক্ষণ কে কি রিপোর্ট করলো তা নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। পৃথিবীতে সাংবাদিক প্রজাতি থেকে বিরক্তিকর কিছু নেই—এমন ধারণার উৎপত্তি এসব রিপোর্ট থেকেই আসে।

আসিফের ইন্টারভিউ নিতে পারলে তাদের রিপোর্ট এর থেকে ভাল কিছু হত এমনটাও নয়। কিছুটা রস তারা মেশাতোই, তাতে করে কিছু নাটকিয় মিথ্যে যোগ হত খবরে। সুতরাং বান্দরবান পালিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট কারণ আসিফের ছিলো।

“বহুদিন পর আমাদের সমালোচকদের দাঁতভাঙা জবাব দেওয়া গেছে, কি বলো?” প্রিয় শিষ্যের দিকে তাকালেন শাহেদ জামান। “হেল অব অ্যা জব, মাই বয়!”

বিনীত একটা হাসি দেয় আসিফ, কিছু বলে না। বলার আছেটাই বা কী? কমিশনারের হাসির পেছনে অনেক কারণ লুকিয়ে আছে। দেশ আলোড়িত সফল কেস—কাজেই বাজেট বাগাতে সুবিধা হবে, এটা একটা ভাল কারণ। আর কিছু হোক বা না হোক, শেষ কেসটি ডিপার্টমেন্টের জন্য অর্থনৈতিক সুখবর এনে দিয়েছে।

স্কেচ আর্টিস্ট নিয়োগ দেবার জন্য আসিফ অনেক আগে থেকে চাপাচাপি করছে কিন্তু বাজেটের দোহাই দিয়ে তাকে নিবৃত্ত করে গেছেন শাহেদ জামান। সরকারি সংস্থার অসুবিধেটুকু সে বোঝে, তারপরও হতাশ হতে হয় মাঝেমধ্যে।

পাশের দেশ ভারতেও হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টগুলো তদন্তের সুবিধার্থে স্কেচ আর্টিস্ট ব্যবহার করে। উন্নত দেশগুলোতে তো এমন আর্টিস্ট অপরিহার্য। সেদিক থেকে পিছিয়ে আছে ওরা।

প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা থেকে খুনিকে ধরে ফেলাটা অনেক কঠিন। তবে এমন বর্ণনা থেকে একজন আর্টিস্ট আসল চেহরার কাছাকাছি একটি পোর্ট্রেইট আঁকতে পারে।

“যাক্গে, যেটা বলতে তোমাকে ডেকেছিলাম, সাংবাদিকরা হন্যে হয়ে খুঁজছে তোমাকে কিন্তু পাচ্ছে না। ওদেরকে বলেছি, কঠিন কেস শেষ করে মানসিক বিশ্রাম নিতে দুটো দিন ছুটি নিয়েছো। তবে আজ ওরা আবার আসবে। দৈনিক পত্রিকা আর ডেইলি সানিউজ থেকে রিপোর্টার আসছে সকাল দশটায়। ওদের একটু সময় দিতে হবে।”

দু-হাতের আঙুলগুলো এক করলো আসিফ। “স্যার, প্রেসের ব্যাপারে আমার রিজার্ভেশন আছে, আপনি জানেন। ওদের কথা দেওয়ার আগে আমাকে একবার ফোন দিলে বোধহয় ভাল হত।”

শাহেদ জামানের হাসি মিইয়ে গেলো। “একটা ভাল রিপোর্ট আমাদের দরকার আছে। ক-দিন আগে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট জহির খানের মেয়ের খুনিকে খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হয়েছি আমরা। মিডিয়াগুলো তখন একেবারে ধুয়ে দিয়েছিলো আমাদের। এতে জহির খানেরও হাত ছিলো, তবে ভদ্রলোককে দোষ দিতে পারি না। ব্যর্থতা

আমাদেরই ছিলো। এখন ডিপার্টমেন্টের দুর্নাম ঘোচানো দরকার। সুনাম ফিরিয়ে আনার জন্য সফল একটি কেস নিয়ে প্রেস কনফারেন্স করার চেয়ে ভাল কিছু আর হতে পারে না।”

আসিফ চুপ করে থাকে। এসব তার জানা আছে কিন্তু মন সায় দিচ্ছে না।

হেসে ফেললেন শাহেদ জামান। “তোমার সাংবাদিক বিমুখতার কথা প্রেসের ওরা জানে। সেজন্যই তোমাকে প্রেস কনফারেন্সের জন্য আলাদা করে ডাকাডাকি করেনি। বরং আমাদের কনফারেন্স রুমেই এটার আয়োজনের অনুমতি চেয়েছিলো ওরা, দিয়েও দিয়েছি। তোমাকে শুধু নিজের ডেস্ক থেকে কনফারেন্স রুম পর্যন্ত যেতে হবে।”

আসিফ জানে, ডেস্ক থেকে কনফারেন্স রুমে যাওয়াটা প্রধান সমস্যা নয়। পাবলিকের সামনে নিজের কাজের কথা তুলে ধরতে ভীষণ অপছন্দ করে সে। একজন হোমিসাইড ডিটেক্টিভ পরিচিত মুখ হয়ে উঠলে সেটা সমস্যার সৃষ্টি করবে। খুনি যদি এক মাইল দূর থেকে আসিফের চেহারা চিনতে পেরে কেটে পড়ে তখন ব্যর্থতার দায়ভার এই সাংবাদিকরা নেবে না, তাকেই নিতে হবে। কিন্তু এ মুহূর্তে এটা এড়িয়ে যাবার কোন সুযোগ নেই।

নিমের তেতো গেলার মতো চেহারা করে মাথা দোলালো সে। “ওকে, স্যার।”

খুশি হয়ে গেলেন শাহেদ জামান। “আমাদের বাজেটের পক্ষে জিনিসটা পজেটিভ হবে। স্কেচ আর্টিস্টের কথা আমার মাথায় আছে। এবার বাজেটে ওটা ঢোকাতে পারবো আশা করি।”

একটু হাসলো সে। “ধন্যবাদ, স্যার।”

উঠে দাঁড়ায় ও, কথাবার্তা মোটামুটি শেষ। নিজের রুমে ফিরে যাওয়াটা দরকার। অতীতের কিছু অমীমাংসিত রহস্যকে পর্যায়েক্রমে সমাধান করতে দেওয়া হয়েছে ওকে। কালের পরিক্রমায় কিছু রহস্যের ট্রেইল মুছে গেছে কিন্তু চেষ্টা করলে হয়তো বাকিগুলো এখনও সমাধান করা সম্ভব। টাটকা মার্ডার কেস হাতে না থাকলে পুরাতন কেসগুলো সমাধানের চেষ্টা করতে হয়—এটাই ওদের রুটিন।

মাত্র ঘুরে দাঁড়িয়েছে আসিফ, তখনই শাহেদ জামানের কম্পিউটার থেকে একটা বিপ্ শোনা গেলো।

“মাই গড!”

বসের মুখে বিস্ময়সূচক শব্দটা শুনে ফিরে তাকালো সে। তার চোখে প্রশ্ন। ডিসপ্লের দিকে ঝুঁকে পড়েছে দ্রুত কিছু টাইপ করছেন শাহেদ জামান। তারপর সোজাসুজি তাকালেন আসিফের দিকে।

“প্রেস কনফারেন্স ক্যানসেল! একটা মার্ডার হয়েছে!”

কপালের সামনে চলে আসা এলোমেলো চুলের ফাঁক দিয়ে তাকায় আসিফ।

বিস্মল দৃষ্টি দিলেন শাহেদ জামান। “ভিআইপি একজন! তোমাকে এই কেসে চাইছে ওরা!”

“চমৎকার!” তিজতার সাথে বলে বসলো অল্পবয়েসি ছেলেটা।

হাইওয়ে ধরে ছুটছে ওদের গাড়ি, সামনের ভারি ট্রাকটা দেখে বিরক্ত হলো ডিটেক্টিভ আসিফ আহমেদ, গতি বাড়িয়ে ওভারটেক করলো ওটাকে। দিনের বেলায় ট্রাক চলছে কেন? এটা সম্ভবত আটকে গেছিলো কোথাও, সেজন্য সকাল নয়টাতেও একটা ট্রাককে সহ্য করতে হচ্ছে ওদের। জিয়ার দিকে তাকালো সে, গন্তব্যের নাম শুনেই গলায় তিজতা ফুটে ওঠার পেছনে যথেষ্ট কারণ সহকারির আছে। তাকে মোটেও দোষ দেয়া যায় না।

“খ্যাতির বিড়ম্বনা বলে একটা কথা আছে, জিয়া। সম্ভবত এখন থেকে ওটাতে আমাদের অভ্যস্ত হতে হবে।”

কাঁধ ঝাঁকালো সহকারি। “তাই বলে গাজীপুরে আমাদের পাঠানো হবে? ওদিকের পুলিশ ডিপার্টমেন্ট কী করছে? অথবা ডিবি? প্রথমে ওদের হাতে যাওয়ার কথা। ওরা না সামলাতে পারলে আমাদের ডাকতে পারতো। প্রটোকলের বাইরের অর্ডার মানতে আমরা বাধ্য নিশ্চয় নই?”

আসিফও তাই মনে করে। তবে ত্যক্ত শিষ্যকে কিছু একটা বোঝানো দরকার।

“ভিক্টিম বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ। প্রফেসর তানভীর জালাল হলেন কেমিস্ট্রির গুরু। জ্ঞান-বিজ্ঞানে আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিমান। পশ্চিমাবিশ্ব গুরুত্ব দেয় মানুষটাকে। হারভার্ডে একমাত্র বাংলাদেশি হিসেবে ডিপার্টমেন্ট অব কেমিস্ট্রি অ্যান্ড কেমিকেল বায়োলজিতে শিক্ষকতা করেছেন। ফিজিক্সের কিছু তত্ত্বও আছে তার-যতটুকু শুনেছি। আন্তর্জাতিক মহলে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছে ওগুলো। এরকম একজন মানুষ খুন হয়ে গেলে তো আর খুনিকে পার পেতে দেওয়া যায় না।”

মাথা ঝাঁকায় জিয়া। “তা ঠিক। দেরি করলে আলামত নষ্ট হতে থাকে। তবে স্থানীয় পুলিশ আর গোয়েন্দাদের উচিত ছিলো নিজেদের কাজের ওপর আস্থা রাখা।”

“ওদের আস্থা হয়তো আছে, নেই জেনারেল জাহিদ ফরমানের। এই কেসটা নেওয়ার জন্য তিনিই আমাদের রিকমেন্ড করেছেন।”

কয়েক সেকেন্ডের জন্য চুপ মেরে গেলো জিয়া। “জেনারেল জাহিদ ফরমান?”

এক পাগলা বাইকারের ওপর বিরক্ত হয়ে দু-বার হর্ন বাজালো আসিফ। “হুম।”

তার সহকারি ডিপার্টমেন্টে পৌছামাত্রই তাকে নিয়ে গাজীপুরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছে আসিফ। সেজন্য বিস্তারিত জানানোর সময় পায়নি। আসিফ কথা দিয়েছিলো যেতে যেতে ব্রিফ করবে তাকে। শুরুতেই জেনারেলের নাম শুনে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে সে।

জেনারেল জাহিদ ফরমান বাংলাদেশ আর্মির প্রধান। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে

এবং চট্টগ্রাম বিদ্রোহ দমন করে শ্রদ্ধা কুড়িয়েছেন। ব্রিগেডিয়ারদের চিফ ইন্সট্রাক্টর ছিলেন—সেখান থেকে সিনিয়র নয়জন অফিসারকে ডিঙিয়ে হয়েছেন বাংলাদেশ আর্মির চিফ। সেই জাহিদ ফরমান যদি হোমিসাইডের কাউকে চান তাহলে সেটা সাধারণ কোন ঘটনা হতে পারে না।

এর পেছনে নিশ্চয় যুক্তি আছে। দেশের সর্বোচ্চ সুনাম এনে দিয়েছেন প্রফেসর। তার সন্দেহজনক মৃত্যু—সম্ভবত হত্যাকাণ্ড—আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর জন্য বিরাট ব্যর্থতাই বটে। তবে এরকম হত্যাকারিকে ধরার কাজ বাংলাদেশ আর্মির নয়। তাদের সে ধরণের এখতিয়ার নেইও। সে-কারণেই আর্মি চিফ হোমিসাইডের কাছে সাহায্য চাইছেন।

জিয়ার বিভ্রান্তি লক্ষ্য করে আরেকটু বলে আসিফ, “জেনারেল মনে করছেন এই ঘটনার পেছনে বড় কোন শক্তি আছে। প্রধানমন্ত্রির অনুমতি আদায় করেছেন তিনি। হোমিসাইড দায়িত্ব নেওয়ার আগপর্যন্ত কঠোর প্রহরার ব্যবস্থা করেছেন। পুলিশের ওপর আস্থা রাখতে রাজি নন ভদ্রলোক। তানভীর জালাল নামকরা বুদ্ধিজীবী। আমাদের পুলিশ এধরণের কেস সামলাতে পারবে বলে তিনি মনে করেন না। তাছাড়া, প্রফেসরের কাছে জেনারেল জাহিদের যাওয়া-আসা ছিলো। জেনারেল তাকে গুরু হিসেবে মানতেন। আমাদের জেনারেলেরও কেমিস্ট্রি নিয়ে অগাধ আগ্রহ ছিলো।”

মাথা ঝাঁকালো জিয়া, আর কিছু বলল না। জেনারেলের রসায়ন-আসক্তি যে তার সুন্দর দিনটার এমন বারোটা বাজাবে তা কে জানত! তাদের ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব সারা বাংলাদেশের নয়। ঢাকাতেই দুটো হোমিসাইডের শাখা আছে। পুরো ঢাকায় ছোটোছুটি করা লাগে না ওদের।

এপাশে কেউ মরলে আমাদের। ওপাশে কেউ মরলে তোমাদের—এই নীতিতে চলে ওরা। সেখানে গাজীপুরে মার্ডার কেস সলভ করতে ছুটতে হলে বিরক্ত হওয়াই স্বাভাবিক। দেশের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হোমিসাইড ইউনিট হিসেবে প্রশংসা করা হোক বা না হোক, এই প্রটোকল-বহির্ভূত দৌড়াদৌড়ি জিয়াকেই করতে হচ্ছে। বসের দিকে তাকিয়ে অবশ্য হতাশ হতে হলো তাকে। আসিফের চেহারা বিরক্তির কোন লক্ষণ নেই, বরং দারুণ মুডে আছে সে। স্টিয়ারিং হুইলের উপর আঙুল নাচাচ্ছে।

কঠিন কেস পেলে বসের আর কিছু লাগে না। সেখানে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বহুল আলোচিত ব্যক্তিটির মৃত্যু-রহস্য নিয়ে মাথা ঘামানোর সুযোগ পেলো তাকে গাজীপুর ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাবে না, এটাই স্বাভাবিক। জিয়ার ধারণা, কেসটা তার বসের হাতে না এলেও ওখানে যেত আসিফ। বেগার খেটেও আনন্দ পেত খুব।

একঘণ্টা পর ওদের গাড়ি যখন মূল সড়ক থেকে একটা ইন্টার রাস্তায় নেমে গেলো তখনও আসিফ খোশ মেজাজেই আছে। ক্রাইম-সিনের যত কাছে যাচ্ছে তার উত্তেজনা যেন ততই বাড়ছে।

জিয়া এখন আর আসিফের দিকে তাকাচ্ছে না অবশ্য। সামনের বেড়াটা পাহারা দিচ্ছে পুলিশ, তাদের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর কিছু সদস্য। বাইরে তিনটি পুলিশের

গাড়ি আর দুটি আর্মির জিপ দেখা যাচ্ছে। প্রেসের লোকজন এখনও কিছু টের পায়নি, তবে এত কড়াকড়ি করলে তাদের চোখে পড়তে বাধ্য। হাসিখুশি ভাবটা মুছে গেলো আসিফের চেহারা থেকে। জেনারেল জাহিদ সম্ভবত একটু বেশিই বাড়াবাড়ি করছেন।

আর্মিদের অপেক্ষমাণ বহর ওদের গাড়ি থামিয়ে দিল, কোন এক মেজর সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে বসলো আসিফকে। কোন কথা না বলে আইডি কার্ড দেখিয়ে দিল সাথে সাথে খুলে গেলো প্রধান ফটক। ভেতরে ইটের রাস্তাটি আরও একশ গজ সামনে চলে গেছে, তারপর ছোটখাটো একটি ফোয়ারার দু-পাশে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে রাস্তাটি।

বামদিকে চমৎকার একটি ডুপ্রেক্স, ডানদিকে প্রফেসরের পার্সোনাল ল্যাব। এটাই বাংলাদেশের সবচেয়ে উন্নতমানের কেমিস্ট্রি ল্যাব। যে পর্যায়ে কাজ তিনি করেন তাতে অবশ্য এর দরকার আছে। বাংলাদেশে বসে বিজ্ঞানের জন্য কাজ করছিলেন, এ নিয়ে দেশবাসির গর্বের কমতি ছিলো না। এই শ্রেণির মধ্যে আসিফও পড়তো। প্রফেসরের দেশে থাকার কারণটা তাকে আরও বেশি মুগ্ধ করেছিলো।

প্রফেসরের স্ত্রী প্রথম সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সেই ছেলেকে নিয়ে আমেরিকাতে ভালই ছিলেন ভদ্রলোক, সিঙ্গেল ফাদার হিসেবে অল্পবয়স্কাদের কাছে তার আবেদন বেড়ে গেছিলো বেশ। ছেলের বয়স যখন পাঁচ, তখন থেকে সমস্যার শুরু। বিরল প্রজাতির আত্মাইটিসে আক্রান্ত হলো সে। ওই বয়সে এটা খুবই দুর্লভ। ডাক্তারের পরামর্শ ছিলো, কোন এক গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়ায় থাকা উচিত বিজয়ের। শীতকালীন পরিবেশ আত্মাইটিসের জন্য ভয়ঙ্কর।

ছেলেকে দূরে না পাঠিয়ে দেশে ফিরে আসার কথা ভাবলেন তখন প্রফেসর। এক টিলে মরলো দুই পাখি-ছেলের স্বাস্থ্যের জন্যও ভাল হলো, তিনিও ফিরে আসতে পারলেন নিজের দেশে। শিশুসন্তানের কথা বিবেচনা করে আর কখনোই বাংলাদেশ ছেড়ে তেমন একটা নড়েননি প্রফেসর। পানির মতো টাকা ঢেলে গাজীপুরে নিজের ওয়ার্কিং এনভায়রমেন্ট তৈরি করে নিয়েছেন। পেছনে হারভার্ডের পৃষ্ঠপোষকতা আছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়েও অসংখ্য কাজ করেছেন তিনি। জায়গাটার সুনাম ওরা আগেই শুনেছিলো, তবে চোখে দেখা হয়নি। এখন কাছ থেকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। জিয়া গেটের বাইরে থেকেই সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে থাকলো সেদিকে।

বাড়িটার সৌন্দর্য অতুলনীয়। প্রফেসরের প্রবাসি জীবনে কাজের পরিধি ছিলো দশদিকে বিস্তৃত। পানির মতো টাকা এসেছে-সেটা পানির মতোই খরচ করেছেন তিনি। ল্যাবটার আকৃতি ঠিক চারকোণার নয়-পাঁচটা দেওয়াল এর। ওপরের দিকে সূঁচালো হয়ে উঠে গেছে ধীরে ধীরে। চূড়োটা একেবারেই দেখা না। উচ্চতায় পঞ্চাশ ফিট হবে। চূড়ার বারো ফিট নীচে পুরো ল্যাবজুড়ে একসাইনে চলে গেছে ভেন্টিলেশন ডাক্ট।

ক্রাইম-সিনটা কোথায় সেটা আর আলাদা করে বলে দিতে হলো না ওদের। ল্যাবের সামনে পুলিশবাহিনীর একই রকম সতর্কতা দেখা যাচ্ছে। ধীরে ধীরে সেখানে গাড়ি পার্ক করলো আসিফ।



ল্যাবটিকে তিনটি প্রকোষ্ঠে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম প্রকোষ্ঠটি প্রবেশপথের কাজ করছে। নিরাপত্তার দিকটি গুরুত্বের সাথে দেখেছিলেন প্রফেসর। ভারি ইম্পাতের দরজা বাইরে। শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কি-কার্ড দিয়েই খোলা যায় সে দরজা। কি-কার্ডের সংখ্যা দুই। একটি থাকতো প্রফেসর তানভীর জালালের কাছে, অপরটি তার ঘনিষ্ঠ ও সহকারি রিয়াজুল করিম রাখতেন। দ্বিতীয় কি-কার্ড দিয়ে এখন দরজা খোলা হচ্ছে। এক্সট্রা কি-কার্ড না থাকলে ইম্পাতের ভারি দরজাটা ভাঙতেই নিঃসন্দেহে সারাদিন লেগে যেত।

দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠটাই মূল গবেষণাগার। নিচতলায় অন্তত বারোটা টেবিলে সাজানো আছে শত রকম কন্টেইনার। ছোট-বড়-মাঝারি, কাঁচের-প্লাস্টিকের। প্রতিটি কন্টেইনারের শরীরেই চমৎকার লেবেল লাগানো আছে। মাথা ঘুরিয়ে ল্যাবটিকে দেখলো আসিফ। বাইরের প্রকোষ্ঠ একটি দেওয়াল কমিয়ে ফেলেছে। তাতে এই ল্যাবটা স্রেফ পিরামিড আকৃতি পেয়েছে। আর সব ল্যাবের মতো এটার গঠনও তিনটি জিনিসের প্রতি খেয়াল রাখা হয়েছে—নিরাপদ, আরামপ্রদ আর শক্তির সঠিক ব্যবহার উপযোগি। এর স্থাপত্য নির্মাতাকে পূর্ণমান দিতেই হবে।

অনেক ওপরে কাজ করছে এয়ার কন্ডিশনগুলো। সেই সাথে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ভিন্নতর অবস্থান তাদের কাজের গতি করেছে আরও দ্রুত। এয়ার ডাক্টগুলো বাতাসের ভেন্টিলেশন ঠিক রাখছে। এটা ল্যাবের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ভেতরের বাতাসের ঘনত্ব আর তাপমাত্রা যাতে বাইরের সমান হয়। আর প্রয়োজনে ডাক্টগুলো বন্ধ করে এয়ারকন্ডিশন ব্যবহার করে কাজের উপযোগি বায়ুতাপমাত্রা জোগাড় করা সম্ভব।

ল্যাবটিকে তিনতলা বলা যায়, তবে সচরাচর যেরকম তিনতলা দেখা যায় সে-রকম নয়। সাধারণত একতলার ছাদের ওপর দোতলার মেঝে থাকলে এদেশিয়রা সেটাকে দোতলা বাড়ি বলে। এই ল্যাবের ভেতরের গঠন তেমনটা নয়। তিনটি মেঝে তিন উচ্চতায় আছে বটে, তবে তাদের কারোই কোন ছাদ নেই। ওপরে ওঠার সাথে সাথে সরু হয়ে এসেছে পিরামিড আকৃতির চারদেওয়াল। চোখা চুড়ো ছাড়া ছাদের কাজ করছে। সব মিলিয়ে দৃষ্টিনন্দন একটি স্থাপত্যকর্ম।

পেছনের শেষ প্রকোষ্ঠকে বলা যেতে পারে গুদামঘর। ওখানে পা রেখে আসিফ অনুমান করতে পারলো একটু আগে ছোট কন্টেইনারগুলোতে যা যা দেখে এসেছে তাদের প্রতিটিই এখানে বেশি করে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

গাজীপুরে রাসায়ানিক উপাদান সহজলভ্য নয়। প্রফেসরকে নিরবিচ্ছিন্ন গবেষণা চালাতে হলে অবশ্যই উপাদানগুলোর ভাল একটা মজুদ রাখতে হবে। সেটা তিনি রেখেছেন। এই গুদামঘরের দুটো অংশ-সামনের অংশে রাসায়ানিক মজুদ, পেছনে যান্ত্রিক যা সাহায্য তার লাগতে পারে সব জমিয়ে রাখা হয়েছে।

পুরো ল্যাবটা একবার ঘুরে এলো আসিফ। প্রতিটি সেন্ট্রিফিউজ, বায়োলজিক্যাল মাইক্রোস্কোপ, অ্যানালাইটিক্যাল ব্যালাস, বিকার, এলরেনোয়ার ফ্লাস্ক, স্পেকটো-ফটোমিটার, ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ, গ্যালিলিও থার্মোমিটার, গোল্ডলিফ ইলেকট্রোস্কোপ আর নাম না-জানা ইকুইপমেন্টগুলোর কাছে একবার করে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলো সে। তারপরে ফিরে এলো নিচতলার ঠিক মাঝখানে। সাদা রঙের টেবিলটার একপাশে চিত হয়ে পড়ে আছেন প্রফেসর। পঞ্চাশোর্ধ্ব একজন মানুষ, ব্রিন শেভ, কাঁচা-পাকা চুল মাথায়। চেহারা প্রজ্ঞার ছাপ, তবে এই মুহূর্তে তা পাল্টে গেছে যন্ত্রণায়। সাদার সাথে কালোর চেক করা নাইটগাউন পরনে। সামান্য দুমড়ে পড়ে আছে শরীরটা। মৃত্যুযন্ত্রণায় এমনটা হতে দেখেছে সে। মৃতদেহের পাশে বসে থাকা মানুষটাকে দেখে অবাক হলো আসিফ।

“তোফায়েল! তুমি এখানে কি করছ?”

দ্বিতীয় হাতে গ্লাভস পরতে পরতে হোমিসাইডের মেডিকেল এক্সামিনার বলল, “পাঠিয়ে দিল জরুরিভিত্তিতে...যেহেতু আপনার ইউনিটের সাথেই কাজ করি আমি।” পড়ে থাকা মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে ছোট করে দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। “বিখ্যাত হওয়ার মজা আছে। আপনি মারা যাওয়ার পর সেটা স্বাভাবিক মৃত্যু নাকি হোমিসাইড তা বোঝার আগে শুধু পুলিশ নয়, আর্মির গাড়িও ঘুর ঘুর করতে থাকবে বাসার চারপাশে, তাই না?”

ঢাকার কাজ ফেলে গাজীপুরের খুনের কেস সামলাতে তোফায়েলেরও ভাল লাগছে না, বুঝতে পারছে আসিফ। কাঁধ ঝাঁকালো ও। “এত আগেভাগে এখানে এলে কীভাবে?”

“হেলিকপ্টার দিয়ে।”

আসিফের দিকে তাকালো জিয়া। “একটা হেলিকপ্টার তো আমরাও পেতে পারতাম?”

শয়তানের মতো হাসলো তোফায়েল। “ওটা আসার আগেই গাড়ি নিয়ে বের হয়ে গেছিলেন আপনারা।”

পকেটে ফোনটা কাঁপছে। কমিশনার শাহেদ। ওটা কানে ঠেকিয়ে লুপিয়ে থেকে বের হয়ে আসলো আসিফ। “ইয়েস স্যার?”

“আমাদের একজন মেডিকেল এক্সামিনারকে তোমার টিমের সাথে পাঠাতে বলেছিলেন জেনারেল। তাই তোফায়েলকে পাঠিয়ে দিয়েছি। গুলি আঁড়াও আর কাউকে যদি লাগে জানাবে।”

দেখা যাচ্ছে, হোমিসাইডের উন্নত প্রযুক্তি আর দ্রুত কাজ করার ক্ষমতার ওপর জেনারেল ভালই আস্থা রেখেছেন। নতুন ডিপার্টমেন্ট ইলেও চোখে পড়ার মতো দক্ষতা নিয়ে কাজ করছে এর সদস্যরা। আসিফ শুধু বলল, “জি, স্যার।”

“আরেকটা কথা। আমাদের জুরিসডিকশন নেই ওখানে। কাজেই কিছু করার আগে স্থানীয় থানার সাথে কথা বলে নিও।”

“জি, স্যার।”

সযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেলো আসিফের। এই কেসে কাজ করার সময় স্বাধীনতা বলে কিছু থাকবে বলে মনে হচ্ছে না। থানার দিকে তাকিয়ে থাকার চেয়ে বিরক্তিকর আর কী হতে পারে? ইটের রাস্তা দিয়ে ছুটে আসা সাদা ভ্যানটাকে দেখে মেজাজের আরও অবনতি হলো। ওটার গায়ে লেখা আছে ‘ক্রাইম-সিন ইউনিট।’ ল্যাবের পাশে পার্ক করে ভ্যান থেকে নেমে আসছে সিএসইউয়ের ড্রেস পরে থাকা একদল মানুষ।

নেতাগোছের লোকটাকে নিজের ব্যাজ দেখালো আসিফ। “লাশ খুঁজে পাওয়ার কতক্ষণ পরে সিএসইউ আসে?”

কাচুমাচু হয়ে গেলো লোকটার মুখ। “সরি, স্যার। আমাদের অফিস থেকে জানাতে দেরি করেছে।”

আর কিছু না বলে ল্যাবের ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। ক্রাইম-সিন ইউনিট সবার আগে লাশের কাছে পৌঁছাবে এটাই নিয়ম। ডিটেক্টিভকে খবর দেওয়ার আগে ক্রাইম-সিন ইউনিটকে খবর দেওয়ার রেয়াজ। তারা এসে সিনটা যাতে নষ্ট না-হয়ে যায় সেদিকটা দেখবে, আলামত সংগ্রহ করবে, ছবি তুলবে। তাদের দেরি হলে এভিডেন্স উদ্ধাও অথবা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

“কি বুঝলে, তোফায়েল?”

লাশের নাক থেকে মুখ তুলল ছেলেটা। “সম্ভবত পয়জন, স্যার। তবে পয়জনটা মুখ দিয়ে প্রবেশ করেনি।”

“সময়টা?”

“আনুমানিক তিনটা?”

“পোস্ট মর্টেম করতে করতে লাশ পচে যেতে পারে। অসহ্য রকম দেরি করতে জানে এদিকের লোকজন।” ল্যাবে মাত্র ঢুকতে থাকা সিএসইউকে দেখে বলল আসিফ।

“মর্টেম ছাড়া বলতে পারবো না কি ধরনের বিষ,” অস্থির ভঙ্গিতে জানালো তোফায়েল।

মাথা দোলালো আসিফ। এটা তার জানা আছে। জিয়া অসহায়ের মতো বসের দিকে একবার তাকালো। ওর দিকে না ফিরে আবারও ল্যাবের বাইরে ফেরত হয়ে এলো আসিফ। রীতিমত বিরক্ত লাগছে তার। সব কেমন যেন হ-য-ব-ক-শ অবস্থা। মোবাইল বের করে কমিশনারকে ফোন দিল। একবারেই ফোন ধরলেন কমিশনার।

“স্যার, বডিটা আমাদের ডিপার্টমেন্টের মর্গে রাখতে চাইছি। এখানে পরিবেশ খুব একটা সুবিধার না। এদের সাথে তাল মেলাতে গেলে পিছিয়ে পড়বো।”

আসিফের ডিম্যান্ডের কথা শুনে একটু থমকে গেলেন শাহেদ জামান। “দেখছি, কী করা যায়,” আশ্তে করে বললেন তিনি।

চকচকে একটা মোটরসাইকেল এগিয়ে এলো তাদের দিকে। সিএসইউ ভ্যানের পাশে ওটা থামলে নেমে এলো একজন মানুষ। মাঝবয়সি, ঘন গোঁফ মুখে, শ্যামবর্ণ।

বেল্টের উপর দিয়ে একটা ভুঁড়িরও আভাস আছে। মোটরসাইকেল যতই নিখুঁতভাবে চালাক, হাঁটার ভঙ্গিটা থলথলে। সরাসরি আসিফের দিকে এগিয়ে এলো সে। “আপনি ঢাকা থেকে এসেছেন?”

মাথা ঝাঁকালো আসিফ, মানুষটির পরিচয় অনুমান করে নিয়েছে। মোবাইল পকেটে পুরে হাত বাড়িয়ে দিল। “ডিটেক্টিভ আসিফ আহমেদ।”

“আমি মির্জাপুরের ওসি গৌরব রায়,” হাসিমুখে হাত বাড়ালো সে, “যেকোন ধরনের সাহায্য করতে বলা হয়েছে আপনাকে...আপনার টিমকে।”

কোমরে হাত দিয়ে সিএসইউয়ের ব্যস্ততা দেখে গৌরবের দিকে তাকালো আসিফ। এই মানুষটার এখানে আসার কথা আরো আগে। সম্ভবত নিজের ট্রুপকে পাঠিয়ে দিয়ে বাড়িতে আয়েশ করে নাস্তা করছিলো, আর নিশ্চয় মনে মনে বলছিলো, গুরুত্বপূর্ণ একজন মারা গেছে তো কী হয়েছে! অথচ সে-সময়টায় ট্রাফিক আইন ভাঙতে ভাঙতে গাড়ি হাঁকাছিলো আসিফ। এসব নিয়ে অবশ্য অভিযোগ তুললো না ও। এখানে কাজ করতে হলে এই ওসি লোকটার সাহায্য লাগবে।

“প্রফেসরের ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট আর ছেলের সাথে কথা বলার দরকার। সম্ভব হলে এই বাসাতেই...খানায় টানা-হ্যাঁচড়া করার দরকার নেই। কিন্তু কী বলব...আপনার লোকজনের কাজ খুবই অগোছালো।”

শীর্ণ হাসি দিলেন ওসি। “বোঝেনই তো, এখানে বড় ধরনের খুন-খারাবি তেমন একটা হয় না।”

“ছোটখাটো খুনগুলো গুরুত্ব না দিলে কেউ কিছু বলার থাকে না, তাই না?” তিক্ত গলায় বলল আসিফ।

“তা হবে কেন? আমাদের সাফল্য প্রায় পঞ্চাশ ভাগ।”

সফলতার বহর শুনে নাক কুঁচকে ফেলল আসিফ। এর অর্থ অর্ধেক খুনের আসামির কিছুই হয় না। এরা নাগালও পায় না ওদের!

“বিষয়টা আমি দেখছি, ডিটেক্টিভ। বাড়ির বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলার ব্যবস্থা আপনাকে করে দেব। আপনার সেল নাম্বারটা দেন,” তাড়াতাড়ি বললেন ওসি।

ওসিকে নিজের কার্ড তুলে দিয়ে ল্যাভে ঢুকে পড়ল আসিফ।

“জিয়া, গতকাল রাতে সিকিউরিটিতে যারা ছিলো তাদের সাথে কথা বল, বাড়ির ভেতরের মানুষগুলোকে আমি দেখছি।” সহকারিকে নির্দেশ দিয়ে লাশটার দিকে এগিয়ে গেলো সে।

অদ্ভুত মনে হওয়া হয়তো উচিত ছিলো, কিন্তু কেন যেন দৃশ্যটাকে অত্যন্ত স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আসিফ একটু ভাবলো।

প্রফেসরের নিষ্পাণ দেহ পড়ে আছে তার নিজস্ব গবেষণাগারে। ওপরে মৃদু গুঞ্জন করছে এয়ারকন্ডিশন। ভেন্টিলেটর ডাক্তগুলো সবই বন্ধ। গবেষণাগারের সামনের দরজায় একজন পুলিশ কি-কার্ড নিয়ে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে। কেউ ঢুকতে গেলে সে কি-কার্ড ব্যবহার করছে।

তাহলে খুনি কিভাবে ভেতরে ঢুকলো?—এটা একটা প্রশ্ন। অতিরিক্ত কি-কার্ড একটা ছিলো বটে, সেটা অ্যাসিস্ট্যান্ট রিয়াজুল করিমের কাছে। তার কাছে কি-কার্ড থাকার দরকার ছিলো, প্রফেসরের মতোই অহরহ ল্যাভে ঢোকা লাগতো তাকে। এক দশক ধরে বিশ্বস্ত সহকারি ছাড়া এই ল্যাভে আর কারও প্রবেশাধিকার ছিলো না। তবে এই একটা বৈশিষ্ট্য তাকে সন্দেহের কাতারেও তুলে আনছে।

দ্বিতীয় সমস্যা, প্রফেসর খুব সম্ভবত বিষপ্রয়োগে নিহত হয়েছেন। এটুকু জানা গেছে, জানা যায়নি বিষটা তার শরীরে কিভাবে ঢুকলো। কয়েকভাবেই সেটা করা যেতে পারে। রাতের কিংবা দুপুরের খাবারের সময় কিংবা প্রফেসরের দৈনন্দিন কোন মেডিকেশন নেয়ার অভ্যাস বা প্রয়োজন থাকলে সেই ছুতোতেও খাইয়ে দেওয়া সম্ভব।

আসিফ পুরনো এক কেসের কথা মনে করতে পারলো। ভিক্টিম ছিলো এক যুবক। প্রাথমিকভাবে পুরো ঘটনাটিকে রহস্য বলে মনে হয়নি, সুইসাইড কেস হিসেবেই ধরে নেওয়া হয়েছিলো। পরে আবিষ্কার করা গেলো, ঈর্ষাকাতর প্রাক্তন প্রেমিকা হত্যাকাণ্ডটি ঘটিয়েছে। বেক-আপের পর কিছু পোশাক আর কসমেটিকস রেখেই ছেলের বাড়ি থেকে বের হয়ে গেছিলো মেয়েটি। পরে সেগুলো আনতে যাওয়ার ছুতোয় খুনের পরিকল্পনা করে ফেলে। ঐ সময় ছেলেটি নিয়মিত ক্যালবো-ডি নামক ক্যালসিয়াম খাচ্ছিলো, তখনও এক ফাইল বাকি ছিলো। মেয়েটি সমান আকারের একটি বড়ি সেই কৌটাতে রেখে চলে আসে।

কৌটার ত্রিশটি ট্যাবলেটের মধ্যে কোনটা বিষ তা হয়তো মেয়েটিও জানতো না। জানতো না কবে সেই নির্দিষ্ট ট্যাবলেট মুখে দেবে তার শিকার। একই কারণে যুবকের মারা যাওয়ার সময়, অথবা তার সাত দিন আগে পর্যন্ত মেয়েটির নিখুঁত অ্যালিবাই ছিলো। নভেম্বরের ৩ তারিখে বিষ রেখে এসেছিলো মেয়েটি, ছেলেটি মারা যায় ১৫ই নভেম্বর। মাঝের বারোদিন ছেলেটার ধারে কাছে পর্যন্ত যায়নি খুনি। কাজেই খুনির জন্য বিষপ্রয়োগে হত্যার মতো সুবিধাজনক প্রক্রিয়া আর হতেই পারে না।

সেক্ষেত্রে অবশ্যই কি-কার্ড রহস্য নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই। কারণ, তখন প্রফেসরকে হত্যা করতে ল্যাভে ঢোকানোর প্রয়োজনই ছিলো না। কিন্তু ল্যাভের মধ্যে যদি প্রফেসরকে সিরিঞ্জ দিয়ে পয়জন পুশ করা হয়—তাহলে আলাদা কক্ষ—এর সম্ভাবনা অবশ্যই অত্যন্ত ক্ষীণ।

এখানে ধন্যধর্মতির কোন চিহ্ন নেই। সুতরাং সিরিঞ্জের সম্ভাবনা হয়তো বাদ দেওয়া চলে। একই সাথে প্রফেসরের অ্যাসিস্ট্যান্ট রিয়াজুল করিমকেও সন্দেহের তালিকা থেকে সরিয়ে রাখা যায়। সবাই জানে একমাত্র কি-কার্ড তার কাছেই থাকে। এর পরও প্রফেসরকে ল্যাভের ভেতরে খুন করাটা তার জন্য নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু হবে না।

গোড়া থেকেই একটা বিষয় রহস্যজনক মনে হচ্ছে আসিফের। মার্চারের জন্য বিজ্ঞানী বা গবেষক শ্রেণির মানুষ একজন খুনির প্রথম পছন্দ হতে পারে না। কোনদিনও তা ছিলোও না।

এই মুহূর্তে খুন থেকে কারা লাভবান হতে পারে তাদের একটা তালিকা করা প্রয়োজন। পোস্ট মর্টেমের রিপোর্ট আর ক্রাইম-সিন ইউনিটের ডাটা এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট কালেকশন শেষ হলে নতুন কোন দিক থেকে আগানো হয়তো সম্ভব। ওগুলো হাতে পৌঁছানোর আগে তানভীর জ্বালালের পরিচিতজনদের সাথে আলাপ সেরে নেওয়া যাবে।

“মি. আসিফ?” পেছনে পরিচিত গলাটা শুনে ঘুরে দাঁড়ালো ও। ল্যাবে পা রেখেছেন গৌরব রায়। “মি. রিয়াজ বাসাতেই আছেন। আমার সাথে আসুন।”

BanglaBook.org

“প্রথমে রিয়াজুল করিমের সাথে কথা বলতে চাইবেন আপনি। সজ্জন ভদ্রলোক। প্রফেসরের ডানহাত ছিলেন।” জানালো গৌরব রায়।

“উনার ছেলে?”

“বিজয় বাসায় নেই। সম্ভবত আশেপাশে আছে। ছেলেটার জন্য বিরাট বড় এক ধাক্কা এটা।” মাথা নিচু করে বলল ওসি গৌরব।

দীর্ঘশ্বাসটা লুকোয় আসিফ। বাবা হারানোর বেদনা যে হারায়নি সে বুঝবে না।

“ছেলেটার বয়স মাত্র পনের,” দুঃখি গলায় বলল গৌরব। “এর আগে একবার দেখা হয়েছিলো আমাদের। ছেলেকে নিয়ে থানায় এসেছিলেন প্রফেসর।”

“কেন?”

“মাসখানেক আগে তার বাড়িতে চুরি করার জন্য কেউ ঢুকেছিলো, সে-ব্যাপারে জিডি করতে এসেছিলেন। সম্ভবত বিচ্ছিন্ন ঘটনা ওটা।”

আসিফের ইচ্ছে করলো লোকটার মাথায় কষে একটা গাট্টা দিতে। “চুরির ঘটনার এক মাসের মধ্যে বাড়ির মালিক খুন হয়ে গেলেন আর সেই ঘটনাটা আপনার কাছে বিচ্ছিন্ন মনে হচ্ছে?”

মাথা নাড়লো গৌরব। “এলাকার সব ছিঁচকে চোর-বাটপার জানে এই এলাকায় সবচেয়ে দামি বাড়ি প্রফেসরের। আগেও ওরা বাড়িটার দিকে নেকনজর দিয়েছিলো। দেখছেন না, ক্যামেরা, ইলেকট্রিফাইড তার...”

তাকিয়ে দেখলো আসিফ। ভুল কিছু বলেনি ওসি। বেড়াগুলো যথেষ্ট লম্বা করে বানানো হয়েছিলো। তার ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কাঁটাতার। বেশ কয়েকটা ক্যামেরাও দেখা যাচ্ছে।

“চুরির ঘটনার সাথে এই হত্যাকাণ্ডটির সম্পর্ক হয়তো আমিও দেখার চেষ্টা করতাম, তবে বিস্ময়োণে হত্যার বিষয়টি আমাকে ওই ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন বলতে বাধ্য করছে, ডিটেক্টিভ। কাজটা ভেতরের কারও করার সম্ভাবনাই বেশি।”

প্রাচীরের দিকে ইঙ্গিত করলো আসিফ। ওপরে দুইসারি তার ঝুলে আছে। “এরপর বেড়াতে বৈদ্যুতিক তারের ব্যবস্থা করেছেন তিনি? গত মাসের ঘটনার পর, নাকি আগে থেকেই ছিলো এসব?”

মাথা নাড়লো গৌরব। “ক্যামেরা আগেই ছিলো তবে তারগুলো ইদানিংকালের।”

“অনুপ্রবেশকারি ব্যর্থ হয়ে অন্য কোন উপায়ে প্রফেসরকে সরিয়ে দিয়েছেন, এমনটাও তো হতে পারে?”

আর কিছু ভাবছিলো আসিফ। আর্মি চিফের সাথে যার ওঠা বসা সেই মানুষটা কেন নিজের নিরাপত্তার অভাব বোধ করতে পুলিশের কাছে গেছিলেন? পরক্ষণেই



বোকার মতো ভাবার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিল সে। প্রফেসর নিশ্চয় ভেবেছিলেন সাধারণ চুরির ঘটনা ওটা। এমন ঘটনার পর নিজের জীবনের ওপর ঝুঁকির আশঙ্কা করতে পারেন না তিনি। এসব সামলানোর জন্য পুলিশই যথেষ্ট। তাছাড়া সামনের গেটে আছে দারোয়ান। অথথা একজন জেনারেলের কানে ছোটখাটো বিষয় তোলার দরকার মনে করেননি।

বসার ঘরেই পাওয়া গেলো প্রফেসর তানভীর জালালের সহকারি এবং এই বিশাল বাড়িটার তত্ত্বাবধায়ক রিয়াজুল করিমকে। উত্তেজিত হয়ে ইংরেজিতে কারও সাথে টেলিফোনে কথা বলছে সে। মানুষটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো আসিফ। পঁয়ত্রিশের কাছে হবে এর বয়স। চুলগুলো রুশ্ম, সেই সাথে চেহারাটাও।

শোনা যায়, প্রফেসর তানভীর জালাল যখন ঢাকা ভার্সিটিতে শিক্ষকতা করতেন তখন তার ছাত্র ছিলো। রসায়ন নিয়ে অসাধারণ কিছু তত্ত্ব ছিলো এই রিয়াজুল করিমেরও। সেই থেকে অসম বয়সের দু-জন জুটি বেঁধেছেন। গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ছিলো ওদের, তার থেকেও বড় সম্পর্কটি ছিলো সম্ভবত পিতা-পুত্রের।

শেষ বয়সে এসে সন্তানের মুখ দেখেছিলেন তানভীর জালাল, তা না-হলে এই মানুষটা হতে পারতো তার উত্তরাধিকারি। তবে জ্ঞানের দিক দিয়ে রিয়াজুল করিম যে তার একমাত্র উত্তরসূরি, এ নিয়ে কারোর কোন সন্দেহ নেই।

খটাস করে টেলিফোনটা রাখার পর আসিফদের দিকে চোখ পড়ল রিয়াজের। লম্বা পায়ে এগিয়ে এলো তাদের দিকে।

“আর বলবেন না, এরই মাঝে হারভার্ডে খবর চলে গেছে, বিস্তারিত জানতে চাইছে এখন। দেখবেন, খুব শিঘ্রই সাংবাদিকেরা এখানে চলে এসেছে।”

“দেশের বাইরে খবরটা গেলো কি করে?” ঞ্চ কুঁচকে জানতে চাইল আসিফ।

“ভোর চারটায় জরুরি একটি পেপার পাঠানোর কথা ছিলো তার। সেটা পাঠাননি গতকাল। প্রফেসরের জন্য এটা অস্বাভাবিক। ওদিকে প্রফেসর জ্যানসেন আমার গলা শুনেই খারাপ কিছু সন্দেহ করেছেন। উনাকে আর কী বলবো, আমারই তো বিশ্বাস হচ্ছে না...” এক মুহূর্ত অ্যাকুরিয়ামের দিকে তাকিয়ে থাকলো রিয়াজ, দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো সাবধানে। ঘুরে ওদের মুখোমুখি হলো তারপর। “ওহ, দেখুন না, আমাদের পরিচয় দেওয়ার ভদ্রতাবোধটুকুও ভুলে গেছি! আমি ডক্টর জালালের সহকারি রিয়াজ। আপনি, ডিটেক্টিভ...?”

“আসিফ আহমেদ।” হাত মেলালো সে। “ডক্টর জালালের মৃত্যু আমাদের জন্য অপূরণীয় এক ক্ষতি। আমি অত্যন্ত দুঃখিত, মি. রিয়াজ। কিন্তু, কিছু ব্যাপারে জানার ছিলো।”

বাধ্য ছেলের মতো বসে পড়ল রিয়াজ। “বলুন?”

চারপাশে তাকালো আসিফ। “এই বাড়ির স্থায়ী বাসিন্দা কয়জন?”

“স্যারকে ধরলে চারজন। উনি, আমি, স্যারের ছেলে বিজয় আর রান্না করার জন্য একটি মেয়ে আছে...ওর নাম ডানা।”

অদ্ভুত নামটা কানে বাঁধে আসিফের। “ডানা?”

“শেফ হিসেবে প্রথম শ্রেণির। এখানে পার্মানেন্ট জব ছিলো ওর। পাশাপাশি অনলাইনে রান্না শেখাতো।”

“প্রফেসর এখানে সেটল হলেন কবে থেকে?”

“গাজীপুরে?”

“হ্যাঁ।”

“দশ বছর হয়ে গেলো প্রায়।” মনে করার চেষ্টা করলো রিয়াজ, “বিজয়ের বয়স তখন পাঁচ-কি ছয়। আত্মাইটিস ধরা পড়ল ওর, হারভার্ডের পাট চুকিয়ে দিলেন উনি। এই ল্যাব আর বাড়িটা দাঁড় করাতে তিন বছরের মতো লাগলো। ততদিন ঢাকাতেই ছিলেন স্যার। এরপর চলে এলেন এখানে।”

“আপনি?” সুরু চোখে তাকালো আসিফ।

“স্যার যখন হারভার্ডে চলে যান আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই ছিলাম। স্যার আমার মধ্যে সম্ভাবনা দেখেছিলেন। অক্সফোর্ডে স্কলারশিপ পেয়েছিলাম, ওখান থেকে ফিরে এসে দেখলাম গাজীপুরে এলাহী কারবার করে ফেলেছেন তিনি। চমৎকার এক ল্যাব। বাংলাদেশে এমন ওয়ার্কিং এনভায়রমেন্ট পাওয়া সম্ভব এটা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আর উনি যখন একসঙ্গে কাজ করার প্রস্তাব দিলেন...” স্বপ্নালু হয়ে এলো রিয়াজের চোখ।

“বেশ, ডানা মেয়েটির প্রসঙ্গে ফেরা যাক তাহলে।”

রিয়াজের চোখে না বোঝার দৃষ্টি এখন।

“কতদিন ধরে আছে মেয়েটি?”

একটু ভেবে বলল রিয়াজ, “ছয়...না, সাত বছর হবে সামনের মাসে।”

নিচের ঠোঁটে আনমনে কামড় দিল আসিফ। “তার মানে এই বাড়িতে শুরু থেকেই আছে সে?”

“হুম,” মাথা দোলালো রিয়াজ। “ওকে নিয়ে আত্মহি মনে হচ্ছে আপনাকে? স্যারের মৃত্যুর সাথে তার কোন সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে কি?”

সরাসরি তার দিকে তাকালো ও। “প্রফেসরকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে, মি. রিয়াজ। আর এ বাড়িতে এই কাজ করতে পারে শুধু ডানা। মেয়েটিকে ডাকুন, কথা বলব আমি। ভাল কথা, বিজয়কেও দরকার আমার। সময়টা খুব ভাল নয় জানি, কিন্তু দেরি করলে খুনিরই সুবিধা হবে।”

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো রিয়াজ।

হত্যাকারি হিসেবে কোন এক কারণে রিয়াজকে সন্দেহ করতে পারলো না আসিফ। প্রবৃত্তি বলছে, এই লোক হত্যা করতে পারে না। কেন এমনটা মনে হচ্ছে সে জানে না। তাছাড়া, হত্যাকারি না হলেও তার আশ্রয়দাতা হতে বাঁধা কোথায়?

ডানার ক্ষেত্রে রিয়াজের মনোভাব রক্ষণাত্মক ছিলো। জল ওদিকে কতদূর

গড়িয়েছে তা জানার জন্য ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। এখানে বিকেল পর্যন্ত থাকতে পারলেই সব জেনে নেওয়া যাবে।

মেয়েটাকে প্রধান সন্দেহভাজন বলে ঘোষণা করার সাথে সাথে রিয়াজুল করিমের চেহারা ডাঙায় তোলা কাতল মাছের মতো হয়ে গেছে। রিয়াজের পরবর্তি বাক্যটি অবশ্য অন্যদিকে সরিয়ে দিল ওর ভাবনা।

“ডানাকে ডেকে দেওয়া সম্ভব, তবে বিজয়কে তো সকাল থেকে দেখিনি আমি।”

সোজা হয়ে বসলো আসিফ। “ছেলেটা কোথায় কেউ জানে না দেখছি! শেষ কখন দেখেছে আপনি ওকে?”

ফ্যাকাশে ভাবটা আরও বাড়ে রিয়াজের চেহারায়। “গতকাল, ডিনারের সময়।”

গতকাল রাত থেকে বাসায় নেই পনের বছরের এক কিশোর। আর সেদিকে কারও নজরই পড়েনি এতক্ষণ! একটা হত্যাকাণ্ড সবার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। শুধু মার্ডার নয়, দৃশ্যপট এখন কি কিডন্যাপের দিকে মোড় নিয়েছে?

দুশ্চিন্তায় ভাঁজ হয়ে গেলো ডিটেক্টিভ আসিফের ক্রজোড়া।

বিজয়কে খোঁজা হচ্ছে সবখানে। ওসি গৌরব রায় এখনও কিডন্যাপের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছে না। বিজয় কোন ছোট শিশু নয়। পনের বছরের এক ছেলে বাবার মৃত্যুর খবর শোনার পর এদিক ওদিক বিক্ষিপ্ত ঘুরে বেড়ানোর অধিকার রাখে। এমন পরিস্থিতিতে বাড়িতে না থেকে একাকি কিছু সময় কাটানো অথবা বন্ধুদের সান্ত্বনা-আড্ডায় থাকার যৌক্তিকতা বেশি। রাতের পর কেউ তাকে দেখেনি বলেই এটা প্রমাণিত হয় না, ছেলেটা কিডন্যাপ হয়েছে।

বিজয়ের স্কুল এখান থেকে বেশি দূরে নয়। পরিচিত সহপাঠীদের সাথে কথা বলা হচ্ছে। ভয়ের কথা হলো, স্কুলে ওর সাথে ঘনিষ্ঠ কাউকে পাওয়া গেলো না। ছেলেটা নিভৃতচারি। যাদের সাথে ক্লাস চলাকালীন সময়গুলো ওঠাবসা করতো, তাদের কারও সাথে গতকালের পর ওর দেখা হয়নি।

প্রফেসর তানভীর জালালের মৃতদেহ আবিষ্কার করেছে রিয়াজ। গতকাল রাতে প্রফেসর তাকে বলেছিলেন, আজ ভোর ছয়টায় কাজ শুরু হবে। কাজ আর শুরু করা হয়নি, ভেতরে ঢুকে তানভীর জালালকে নিখর পড়ে থাকতে দেখে। প্রায় সাথে সাথে পুলিশকে ফোন করে সে। পুলিশ জানার সাথে সাথে জেনে যান জেনারেল জাহিদ ফরমান। তারপর তাদের অপেক্ষা করার নির্দেশ দেন তিনি। দুই জিপ আর্মি পাঠিয়ে দেন যাতে ক্রাইম-সিনের এতটুকু হের ফের না হয়। এসব পৌনে আটটার কথা। তারপরই ডাক পড়ে ডিটেক্টিভ আসিফ আহমেদ এবং তার গ্রুপের।

“ভেবে দেখুন,” নিজের বিশ্বাসে অটল থেকে জানান গৌরব, “ছেলেটা হয়তো পুলিশে ফোন করার সময় মি. রিয়াজের কথা শুনে থাকবে। তারপর বাসা থেকে হয়তো বের হয়ে গেছে। আফটার অল, এরকম একটা শোক সংবাদ শুনে তার মন বিক্ষিপ্ত থাকতেই পারে।”

তর্ক করলো না আসিফ, এই লোক দায়িত্ব এড়ানোতে ওস্তাদ। “আপনারা খুঁজতে থাকুন, মি. রিয়াজ। মিস ডানাকে এখানে পাঠিয়ে দেবেন, প্রিজ? আরেকটা জিনিস চাইবো আপনার কাছে, আপনাদের এখানে কয়েকটা ক্যামেরা দেখলাম। ওগুলোর ভিডিও রেকর্ডিংগুলোর এক কপি আমাদের ডিপার্টমেন্টে থাকবে। আপনার কাছে লোক পাঠাচ্ছি, তার হাতে দিয়ে দেবেন।”

মাথা ঝাঁকালো রিয়াজ। জিয়াকে ইশারায় দেখিয়ে দিল আসিফ, রিয়াজের সঙ্গে ফুটেজ কালেকশন করতে ঘর ছাড়লো সে। গৌরব রায় বাইরের দিকে রওনা দিল, ল্যাবে ফিরে যাচ্ছে। সবাই ঘর থেকে বের হয়ে যেতে-আবাইল বের করলো আসিফ। তৃণাকে ছোট একটা মেসেজ পাঠিয়ে দিল।

চারপাশে তাকিয়ে ড্রাইংরুমের অবস্থাটা একবার দেখলো ও। তানভীর জালাল সারাজীবন পড়াশোনা আর গবেষণা নিয়েই থেকেছেন। নিজের জীবনের পঞ্চাশ বছরে এসে গ্রীষ্মকালীন পরিবেশে কাজ করার তাগিদ অনুভব করলেন ছেলের সঙ্গে থাকার জন্য। আবহাওয়া অনুকূলে যায় এমন বেশ কয়েকটি উন্নত দেশ থেকে তাকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু তিনি তার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন। আর কোন অ্যাকাডেমির সাথে যুক্ত থাকা নয়, স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখে কাজ করার জন্য চলে এসেছিলেন এই গাজীপুরে। স্পন্সরের অভাব তার কখনই হয়নি, সে-সাথে হারভার্ডও তার পাশে ছিলো। নির্বিঘ্নে কাজ করতে পেরেছেন, তবে সেই ছাপ নিজের বাসায় মোটেও ঢুকতে দেননি।

এই ঘরের চারপাশে তাকিয়ে বোঝার কোন উপায় নেই বাড়ির মালিক গুরুগম্ভীর একজন কেমিস্ট ছিলেন। সৌখিনতার ছাপ সবখানে। দেওয়ালগুলো থেকে নাম না-জানা ছবি ঝুলছে। কয়েকটা বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের বিখ্যাত চিত্রকর্মের কপি। বেশ কিছু কনটেম্পোরারি আর্ট। শোকেসে অডুত সব কালেকশন। দেওয়ালের একদিক ভর্তি করে ঝোলানো হয়েছে তানভীর জালালের অর্জনের চিহ্নস্বরকগুলো। ঘরের একপাশে একটা ওয়াল অ্যাকুরিয়ামও আছে। ধীর পায়ে ওদিকে এগিয়ে গেলো আসিফ। বেশ কিছু গ্রাস ক্যাটফিশ, সিলভার হ্যাচেটফিশ, আফ্রা চিকলিড ছাড়া আর কিছু চেনা গেলো না।

গ্রাস ক্যাটফিশগুলো একেবারেই স্বচ্ছ-ভেদ করে অন্যপাশ দেখা যায় ওদের। হ্যাচেটফিশগুলোর ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে নিরীহদর্শন মাছগুলোকে খেয়ে ফেলবে যেকোন সময়! কিন্তু ওরা একসাথেই বাস করে এসেছে এতদিন। দীর্ঘশ্বাস ফেলল আসিফ। মানুষের চেয়ে মাছরা অনেক ভালো।

“আপনি মি. আসিফ আহমেদ?...ডিটেক্টিভ?” পেছন থেকে নারীকণ্ঠ শুনে ফিরে তাকালো সে।

দরজা দিয়ে মাত্র ঢুকেছে ডানা বাতশিভা। মেয়েটাকে দেখে বাংলাদেশি মনে হয় না। ইউরোপিয়ানদের মতো ফ্যাকাসে চামড়া, নীল চোখ আর ঘন কালো চুলের সাথে অতিমিষ্টি চেহারা, শুধু খাঁটি বাংলায় কথা বলছে—এই যা! বাবা-মার একজন অবাঙালি না-হয়েই যায় না।

“ঠিক ধরেছেন,” বলল আসিফ। “আপনি নিশ্চয় ডানা বাতশিভা বসুন।”

মেয়েটি সোফায় এসে বসলে আসিফও বসে পড়ল। শান্ত শায় জানতে চাইল, “আপনার নামটা ঠিক—”

“সেই সাথে চেহারাও খাপ খায় না এদেশিয়দের সাথে,” নরম গলায় বলল ডানা। যেন মনের কথা পড়তে পারছে। “এমনটা আমাকে মাঝে মাঝেই শুনতে হয়। উপজাতি নই আমি, বাবা জার্মান ছিলেন। মা বাংলাদেশি।”

নিজের অনুমান মিলে যেতে দেখে অবাক হলো না আসিফ। “প্রফেসরের মৃত্যু আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক। তার মতো ব্রিলিয়ান্ট ব্যক্তি...এ বাড়িতে এমন একটা

ঘটনা নিঃসন্দেহে হতাশাজনক। তবুও এখন কয়েকটা প্রশ্ন করা দরকার ছিলো। আশা করি মনে কিছু করবেন না।”

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়েটির মুখ দেখেছে ও। চোখের নিচে পানির হালকা দাগগুলো নজর এড়ায়নি। তানভীর জালালের মৃত্যুতে মেয়েটি অনেক কেঁদেছে, নাকি আর কোন কারণ কাজ করেছে তার পেছনে?

“সব হারিয়েছিলাম একটা সময় আমি, টিন এজার তখন। পথে নেমে আসতে হয়েছিলো আমাকে। সম্মানজনক কোন পেশা হয়তো আমি পেতাম না কিন্তু স্যার এগিয়ে এলেন, আমাকে নতুন একটা জীবন দিলেন তিনি। আর আজ সেই পুরনো স্মৃতি ফিরে এসেছে...দ্বিতীয়বারের মতো সব হারালাম।”

“প্রফেসরের সাথে আপনার প্রথম কখন সাক্ষাৎ হয়েছিলো?”

ভেতরে ভেতরে চমকে গেলো মেয়েটি। রিয়াজ বলেছিলো ডানার সাথে প্রফেসরের পরিচয় সাত বছর আগে। তখনই শেফ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় তাকে। রিয়াজ কেন লুকিয়েছে আগে থেকেই ওদের পরিচয় ছিলো? নাকি সে নিজেও জানে না?

“কলেজ শেষ করেছি তখন আমি। ইংলিশ মিডিয়ামের স্কুলে পড়তাম। জার্মানি থেকে আসার বেশিদিন হয়নি। মা চেয়েছিলেন আমি বাংলাদেশে সেটল হই। বাবার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছিলো মার। কলেজ শেষ করতে না করতেই বঞ্চে গেলাম। এদেশের রক্ষণশীল পরিবেশ আমার পছন্দ হতো না। একটা মেয়ে বঞ্চে গেলে কি হয় তা কি জানেন, মি. আসিফ?”

ডানার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নেয় আসিফ। মেয়েটি কি একটু বেশি সরাসরি কথা বলছে না? অতি শোকে?

“ড্রাগসের সাথে জড়িয়ে পড়লাম। নিজেও নিতাম, আবার সাপ্লাইও দিতাম। সামনে ও-লেভেল, কোন চিন্তা নেই আমার। জীবন যখন গড়ে নেওয়ার সময় তখন ভেসে যাচ্ছিলাম। কিসের স্নোতে ভেসে যাচ্ছিলাম সেটাও জানতাম না। জীবনের মানে খুঁজে পেতাম না। তখনই কার অ্যাকসিডেন্টটা হলো। আমার বয়স তখন সতের।”

ডানা চুপ হয়ে গেলো। আসিফ কিছু বলল না।

দু-হাত এক করে ধরলো ডানা। আবার বলতে শুরু করলো সে, “আমরা তিনজন ছিলাম গাড়িতে। আমি আর আমার দুই ছেলেবন্ধু। ড্রাইভ যে করছিলো সে একটু বেশিই ড্রিঙ্ক করে ফেলেছিলো সেদিন। যা হওয়ার তাই হলো। অন্য পাশ থেকে আসা ট্রাকের সাথে লাগিয়ে দিল নাহিয়ান। আমার ফ্রেন্ড দু-জনে স্পটডেড। আমি রাস্তায় পড়ে থাকলাম রক্তাক্ত অবস্থায়।” একটু থেমে আসিফ বলল ডানা, “রাস্তা থেকে আমাকে তুলে নিয়ে গেলো পরের গাড়িটা। সময়মতো হাসপাতালে নিয়ে গেলেন তিনি। আমাকে শেখালেন জীবনের অর্থ। ড্রাগসের জগত থেকে ফিরে এলাম। পেছনে মানুষটার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। তানভীর জালাল আপনাদের কাছে ডক্টর, প্রফেসর, তবে আমার কাছে নতুন জীবনদাতা ছাড়া আর কিছু নন। এখানে আমি সেই

কৃতজ্ঞতা থেকেই কাজ করি। অস্ট্রেলিয়া-আমেরিকা থেকে অফার পেয়েছি শেফ হিসেবে বড় বড় রেস্টুরেন্টে জয়েন করার জন্য, যাইনি। তবে এখন মনে হয় যাওয়া লাগবে। এখানে থাকার তো কোন মানে হয় না আর!” দীর্ঘশ্বাস ফেললো ডানা। সুন্দর মুখটা কি এক অজানা বিষাদে ভরে গেছে। পিটপিট করে তাকাচ্ছে আসিফের দিকে।

সোফায় হেলান দিল আসিফ। “আপনার সাথে প্রফেসর জালালের ইতিহাসটুকু মি. রিয়াজ জানতেন?”

“জানে তো। ও স্যারের—কি বলব, ডানহাত ছিলো। স্যার যা জানতেন তার সবকিছুই সম্ভবত জানে রিয়াজ।”

“আপনার সাথে প্রফেসরের আগে থেকে জানাশোনার ব্যাপারটা কিন্তু তিনি আমাকে বলেননি,” নির্বিকার কণ্ঠে বলল আসিফ।

“আমার পার্সোনাল ব্যাপার নিয়ে আপনার সাথে ডিসকাস করতে চাননি হয়তো। এসবের সাথে স্যারের মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই।”

“গতকাল রান্না করেছিলেন আপনি,” ওর দিকে তাকিয়ে বলল আসিফ, “আর বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে প্রফেসরকে।”

ঝট করে দাঁড়িয়ে গেলো ডানা। “আপনি...আপনি আমাকে খুনি হিসেবে সন্দেহ করছেন? আমি স্যারকে বিষ দেব? কেন! আমি কেন এমন কাজ করতে যাবো?”

“কয়েকদিন আগে এই বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছিলো। চোর কিছু নিতে পারেনি। কিন্তু আমার মনে হয় এই রহস্যময় অনুপ্রবেশকারি পরবর্তিতে তার উদ্দেশ্য সফল করার জন্য ভেতরের কারোর সাহায্য নিয়েছে। এমন কিছু দরকার ছিলো তার, যা প্রফেসরকে না জানিয়ে নেয়াটা হয়তো আসলেই সম্ভব ছিলো না। আরও সোজা করে বললে, প্রফেসর জীবিত অবস্থায় হাতছাড়া করতেন না সে জিনিস।”

“আপনি কি বলতে চাইছেন?” চোখ সরু করে তাকালো ডানা।

“আপনার চেয়ে ভাল আর কে জানে? রিয়াজ মৃতদেহ আবিষ্কারের পর আপনি বিশ্বাস করতে চাননি। পুলিশ আসার আগে তার সাথে ল্যাভে চুকেছিলেন আপনিও। মৃতদেহটা দেখাই কি আপনার উদ্দেশ্য ছিলো?”

রাগে লাল হয়ে গেলো ডানার সুন্দর মুখটা। “হোয়াট! আমার রক্ষাকর্তা মানুষটা মরে পড়ে থাকবে আমি তাকে দেখতে যেতেও পারবো না?”

পাল্টা প্রশ্ন করলো আসিফ, “প্রফেসর ডানহাতে একটা আঙুল পড়তেন?”

দ্বিধা না করে উত্তর দিল ডানা, “অবশ্যই!”

“ওটা আমি মৃতদেহের হাতে দেখি নি। তাহলে জানলাম কি করে? তাই তো? আঙুলের ফ্যাকাসে ভাব দেখে অনুমান করে নিয়েছি, কি ছিলো আঙুলটাতে, মিস ডানা? যে কারণে বিষ প্রয়োগে নিজের প্রটেক্টরকে খুন করতেও বাঁধেনি আপনার? সম্ভবত জীবিত অবস্থায় হাতছাড়া করতেন না তিনি আঙুলটা। আপনাকে অন্যপথে এগোতেই হলো, তাই না?”

ঝট করে ঘুরে দাঁড়ালো ডানা। “আপনার ফালতু প্রশ্নের জবাব আমি দেব না।

আইন কিভাবে কাজ করে আমার জানা আছে। আমার কোন মোটিভ নেই, থাকলে দেখান! আমার রান্নাঘর আর সব কুকিং ম্যাটেরিয়াল চেক করতে পারেন, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, কিছু পাবেন না!”

বাইরে হেলিকপ্টারের গর্জন শোনা যাচ্ছে, কান পেতে সে আওয়াজ শুনে হেসে ফেললো আসিফ। “অতিমাত্রার আত্মবিশ্বাস? আপনার ব্যাংক-ব্যালাঞ্চে হঠাৎ করে বিশ লক্ষ টাকা যোগ হয়েছে কেন তাহলে? বলতে পারেন?”

ডানার শরীরটা শক্ত হয়ে গেলো। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো আসিফের দিকে। “এর সাথে এ ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই।”

মেয়েটার পাশে এসে দাঁড়ালো আসিফ। “হেলিকপ্টারটা প্রফেসরের মৃতদেহ নিয়ে যাবে আমাদের ডিপার্টমেন্টে, সাথে আপনিও যাচ্ছেন। পোশাক-আশাক কিছু নেওয়ার থাকলে নিয়ে নিন। পালানোর চেষ্টা করবেন না।”

হেলিকপ্টারের রোটরের শব্দ ক্রমেই বাড়ছে। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো ডানা।



ক্রিশ্চিনার সুন্দর ঠোঁটজোড়ায় চুম্বক লাগানো আছে।

এই নিয়ে তিনবার সে আকর্ষণ এড়ানোর চেষ্টা করেছে মাজহার। চতুর্থবার নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেনি। মেয়েটাকে এখন দেওয়ালের সাথে চেপে ধরেছে। সাড়া দিচ্ছে ক্রিশ্চিনাও। আলতো করে মাজহারের মাথার পেছনটায় হাত রেখে নিজের আরও কাছে টানলো।

ক্লাস নাইনের একটা মেয়ে এতকিছু বোঝে কী করে?

ক্রিশ্চিনা শারীরিক বিষয়ে অভিজ্ঞ, জানে মাজহার। তার ওপর মেয়েটি খ্রিস্টান। ওদিকে মাজহারের পরিবার কঠোরভাবে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলে। তারপরও কিভাবে এই মেয়েটার প্রেমে পড়তে পারলো ও?

মাজহার এতকিছু ভাবতে চায় না। আশা আর অনিশ্চয়তায় পা বাড়ানোর বয়স এটা। কলেজের ফাস্ট ইয়ার পড়ুয়া ছেলেরা এই কাজটা ভাল পারে।

মানসিক দৃঢ়তা যাদের প্রবল, তারা এই পাগলামিটুকুর জন্যই অনেক দূরে চলে যেতে পারে। আর বাকিরা ঝরে পড়ে অকালে। এই বয়সটা এজন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মাজহারের প্রতি ক্রিশ্চিনার দুর্বলতা আছে। বিষয়টা মাজহার টের পায়। আর টের পায় বলেই আরেকটু বড় করে স্বপ্ন দেখার সাহস পায় সে। এই মুহূর্তে একে অন্যের ঠোঁট খেয়ে ফেলার যে অসীম প্রতিযোগিতা ওরা শুরু করেছে, বিষয়টা তাকে আরও আশাবাদি করে তুলছে। মেয়েটার এত কাছে সে আগে কখনও আসেনি।

কাঁধের কাছে প্রচণ্ড টান অনুভব করলো সে—একেবারেই হঠাৎ করে! তারপর অনুভব করলো কেউ দু-হাতে শূন্যে তুলে ছুঁড়ে মেরেছে ওকে। গলির অন্যপাশে আছড়ে পড়েছে ও। সম্মিত ফিরে পেতেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, ঘুরে তাকালো আক্রমণকারি দিকে, চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে।

বিশালদেহী মানুষটা অন্তত ছয় ফিট দুই ইঞ্চি হবে লম্বায়। মাজহারের চেয়ে চার ইঞ্চি বড়। কালো পোশাক পরনে, তীব্র অনুভূতিতে দুচোখ চকচক করছে।

এগিয়ে যাবার আগে একটু ভেবে নেয় মাজহার। অন্ধকার একটা গলিতে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। এলাকায় লোড শেডিং চলছে। আশেপাশের বাসগোলা ঢেকে আছে অন্ধকারে। ওরা এখন আছে দুটো বাড়ির মাঝখানে সরু সড়ক। অন্ধকারাচ্ছন্ন এক গলিতে। এখানে কোন মানুষজন আসে না সচরাচর।

নির্জনতার সুযোগ নিয়ে ক্রিশ্চিনাকে মনের কথা বলতে চেয়েছিলো মাজহার। তাই বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার সাথে সাথে মেসেজ দিয়েছিলো মেয়েটিকে। বাসা থেকে বের হতে বলেছিলো সে। ক্রিশ্চিনার বাসার ঠিক পেছনেই এই সরু গলি। মেয়েটাকে রাতের বেলায় দূরে কোথাও নেওয়ার ইচ্ছে মাজহারের ছিলো না।

এখন মনে হচ্ছে বোকার মতো কাজ হয়ে গেছে। এই লোকটার মতলব মাজহার জানে না-তবে সেটা ভাল কিছু হওয়ার সম্ভাবনাও দেখতে পাচ্ছে না। সেই সাথে দেখতে পাচ্ছে না আর কোন মানুষজন। জায়গাটা নির্জন। কিন্তু সাথে মেয়ে থাকলে যেকোন ছেলেই একটু বেশি সাহসি হয়ে ওঠে। মাজহারের ক্ষেত্রেও তাই হলো।

দু-পা এগিয়ে এসে সজোরে লোকটার বুকে ধাক্কা দিল সে। “তুমি হালার পো কোন এলাকার মানুষ?”

ঘোঁৎ করে শব্দ তুলে তার দিকে তাকালো আগন্তুক, মুখে কোন রা নেই। কেমন মরা মানুষের দৃষ্টি তার চোখে। মাজহারের মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল প্রবাহ বয়ে গেলো।

দু-জনের মাঝে একটা ঝামেলা তখনই লেগে যেত কিন্তু ক্রিশ্চিনা তাদের মাঝে এসে পড়ল দ্রুত। “মাজহার, ঝামেলা করে কাজ নাই। চল বের হই!” কটমট করে আগন্তুকের দিকে তাকালো সে। “আর আপনি আমাদের থেকে দূরে থাকুন।”

মেয়েটা ভয় পেয়েছে, বুঝতে পারলো মাজহার। ওর দিকে না তাকিয়ে আরেকবার ধাক্কা দিল লোকটার বুকে। এবার আরও জোরে। ওজনে লোকটা তার চেয়ে দেড়গুণ হবে, সেদিকে যেন লক্ষ্যই নেই। এরপর মাজহার যেটা করলো তার জন্য যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন আছে।

অচেনা আক্রমণকারির কান বরাবর সশব্দে একটা থাপ্পড় দিয়ে হুঙ্কার ছাড়লো সে, “মাদারচোদ, দেখস না প্রেম করতাহি! বাগড়া দিলি ক্যান?”

নিজের এলাকায় মাজহারের দুর্নাম আছে। ঝামেলা লাগলে হাসপাতালে রোগি পাঠানোর সুখ্যাতির জন্য অন্য কলেজের ছেলেরা সমীহ করে চলে ওকে। সিটি কলেজের সাথে যখন ঢাকা কলেজের লাগলো, এই মাজহারই কি ঢাকা কলেজের দুটো ছেলের হাত ভেঙে দেয়নি?

এই গলিতে দাঁড়ানো একা একজন মানুষকে ভয় পাওয়ার ছেলে নয় সে। ওর হাত ধরে টান দিল ক্রিশ্চিনা। “প্রিজ, বাদ দাও তো। আসো?”

কিন্তু মাজহার চোখ সরালো না। সোজা তাকিয়ে আছে লোকটার দিকে। থাপ্পড় খেয়েও চুপ হয়ে আছে মানুষটা। মেরুদণ্ড নাই নাকি? পাল্টা আক্রমণ করতে আসলে এই শালাকে শিক্ষা দেওয়া যাবে। চুপচাপ মার খেলে তো সেটা করার উপায় নেই। লোকটার মুখ থেকে এখন জম্বুর মতো ঘর ঘর শব্দ হচ্ছে। অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকলো ওরা। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বের হয়ে এসেছে শব্দন্ত! পরক্ষণেই লাফ দিয়ে মাজহারকে নিয়ে মাটিতে পড়ে গেলো আগন্তুক। এতটাই আচমকা-ক্রিশ্চিনার বুঝতে দুই সেকেন্ড লেগে গেলো।

মাজহার গলা ফাঁটিয়ে চৈচাচ্ছে। তার দিকে ছুটে গেলো মেয়েটা, আক্রমণকারিকে দু-হাতে টেনে সরানোর চেষ্টা করলো সে।

মাজহারের গলায় আঁঠার মতো লেগে আছে মানুষটা। ছটফট করতে করতে ছাড়ানোর চেষ্টা করছে সে, কিন্তু এক চুলও নড়াতে পারছে না। ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে। পুরো ঘটনাটাই তার কাছে স্বপ্নের মতো লাগছে। ওর গলা কামড়ে ধরে আছে হারামজাদা! মানুষটা কি ওর রক্ত খাচ্ছে?!

গলায় তীব্র ব্যথা আর রক্ত বের হওয়ার অনুভূতি ওর মস্তিষ্কে জানিয়ে দিচ্ছে।  
লোকটা রক্ত খাচ্ছে ওর গলা থেকে!

আচমকা মাজহারের মাথাটা শক্ত রাস্তায় ঠুকে দিল মানুষটা, তারপর ফিরে  
তাকালো ক্রিশ্চিনার দিকে। গাল গড়িয়ে রক্ত নেমে আসছে, সেদিকে খেয়ালও নেই  
আক্রমণকারির। ক্রিশ্চিনার মুখ হা-হয়ে গেছে। ছিটকে পেছনে সরে যাওয়ার চেষ্টা  
করলেও পারলো না। ধাক্কা দিয়ে ওকে দেয়ালে আছড়ে ফেলল রক্তখেকো। দেয়ালে  
বাড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলো মেয়েটা। ওখানে পড়ে থেকেই এগিয়ে আসতে দেখল  
মৃত্যুদূতকে।

কাছে, খুব কাছে এগিয়ে এসেছে প্রাণিটা। তার দুর্গন্ধময় নিঃশ্বাস ক্রিশ্চিনার মুখে  
লাগছে। অপার্থিব আতঙ্কে থর থর করে কাঁপছে সে।

“ই-ই-ই-ভা!” টেনে টেনে উচ্চারণ করল মানুষটা।

ক্রিশ্চিনার কাঁপুনি বেড়ে গেলো। এই মানুষটা তাহলে ইভার জন্য এসেছে?

ভ্যাম্পায়ারে বিশ্বাস করার কোন কারণ দেখে না ও। ওদের অস্তিত্ব থাকলে বড়রা  
বলতো। এখানে ভিন্ন ধরনের কিছু ঘটছে। বাস্তব কিছু, কিন্তু অবাস্তব! কিছু একটার  
হিসেব মিলছে না। ইভার জন্য কারও আসার কথা নয়। ব্যাপারটা ভুল হয়ে গেছিলো  
ঠিক, তবে সেটা সামাল দেয়াও হয়েছিলো। অন্তত ক্রিশ্চিনা তেমনটাই জানে।

কাঁপা গলায় বলল ও, “ওটা একটা অ্যাকসিডেন্ট ছিলো!”

হিস হিস করে উঠলো কালো পোশাকের মানুষটি। “তুমিই সিলেক্ট করেছিলে  
ওকে!”

স্থির দৃষ্টিতে তাকালো ক্রিশ্চিনা, প্রথমবারের মতো। “সিদ্ধান্তটা ওর নিজের  
ছিলো।”

নরকের প্রাণিটা মাথা নাড়লো। “আইডিয়া আমার কাছ থেকে পায়নি ইভা।  
দোষটা তোমার। পুরোপুরি তোমার।”

বড় বড় দাঁতগুলো নিয়ে ক্রিশ্চিনার গলার দিকে এগিয়ে আসছে সে। আতঙ্কে  
দুচোখ বন্ধ করে ফেলল মেয়েটা। শেষ চেষ্টা হিসেবে দাঁতের ফাঁক দিয়ে উচ্চারণ  
করলো, “কিন্তু আমি তো তাকে রেইপ করিনি! তুমি রিভেঞ্জ নিয়ে চাইলে  
আনোয়ারকে ধরো!”

“আনোয়ারের যত্ন নেওয়া হয়েছে। রেইপড হলেও ইভা আজ বেঁচে থাকত।  
তোমাদের পথে চলার জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে ওকে। দারুণ শুধু তোমাদের নিতে  
হবে, ক্রিশ্চিনা। তোমার জন্য মারা গেছে ও।” শীতল রক্তটা শীতলতর হয়ে যায়  
এবার, “সুতরাং তোমাকেও যেতে হবে।”

গলায় সুস্পষ্ট দাঁতের ছোঁয়া পেয়ে চোঁচিয়ে উঠতে চাইল মেয়েটি, কিন্তু পারল না।  
মুখ চেপে ধরেছে অদ্ভুত খুনি।

মেয়েটার শুভ্র গলা থেকে টেনে চলেছে রক্ত!

ছোট্ট একটা বিরতি দিয়ে নিচে নেমেছে আসিফ। ডিপার্টমেন্টে ফেরার পর জিয়ার কাছ থেকে দারোয়ানের বক্তব্য শুনেছে, তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। আর দশটা দিন থেকে আলাদা কিছু ঘটেনি গতরাতে। এমন কিছু শোনার আশাই আসিফ করেছিলো। রিপোর্ট নেওয়ার পর বিল্ডিংয়ের নিচে নেমে আসে ওরা। এই মুহূর্তে একটু কফি না হলে কি চলে? রাত দশটা পর্যন্ত ডিপার্টমেন্টে থাকার ঘটনা রোজ রোজ ঘটে না। আজ সম্ভবত এখান থেকে বাড়ি ফিরে যেতে আরও সময় লাগবে।

ডিপার্টমেন্টের ভেতরই একটা কফি মেশিন আছে। ওটার যথেষ্ট ব্যবহারও হয়। কিন্তু ‘আর কফি হাউজ’-এর মত কফি সেখানে পাওয়া যায় না।

অবশ্য কফিটা শুধুই বাহানা। একটু হাটার সুযোগ আর ডিপার্টমেন্টের চার দেয়ালের বাইরে থেকে ভাবার সুবিধেটুকু ওখানে গেলে পাওয়া যায়। এটাই আসল উদ্দেশ্য। ঘোর জটিলতায় পড়ে গেলে একটা সময় আসিফ সিগারেট খেতো। সিগারেট ছেড়ে দেওয়ার পর থেকে এই কফি-বাহানা বের করেছে। এখন জীবন-মরণ সমস্যায় না পড়লে সিগারেটের দিকে পারতপক্ষে হাত বাড়ায় না।

লিফটের মধ্যে জিয়া ইতস্তত ভঙ্গিতে শরীর নড়াচড়া করেই যাচ্ছে, কিছু বলছে না। ওর দিকে সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তাকাল আসিফ।

“স্যার, আমরা যদি এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্যগুলোর দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব প্রফেসরের মৃত্যুটা এমনতেই রহস্যজনক। ল্যাবের মধ্যে মারা গেছেন তিনি। বিষক্রিয়ায় একাকি যতটুকু স্ট্রাগল করার কথা ততটুকুই করেছেন। দ্বিতীয় কারও উপস্থিতি ছিলো না ওখানে। তারপর, একই সময়ে উধাও হয়ে গেলো প্রফেসরের ছেলে বিজয়। তাকে এখন পর্যন্ত কোথাও দেখা যায়নি। ক্যামেরাগুলোতেও বাইরের কাউকে দেখা যায়নি। দারোয়ানও বাইরের কাউকে ঢুকতে বা বের হতে দেখেনি। গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিজয়কে দেখেনি কেউ। সাধারণত এই পর্যায়ে পূর্ণবয়স্ক মানুষকেও মিসিং ধরে নেয় পুলিশ। সেজন্য আমরা ছেলেটাকে খরচের খাতায় তুলে রেখেছি। তার ওপর ডানা মেয়েটা মনে হচ্ছে, খাবারে বিষ দিয়ে প্রফেসরকে সরিয়ে দিয়েছে। বিশ লাখ টাকা সাত বছরের বিশ্বস্ততার তুলনায় শক্ত কোন মোটিভ নয়। আসার ঘটনাটা যদি খুন না হয়ে কিডন্যাপ হয়, তাহলে বিজয়কে কিডন্যাপ করার জন্য প্রফেসরকে ল্যাবে বিষপ্রয়োগে খুন করার যৌক্তিকতা দেখছি না। বাসা থেকে স্কুলের মাঝে কয়েকভাবে বিজয়কে কিডন্যাপ করা যেতে পারতো। ওকে কিডন্যাপ করার জন্য ডানাকে বিশ লাখ টাকা দেয়ার প্রয়োজনও নেই। এগুলোর সাথে নতুন ঝামেলা, আঙুটিটা গায়েব হয়ে গেছে।” একনাগারে বলার পর থামল সে।

লিফট থেকে নেমে এসেছে ওরা। অন্ধকার শহরের আকাশ ঢেকে ফেলেছে।

কফি শাপে ঢোকার পর ওয়েটারদের কিছু বলতে হলো না। আসিফকে দেখলে কফি চলে আসবে। পুরনো কাস্টমার ও। জিয়ার জন্যও কি দিতে হবে তাদের জানা আছে।

টেবিলে বসে পড়ে জানতে চাইল আসিফ, “তোমার পয়েন্টটা কি?”

“হাইপোথিসিস, স্যার। দেখুন, ডানার দিকে কিন্তু খুব সহজে আমাদের সন্দেহ এসে পড়ছে। এমন কী হতে পারে না, কেউ চাইছে আমাদের চোখে ডানা সন্দেহভাজন হয়ে উঠুক? বিজয়কে কিডন্যাপ করলে কার লাভ, যদি প্রফেসর নিজেই মারা যান? মুক্তিপণের টাকাটা তো কাউকে দিতে হবে? এখন স্বজনহীন একাকি এক প্রফেসরের ফাইন্যান্সিয়াল ম্যাটারগুলো কে দেখাশোনা করছে সেটা যদি আপনি লক্ষ্য করেন, তাহলে কি দেখতে পাবেন? সবকিছুর দায়িত্ব এখন পেয়েছে প্রফেসরের ঘনিষ্ঠজন ঐ রিয়াজ। বিজয়ের মুক্তিপণ দেয়ার প্রশ্ন আসলে কি সে টাকাটা দেবে না? দেবে। ইনসাইড হেল্ল যদি আমরা খুঁজি, তাহলে এদিকে নজর দেওয়া উচিত।”

কফির মগ চলে এলে গরম কফিতে চুমুক দিল আসিফ। “তুমি বলতে চাইছ, রিয়াজ কিডন্যাপ করেছে বিজয়কে। মুক্তিপণ দেয়ার প্রশ্ন আসলে প্রফেসরের অ্যাকাউন্ট থেকে নিজের অ্যাকাউন্টে টাকাটা ট্রান্সফার করে দেবে সে। তারপর ছেড়ে দেবে ছেলেটাকে? কিন্তু এখানে দুটো সমস্যা আছে।”

বসের দিকে তাকিয়ে চুপসে গেলো জিয়া।

“প্রথমত কখনই একটা কেসে ‘যদি’ আর ‘হয়ত’ শব্দগুলো ঢোকাবে না। আগে থেকে একটা ধারণা করে নিলে সেখান থেকে বের হওয়া কঠিন। আর এভাবেই সত্যিকারের দরকারি তথ্যগুলো মিস করে ফেলে একজন গোয়েন্দা। তুমি নিজেই বলো, প্রফেসরের হাতে একটা আঙুটি ছিলো—বিষয়টা তোমার চোখে কেন পড়েনি? ল্যাভে কিন্তু আমিও ছিলাম, তুমিও ছিলে। আমি কথা বলার জন্য মূল বাড়িতে চলে যাই। কাজেই বলা যায়, আমার চেয়ে তুমি বেশি সময় ধরে ল্যাভে ছিলে। তবুও কেন বিষয়টা তোমার চোখে পড়ল না?”

মাথা নিচু করে ফেলল জিয়া। “ল্যাভে কিভাবে দ্বিতীয় একজন চুকতে পারে সেটা বোঝার চেষ্টা করছিলাম, স্যার।”

শিষ্যের দিকে তাকাল আসিফ। “কখনই জোর করে কিছু বানাতে যাবে না। এই পেশায় সাফল্য তখনই আসবে যখন শুধু দেখতে শিখবে। বুঝতে হবে না। শুধু দেখতে হবে। ঠিকমতো দেখতে পেলে একসময় সবকিছু বুঝে ফেলবে। কিন্তু আগে যদি দেখতে না পাও, পরে বুঝিয়ে দিলেও বুঝবে না।”

“জি, স্যার।”

কফির কাপে চুমুক দিল আসিফ। “দ্বিতীয় সমস্যা, প্রফেসর তানভীর আর রিয়াজ আরো দশ বছর একসাথে কাজ করতে পারলে নিঃসন্দেহে একটা নোবেল প্রাইজ পেত তারা। এ বিষয়ে কারও কোন সন্দেহ নেই। আমরা যদি ধরেই নেই, রিয়াজ বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো, এখানেও হিসেব মিলছে না। প্রফেসর ছিলেন সোনার ডিম পাড়া হাঁসের মতো। তাকে হত্যা করে বিজয়ের কিডন্যাপার হয়ে আমাদের এই

রিয়াজ যতটুকু অর্জন করতে পারবে, বেঁচে থাকা প্রফেসর তার থেকে অনেক বেশি দিতে পারতেন। নাম, জশ, খ্যাতি, টাকা-পয়সা, সব। বিজয়কে আর যে-ই কিডন্যাপ করুক, রিয়াজ করেনি।”

কফি হাউজের দোকানের অন্যপাশে চোখ আটকে গেলো আসিফের। “ডিটেক্টিভ রেজার ব্যাপারটা কি, বল তো?”

রেজাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখলো জিয়া। রাস্তার অন্যপাশে ডিপার্টমেন্টের প্রবেশপথ, তার সামনেই গাড়ি পার্ক করেছে রেজা। পার্কিংলট পর্যন্ত যাওয়ার ধৈর্য নেই তার, বোঝা যাচ্ছে। এত জোরে গাড়ির দরজা লাগালো মানুষটা, এখানে বসেও শব্দ পাওয়া গেলো। ভাল ব্যবহারের জন্য রেজার সুনাম কোনদিনও ছিলো না। আজ আরও বেশি বদরাগি বলে মনে হচ্ছে তাকে। চট করে বিল্ডিংয়ে ঢুকে পড়ল সে।

“ডিটেক্টিভ রেজার কাঁধে অড্ডুত একটা কেস চেপেছে, স্যার। ক্ষেপে আছে একেবারে। গতকাল রাতে তাসলিম রোডের কাছে নয়াতলায় একটা খুন হয়েছে, ওটা নিয়ে মাথা খারাপ হয়ে আছে ওর। ডিপার্টমেন্টের হটেষ্ট কেস।”

ঐ কুঁচকে গেলো আসিফের। “আমাদেরটা হটেষ্ট কেস না? আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন বিজ্ঞানী মারা গেলেন, তবুও ওটা হটেষ্ট না? ডিটেক্টিভ রেজার কেসটা কি নিয়ে?”

আয়েশ করে কফির কাপে চুমুক দিল জিয়া। “ভ্যাম্পায়ার, স্যার। ভিক্টিমের গলায় দাঁতের দাগ পাওয়া গেছে।”

আসিফের মনে পড়ে লিফটে ঢুকতে যাওয়ার সময় রেজাকে বের হতে দেখেছিল। তখন নিশ্চয় ক্রাইম-সিনের দিকেই যাচ্ছিলো সে। অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাসি ছেলেটা। কোন সহযোগি ছাড়াই কাজ করে। কয়েক মাস আগে তার সহকারি সন্ধানির গুলিতে বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছে, এরপর কাউকে পার্টনার বানাতে রাজি হয়নি।

“ভ্যাম্পায়ার? আমি কেন জানি না কেসটার ব্যাপারে?”

“আমিও জানতাম না। ফিরে এসে আপনি তো কমিশনারের সাথে ব্যস্ত ছিলেন। এই ফাঁকে বাকিদের সাথে কথা বলে জানলাম।” হাসে জিয়া। “রেজার দৌড় দেখা যাবে এবার।”

দাঙিক রেজাকে জিয়াও পছন্দ করে না, জানে আসিফ। একটু হেসে উঠে দাঁড়ালো সে। “চলো, নিজেদের চরকায় তেল দেওয়া যাক।”

কফির দাম মিটিয়ে লিফটে উঠে এসেছে ওরা। রেজাকে অধীর ছুটে বের হতে দেখা গেলো। নিশ্চয় ভ্যাম্পায়ারের ডাক পড়েছে! দুশ্চিন্তায় ঢেকে থাকা তার মুখটা দেখে আমোদিত হলো আসিফ।

অপারেটর তৃণাকে এদিকেই আসতে দেখা গেলো। “স্যার, আপনাদেরকেই খুঁজছিলাম।”

ওর দিকে তাকাল আসিফ। “কফি খেতে গিয়েছিলাম। কি হয়েছে?”

“ডানা মেয়েটা কথা বলতে চেয়েছে আপনার সাথে। ইন্টেরোগেশন রুমে একটা

সিটিংয়ের ব্যবস্থা করবো?”

ক্লান্তি দূর হয়ে গেলো আসিফের মুখ থেকে নিমেষে। “শিওর।”

তৃণার মুখ থেকে উত্তেজনার ভাবটা দূর হলো না। কয়েকটা প্রিন্টেড কাগজ বাড়িয়ে দিল সে। “আশুলিয়ার গ্র্যান্ড-ডি-সিলভার রেস্টোরার সিসিক্যামে বিজয়ের ফেস সার্চিং চলার সময় এক পর্যায়ে পাওয়া গেছে। এই ক্যামের পরে ওদের আর ট্রেস পাওয়া যায়নি, স্যার। স্রেফ উধাও হয়ে গেছে ওরা।”

নিঃশ্বাস বন্ধ করে কাগজটার ওপর ঝুঁকে এলো আসিফ আর জিয়া। বিজয়কে দেখা যাচ্ছে পাশ থেকে একটা ছবিতে। হালকা গড়নের এক কিশোর, ফর্সা, চেহারা, খাড়া নাক, বাদামি চোখ। আধুনিক ফ্যাশনের সাথে তাল মিলিয়ে ওপরের দিকে শিংয়ের মতো উঠে গেছে চুল। সাথে সুঠামদেহি কেউ বসে আছে। তার চেহারা দেখা যাচ্ছে না অবশ্য।

ডেট দেখলো আসিফ। আজকে সকাল আটটা বারোতে তোলা এগুলো। অন্য ছবিগুলো একে একে দেখলো ওরা। শেষ ছবিতে ক্লিয়ার একটা ভিউ পাওয়া গেলো।

সানগ্লাস পরে থাকা যুবকের চেহারাটা কঠোর, কিন্তু তাকে সুদর্শন বলতেই হবে। গালে হালকা চাপদাঁড়ি আর সানগ্লাসে মুখ প্রায় ঢেকে আছে।

“দ্যাট’স আওয়ার গাই!” বিড় বিড় করে বলল আসিফ।

“ডক্টর রমিজ খানের নাম শুনেছেন?” দু-হাত টেবিলের ওপর রেখে বলল ডানা, “কেমিস্ট্রির আরেকজন ছাত্র। ঢাকা ভার্সিটি থেকে পড়েছেন ইনিও। তারপর এম.টেক করেছেন মডার্ন মেথড অব কেমিস্ট্রি অ্যানালাইসিসের ওপর। পিএইচডি করেছেন আইআইটি থেকে অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রিতে।”

মাথা ঝাঁকাল আসিফ। “এটা তো ইন্ডিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, তাই না?”

“হুম।” অস্বস্তির সাথে একবার আয়নার দিকে তাকাল ডানা, জানে এখান থেকে দেখা না গেলেও আয়নার অন্যপাশ থেকে কেউ ঠিকই তাকিয়ে আছে। “ডক্টর রমিজ খান এখন স্কয়ারের হয়ে কাজ করছেন। তবে কেমিস্ট্রি নিয়ে স্টাডি করার আগ্রহ আগের মতোই আছে। আর আছে ডক্টর তানভীর জালালের প্রতি এক ধরনের ঈর্ষা।” আসিফের চোখের দৃষ্টি লক্ষ্য করে আবার বলল ও, “ডক্টর জালালকে সবাই প্রফেসর জালাল বলে ডেকে থাকেন, সম্ভবত ঢাকা ভার্সিটিতে শিক্ষকতার সময় থেকে এটা চলে আসছে। যাই হোক, ডক্টর খান স্যারকে আগে থেকেই ঈর্ষা করতেন। নানা ধরনের কথা ছড়িয়ে বেড়াতেন তার নামে। স্যারের ল্যাব আর বাসা একবার তল্লাশি করা উচিত, লোকজনের সামনে প্রকাশ্যে এমন দাবি তিনি কম করেননি। তার মতে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই জায়গাটাতে অবৈধ কাজকর্ম চলে আসছে।” মুখ বাঁকালো ডানা।

ওর দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকাল আসিফ। “কাজেই এই ডক্টর খান আপনাকে কিনে নিলেন ডক্টরের চোখ হয়ে কাজ করার জন্য। প্রফেসর জালালের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করলে আপনারও বা কি খারাপটা হচ্ছে? সেই সাথে অবৈধ কোন কাজে প্রফেসর জড়িয়ে থাকলে নীতিগতভাবেও ঠিক পথেই থাকছেন। মাঝ থেকে যদি আপনার সামান্য আয় হয়, কে সেটাকে অন্যায় বলবে?”

তীব্রভাবে মাথা নাড়লো ডানা। “টাকা নেওয়ার প্রশ্নই আসে না। স্যারের ওপর স্পাইং করার অফার তিনি দিয়েছিলেন। তবে লোকটার মুখের ওপর না করে দিয়েছিলাম আমি।”

“তাই?” কৌতুকভরে জানতে চাইল আসিফ।

“অফকোর্স! আপনার কি মনে হয়, একসময় আমার নতুন জীবন দিয়েছিলেন যিনি, সামান্য টাকার বিনিময়ে তার বিরুদ্ধে কাজ করবো? তার ওপর গুপ্তচরগিরি করবো? টাকার প্রয়োজন হলে প্রফেসর জালালই সেটা আমাকে দিতে পারতেন। অন্যের কাছ থেকে কেন নিতে যাবো?”

“তার মানে, আপনি প্রফেসরে জালালের প্রতি বিশ্বাস ছিলেন? টাকাটা আপনি ডক্টর খানের কাছ থেকে নেননি?”

শব্দ মুখে তাকাল ডানা। “সন্দেহ হচ্ছে? ডক্টর খানকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে পারেন এটা।”



পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল আসিফ, “আমাকে হঠাৎ ডক্টর খানের ব্যাপারে বলার অর্থ কি? প্রফেশনাল ঝামেলা তাদের ছিলো বলে মনে হচ্ছে। একই ফিল্ডে কাজ করা দু-জন ব্যক্তির মধ্যে প্রতিযোগিতা হতেই পারে। ধীরে ধীরে সেই প্রতিযোগিতা খারাপের দিকে মোড়ও নেয়—এটা নতুন কিছু না। এধরনের প্রতিযোগিতা থেকে খুনোখুনি হবার ঘটনা খুবই বিরল।”

রেজার কথা মনে পড়ে যায় আসিফের। মার্ডার সলভ করা প্রতিযোগিতার জিনিস নয়, সেটা করতেও পিছপা হয়নি সে!

“মির্জাপুর থানার ওসি আপনাকে এব্যাপারে কিছুই বলেননি?” অবাক হলো ডানা, “স্যারের বাড়ির নিরাপত্তা ব্যবস্থা আপনি দেখেছেন। চুরির ঘটনার পর ইলেক্ট্রিক ওয়্যার ইন্সটল করেছিলেন তিনি। তবে ক্যামেরাগুলো আগে থেকেই ছিলো কিন্তু! আর, একজন মানুষের ছায়া সেখানে ধরা পড়েছে, মি. আসিফ। চেহারা স্পষ্ট করে বোঝা যায়নি ঠিক, তবে অবিকল ডক্টর খানের অ্যাসিস্টেন্টের মতো দেখতে। ডক্টর খানের বিরুদ্ধে থানায় জিডি করেও এসেছিলেন ডক্টর জালাল।”

এই তথ্যটা আসিফকে বিস্মিত করলো। ওসি গৌরব দেখা যাচ্ছে মোটেও সহযোগিতা করেননি, তথ্য গোপন করেছেন। গৌরবের ধারণা চুরির ঘটনার সাথে মার্ডারের কোন সম্পর্ক নেই।

অথবা, আরও কিছু থেকে থাকবে এর ভেতরে। মির্জাপুরের ওসির নির্বুদ্ধিতাই হয়তো এককভাবে দায়ি নয়। আসিফের কাছে তথ্য গোপন করার পেছনে টাকার খেলা কাজ করে থাকতে পারে। যে মানুষ তানভীর জালালের কুককে টাকা অফার করতে পারে, তার পক্ষে গৌরবকে টাকা সাধা কোন আশ্চর্যের ব্যাপার হবে না। বিষয়টা খতিয়ে দেখতে হবে, ভাবলো সে। অবশ্য তবে এরচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কাজ এখন আছে। ডক্টর রমিজ খানকে লুজ ট্র্যেইল বলে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না।

“ডক্টর রমিজ খানের ঠিকানা আর মেইল অ্যাড্রেস আমাকে দেবেন, তবে পরে। প্রফেসর কি উনার সাথে কাজ করেছিলেন কখনও? সংঘাতটা বাঁধলো কবে থেকে?”

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল মেয়েটি। “আসলে, ঝামেলা একেবারে শুরু থেকেই লেগেছিলো। ডক্টর তানভীর জালালের উত্থানের সময় থেকে বলতে পারেন। মৌলিক পদার্থগুলোর মাঝে যৌগিক পদার্থ থাকতে পারে—এরকম একটা জিনিস দিয়েছিলেন ডক্টর খান। নিছক হাইপোথিসিস। সেমিনারে ছিলেন ডক্টর জালালও। তিনি খুব প্রশংসা করেছিলেন। প্রমাণ করেও দেখিয়েছেন মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই।”

বুঝে ফেলল আসিফ। “আর ওই প্রমাণের পরে প্রফেসর কোথাও ডক্টর খানের নাম উচ্চারণও করেননি। বিশ্ব ডক্টর জালালকে নিয়ে স্তম্ভিত করেছে। হারভার্ডে বসিয়েছে তাকে, কয়েক বছর শিক্ষকতার পাশাপাশি চমৎকার পরিবেশে চালিয়ে গেছেন গবেষণা। আরও দারুণ দারুণ কিছু আবিষ্কার করেছেন ওয়ার্কিং এনভায়রমেন্টের সুবিধা নিয়ে। কিন্তু ডক্টর খান মনে করছেন, ওগুলো তার পাওয়ার কথা ছিলো। আইডিয়া তার ছিলো, কয়েক মাস পরে হয়তো প্রমাণও করতে

পারতেন। প্রফেসরের জায়গায় থাকতে পারতেন ওই ডক্টর খান। কিন্তু তার স্থানটা স্রেফ কেড়ে নিয়েছেন প্রফেসর, তাই ধরে নিয়েছেন ভদ্রলোক।”

বিশ্ব দৃষ্টিতে আসিফকে দেখলো ডানা। “হুম। কিন্তু এরকম ধারণা অমূলক। ডক্টর জালাল সেই সেমিনারে বলেছিলেন এমন একটা আইডিয়া উনার আগে থেকেই আছে, সেই থিওরির ওপর অল্পস্বল্প কাজও করেছেন। কিন্তু ডক্টর খান তা মানতে নারাজ। উনার কথা হলো, তার আইডিয়া চুরি করেছেন ডক্টর জালাল। পনের বছর পরও মেনে নিতে পারেননি ডক্টর খান। আগে কেমিস্ট্রি নিয়ে লাগতেন, তারপর উঠেপড়ে লাগলেন উনার চরিত্র নিয়ে।”

“চরিত্র নিয়ে?” অবাক হয় আসিফ।

“হু। ডক্টর জালাল অল্পবয়সি মেয়েদের সাথে সন্দেহজনক মিটিং করছেন, এরকম কথাবার্তা বলে বেড়াতেন। নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে এমন ছবি আপলোডও করেছিলেন তিনি। ডিসগাস্টিং সব জিনিস! বিজ্ঞানের মানুষজন নিজেদের মধ্যে কলেজ স্টুডেন্টদের মতো মারামারি করলে কেমন বাজে একটা ব্যাপার হয়, আপনিই বলুন?”

কিছুক্ষণ চুপ হয়ে থাকল দু-জনেই, তারপরই চট করে আসল প্রশ্নটা করে ফেলল আসিফ, “আমাকে কিছু একটা বলার জন্য ডেকেছিলেন আপনি। নিশ্চয় ডক্টর রমিজ খানের প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে নয়?”

মাথা নিচু হয়ে গেলো ডানার। “বিশ লাখ টাকার ব্যাপারটা...ওটা আমি কোন অন্যায় কাজের জন্য নেইনি।”

শান্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল আসিফ। গাজীপুরের বাসিন্দাদের মধ্যে এই এক ডানাকেই সন্দেহ করতে পারছে সে। বাড়ির বাসিন্দাদের মধ্যে আর কারও কোন মোটিভ দেখতে পায়নি। বিজ্ঞানীর নিজের ছেলে বিজয় বাবাকে হত্যা করেছে এমনটা বিশ্বাস করা কঠিন। রিয়াজের জন্য জীবিত প্রফেসর অনেক বেশি লাভজনক। যেমনটা আগে ভেবে দেখেছিলো আসিফ। আর এই ডানা, একে বিশ্বাস করার মতো কিছু দেখেনি আসিফ।

ল্যাভে থাকতেই তৃণাকে একটা মেসেজ দিয়ে বলেছিলো ডানার ফাইন্যান্সিয়ালস চেক করতে। ছট করে বিশ লাখ বেড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা তখনই চোখে পড়ে ওদের। মাত্র একসপ্তাহ আগে এই ট্রান্সফারটা এসেছে। এরকম ট্রান্সফারের পরে একটা অপরাধের সংযোগ বোঝা খুব একটা কঠিন কাজ নয়।

এরপর ডানার ব্যক্তিগত জীবনের দিকেও নজর দিয়েছে ওরা। মেয়েটা বাংলাদেশি মায়েরসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক। জার্মানিতে ছিলো, দেশে ফিরে এসেছে এক যুগ আগে। পরিবারে বাবা না থাকলে যা হয়, বেয়াড়াপনা থেকে মাইনর ক্রাইম সবকিছুতেই জড়িয়েছিলো সে। পরে তানভীর জালাল তাকে এরকম দণ্ডক নিয়ে ফেলেন। ন্যাশনাল হোটেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইন্সটিটিউট থেকে প্রফেশনাল শেফ কোর্স করেছে মেয়েটা। তানভীর জালালের ছত্রছায়া থেকে বের হয়ে মালয়েশিয়ার

সাহাতিনা রেস্তোরাঁয় কয়েক বছর শেফের দায়িত্ব পালন করেছিলো। তারপর এক বছর কাজ করেছিলো হোটেল র‍্যাডিসনে। এরপরই ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তানভীর জালাল দেশে ফিরে এসেছেন মাত্র, তার বাড়িতে কুকের চাকরিটা নিয়ে নেয় সানন্দে। সেই সাথে চালিয়ে যায় অনলাইন কোর্স।

এসব তথ্য দেখে আসিফ অবাক হয়নি। অবাক হয়েছিলো ডানার পারিবারিক অবস্থা দেখে। ডানার মায়ের লিউকোমিয়া ধরা পড়ে গত বছর। প্রচুর খরচের ধাক্কা, তারপরও অনেক সময় বাঁচে না রোগি। এর কয়েক মাস পর প্রফেসর তানভীর জালালের মৃত্যু আর ডানার অ্যাকাউন্টে বিশলাখ টাকার ট্রান্সফার দেখে যেকোন গোয়েন্দা একটা উপসংহারেই পৌঁছে যাবে।

নিজের চেয়ারে হেলান দিল আসিফ। ইন্টেরোগেশন রুমের একমাত্র টেবিলের একপাশে মাথা নিচু করে বসে আছে ডানা, অন্যপাশে ও। এবার যখন মুখ খুললো, উষ্ণতার লেশমাত্র থাকলো না তার কণ্ঠে।

“মিস ডানা, আপনি বোধহয় অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পারছেন না। আমাদের দেশের ইতিহাসে উজ্জ্বলতম ব্যক্তিত্ব প্রফেসর তানভীর জালাল মারা গেছেন। তার মৃত্যুতে বাংলাদেশের সেনাপ্রধান নিজে আমাদের রিকমেন্ড করেছেন কেসটা নেওয়ার জন্য। শুধু বাংলাদেশই না, এই কেসে নিয়ে সিরিয়াস ধরণের মাথা ঘামাচ্ছে আমেরিকা। সঙ্গতকারণে একদিন দেরি করে জানানো হয়েছে ওদের। তারা আমাদের এখানে এফবিআই’র একাধিক সদস্য পাঠাতে আগ্রহি। এফবিআই’র লিয়াজো করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাকে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বেশ শোরগোল শুরু হয়ে গেছে প্রফেসরের মৃত্যুতে। তিনি নিজের বাড়িতে খুন হয়েছেন, সেই বাড়ির আপনিও একজন বাসিন্দা। শুধু তাই নয়, প্রফেসর মারা গেছেন বিষক্রিয়াতে। আর আপনি এই বাসার রান্না-বান্নার দায়িত্বে আছেন। হয়তো জানেন, তবুও মনে করিয়ে দিচ্ছি, প্রফেসর আমেরিকার নাগরিকও ছিলেন। আপনি ফাঁসির দড়ির দিকে তাকিয়ে আছেন নাকি ইলেক্ট্রিক্যাল চেয়ারের দিকে সেটা আমি বলতে পারবো না। তবে আপনি কথা বলা শুরু করলেই ভাল করবেন। আমি কি আপনাকে বোঝাতে পেরেছি?”

আসিফের শীতল গলা স্পর্শ করলো ডানাকে। ভীত একটা মুখ নিয়ে ঠিকাকালো মেয়েটা। “দেখুন, বিষয়টা এমন নয়। আমাকে টাকাটার ব্যাপারে বলতে নিষেধ করেছিলেন স্যার...”

“প্রফেসর জালাল মানা করেছিলেন? তিনি জানতেন এটা?”

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটি। “ইনফ্যাক্ট, টাকাটা তিনিই দিয়েছিলেন আমাকে। হয়তো আপনি হোমওয়ার্ক ঠিকমত করেননি ডিটেক্টিভ, কখনো বুঝতে পারতেন, কেন!” মেয়েটার গলায় এখন পরিষ্কার ঝাঁঝ।

“আপনার মার লিউকোমিয়া হয়েছে,” বিড় বিড় করে বলল আসিফ। এজন্যেই সন্দেহ করছিলো মেয়েটাকে। মায়ের চিকিৎসার জন্য জঘন্যতম অপরাধ করতেও বাঁধে না একজন মানুষের। তবে টাকার উৎস স্বয়ং প্রফেসর? হিসেবে গোলমাল হয়ে গেলো

আসিফের। “আপনার বক্তব্য প্রমাণ করতে পারবেন?” চ্যালেঞ্জের সুরে বলল সে।

“নিজের ব্যাকআপ অ্যাকাউন্ট থেকে আমাকে ট্রান্সফার করেছিলেন উনি। মায়ের ব্লাড ট্রান্সপোর্টেশন দরকার। সামনের পনের তারিখ অপারেশন ডেট। আপনি এখনও সন্দেহে থাকলে রিয়াজকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। অ্যাকাউন্টটা ভালমত ট্রেস করলেও লিংক পাবেন স্যারের সাথে। এরকম সাহায্যের কাজগুলো ডক্টর জালাল ঢাক পিটিয়ে করতেন না। আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন যাতে কাউকে না বলি।”

থম মেরে বসে থাকলো ডিটেক্টিভ আসিফ আহমেদ। প্রফেসর জালালের প্রতি শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেছে ওর। একই সাথে গাঢ় অন্ধকারে পড়ে গেছে। এই ডানা কাজটা না করে থাকলে কে করেছে? বাইরের কেউ?

ছবিতে দেখা যুবকটির চেহারা আবারও ভেসে উঠলো আসিফের মনের পর্দায়। কিডন্যাপ আর মার্ডার-দুটোর পেছনে কি একজনের হাতই আছে?

হেসে উঠলেন ডক্টর রমিজ খান।

সন্দেহের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে আসিফ। বয়স্ক ভদ্রলোক, মুখ ভর্তি দাঁড়ি। দৈর্ঘ্য একেবারে কম হবে না-নির্ধাত দেড়ফুট। ওই কাঁচাপাকা দাঁড়িকে গত কয়েক বছর কাঁচি অথবা রেজরের ধারে কাছেও যেতে হয়নি। চোখে আছে ভারি চশমা। সবমিলিয়ে গুরুগম্ভীর ওই মুখের সাথে শিশুসুলভ হাসিটা মোটেও যাচ্ছে না। নিজের বিরুদ্ধে চুরি আর হত্যার অভিযোগ শুনে কেউ যে হেসে উঠতে পারে, আগে কখনও কল্পনাও করতে পারেনি সে।

মির্জাপুর থানায় ডক্টর রমিজ খানের নামে করা জিডির ব্যাপারে ফোনে খোঁজ নিয়েছে আসিফ। এই লোককেই বাড়িতে অনুপ্রবেশের জন্য সন্দেহ করেছিলেন প্রফেসর। অন্তত এ ব্যাপারে কোন সন্দেহই নেই এখন। গৌরব রায়কে থানায় পাওয়া যায়নি, না-হলে তাকে ফোনেই একচোট নেয়া যেত। লোকটার সাথে সামনাসামনি আলোচনায় বসার পরিকল্পনা আছে তার।

ইন্টেরোগেশন চেম্বারের টেবিলের অন্যপাশে আজ দুটো চেয়ার। একটাতে ডক্টর রমিজ খান বসে বসে হেসে চলেছেন। অন্যটাতে আছে ভদ্রলোকের অ্যাসিস্ট্যান্ট ফরহাদ। সুঠামদেহি, বয়স ছাব্বিশের বেশি হবে না। ছেলেটার মুখ শুকিয়ে পাংশু হয়ে গেছে। কড়া চোখে তার দিকে একবার তাকালো আসিফ।

“আপনার কাছে পুরো বিষয়টা মজার মনে হচ্ছে, ডক্টর? একজন মানুষ খুন হয়ে গেছেন। এদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের একজন ছিলেন তিনি, তার ওপর তিনি ছিলেন আমেরিকান সিটিজেন। আমেরিকা মাথা গলাচ্ছে এ-ব্যাপারে, এফবিআই’র দু-জন এজেন্ট আগামিকাল এদেশে আসছে। তাদের কাছেও আপনার ব্যাপারে রিপোর্ট করবো আমি। তারপরও যদি আপনার কাছে সবকিছু হাস্যকর লাগে, আমি সত্যিই হতাশ হব।”

এবার অনেক কষ্টে হাসি থামালেন ডক্টর। শব্দ করে ঠোটদুটো চেপে ধরলেন তিনি। মনে হচ্ছে গোটা ব্যাপারটা তার কাছে এখনও হাস্যকর লাগছে। টেবিলের উপর দু-হাত রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে এলেন।

“হাস্যকরই তো লাগবে, মি. আসিফ। সামান্য এক চোরকে একটু বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন আপনারা! তার ব্যাপারে শ্রদ্ধায় চোখ বন্ধ করে যেতেছেন। তার দোষ তো আপনার চোখে পড়ার কথা নয়। সত্যি বলতে কি, তার মৃত্যু ছিলো অবধারিত। এটা সম্ভবত ওই তানভীর জালালও জানতো।”

“এই লোকটা,” ডক্টরের সহকারির দিকে ইঙ্গিত করলো আসিফ, “কয়েকদিন আগে এক রাতে প্রফেসরের বাসায় হানা দিয়েছিলো। সময়টা জানতে চান? রাত দুটো

বেজে সাঁইত্রিশ মিনিট। কিভাবে জানলাম গুনতে চান? ক্যামেরায় ধরা পড়েছে আপনার বিশ্বস্ত সহকারি। আর এইমাত্র আপনি নিশ্চিত করলেন প্রফেসরের মৃত্যু ছিলো অবধারিত এবং আপনি সেটা জানতেন। এর অর্থ কি ধরে নেব, খুনটা যে হবে আপনি তা জানতেন?”

ডক্টর খানের মুখ হঠাৎ করে গম্ভীর হয়ে গেলো। গলা নামিয়ে ফেললেন তিনি। “খুনটা কে করেছে আমি জানি, ডিটেক্টিভ।”

স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলো আসিফ। “কে?”

“শয়তান। শয়তান সরিয়ে দিয়েছে জালালকে। হি হ্যাড ইট কামিং!”

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো আসিফ, হেলান দিল চেয়ারে। ভদ্রলোকের মানসিক সুস্থতা নিয়ে সন্দেহ ওর আগেও ছিলো। এবার নিশ্চিত হলো পুরাপুরি।

“প্রিজ, ডক্টর!” শান্ত কণ্ঠেই বলল সে। “আপনি বিজ্ঞানের লোক, এসব ফালতু কথা বলবেন না। বলার মতো কিছু থাকলে বলুন। চোর হিসেবে ঢুকেছিলো আপনার ডানহাত ফরহাদ। এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত। নিশ্চয় অস্বীকার করবেন না?”

ফরহাদ নিজের সিটে আরও কুঁকড়ে গেলো। এখন পর্যন্ত টু শব্দটিও করেনি সে। ডক্টরের পরবর্তি বাক্য শুনে তার চোখদুটো শূন্য হয়ে গেলো। শেষ আশাটাও শেষ হয়ে গেলে মানুষের দৃষ্টি এমনই হয়ে থাকে।

“অস্বীকার করবো না, ওটা ফরহাদই ছিলো। তবে কাজটা ও আমার নির্দেশে করেছে। অযথা ওকে দোষ দেওয়ার দরকার নেই, ডিটেক্টিভ।” নিঃসংকোচে স্বীকার করে নিলেন ডক্টর খান, সেই সাথে যোগ করলেন, “আর খুনটাও করেছে শয়তান।”

চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ছেড়ে দিল আসিফ। সামনের স্বীকারোক্তি দেওয়ার কাগজটা টেনে নিল। এই কেস এত সহজে সমাধান হয়ে যাবে ভাবেনি।

“নিশ্চয়!” সায় দিল সে, “আপনাকে দেখে ধার্মিক মানুষ বলে মনে হচ্ছে আমার। তাহলে নিশ্চয় জেনে থাকবেন, মানুষ সব খারাপ কাজ শয়তানের ধোঁকাতে পড়েই করে। এটাই তো বলে আমাদের ধর্ম, তাই না?” কাগজটা ওদের দিকে ঠেলে দিল এবার। “আপনারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে ফেললে আদালতে আপনাদের সহযোগিতার কথা জানানো হবে। আশা করা যায় শাস্তিটা কমে আসবে অনেকটাই। মৃত্যুদণ্ড এড়িয়ে যাবজ্জীবন পেতে পারেন।”

ডক্টর খান কাগজটার দিকে ফিরেও তাকালেন না। “অ্যালকেমি নিয়ে কিছু জানেন, ডিটেক্টিভ?”

“অবাস্তব প্রসঙ্গ টানবেন না, ডক্টর। এটা কেমিস্ট্রি কুস্তি নয়,” বিরক্ত হয়ে বলল আসিফ।

“আপনাদের সহযোগিতা করতেই চাইছি একটু,” শেষ মেশানো কণ্ঠে বললেন ডক্টর। “অ্যালকেমি নিয়ে কতটুকু জানেন, স্যার?”

লোকটার মানসিক সুস্থতা প্রশ্নবিদ্ধ হলেও তার সাথে খেলার সিদ্ধান্ত নিল আসিফ। অনেক সময়ই অপরাধিকে কথা বলতে দিলে একসময় স্বীকারোক্তি বের হয়ে আসে।

কাঁধ ঝাঁকালো ও। “ফালতু একটা বিষয়। বিশ্বাস বলাই ভাল। একদল ক্ষাপাটে লোক পরশপাথর আর অমরত্বের সুখা আবিষ্কার করার নেশায় নিজেদের জীবন শেষ করে ফেলেছিল, তাদের পাগলামি বিদ্যাই হলো অ্যালকেমি।”

মাথা নাড়লেন গুরুগম্ভীর মানুষটা। “আপনার ধারণা একেবারেই ভুল। অবশ্য আপনাকে কী আর দোষ দেব! আজকের যুগটাই এমন, পুরনোকে অবিশ্বাস করার যুগ।”

কিছু না বলে তাকিয়ে থাকলো আসিফ। আজকের একবিংশ শতাব্দির এক মার্ভার কেসের সাথে প্রাচীনবিদ্যার সম্পর্ক কোথায় সেটা বোঝার চেষ্টা করছে।

“অ্যালকেমি ছাড়া আজকের রসায়ন-শাস্ত্রের মুখও দেখতে পেতাম না আমরা, ডিটেক্টিভ। শুরুটা কখন হয়েছিলো জানেন তো? বলতে পারেন সেটা ছিলো সক্রিটিসের যুগ। দর্শনশাস্ত্রই তখন সব ধরনের জ্ঞান বলে বিবেচিত হত। বুঝতেই পারছেন, সাধারণ বিজ্ঞান, যেমন, পদার্থ অথবা রসায়নের কোন ভূমিকা তখন ছিলো না। জ্ঞান-বিজ্ঞান ছিলো শুধুই প্রাকৃতিক দর্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধ।”

বিরক্ত লাগছে আসিফের, এক কথায় বলে দিল সে, “দর্শনের মতো আরেকটি ভ্রান্তবিদ্যা ছিলো আপনার ওই অ্যালকেমি।”

ঐ কুঁচকে গেলো ডক্টর খানের। বাঁধা পেয়ে যারপরনাই বিরক্ত তিনি। “ওটাকে মোটেও ভ্রান্ত বলব না আমরা। কেমিস্টমাত্রই আমার সাথে সুর মেলাবেন। কারণ, অ্যালকেমিকে আমরা অভিহিত করি প্রোটোসায়েন্স হিসেবে। প্রোটোসায়েন্স মানে তো বোঝেন, নাকি?”

মাথা ঝাঁকাল আসিফ। “সমালোচিত বিজ্ঞান। পরবর্তিতে যেগুলোর সীমাবদ্ধতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেই ওই সমালোচিত বিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে নিখুঁত কোন তত্ত্ব দাঁড় করানো হয়, সেটাই প্রোটোসায়েন্স।”

প্রশংসার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন ডক্টর। পুলিশের লোকজনকে মূর্খ ভাবার সহজাত প্রবণতা। “ঠিক তাই। আর অ্যালকেমি থেকেই আজকের রসায়নের উৎপত্তি। অনেকে হয়তো জানে না-অ্যালকেমি সেই যুগে যা ডেভেলপ করেছিলো, গবেষণাগারের কলাকৌশল, তত্ত্ব, প্রক্রিয়া এমনকি কিছু পারিভাষিক শব্দ আজও মডার্ন কেমিস্ট্রিতে ব্যবহার হচ্ছে। অ্যালকেমিস্টরা আবিষ্কার করেছিলেন আকস্মিক পরীক্ষা আর বিশোধনের উপায়, ধাতুর কাজের প্রক্রিয়া। অ্যালকেমিস্টদের কিছু আবিষ্কার তো শিল্প জগতের শুরুই বলা যায়-গানপাউডার, কালি, ডাই, রঙ কেমিক্যাল, সিরামিক, লেদার ট্যানিং, কাঁচ প্রস্তুতকরণ-অনেক অনেক দারুণ আবিষ্কার তাদের ছিলো। কাজেই অ্যালকেমি ছাড়া আজকের রসায়নের কথা ভাবতে যায় না। বিষয়টাকে নগন্য ভাবার কারণও দেখি না আমি।”

ডক্টরের কথায় যুক্তি আছে। এ নিয়ে আর তর্ক করলো না আসিফ। কিন্তু সব কথা মেনে নিতেও পারলো না। কাজেই ভিন্ন সুরে কথা বলল এবার, যদিও আগের মন্তব্যে এখনও অনড় সে।

“অ্যালকেমিস্টদের ওই ভৌত আবিষ্কারগুলো আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। তবে সেজন্য অ্যালকেমিকে মহানবিদ্যা ভাবার কারণ নেই। আমার জানামতে, অ্যালকেমি মূলত প্রচলিত হয়েছে স্বল্প মূল্যবান ধাতুকে পরশপাথর দিয়ে ঘষলে সোনা হয়ে যাবে, আর সজ্জিবনী সুখা পান করলে একজন মানুষ অমরত্ব লাভ করবে—এই দুই লক্ষ্যকে সামনে রেখে। তারা মূলত বানাতে চেয়েছিলো পরশপাথর—ফিলোসফার স্টোন। আর এলিক্সির অফ লাইফ—যা পান করলে মানুষ পাবে অমরত্ব। এসবে তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতো। সে লক্ষ্য সাধন করতেই ওসব রাসায়নিক আবিষ্কার তাদের। অথচ আপনি-আমি জানি, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অমরত্ব লাভ অসম্ভব। অলীক স্বপ্ন দেখা সেই অ্যালকেমিস্টদের ওপর বিশ্বাস রাখছেন আপনি—এটা আমার কাছে অবিশ্বাস্য লাগছে, স্যার।”

“হ্যারি পটার পড়েছেন?” আবারও প্রশ্ন করলেন ডক্টর খান।

হাত ওল্টালো আসিফ, “কে না পড়েছে?”

“প্রথম বইতে ফিলোসফার স্টোন নিয়ে হ্যারির সাথে লেগে যায় ভোল্‌ডেমর্টের, জানেন তো? নিকোলাস ফ্ল্যামেলকে ওই স্টোনের আবিষ্কারক বলা হয়েছিলো। আপনার কি মনে হয় তিনি শুধুই কাল্পনিক একটি চরিত্র?”

বিরক্ত লাগছে আসিফের, রুক্ষভাবেই বলল, “এত গভীরভাবে ভেবে দেখিনি।”

“নিকোলাস ফ্ল্যামেল অ্যালকেমিস্ট ছিলেন—এই ধারণা অনেক উপন্যাসেই ব্যবহার করা হয়। তাকে একটা চরিত্র হিসেবে দেখানো হয়। অনেকের ধারণা এই ফ্ল্যামেল আসলে মিথ। শুধুই গালপল্প। অথচ ব্যাপারটা মোটেও তা নয়। নিকোলাস ফ্ল্যামেল নামে বাস্তবেই একজন মানুষ ছিলেন। প্যারিসে জন্মেছিলেন। সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর একমাত্র সফল অ্যালকেমিস্ট তিনি।”

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো আসিফ। হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের ইন্টেলিগেন্স রুমে এসে কেমিস্ট্রি ক্লাস নিচ্ছেন এই ডক্টর! অসহ্য রকম বিরক্তি লাগতে শুরু করলো ওর। আধপাগল লোকটার মুখ বন্ধ করতে হবে।

“বেশ। নিকোলাস ফ্ল্যামেল একজন অ্যালকেমিস্ট ছিলেন। কিন্তু প্রফেসর তানভীর জালালের হত্যারহস্য নিয়ে কিছু বলতে পারলে জানান, ডক্টর। শত শত বছর আগের ইতিহাস শোনা যাবে আর আরেকবদিন, অন্য কোথাও।”

ডক্টর মাথা নাড়লেন। “এখানেই এর আলোচনা দরকার, ডিটেক্টিভ। আর তানভীর জালালের মৃত্যুর সাথে এটা সরাসরি সম্পর্কিত। দেখুন...” ব্যস্ত হয়ে পকেট থেকে মোবাইলফোন বের করলেন তিনি। একটি পিডিএফ ফাইল ভেসে উঠলো পর্দায়। ফোনটা ডিসপ্লে দেখিয়ে বললেন, “ঐ চোরটা পিজেকে কি পরিচয় দিতেন তা দেখুন। আপনি কি সাক্ষর করার সময় নিজের নামের পরে ডিটেক্টিভ বসিয়ে সাক্ষর করেন, মি. আসিফ? স্বীকার করবেন, বিষয়টা অদ্ভুত দেখাবে।”

ঠেলে দেওয়া মোবাইলফোনের স্ক্রিনে তানভীর জালালের লেখা একটি বইয়ের প্রিফেস দেখা যাচ্ছে, নিচে তার সিগনেচার। ইংরেজি অক্ষরগুলো খুব একটা অস্পষ্ট



নয়। চেষ্টা করলেই পড়া সম্ভব। অসম্ভব গোছানো হাতের লেখা ছিলো ভদ্রলোকের। অন্তত সিগনেচার দেখে আসিফের সেরকমটাই ধারণা হচ্ছে। তবে এটা কেন দেখতে বলা হচ্ছে তা বুঝতে ওর বেশ কয়েক সেকেন্ড লেগে গেলো।

আসিফের চোখ বড় হয়ে গেলো বুঝতে পারার পর। ভাল একটা দিকে মোড় নেওয়ার সম্ভাবনা রাখে বিষয়টা। দেখা যাচ্ছে, প্রফেসর তানভীর জালাল নিজেকে একজন ‘অ্যালকেমিস্ট’ ভাবতেন—এমন একটি সম্ভাবনা আছে! আশ্চর্যের সাথে তাকালো এবার ডক্টর খানের দিকে। এই মানুষটা হয়তো রহস্যের গভিরে আসলেই আলোকপাত করতে পারবেন।

“নিকোলাস ফ্রামেল নিয়ে বলছিলেন...বলে যান ডক্টর, প্লিজ।”

*Tanvir Jalil Hemist*

BanglaBook.org

“নিকোলাস ফ্ল্যামেলকে নিয়ে কথা বলার আগে আপনাকে অ্যালকেমির গুরুটা একটু বলি। নয়তো পরবর্তিতে বুঝতে আপনারই অসুবিধা হতে পারে।”

সায় দিল আসিফ। রসায়নে নিজের ক্ষমতা কতদূর তা সে জানে। আর প্রাক-রসায়নের মতো বিষয় নিয়ে কথা বলতে গেলে যে পদে পদে হেঁচট খেতে হবে, তা তো নিশ্চিত!

“অ্যালকেমি শব্দটা এসেছে সম্ভবত আরবীয় আল-কিমিয়া শব্দ থেকে। প্রাচীন মিশরে এর অর্থ কালোমাটি। গুরুটা কিন্তু ছিলো আধিভৌতিক। এই বিদ্যার মূলকথা খুবই সাদামাটা। পরিশুদ্ধি। অ্যালকেমিস্টরা মৌলগুলোকে বিশুদ্ধতার চোখে দেখত। তাদের চোখে পৃথিবীর সবচেয়ে বিশুদ্ধ ধাতু হলো সোনা। বিশুদ্ধতা কমতে থাকলে রূপা-লোহা-তামায পরিণত হবে তারা। আর পর্যায় সারণি বা মৌলসমূহের বন্ধন নিয়ে আধুনিক তত্ত্বের সম্পর্কে ধারণা না থাকা অ্যালকেমিস্টদের ধারণা এমনটা হলে তাদের দোষ দেবেন কি করে?

“অ্যালকেমির উদ্দেশ্যগুলোকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়। এক, বস্তুগত। দুই, অবস্তুগত। বস্তুগত অংশটা আপনি বুঝতে পারছেন। এই কম বিশুদ্ধ ধাতুগুলোকে বিশুদ্ধ করা। যেন নিম্নমানের ধাতু থেকে বের হয়ে আসে সোনা। অবস্তুগত অংশটিতে আসছে মানুষের আত্মা। এভাবেই এলো সেই সঞ্জিবনী পানীয়ের ধারণা, যা পান করলে মানুষের আত্মা হবে শুদ্ধ। আর তাদের ধারণা অনুযায়ী বিশুদ্ধ আত্মা হলো অমর। কাজেই সেই সুখা পানকারি মানুষগুলো পাবে অমরত্ব। খেয়াল করবেন, তারা কিন্তু বায়োকেমিস্ট্রি আর কেমিস্ট্রি নিয়ে কাজ করেছে একই সাথে। ধাতু পরিবর্তন করার যে ইচ্ছে তারা প্রকাশ করেছিলো ওটা কিন্তু ট্রান্সমিউটেশন। এক মৌলকে অন্য মৌলে পরিবর্তন। আর সেই সুখা প্রস্তুত করতে গিয়ে যে কত শত ঔষধ তারা আবিষ্কার করেছিলো তার ইয়ত্তা নেই। অ্যালকেমির প্রতি শুধু কেমিস্ট্রি নয়, মেডিসিন স্নায়ুশাস্ত্রও অনেকটা কৃতজ্ঞ।”

আয়নার অন্যপাশে অস্থির হয়ে পা ঘষলো জিয়া। কাঁচের আয়নাগুলো এখন সব ইন্টারোগেশন চেম্বারেই থাকে। একপাশে আলো ভেদ করে চলে যেতে পারে, আরেকপাশে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়। দুই তলের মধ্যে জ্যাকুইনিনিয়ামের মধ্যস্তর এই ভেঙ্কিটা করে। এই আয়নাগুলোর গুরুত্ব আছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাসপেন্ডিকে একা একা বসিয়ে রেখে তার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। জিজ্ঞাসাবাদের আগে, মাঝে এবং শেষে অগোচরে মুখের ভঙ্গি লক্ষ্য করতে সাহায্য করে এটা। সবচেয়ে বড় যে উপকার এই আয়না করে, প্রত্যক্ষদর্শীরা নিজের জীবনের ঝুঁকি না নিয়েই অপরাধিকে চিহ্নিত করতে পারে।

জিয়া এখন অন্যপাশ থেকে এই জেরা দেখতে গিয়ে যুক্তিবিহীনভাবে অস্থির হচ্ছে না। এই প্রথমবারের মতো হোমিসাইডের এই ইন্টেলোগেশন চেম্বারটা ক্লাসরুম হয়ে গেছে। পুরনো বিদ্যা নিয়ে গবেষণা চলছে! ডক্টর অবশ্য জিয়ার বিরক্তির কারণ বোঝেন না। তিনি তার মতো বলে চলেছেন।

“এখানে অ্যালকেমিস্টদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কিন্তু ঠিক পরশপাথর তৈরি কিংবা সম্ভবনীয় সুধা প্রস্তুত নয়। তারা চেয়েছিলো মহাবিশ্বের প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করতে। যদি আপনি বিশুদ্ধতার জানতে চান তাহলে মহাবিশ্বের প্রতিটি পদার্থের রহস্য আপনাকে জানতে হবে। ধাপে ধাপে আপনাকে শিখতে হচ্ছে বিশুদ্ধতা। আণবিক ভর ধরে একের পর এক মৌল নিয়ে জানতে হচ্ছে। এভাবে একসময় বিশ্বের প্রতিটি পদার্থ আপনার জ্ঞানের নাগালে চলে আসবে। কাজেই-যখন পরশপাথর বানানো আপনার আয়ত্বে তখন বিশ্বের রহস্য আপনি জানবেন। এটাই ছিলো তখনকার অ্যালকেমিস্টদের মূলচিন্তা। এখানে আপনাকে আরেকটি প্রশ্ন করবো, অ্যালকেমিস্ট আর কেমিস্টদের মাঝে পার্থক্যটা কোথায়, বলতে পারবেন?”

টেবিলে দু-বার টোকা দিল আসিফ। “অ্যালকেমিস্টদের টার্গেট কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া, পরশপাথর দিয়ে ঘষা দেবেন আর ফালতু ধাতু হয়ে যাবে সোনা। এটা কখনও সম্ভব নয়, অলীক কল্পনা। কেমিস্টরা শুধু ফ্যাক্টস নিয়ে কাজ করেন। ফ্যান্টাসি নিয়ে নয়। তাই তো?”

হেসে ফেললেন ডক্টর খান। “আপনি অতিমাত্রায় যুক্তিবাদি, ডিটেক্টিভ আসিফ। এখানেও যুক্তিনির্ভর চিন্তা করছেন। আমরা যদি শুধু থিওরির দিক থেকে চিন্তা করি তাহলে পার্থক্যটুকু কি হবে সেটা জানতে চেয়েছিলাম। থিওরিতে ঠিক থাকলে কিন্তু বাস্তবতার ছোঁয়া না থাকলেও সেটা সত্যি। জুল ভার্ন ভেবেছিলেন সাবমেরিনের কথা, সুপারসনিক প্লেনের কথা। আজ সেগুলো স্বাভাবিক ব্যাপার। ওই আমলে থাকলে আপনি কি তাকে অযৌক্তিক কথা বলতে থাকা এক বুড়োর চেয়ে বেশি কিছু ভাবতেন? তাছাড়া দেখুন, অ্যালকেমিস্টদের স্বপ্ন আজ কিন্তু বাস্তব। লোহা থেকে সোনা বানানোর মূলতত্ত্ব আমাদের জানা আছে। ট্রান্সমিউটেশন করা সম্ভব আমরা জানি। শুধু আমাদের প্রযুক্তি দিয়ে যেভাবে করা হয় তা অনেক খরচের ব্যাপার। ঘষা দিয়ে ট্রান্সমিউটেশন সম্ভব কি না এটা আমাদের জানা নেই। সে যাকগে, অ্যালকেমিস্ট আর কেমিস্টদের মাঝে পার্থক্য নিয়ে কথা বলছিলাম। মূল পার্থক্য হলো, কেমিস্ট কাজ করেন হাতে আসা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে। কিন্তু একজন অ্যালকেমিস্ট শুধু ভৌতবিদ্যার ওপর ভরসা করতে পারবেন না। তিনি যদি শুধু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কাজ করে থাকেন তাহলে তিনি শুধুই একজন কেমিস্ট। অ্যালকেমিস্ট নন।”

ডক্টরের কথা বোঝার চেষ্টা করছে আসিফ। “তাহলে অ্যালকেমিস্ট হতে গেলে আরও কিছু গুণ থাকা লাগবে, এই তো? নাকি প্রক্রিয়াটা তাদের আলাদা?”

নিজের হাতের আঙুলগুলো একবার দেখলেন ডক্টর খান। “গুণ...তা বলতে পারেন। অবশ্যই অলৌকিক শক্তি ব্যবহার করতে হবে একজন অ্যালকেমিস্টকে।

ওটা ছাড়া যতই রসায়নভিত্তিক কাজ করে থাকুন না কেন আপনি একজন কেমিস্ট। অ্যালকেমিস্ট নন।”

চেষ্টা করেও আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না আসিফ। ঠোঁটের কোণে একটা বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠেছে ওর। “কাম অন, ডক্টর। অলৌকিক শক্তি? প্লিজ, আমরা মনে হয় এখানে সময় নষ্ট করছি। আপনি কোনদিকে কথা নিয়ে যাচ্ছেন সেটা আমি এখন বুঝতে পারছি স্পষ্ট। আপনি বলতে চাইছেন, অলৌকিক শক্তি ব্যবহার করতেন প্রফেসর তানভীর জালাল। এই অলৌকিক শক্তি আসতো শয়তানের তরফ থেকে। হিসেবে ভুল হওয়াতে শয়তান তাকে মেরে ফেলেছে—এই তো বোঝাতে চাইছেন? এ কথা কোন আদালতে টিকবে না। আদালত কেন, চারপাশে চেয়ে দেখুন, এই ইন্টেলিগেন্স চেস্বারেই কি টিকবে এধরণের অবাস্তব কথা?”

কোনরকম প্রতিবাদ ছাড়া আসিফের কথা শুনলেন ভদ্রলোক, তারপর বললেন, “আমার কথা আদালতে টিকলো কি না তার জন্য আমি বলছি না, ডিটেক্টিভ। বলছি, কারণ...ঠিক এমনটাই বিশ্বাস করতেন আপনার ওই মৃত প্রফেসর। আপাতত আপনার জন্য এতটুকু জানাটাই যথেষ্ট। আপনি কিসে বিশ্বাস করেন আর কিসে বিশ্বাস করেন না এসবে তো আর কেসটা সল্ভ হচ্ছে না। ভিক্টিম কি বিশ্বাস করতো সেটা নিশ্চয় আমলে নিতে হবে।”

চুপ হয়ে গেলো আসিফ, অন্তত এই কথাতে যুক্তি আছে।

সুযোগ পেয়ে আবার বলতে শুরু করলেন প্রফেসর, “তাহলে আমরা জানলাম, অ্যালকেমিস্ট হতে হলে আপনাকে হতে হবে অলৌকিক শক্তির ব্যবহার করতে সক্ষম কেউ। হয়তো জাদুবিদ্যা বা অলৌকিকতা ছাড়া আর কোনভাবে নিম্নমানের ধাতুকে সোনা বানানো সম্ভব, এমনটা তখনকার জ্ঞানীরা ভাবতে পারেননি। অমরত্ব হাসিল করা তো আরও ঝামেলার কাজ। আধ্যাত্মিক ব্যাপার-স্বাপার চলে আসে।”

“এখানে আপনাকে আরেকবার বাঁধা দিতে হচ্ছে বলে দুঃখিত,” বলে উঠলো আসিফ, “কিন্তু, আমি যতদূর জানি বিখ্যাত মুসলিম রসায়নবিদ জাবির ইবনে হাইয়ান ছিলেন একজন অ্যালকেমিস্ট। অন্তত নিজের সেই পরিচয় তিনি দিতেন। একজন খাঁটি মুসলমান তিনি ছিলেন। শয়তানের অনুগ্রহ ছাড়া অ্যালকেমিস্ট হওয়াটা গলে সেটা কিভাবে সম্ভব?”

আসিফ মনোযোগ দিচ্ছে বুঝে খুশি হয়ে গেলেন ডক্টর। “আমি শুধু শয়তানের অনুগ্রহের কথা বলিনি। অলৌকিক শক্তি—তা দু-ধরণের হতে পারে। পজিটিভ এনার্জি আর নেগেটিভ এনার্জির ব্যাপারে জানেন তো?”

আসিফ মাথা দোলালো।

“ঠিক সেভাবেই অ্যালকেমিস্টরা পজিটিভ বা নেগেটিভ শক্তির সাহায্য নিতে পারে। পজিটিভ এনার্জি বলতে ঈশ্বরপ্রদত্ত শক্তির ব্যাপারে বলা হচ্ছে। জাবির ইবনে হাইয়ানের প্রসঙ্গ যখন তুললেনই, আপনি কি জানেন তিনি কার কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েছেন?”

মাথা নাড়লো আসিফ। এতকিছু সে জানে না।

“ইরানের খোরাসান নগরীতে জন্মগ্রহণ করলেও জাবির পরে কুফা নগরীতে বেড়ে ওঠেন। সম্ভবত সেখানেই মহানবী (সাঃ)-এর বংশধর জাফর সাদিকের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছিলেন তিনি। অ্যালকেমিস্ট জাবির ইবনে হাইয়ান যখনই অ্যালকেমি নিয়ে কিছু বলতেন, তখনই উনার কথা উল্লেখ করেছেন। সরাসরি উনার উদ্ধৃতি তুলে দিতে পারি। ‘অ্যালকেমির যা যা আমি শিখেছি সবই আমাকে শিখিয়েছেন আমার দীক্ষাগুরু জাফর আল সাদিক। উনার কাছ থেকেই আমি বাষ্পীভবন, ঘনীভবন, কেলাসন প্রক্রিয়া শিখেছি। উনি শিখিয়েছেন কিভাবে ক্যালসিয়াম শোধন করতে হয়।’ ” আসিফের দিকে একঝলক দেখেন ডক্টর। “আমার ধারণা, আরও অনেক ইতিহাসবিদেরও ধারণা, আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ছিলো জাবির ইবনে হাইয়ানের ওপর। ওই যে বললাম, অলৌকিক শক্তি! আর উনাকে আমার-আপনার পাগল খেতাব দেয়ার ক্ষমতা নেই। তিনিই ওই যুগে প্রথম কেলাসন প্রক্রিয়া করে দেখিয়েছেন। আর আবিষ্কার...ওগুলো তো বলে শেষ করা যাবে না। সাইট্রিক এসিড, অ্যাসিটিক এসিড, টারটারিক এসিড, আর্সেনিক গঠন করেছেন তিনি। অ্যান্টিমনি, বিসমাথ, সালফার, মার্কারির আবিষ্কারও তিনি। শিক্ষক জাফর আল সাদিকের অনুরোধে তিনি অদাহ্য কাগজ আর রাতে পড়া যায় এমন কালিও তৈরি করেছিলেন। অদ্ভুত অদ্ভুত অনেক আবিষ্কার তার ছিলো। আবিষ্কার করেছিলেন অ্যালকোহল। আর গবেষণাগারের অনেক যন্ত্রপাতি নিজের প্রয়োজনে বানিয়েছেন, এত বছর পরও দারুণ উপযোগি সেগুলো। এমনি এমনি রসায়নের জনক তাকে বলা হয় না-ইউরোপিয়রা যদিও অস্বীকার করে-সেটার কারণও আপনাকে আমি বলতে পারি।”

একটু থেমে ঝুঁকে এলেন ডক্টর সামনের দিকে। “তারা এই গৌরব দেয় রবার্ট বয়েলকে। তিনিও একজন অ্যালকেমিস্ট, নেগেটিভ এনার্জির হেল্প নিয়ে কাজ করতেন। শয়তানের কাছে হাত পেতে দেওয়া রবার্ট বয়েল অনেক অনেক অবদান রেখেছেন কেমিস্ট্রিতে। কিন্তু ওই যে, অল্প সময়ে দ্রুত উন্নতি করতে হলে কেউ হাত পাতে ঈশ্বরের কাছে, কেউ শয়তানের কাছে।”

ঐ কুঁচকে তাকিয়ে আছে আসিফ। “তাহলে, রবার্ট বয়েল ছিলেন অ্যালকেমিস্ট?”

মাথা ঝাঁকালেন ডক্টর। “তার বন্ধু নিউটনও।”

“স্যার আইজ্যাক নিউটন?” অবাক হয়ে গেলো আসিফ।

“জানেন, নিউটন ফিজিক্সের আবিষ্কারগুলো সব একুশ থেকে সাতাশ বছরের মাঝে করে ফেলেছিলেন? অসাধারণ প্রতিভাবান ছিলেন তিনি। আমাদের বাচ্চা-কাচ্চারা আজ নিউটনের যেসব থিওরি নিয়ে পড়ছে, সবই তার সাতাশের মাঝেই করা। চালাক ছিলেন তিনি, আবিষ্কারগুলো প্রকাশ করেছিলেন সারাজীবন ধরে। ধীরে ধীরে। একটা টাইম গ্যাপ রেখে। আবিষ্কার করেই প্রকাশ করার মতো মানুষ তিনি ছিলেন না। পরে এক বিখ্যাত মামলায় সেটার প্রমাণ পাওয়া যায়। ক্যালকুলাস কে আবিষ্কার করেছিলেন, নিউটন না লাইবনিজ?”

আস্তে করে মাথা নাড়লো আসিফ, এটা সে জানে না।

হাসলেন প্রফেসর। “সন্দেহটা আজও চলে আসছে। ওই যে, নিউটনের আবিষ্কার করে লুকিয়ে রাখার অভ্যাস ছিলো—তিনি একেবারে ১৬৯৩-এ গিয়ে প্রকাশ করেছেন। লাইবনিজ ১৬৮৪-তেই! এটা নিয়ে মামলাও লড়েছিলেন তারা। যাই হোক, প্রশ্ন আসে, সাতাশ বছরের পর বাকি জীবন নিউটন কি করেছিলেন তাহলে? কেনই বা এত লুকোচুরি?”

“নিশ্চয় অ্যালকেমির পেছনে ছুটেছিলেন?” ধারণা করে বলল আসিফ।

টেবিলে চাপড়ে দিলেন ডক্টর উৎসাহে। “আলবত! নিউটনের মৃত্যু পর্যন্ত এসব কর্মকাণ্ড গোপন রেখেছিলেন। মৃত্যুর পর তার মাথার চুলে পারদের আধিক্য পাওয়া গেছিলো। সন্দেহের শুরুটা ওখানে। তলা খুঁড়তে বের হয়ে আসে আমাদের অপরিচিত কিন্তু নিউটনের আসল সত্তা। অ্যালকেমিস্ট নিউটন! তিনি ব্যস্ত ছিলেন ফিলোসফার স্টোন তৈরির কাজে। একেবারে সমগ্র সত্তা দিয়ে চেষ্টা করে গেছেন তিনি। আপনাকে আমি নিউটনের হাতে লেখা নোট দেখাবো আমার বাসায় কোনদিন গেলে। ফিলোসফার স্টোন বানাবার রেসিপি আবিষ্কারের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছিলেন তিনি। নিউটনের অ্যালকেমির ওপরে নোট ছিলো দশ লক্ষ শব্দেরও বেশি। সারাজীবন তিনি কিসের পেছনে ব্যয় করেছেন সেটা এখন থেকেই বোঝা যায়।”

“আর বোঝা যায় নিউটন কেন চিরকুমার ছিলেন,” মুখ ফসকে বলে ফেললো আসিফ।

আয়নার ওপাশে হেসে ফেললো জিয়া। কিন্তু আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন ডক্টর খান। প্রসঙ্গ পাল্টে ফেললেন এবার।

“যাই হোক, আমাদের আলোচনা নিউটন ছিলেন না। আমরা কথা বলছিলাম কেন জাবির ইবনে হাইয়ানকে রসায়নের জনক বলতে ইউরোপিয়দের আপত্তি। নিউটনের বন্ধু রবার্ট বয়েল—যাদের বন্ধুত্বটা গড়েই উঠেছিলো অ্যালকেমির ওপর গবেষণা করতে করতে—তিনি অ্যালকেমিস্ট হিসেবে আরও এগিয়ে ছিলেন। ইংল্যান্ডে সোনা তৈরির বিরুদ্ধে একটা আইন ছিলো। রবার্ট বয়েল লেগেছিলেন ওই আইনের পেছনে। সোনা বানাতে নিষেধাজ্ঞা থাকলে তার কি সমস্যা? নিশ্চয় সোনা প্রস্তুত করার ফর্মুলা তিনি আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন? অথবা পৌঁছে গেছিলেন সফলতার কাছাকাছি? ওদিকে আরও মজার ব্যাপার, নিউটনকে অজ্ঞাত কোন কারণে নিজ দেশের স্বর্ণ মজুদের রক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয় এক সময়। জীবনের শেষ প্রান্তে চলে এসেছিলেন তিনি, কিন্তু প্রশ্ন হলো এত মানুষ থাকতে নিউটনকে কেন? সোনা রক্ষার কি বোঝেন তিনি?”

“অনেকেই বিশ্বাস করতেন উনি সোনা প্রস্তুত করার জন্য কাজ করছিলেন। হয়তো সফলও হয়েছিলেন,” মন্তব্য করে আসিফ।

বড় করে নিঃশ্বাস নিলেন ডক্টর খান। “অবশ্যই। এতগুলো ট্যালেন্টেড মানুষ নিশ্চয় পাগল ছিলেন না? আমি প্রমাণ করে দিতে পারবো ডক্টর তানভীর জালালের

মৃত্যুর পেছনে এই অ্যালকেমির ভূমিকা আছে। পাপ সে আরও করেছে। আপনার জেনুইন আগ্রহ থাকলে আপনি সত্যটা ঠিক বের করে আনতে পারবেন। তবে এখানে বসে আমার গালগল্প শুনলে তো আপনার চলবে না। আপনি একবার ঠিকমতো গুর ল্যাবটা ঘুরে দেখবেন, প্রিজ। তারপর নিজেই যাচাই করবেন।”

“ল্যাব ঘুরে দেখার জন্য কি আপনার সেজন্যই এত আগ্রহ? ভেতরে অ্যালকেমি নিয়ে গবেষণা হচ্ছে কি-না জানার জন্য শুকে পাঠিয়েছিলেন?” ফরহাদের দিকে অনেকক্ষণ পর তাকালো আসিফ, ছেলেটা প্রথম থেকে এ পর্যন্ত চুপ হয়ে আছে। সম্ভবত কথা কম বলে অভ্যাস। তারওপর ক্যামেরায় ধরা খাওয়ার পর কিছু বলার মুখ থাকারও কথা না।

“হ্যাঁ এবং না। একজন স্যাটানিস্ট বসে থাকবে শহরের মাঝে আর আমরা সবাই চুপ করে বসে থাকবো?”

“স্যাটানিস্ট?” চট করে কথাটা ধরলো আসিফ।

“এখন এসব বললে আপনার কাছে স্রেফ পাগলের প্রলাপ বলেই মনে হবে। আগে গুর ল্যাব থেকে আরেকবার ঘুরে আসুন, প্রিজ। এবার আপনি জানেন ঠিক কী খুঁজতে হবে।”

ইতস্ত করলো আসিফ। এই লোককে লক-আপে পাঠাবে, না বাড়ি ফিরে যেতে দেবে তা ভাবছে। সম্পূর্ণ নতুন এক দিকে আলোকপাত করেছেন তিনি, এ কথা সত্য। টাকা-পয়সা ছাড়িয়ে ক্ষমতার দিকে এগিয়ে গেছে মোটিভ। কিন্তু ডক্টর খানকে এখনও মানসিকভাবে সুস্থ বলে ভাবতে পারছে না। আসিফের দ্বিধার কারণটা মনে হয় বুঝে গেলেন ডক্টর।

“আপনি বলেছিলেন আগামিকাল এফবিআই টেকওভার করবে, তাই না? কেসটা সমাধান করতে চাইলে দয়া করে আমার এই অনুরোধটা রাখুন। ল্যাব থেকে আরেকবার ঘুরে আসুন। আলোচনার করার জন্য পরে আমাকে পাবেন। অ্যালকেমির ব্যাপারে যা বললাম তার কোন প্রমাণ না পেলে আমাকে গ্রেফতার করতে পারেন, মার্ডার চার্জ আনতে পারেন, আমার আপত্তি থাকবে না। আদালতে লড়বো না-হয়। কিন্তু একটা কথা বিশ্বাস করতে পারেন, এই তানভীর জালালকে আমি বছরের পর বছর চোখে চোখে রেখেছি, তার ব্যাপারে আমার অনুমান ভুল হওয়ার কতখানি নয়।”

ভদ্রলোকের আত্মবিশ্বাস আসিফকে বিস্মিত করলো। “ল্যাব তোলপাড় করে খুঁজবো আমি, তবে সে-সব পরের কথা। আপনি নিকোলাস ফ্রামেলের কথা বলুন। অ্যালকেমির উপস্থিতির প্রমাণ আপনি দিতে চাইছিলেন।”

দম নিয়ে বলতে শুরু করেন ডক্টর খান, “১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে প্যারিসের পন্টয়েজে জন্মেছিলেন নিকোলাস ফ্রামেল। বইয়ের দোকানদার ছিলেন তিনি। জ্ঞান অর্জনের জন্য তার ছিলো প্রবল তৃষ্ণা। নিষিদ্ধ জ্ঞানের দিকেই আগ্রহটা বেশি ছিলো। এভাবেই অ্যালকেমির প্রতি তীব্র আগ্রহ অনুভব করতে শুরু করেন। মিশরিয়, গ্রিক, অ্যারাবিয়ান লেখকের বই-অ্যালকেমি নিয়ে যেখানে যা পেয়েছেন পড়ে শেষ

করেছেন। তবে উনার সবচেয়ে বড় ব্রেকথ্রুটা ছিলো এক ইহুদি যুবরাজ আব্রাহামের লেখা একটি বই।”

চোখ কুঁচকে তাকালো আসিফ। “ইহুদি যুবরাজ?”

“বলতে পারেন। ইহুদিরা এদিকে এগিয়ে ছিলো বটে। যাই হোক, বইটির অর্থ বের করতে গিয়ে নিকোলাস ফ্রামেলের জান কাবার হয়ে যাচ্ছিলো। এই বইয়ের পাঠোদ্ধার করতে দুনিয়ার হেন জায়গা নেই ঘোরেননি। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে লিওনে এক বুড়োকে তিনি পেয়ে যান, যিনি বইটি পড়তে পেরেছিলেন। এই বৃদ্ধের নাম মায়েস্ত্রো কানশেস। আব্রাহামের বইটি বুড়ো অনেক বছর ধরে খুঁজেও পাননি।

“আব্রাহাম ইলিয়েসতার ছিলেন ওই বইয়ের লেখক। অন্তত নিকোলাস ফ্রামেলের নোট থেকে মায়েস্ত্রো কানশেসের উক্তি অনুযায়ী তাই বোঝা যায়। এই ইহুদি যুবক ছিলেন কাব্বালার সাধক। অ্যালকেমি হিসেবে অদ্বিতীয় ছিলেন তিনি। পুরো বইটি প্যারিসে রেখে বের হয়েছিলেন ফ্রামেল। দামি বই কোথায় নষ্ট হয়ে যায় তার তো ঠিক নেই। সাথে মাত্র কয়েকটি পৃষ্ঠা ছিলো তার। লিওনের সেই বুড়ো মায়েস্ত্রোকে এই কয়টি পৃষ্ঠা দিয়ে সম্ভুষ্ট করা গেলো না। কিন্তু আবার ফ্রান্সে গিয়ে বাকি অংশে চোখ বোলাবেন তারও কোন উপায় নেই। ইহুদিরা ফ্রান্স থেকে আগে থেকেই বিতাড়িত।”

একটু কাশলো আসিফ। “তাহলে?”

“ধর্ম পাল্টে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন মায়েস্ত্রো। অ্যালকেমি এমন এক নেশা, একবার আপনাকে ধরলে এর জন্য মরিয়া হয়ে উঠবেন। কতশত মানুষ শয়তানের পূজায় ডুবে গেলো, আর এ তো সামান্য ধর্ম পরিবর্তন!”

আগ্রহি হয়ে উঠলো আসিফ, অধৈর্যের মতো জানতে চাইল সে, “তাহলে ধর্ম পাল্টে ফ্রান্সে যেতে হলো মায়েস্ত্রোকে?”

মাথা নাড়লেন ডক্টর খান। “উহঁ। তিনি ওখানে পৌছাতে পারেননি। অরলিয়েন্সের কাছে পৌছাতে পৌছাতেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। মারাও যান ওখানেই। তাকে কবর দিয়ে ফিরে আসলেন নিকোলাস ফ্রামেল। তবে এর মাঝে যতটুকু কাগজ এনেছিলেন তার মর্মোদ্ধার করে দিয়েছেন মায়েস্ত্রো। নিকোলাস ওই কটি পৃষ্ঠা তখন পড়তে পারেন। ওইটুকু বিদ্যাকে পুঁজি করে বাড়ি ফিরে আবার বইটার পেছনে লাগলেন। তিনটি বছর অতটুকু বিদ্যা থেকে বইটির বাকি অংশ জানার চেষ্টা করে গেছেন তিনি। যেমনটা বলেছিলাম, এই লেখক আব্রাহাম অ্যালকেমিতে অনেক অ্যাডভান্সড ছিলেন। কাজেই তর তর করে আগালেন নিকোলাস। ব্যবহারিক পরীক্ষা করতে শুরু করলেন। ইতিহাসের প্রথম ট্রান্সমিউটেশন তিনিই করেছিলেন।”

নাটকীয়ভাবে থেমে গেলেন ডক্টর খান।

“মানে, তিনি সীসা থেকে সোনা বানিয়েছিলেন?” জানতে চাইল আসিফ।

“উহঁ, পারদ থেকে রূপো বানিয়েছিলেন ১৩৭৯ খ্রিস্টাব্দে। ২৩০ গ্রাম পারদকে রূপোতে পাল্টাতে পারলেও সোনায় কনভার্ট করতে পারেননি ওই সময়।”

আবার চেয়ারে হেলান দিল আসিফ। “ওহ্।”



চোখ টিপইদলেন ডক্টর খান। “তিন বছর পর বিরশি সালে ওই পরিমাণ পারদকেই সোনায়ে রূপান্তরিত করেছিলেন অবশ্য। অ্যালকেমি ভ্রান্ত বিদ্যা নয়, ডিটেক্টিভ। কঠিনতম সত্য এটি।”

উঠে দাঁড়ালো আসিফ। “দারুণ গল্প, স্যার। তবে অ্যালকেমির সাথে ডক্টর জালালের কি সম্পর্ক ছিলো সে-ব্যাপারে আপনার কথা থেকে কিছুই প্রমাণ হচ্ছে না। সিগনেচারটা কাকতলীয় হতে পারে। সলিড কিছু দিতে পারলেন না আমাকে।”

দাঁড়িয়ে গেলেন জ্ঞানতাপস বৃদ্ধ। “সেজন্যেই আপনাকে আমি কিছু বিশ্বাস করতে বলিনি। দেখে আসুন নিজেই। তানভীর জালালের ল্যাব ওলট-পালট করে দিন। কিছু না কিছু পাবেনই।”

দরজার কাছে গিয়ে ফিরে তাকালো আসিফ। “আপনার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আপনিও আসতে পারেন আমার সাথে।”

কথাটা বুঝতেই এক সেকেন্ড লেগে গেলো ভদ্রলোকের। এতদিন ধরে যেখানে ঢোকায় বাসনা তার ছিলো সেটা এভাবে পেয়ে যাবেন ভাবতেও পারেননি। “দ্যাট উইল বি অ্যা প্রেজার!” দাঁড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন ডক্টর।

ইন্টেরোগেশন রুম থেকে বের হলো আসিফ। আগামিকাল এফবিআই চলে আসলে তার গতিবিধি কমে যাবে। ওদের সম্পর্কে যতদূর জানে, এরা নিজেদের কাজে বাইরের কাউকে নাক গলাতে দেয় না। অনেক রাত হয়ে গেছে, তবে আসিফ তার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। এখনও জেনারেল জাহিদ ফরমানের আশীর্বাদ আছে। এর মধ্যে একবার ঘুরে আসতে হবে ওই ল্যাব থেকে। ডক্টর রমিজ খান কি স্রেফ রূপকথার কাহিনী শোনালেন কি-না তা নিশ্চিত হতে হবে।

আমেরিকা কি একটু বেশি মাথা ঘামাচ্ছে না? এভাবে আর কোন বাংলাদেশি নাগরিকের জন্য তো আগে কোনদিন আত্মহ দেখায়নি তারা। অবশ্য নাগরিকতার দিক থেকে প্রফেসর জালাল একজন আমেরিকানও। মূল্যবান একজন আমেরিকান।

মাথা থেকে ওসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে আসিফ। কেসটা ওর। আর এটা ও নিজেই সলুভ করবে। এফবিআইর সেটা ভাল লাগুক আর না লাগুক।

এখন পর্যন্ত খুন আর কিডন্যাপকে দুটো আলাদা অপরাধ হিসেবে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে ধরে নেওয়া হয়েছে, এ দুটো বিচ্ছিন্ন ঘটনা। কাকতলীয়ভাবে একই রাতে ঘটে গেছে। এই জগতে কাকতাল খুবই কম ঘটে। তবে শাহেদ জামান বলেছেন, যতক্ষণ না উল্টোটা প্রমাণিত হবে ততক্ষণ এগিয়ে যাচ্ছে ওদের কাজ।

অফিস থেকে বের হওয়ার আগে দুটো কাজ করলো আসিফ। প্রথমে তৃণাকে জানাল, বিজয়ের কিডন্যাপারের পরিচয় সনাক্ত করা গেলো যাতে ফাইলটা আসিফের বাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যত রাতই হোক, দেরি করার দরকার নেই।

তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে টেক-রুমে ঢুকে পড়ল সে। নিজের আইডি আর পাসওয়ার্ড দিয়ে ডাটাবেজে ঢুকে ডক্টর রমিজ খানের নামে থাকা প্রতিটি তথ্য ডিলিট করে বের হয়ে এলো ওখান থেকে।

কপাল থেকে নেমে আসা ঘাম ঝেড়ে ফেললো আসিফ।

এসি চলছে, তারপরও ঘেমে উঠছে সে। একই অবস্থা সহকারি জিয়ারও। নড়বড়ে অবস্থা ডক্টর খানের। দুই গোয়েন্দার সাথে ল্যাবের এমাথা থেকে ওমাথা ছুটে গেছেন তিনি, চেষ্টা করেছেন প্রতিটি টেবিল, প্রতিটি ইকুইপমেন্ট খতিয়ে দেখতে। নিচতলা থেকে তিনতলা ওলোট-পালোট করে ফেলেছে ওরা। লাভের লাভ কিছুই হয়নি। এখনও কোনধরণের অ্যালকেমিকাল প্রমাণ পাওয়া যায়নি এখানে।

জেনারেল জাহিদ ফরমানের সাহায্য দু-হাতে নিচ্ছে ওরা। যেভাবে প্রফেসরের লাশটা হোমিসাইডে এনেছিলো, কমিশনারের কাছে একইভাবে হেলিকপ্টার ব্যবহারের অনুমতি চেয়েছে। ঢাকা থেকে গাজীপুর খুব দূরে না-হলেও পথে যেতে আসতে সময় একেবারে কম লাগে না।

রাত সাড়ে দশটায় এখানে পৌছে গেছে ওরা। হেলিকপ্টার থাকলে মিনিট পনেরই যথেষ্ট। ডক্টর খানের সহকারি ফরহাদকে এখানে আনা হয়নি। ওকে নিজের ল্যাবে ফেরত পাঠিয়েছেন ডক্টর। আর প্রফেসর জালালের ল্যাবে দু-ঘণ্টা ধরে খোঁজাখুঁজি করেও কিছু পায়নি ওরা। বাইরে প্রহরায় থাকা পুলিশদের মুখে প্রথমে বিভ্রান্তি এবং পরে বিদ্বেষের ছাপ চলে এসেছে। খোঁজাখুঁজিতে হাত লাগাতে চেয়েছিলো ওরা, আসিফ মানা করে দিয়েছে।

কোন এক অজ্ঞাত কারণে প্রফেসর সবজায়গায় নিজে পরিচয় দিয়েছেন ‘তানভীর জালাল, কেমিস্ট’ নামে। ব্যাপারটা অনেকেই বিনয় মনে করতো। সব ধরনের ডিগ্রি এড়িয়ে শুধুমাত্র একজন কেমিস্ট হিসেবে পরিচয় দেওয়া বিনয়েরই লক্ষণ। তবে এমনটা ভাবতে পারেননি ডক্টর খান। তার মতে, রসায়নের এই দিকপালের পরিচয়টা শুধুই তানভীর। নিজেকে অ্যালকেমিস্ট বলে পরিচয় দিয়েছেন তিনি ওভাবেই। সিগনেচারের মাঝে ‘অ্যালকেমিস্ট’ শব্দটা স্পষ্ট ফুটে ওঠে, এমন ধাঁচেই কলম চালাতেন তিনি।

বিষয়টাকে নিছক কাকতালিয় ব্যাপার হতে পারতো, তবে একটু খোঁজ নিয়ে সন্দেহ করতে বাধ্য হয়েছে আসিফও। ডক্টর তানভীর জালালের নাম এফিডেভিট করে একবার পরিবর্তন করা হয়েছিলো। জন্মসূত্রে তার নাম তানভীর আহমেদ, সেটা পাল্টে তানভীর জালাল করা হয়। বিষয়টা অদ্ভুত। অস্বাভাবিক ডক্টর ভদ্রলোক যুক্তি হিসেবে বলেছিলেন, বাবার নামের অংশ এদেশে বহন করা হয় না। আশরাফ জালালের ছেলের নাম রাখা হয়েছিলো তানভীর আহমেদ। কিন্তু বাবার শেষ নামটি নিজের নামে রাখতে চেয়েছিলেন তিনি। এ কারণেই এফিডেভিটের প্রয়োজন পড়েছিলো।

ডক্টর খান পাগলাটে ধাঁচের মানুষ হতে পারেন তবে জ্ঞানের দিক থেকে তার অবদান নড়বড়ে নয়। প্রজ্ঞাবান এই মানুষটির বিশ্বাসের ওপর একটা শট নিয়ে দেখতে এসেছে আসিফ। অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানোর চেয়ে এটা অনেক ভাল। গোমড়ামুখো রিয়াজুল করিম কি-কার্ড এনে দরজা খুলে দিয়েছে। সেই থেকে এখানেই আছে তারা।

এতক্ষণ ধরে প্রতিটি টেবিল, স্ক্রু সরিয়ে ল্যাবটিকে অ্যালকেমি-ল্যাব প্রমাণ করার মতো যেকোন সূত্র খুঁজেছে। ড্রেনেজ সিস্টেমের কাভারগুলো তুলে তুলে উঁকি দিয়েছে। প্রমাণ কিছু থেকে থাকলে ডক্টর খানের চোখে ধরা পড়তে বাধ্য। তাকে নিয়ে আসার পেছনে একমাত্র কারণ এটাই। নয়তো একে লকআপে ভরে রাখার সম্ভাবনা ছিলো। কিন্তু তিনিও এখন পর্যন্ত কিছু দেখতে পাননি। তানভীর জালাল ঠিক যে টেবিলের সামনে প্রাণহীন পড়ে ছিলেন তাতেই ধপ্ করে বসে পড়ল জিয়া।

দু-হাতে মেঝেতে আঁকিবুকি করছে আসিফ। কিছুটা হলেও হতাশ হয়েছে সে। পাগলা ডক্টরের কথায় রাতের বেলায় এভাবে ছুটে আসাটা এখন পাগলামি ঠেকছে ওর কাছে। এই কেসে ডানা হলো ডেড-লিংক, রিয়াজ সন্দেহের উর্ধ্বে, বিজয় অপহৃত।

দুঃখজনক হলেও সত্যি, ডক্টর খান আর তার সহযোগি ফরহাদ গত পরশু সারারাত ল্যাবে ব্যস্ত ছিলো। অ্যালিবাই চেয়ে ওটা জেনেছে আসিফ। ওরা যখন হেলিকপ্টারে করে এখানে আসছে, ডক্টর খানের ল্যাবের ক্যামেরা থেকে ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করে সেটা নিশ্চিতও করেছে তৃণা। একই সাথে দুই জায়গাতে থাকার পদ্ধতি যতদিন না মানবজাতি আবিষ্কার করতে পারছে ততদিন এ ধরনের অ্যালিবাই ডক্টর খান আর তার সহকারিকে নির্দোষ প্রমাণ করবে। অনেক সময় ভিডিওর সময় নিয়ে কারচুপি করতে পারেন অভিজ্ঞ টেক-গিক। দেখা যায় তিন দিনের আগের ভিডিও ফুটেজের টাইমার পাল্টে দু-দিন আগের বলে দেখিয়েছে অপরাধি। খুনের সময় সে যে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোথাও ছিলো এটাই প্রমাণ হয়, অথচ পুরো ব্যাপারটা ভুয়া হতে পারে।

ল্যাবের ভিডিওটি অথেনটিক কি-না তা নিয়ে টেক-ক্রমের কর্মিরা কাজ করছে। তবে আসিফের মনে হয়েছে ওই ভিডিওকে নকল প্রমাণ করা যাবে না। বিজয়ের ট্রেনিং ধরে আগাতে হবে বলেই মনে হচ্ছে তার। এটাকে আগামিকাল থেকে শুরু করার জন্য রেখেছিলো। পুলিশ কিডন্যাপ কেসটা নিয়ে কাজ করছে অবশ্য আসিফ আশা করেছিলো চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মুক্তিপণ দাবি করা হবে। সেটাও করেনি কিডন্যাপাররা।

“থার্ড চেম্বার!” তুড়ি বাজালেন ডক্টর খান।

এক পা এগিয়ে গেলো আসিফ তার দিকে। “থার্ড চেম্বারও আমরা চেক করেছি। দু-বার। আপনিও ছিলেন আমাদের সাথে।”

“আগে সবগুলো কন্টেইনার বাইরে বের করে আনতে হবে। কন্টেইনারের স্তুপ দেখে হাত বাড়াইনি আমরা।”

তৃতীয় ঘরটাতে একরকম লাফিয়েই ঢুকে গেলেন ডক্টর খান। উনার বয়সের তুলনায় এরকম অস্থিরতা আসলেই বেমানান। মুখ কুচকে তাকে অনুসরণ করলো

আসিফ আর জিয়া।

বিশ ফিট বাই চল্লিশ ফিটের একটা ঘর। অর্ধেকটা বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের কন্টেইনারে ভরা। এখান থেকেই কুইক সাপ্লাই নিতেন ভদ্রলোক-বোঝা যায়। বাকি অর্ধেক আছে মেশিনারিজ।

কন্টেইনারগুলোর গায়ে সিলও মারা আছে। একই কোম্পানির সাপ্লাই সব। সেটাই স্বাভাবিক। তবে সংখ্যায় তারা অনেক বেশি। দরজায় এসে পাগলা ডক্টরকে দেখা গেলো দু-হাতে সেসব কন্টেইনার টেনে সরানোর চেষ্টা করছেন। দরজার সবচেয়ে কাছে কন্টেইনারের পেছনেই লেগেছেন তিনি।

মাথা নাড়লো আসিফ। “আগেই বলেছিলাম, স্যার...এই মাটির নিচে যদি তিনি কিছু লুকিয়ে রাখেন প্রতিবার তাকে ল্যাভে ঢুকতে আর বের হতে হলে সব সরাতে হবে। এগুলো সরানো আর আবার জায়গামত রাখাই বেশ সময়ের ব্যাপার।”

মুখ তুলে তাকালেন ডক্টর খান। “এরকমটা মনে হবে দেখেই এখানে লুকিয়েছেন তিনি। আরেকটা প্রশ্ন-ল্যাভে ক্যামেরা নেই কেন? বাড়ির বাইরে কয়েকটা বসিয়েছেন। ল্যাভের প্রবেশপথেও নেই, ভেতরেও নেই। আমার ল্যাভে তো আছে। রাখতে হয়। পরে কাজে দেয়। এই ল্যাভে সেটা নেই।”

“গোপনীয়তা পছন্দ করতেন তিনি,” ব্যাখ্যা দিল আসিফ।

“তা তো বটেই।” আনমনে বলতে বলতে ভারি সিলিভারটার দিকে তাকালেন তিনি।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে আসিফও তাকালো। এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা টকটকে লাল রঙের সিলিভারটি।

“এই জিনিস এখানে কেন?” বিড় বিড় করে বললেন ডক্টর।

“হয়তো কোন গ্যাস সংরক্ষণ করে রেখেছেন তিনি।”

“অ্যাসিটিলিন গ্যাস। ল্যাভ উড়িয়ে দেয়ার ইচ্ছে থাকলে এই জিনিস সংরক্ষণ করতে পারতেন।”

আসিফ ওটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। “এই জিনিস কেমিস্ট্রির কোন গবেষণায় লাগে না?”

মাথা নাড়লেন ডক্টর খান। “এক সিলিভার অ্যাসিটিলিন গ্যাস কি করবেন একজন কেমিস্ট ওটা নিয়ে? ভেতরে ওয়েল্ডিং হোজ বা টর্চ দেখলেন না। আশেপাশে অক্সিজেনের কোন সিলিভার নেই-”

“মানে, একে অক্সি-অ্যাসিটিলিন ওয়েল্ডিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হয় শুধু?”

দাঁড়ি চুলকালেন ডক্টর খান। “আর কিছু ব্যবহার আছে বটে, তবে ওটাই সাধারণত করা হয়। যাই হোক, এটার এখানে অবস্থান আমার কাছে ভাল ঠেকছে না। এই ঘরে প্রচুর দাহ্য কেমিক্যাল আছে, সেফটি প্রসিডিউরের কথা চিন্তা করলে এখানে এটা আসলেই বেমানান। ওয়েল্ডিংয়ের উদ্দেশ্য না থাকলে এরকম একটা বিস্ফোরক সিলিভার কেন রাখবেন তানভীর জালাল?”

“হয়তো ওটা খালি,” বলল আসিফ। “তাহলেও প্রশ্ন আসে—খালি একটা সিলিভার ল্যাবের এক কোণে কি করছে?” গায়ের জোরে ঠেলল সে ওটাকে। একচুলও নড়াতে পারলো না। বিরক্তিতে ক্র কুঁচকে তাকালো। “বিল্ট ইন নাকি?”

জিয়া এসে দাঁড়ালো তার পাশে, দু-জন মিলে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল। কেঁপে উঠলো সিলিভার। তবে ওটুকুই, আর নড়লো না।

ওদের সরিয়ে সিলিভারের কাছে দাঁড়ালেন ডক্টর খান, আঙুল রাখলেন সিলিভারের গলায়। “নেক রিং। সেফটি। যাতে ভেতরের হাই প্রেশারে থাকা গ্যাস লিক না করে। আর এটা এক্সট্রানাল থ্রেড। এখানে প্রেশার গজ লাগানো থাকে সাধারণত। প্রেশার মাপার জন্য ওটা কাজে দেয়। এখানে প্রেশার গজ নেই, কিন্তু এক্সটার্নাল থ্রেড আছে...অদ্ভুত...সব মিলিয়ে এই—” বলতে বলতে এক্সট্রানাল থ্রেডে হাত রেখে আলতো করে চাপ দিলেন তিনি।

ঘড়ঘড়ে একটা শব্দে ঘরটা ভরে গেলো। পায়ের নীচে মাটি কাঁপছে। দেওয়ালগুলো এখনও শান্ত। দূরের কন্টেইনার দুটোকে ধীরে ধীরে নেমে যেতে দেখলো ওরা। হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে ফেলেছে আসিফ। সন্তর্পনে ওদিকে আগাচ্ছে এখন। পিছু পিছু রওনা দিল ডক্টর আর জিয়া।

এক প্রস্থ সিঁড়ি ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। সোজা নিচের দিকে নেমে গেছে। কোনরকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়া সিঁড়িটিকে অনুসরণ করে নেমে গেলো আসিফ। ওপরের মতো এখানেও বিশ ফিট বাই চল্লিশ ফিট একটা ঘর। তবে এখানে কোন কন্টেইনার নেই। বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলো আসিফ। বিহ্বলের মতো এগিয়ে যাচ্ছে সামনে। কোন আলোর উৎস দেখা যাচ্ছে না। তবুও নরম আলোয় ভরে আছে ঘর। মাঝখানে দশফিট বাই বিশফিট টেবিলটা চলে গেছে ঘরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। কি নেই তার ওপর?

অনেকগুলো বিকার আর টেস্টিউবের মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে একগাদা সিলিভার। কাঁচের ওসব সিলিভারের মাঝে স্থির হয়ে বসে আছে রূপালি কিছু। ডক্টর এক আঙুল রাখলেন ওগুলোর ওপর। “পারদ।”

তারপর এগিয়ে গেলেন ঘরের একপাশে রাখা বোর্ডের দিকে। টেম্পোরারি মার্কার দিয়ে ওতে নোট নিতেন তানভীর জালাল—এখান থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে। ওটার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা দোলালেন ডক্টর। “এটাই তাহলে ছিলো ডক্টর তানভীর জালালের ম্যাগনাম ওপাস।”

পিস্তল হোলস্টারের ভরে রাখলো আসিফ। “মানে বলতে চাইছেন, এটাই ডক্টরের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার?”

হাত নেড়েই উড়িয়ে দিলেন তিনি। “আরে নাহ—ল্যাটিন ম্যাগনাম ওপাস বোঝাই নি। অ্যালকেমির পরিভাষিক শব্দ ম্যাগনাম ওপাস বুঝিয়েছি।”

আসিফ তবুও চুপ করে থাকাতে ব্যাখ্যা দিলেন ভদ্রলোক, “ম্যাগনাম ওপাস বলতে বোঝায় ফিলোসফার স্টোন প্রস্তুত প্রক্রিয়াকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়,

জর্জ রিপলি যে রেসিপি বানিয়েছিলেন তাতে ম্যাগনাম ওপাস ছিলো বারো ধাপের। ক্যালসিনেশন, সলিউশন, সেপারেশন, কনজাংকশন, পিউট্রোফ্যাকশন...”

এমন সময় জিয়ার গলা শোনা গেলো ঘরের অন্যপ্রান্ত থেকে।

“এটা আবার কী!”

একটা বদ্ধ ওয়াল সেফের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ও। কোমর থেকে স্টেথেসকোপ জাতীয় একটা যন্ত্র খুলে জিয়ার দিকে এগিয়ে দিল আসিফ। ডিজিটাল লক আশা করেছিলো, তার বদলে প্রাচীন আমলের লকার দেখতে পেয়ে স্বস্তি অনুভব করলো সে। এইমাত্র জিয়াকে ছুঁড়ে দেওয়া যন্ত্রটা কম্বিনেশন দেওয়া তালা খোলার জন্য খুবই কার্যকর। সিঁধেল চোরদের প্রিয় জিনিস। আজকে এখানে খোঁজাখুঁজি করতেই এসেছে আসিফ, কাজেই ব্যাকপ্যাকে করে বেশ কয়েকটা বার্গলারি টুল এনেছিলো। একটা কাজে লেগে গেলো এখন।

জিয়া ব্যস্ত হয়ে পড়ল সেফ খোলার কাজে। প্রফেসরও সুযোগ বুঝে তার লেকচারে ফিরে গেলেন। “কেন পর্যন্ত জানি বলেছিলাম?”

“পিট্রে...কি জানি একটা ধাপের নাম বলছিলেন।” বার দুই চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো আসিফ।

“ও, হ্যা।” চমৎকার একটা হাসি দিলেন ডক্টর খান। “পিউট্রোফ্যাকশন। পচন বলতে পারেন। এটা একটা ধাপ। এর পরের ধাপগুলো হলো কনজেলেশন, সিবেশন, সাবলিমেশন, ফার্মেন্টেশন, এক্সালটেশন, মালটিপ্লিকেশন, প্রজেকশন। এই গেলো বারো ধাপ। রিপলির ম্যাগনাম ওপাসের এই বারো ধাপ। ম্যাগনাম ওপাসের ওপর কাজ করেছেন ষোড়শ শতাব্দীর বিজ্ঞানী নরটন। স্যামুয়েল নরটন-অর্ডিনাল অব অ্যালকেমি বইটি তারই লেখা। ওখানে তিনি বলেছেন চৌদ্দটা ধাপের কথা...”

ডক্টর মুখ খুললে জ্ঞান দিতেই থাকবেন, তাই তাড়াতাড়ি বলল আসিফ, “স্যার, তাহলে আমাদের প্রফেসর কোনদিকে পা বাড়িয়েছিলেন বলে মনে করেন? রিপলির মেথডে, না নরটনের?”

মনোযোগ দিয়ে বোর্ডের দিকে আরেকবার তাকালেন ডক্টর খান। “সেটাই আমাকে অবাক করছে, ডিটেক্টিভ। মনে হচ্ছে নতুন কোন ধরনের ম্যাগনাম ওপাস আবিষ্কার করেছিলেন তানভীর জাল-অ্যালকেমিস্ট।”

ত্র্যক্ষজাতীয় একটা শব্দের সাথে সাথে জিয়ার উল্লসিত চিৎকার শুনতে পেলো ওরা।

“খুলে ফেলেছি, স্যার!”

ব্যস্ত হয়ে ওদিকে এগিয়ে গেলো আসিফ আর ডক্টর। যেতে যেতে দু-জনের মাথায় একটাই প্রশ্ন সিক্রেট ল্যাবের সিক্রেট চেম্বারের সিক্রেট সেফে কি লুকিয়ে রেখেছেন প্রফেসর তানভীর জালাল?

হলুদ রঙের গুঁড়োগুলোর দিকে তাকিয়ে বিজ্ঞের মতো মাথা দোলালেন ডক্টর খান। তারপর পকেট থেকে একটা টেস্টিউব বের করে সামান্য কিছু গুঁড়ো ওতে তুলে নিলেন।

“কি বুঝলেন?” নিরুপায় হয়ে প্রশ্ন করতেই হলো আসিফকে। অন্তত এ বিষয়ে ডক্টরের সাহায্য ছাড়া কিছু বোঝা সম্ভব নয়।

“সাইট্রিনিটাস,” বিড় বিড় করে বললেন ডক্টর খান।

“সেটা কি?” জিয়াও প্রশ্ন না করে পারলো না। এই সামান্য এক শব্দের ব্যাখ্যায় সে সম্ভ্রষ্ট হবে না সেটাই স্বাভাবিক।

“ম্যাগনাম ওপাসের একটা পর্যায়। সাইট্রিনিটাস। যে পর্যায়ে এসে হলুদ হতে শুরু করে ফিলোসফার স্টোন।”

আগ্রহের সাথে এবার গুঁড়োগুলোকে দেখলো আসিফ। “এটা ফিলোসফার স্টোন?”

“হুম। গুঁড়োগুলোকে শক্ত করতে হবে। তবে এই পর্যায়ে সোনা তৈরি করা যাবে বলে হয় না।”

“কোন পর্যায়ে করা যাবে?” আগ্রহি হয়ে জানতে চাইল জিয়া।

“রুবোডো। লাল হতে শুরু করবে তখন পাথরটা।” আলোতে তুলে ধরে টেস্টিউবের ভেতরে দেখলেন ডক্টর খান।

স্বপ্ন আলোতে ভরে আছে তানভীর জালালের অ্যালকেমি-ল্যাব। সেদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো আসিফ। তারপর হাত বাড়িয়ে দিল ডক্টর খানের দিকে। মাত্রই টেস্টিউবটা পকেটে ঢুকিয়েছেন তিনি।

“ওটা এভিডেন্স, স্যার। এখান থেকে কিছুই নিতে পারবেন না আপনি,” শীতল কণ্ঠে বলল আসিফ।

বের করে দিলেন ডক্টর খান। “দুঃখিত। ভেবেছিলাম নিজের ল্যাবে নিয়ে গিয়ে একবার পরীক্ষা করে দেখতে পারবো।”

“সেজন্যই কৌশলে খুন করে ফেলেননি তো উনাকে? সবকিছুই করতেন আপনার প্ল্যান করা ছিলো। খুন করার আগে একরাতে ইচ্ছে করে এখানে ঢোকালেন সহকারিকে—যেন সে ক্যামেরায় ধরা পড়তে পারে। এরপর আপনাকে আমরা সাসপেক্ট ভেবে ডিপার্টমেন্ট নেব? অ্যালকেমির প্রতি তানভীর জালালের আগ্রহের কথা কেউ জানতো না, জানতেন আপনি। সেটাকে পুঁজি করেই ডিপার্টমেন্টে আমার আস্থা অর্জন করেছেন, ঢুকে পড়েছেন ল্যাবে। তারপর সাইট্রিনিটাস পেয়ে গেলেন। এখান থেকে কাজ করতে আপনার সুবিধেই হবে, তাই না? অর্ধেক তো বানিয়েই রেখেছেন প্রফেসর। বাকিটুকু শেষ করতে পারলে পৃথিবীর প্রথম ফিলোসোফার স্টোন হবে

আপনার তৈরি। এটাই চাইছিলেন আপনি। ক্রেডিট। শ্রদ্ধা। সম্মান। বেঁচে থাকতে আপনার প্রাপ্য শ্রদ্ধা কেড়ে নিয়েছিলেন তানভীর জালাল। মৃত্যুর পর সেটা তার আবিষ্কারই ফিরিয়ে দিলে দেনা-পাওনা চুকানোর ব্যাপারটাও হয়ে যায় একরকম।”

রাগলেন না ডক্টর খান। লম্বা দাঁড়িতে হাত বোলালেন মাথা নাড়তে নাড়তে। “আমি আবিষ্কার করতে পারলেও সেটা হবে দ্বিতীয় আবিষ্কার। প্রথমবার কাজটা করে ফেলেছিলেন নিকোলাস ফ্রামেলই। যাই হোক, আমাকে বিশ্বাস করতে বলব না। তবে আমার কথা আর অনুমান যে সত্য সেটা এই ঘরে দাঁড়িয়ে অন্তত স্বীকার করবেন?”

চারপাশে তাকিয়ে দেখলো আসিফ, ডক্টর খানের কথা একেবারে ফেলনা নয়। পৃথিবী কাঁপানো কেমিস্ট তানভীর জালালকে এই ডক্টর খানই একজন অ্যালকেমিস্ট হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

“আমি জানতাম... শুরু থেকে জানতাম, এই মানুষটার মধ্যে কিছু একটা সমস্যা আছে। প্রতিটি মানুষ আমাকে অবিশ্বাস করেছে। সবাই ভেবেছে আমার তত্ত্ব প্রমাণ করে তিনি বিখ্যাত হয়েছেন বলে আমি ঈর্ষান্বিত। তবে আমার চোখকে তানভীর ফাঁকি দিতে পারেনি।”

তার দিকে তাকিয়ে আছে আসিফ। “আপনি বলেছিলেন, অ্যালকেমিস্ট হিসেবে তানভীর জালালকে প্রমাণ করার পর আরও কিছু বলবেন। এখন শোনা যেতে পারে, কি বলেন?”

“এখন আমি যা বলব, আপনি বিশ্বাস করবেন বলে তো মনে হয় না। সব শুনবেন, এভিডেন্স দেখবেন তারপর আবার বলে বসবেন, এসব আমি শুধুই আপনাকে প্রভাবিত করতে বলেছি।”

মুখে তালা আঁটলেন ডক্টর খান। বোঝাই যাচ্ছে, একটু আগে আসিফের শীতল ব্যবহারে মনোক্ষুব্ধ হয়েছেন। এক পা এগিয়ে এলো আসিফ। “আমি দুষ্টু, ডক্টর। পেশাগত কারণে এখনও আপনাকে সন্দেহের উর্ধ্বে রাখতে পারছি না।”

“আমি আপনাকে আর কিছুতে না হোক, দুটো বিষয়ে সাহায্য করতে পারি,” শান্ত মুখে জানালেন ডক্টর। “এক, কেমিস্ট্রি। যে ব্যাপারে আপনাদের আগ্রহ তেমন আছে বলে মনে হয় না। আর দুই, তানভীর জালাল। এই দুটো নিয়ে ঘাঁটখাটি করে গত পনেরটা বছর কাটিয়েছি আমি। ডিটেক্টিভ, সবকিছু আপনার স্বার্থে, আমাকে সহযোগিতা করলে আপনিও তা পাবেন।”

কথাগুলো চুপচাপ হজম করলো আসিফ, তারপর ল্যাবের চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখলো। বড় করে নিঃশ্বাস নিয়ে ফিরে তাকালো ডক্টরের দিকে, “ফাইন। ইন্টেরোগেশন চেম্বার ছাড়া আর কোথাও জেরা না করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আপনাকে।”

সন্তুষ্ট হয়ে মাথা দোলালেন ডক্টর। “ধন্যবাদ। এখন বলুন, কি জানতে চান।”

“আমাদের ইন্টেরোগেশন চেম্বারে প্রফেসরকে স্যাটানিস্ট বলেছিলেন আপনি। তারও আগে তার চরিত্র নিয়ে অপবাদ দিয়েছেন। প্রফেসর নাকি অল্পবয়সি মেয়েদের প্রতি ঝুঁকেছেন—ইত্যাদি ইত্যাদি। এসবের ব্যাখ্যা কি দেবেন?”



“এক সেকেন্ড, চরিত্র নিয়ে আমি কোন অপবাদ দেইনি। নিজেই দেখুন।” ঝটকা দিয়ে পকেট থেকে মোবাইল বের করে একটা ছবি এগিয়ে দিলেন তিনি।

ছবির প্রফেসর তানভীর জালালকে দেখা যাচ্ছে কোন এক রেস্টুরেন্টে ডিনার করতে। রোমান্টিক একটা পরিবেশ-অল্প আলো। প্রফেসরের অন্যপাশে বসে থাকা মেয়েটির বয়স খুবই কম। আঠারো পার হয়েছে বলে মনে হয় না। পোশাক খুব সভ্য প্রকৃতির নয়, তবে উশৃঙ্খল বলা চলে। এক হাত আটকে আছে প্রফেসরের হাতে।

একপলক দেখে চোখ সরিয়ে নিল আসিফ। “ছবিটা পেলেন কোথায়?”

“ফরহাদ। শখের গোয়েন্দা ছিলো ও। এসব কাজে আগ্রহের সীমা নেই। সেজন্যে অনেকবার প্রফেসরকে সে ফলো করেছে ছদ্মবেশে।”

“বেশ। প্রফেসরের স্ত্রী মারা গেছেন পনের বছর আগে। তিনি অন্য কোন মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হলে সেটা নিশ্চয় দোষের কিছু না। তার পার্সোনাল লাইফ একান্তই তার নিজস্ব ব্যাপার।”

চুপসে গেলেন ডক্টর খান, প্রসঙ্গ পাল্টে ফেললেন। “এখানে আর কিছু দেখার কি আছে, ডিটেক্টিভ? না-হলে চলুন, বাইরে বের হওয়া যাক।”

মাথা ঝাঁকিয়ে আবারও সিঁড়ি দিয়ে মূল গবেষণাগারে ফিরে এলো ওরা। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশটিকে আসিফ নির্দেশ দিল যেন অবিলম্বে এখানে আরেকটি ক্রাইম সিন ইউনিট পাঠানো হয়। নিচতলায় সম্ভাব্য ক্রাইম-সিন পাওয়া গেছে-খবরটা শুনে পুলিশটির চেহারা নিখাদ বিষময় ফুটে উঠলো।

বাড়িটা থেকে বের হয়ে এলো ওরা। আসিফের আরও কিছুক্ষণ থাকার ইচ্ছে ছিলো, তবে ডক্টর খান তাতে একমত হলেন না। বাইরে বসে আলোচনা করার ওপর জোর দিচ্ছেন তিনি। অগত্যা ওদেরও বের হতে হয়েছে।

হন হন করে হাটছেন ডক্টর। তার সাথে তাল মেলাতে বেগ পেতে হলো ওদের দু-জনকে।

“যাচ্ছেনটা কোথায়?” প্রশ্নটা না করে পারলো না আসিফ।

“ওই লেকটা পার হলেই দেখতে পাবেন।” পাশের জলাশয়টা দেখিয়ে দিলেন তিনি।

হাতঘড়ি দেখে নিল আসিফ। এরইমধ্যে রাত সাড়ে বারোটা বেজে গেছে। মাইন্ড করার কিছু নেই। আগামিকাল সকালে সবখানে এফবিআই’র পোদারি থাকবে। নিজে থেকে শান্তির সাথে কিছুই করতে পারবে না ওরা। মনে মনে এই বাড়তি ঝামেলাটাকে ঠাণ্ডা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে আসিফ। আজ সন্ধ্যায় কমিশনার শাহেদ জামান তাকে ডানিয়েছেন, এই বিদেশি লোকদুটোকে ‘বেবিসিটিং’ করতে হবে তাকে।

এফবিআই’র ‘সু নাম’ সম্পর্কে আসিফ জানে না, এমনটি নয়। বেবিসিটি বলে শাহেদ জামান স্রেফ সাজুনা দিয়েছেন তাকে। ওরা নিজেদের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবে। আর ভাবটা অস্বাভাবিক, তা-ও নয়। বাংলাদেশের সংস্থাগুলো থেকে তাদের রিসোর্স বেশি, উন্নত ট্রেনিং আছে তাদের। আসিফ ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে তাদের চেয়ে কিছুটা কম

ভাবে না, তবে ওদের মতো এত রিসোর্স হোমিসাইডের নেই। এফবিআই'কে সহ্য করতে না পারার কারণ ভিন্ন। যার কাছ থেকে কেস টেকওয়ার করে তাদের ন্যূনতম প্রফেশনাল কার্টেসিটুকুও দিতে ওরা নারাজ। এই জিনিসটাকেই আসিফ ঘৃণা করে।

পুলিশের সাধারণ একজন কনস্টেবল থেকে একজন হোমিসাইড ডিটেক্টিভের মর্যাদা অনেক বেশি। যখন মাঠে একসাথে কাজ করার প্রয়োজন পড়ে, পুলিশকে প্রফেশনাল কার্টেসি দিয়েই চলে আসিফ। অথচ এই সৌজন্যতাবোধ এফবিআইর মধ্যে দেখা যায় না। নিজের হাত থেকে কেসটা ছুটে যাচ্ছে—এটা সে ভালভাবেই বুঝতে পারছে। রাত সাড়ে বারোটা বাজলেও সেটাকে পাত্তা দেওয়ার কিছু নেই।

ডক্টরও ভাল মুডে আছেন। বহুদিন পর চিরশত্রু তানভীর জালালের ব্যাপারে তার থিওরিগুলো কেউ মন দিয়ে শুনছে, এটাই তার কাছে অনেক। তার ওপর সেরকম একটা থিওরি তিনি প্রমাণও করে ফেলেছেন। প্রফেসর জালাল একজন অ্যালকেমিস্ট ছিলেন। কাজেই এখানে সারারাত কথা বলতেও তার ক্লান্তি লাগবে বলে মনে হয় না। তিনিও বাড়ি ফেরার কথা তুলছেন না। পরিস্থিতির গুরুত্ব জিয়াও বুঝতে পেরেছে। কাজেই চুপচাপ হাটছে ওদের সাথে। ল্যাবে পৌঁছানোর পর থেকে খুব একটা কথা বলেনি ও।

“অ্যা-অ্যাহ্!” একজায়গাতে কিছু ইট ফেলে রাখা হয়েছে। তারওপর বসে পড়তে পড়তে দুর্বোধ্য শব্দটুকু করলেন ডক্টর খান।

চারপাশে তাকিয়ে পরিবেশটা দেখলো জিয়া, এখানে বিশাল বিরানভূমি। তারপরই জলাশয়। যার পাশে প্রফেসরের বাড়ি আর ল্যাব। এখান থেকে ভালই দেখা যাচ্ছে। আসিফও বসে পড়ল ডক্টরের পাশে। রীতিমত বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে বসকে। তবে জিয়া জানে, যখন মাথায় ঝড়ের বেগে চিন্তা চলে, তখন তাকে এমন দেখায়। ধপ করে গুরুর পাশে বসে পড়ল সে-ও।

“কেন আমি ডক্টরকে স্যাটানিস্ট বলেছিলাম সেটাই জানতে চাইছেন তো?”

মাথা দোলালো আসিফ।

“আপনি তো শয়তানের ক্ষমতায় বিশ্বাস করেন বলে মনে হয় না। তাহলে কেন জানতে চাইছেন?” আবার প্রশ্ন করলেন ডক্টর।

“উত্তরটা আপনি নিজেই দিয়েছিলেন। আমার বিশ্বাসে কিছু আসে যায় না।” সাফ সাফ বলে দিল আসিফ। “আমাকে জানতে হবে আমার ভিক্টিম কি বিশ্বাস করতো। হয়তো সেটা থেকে আমি তার ফুটস্টেপ বের করতে পারবো।”

“ভালো বলেছেন,” মাথা দোলান ডক্টর খান, “আপনার জেনুইন আগ্রহ দেখে ভাল লাগছে। আসলে আমি জানি না ঠিক কোথা থেকে শুরু করতে হবে।”

“শয়তানের প্রতি প্রফেসরের বিশ্বাস থেকে শুরু করতে পারেন,” পরামর্শ দিল আসিফ।

পানির দিকে তাকিয়ে ভাবলেন ডক্টর, “না, সরাসরি ওখানে চলে গেলে দুর্বোধ্য শোনাবে। আপনাদের একটা প্রশ্ন করি প্রথমে, ইলুমিনাতির নাম শুনেছেন?”

মাথা দোলাল দু-জনেই। আজকের যুগে ইলুমিনাতিদের চেয়ে না কে? গল্প-মুভিতে কম আলোচিত হয়নি তারা।

“তা-ও একটা ব্রিফ দিয়ে নেই। কিছু অজানা থাকলে মিলিয়ে নেবেন। ১৭৭৬-এর পয়সা মে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ইলুমিনাতি। ইলুমিনাতি উচ্চারণও করা হয় তাদের। বাভারিয়াতে সঙ্ঘটির উৎপত্তি হয়। এর অর্থ এনলাইটমেন্ট। উদ্দেশ্য ছিলো চমৎকার-কুসংস্কার, বাজে সংস্কার, ধর্মীয় প্রভাব থেকে জন-জীবনকে মুক্ত রাখা। অন্যতম আরেকটা উদ্দেশ্য ছিলো লিঙ্গবৈষম্য দূর করা। নারী-পুরুষ সমান অধিকার পাবে, এটা তারা চাইতো। মুক্তমনে চিন্তা করার কথা বলত ওরা। সেই সাথে ধর্মীয় বিধি-নিষেধ অগ্রাহ্য করতো, অস্বীকারও করতো। তারা বিশ্বাস করতো, ধর্মীয় অনুশাসন মনের ওপর বাজে প্রভাব ফেলে। বুঝতেই পারছেন এর পরিণতি কি হতে পারে! বাভারিয়ান সম্রাট চার্লস থিওডোর তাদের বাভারিয়া থেকে খেদালেন। থিওডোর রোমান ক্যাথলিক চার্চকে পাশে পেলেন। ১৯৮৫ আসতে না আসতেই ইলুমিনাতিরা বিতাড়িত হয়ে যায়।”

“একেবারে নয়। যতদূর জানি তারা গোপনে কাজ করে গেছিলো,” বলল আসিফ, “ফ্রেন্স রেভল্যুশন তারাই ঘটাতে সক্ষম হয়।”

“বাভারিয়ার ইলুমিনাতিরা প্রায় দশবছর সময় পেয়েছে। জায়গাটাকে ওরা বলত অর্ডার অফ দ্য ইলুমিনাতি। মাত্র দশ বছর সময়ের মধ্যেই ওরা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো দু-হাজারের মতো শাখা। থিওডোর যতদিনে সব সিক্রেট সোসাইটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করছেন, ততদিনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। গোয়াতে আর গটফ্রিডের মতো শিক্ষিত লোকেরাও তাদের সমর্থন দিয়ে গেছেন। আর এজন্যেই মার্ক ডাইস, টেক্স মারস, জুরি লিনার মতো মানুষ মনে করে তারা টিকে গেছে। ১৮৮৫-তে তারা ধ্বংস হয়নি, টিকে আছে আজকের দিন পর্যন্ত।”

এতক্ষণে মুখ খুলল জিয়া, “যতদূর জানতাম, ইলুমিনাতিরা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাদের নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের স্বপ্নও সেই সাথে ধূলিস্যাৎ হয়ে গেছে।”

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার অনুযায়ী পুরো পৃথিবীর সিস্টেমকে পাল্টে তাদের মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছে ইলুমিনাতিদের ছিলো। এসব জানা আছে ডক্টরবাবু, মাথা দোলালেন তিনি। “সেরকমটা মনে করাটা মোটেও অবাস্তব নয়। এজন্য বাকিদের ধারণা, ইলুমিনাতিরা এখন শুধু থিওরির ওপর টিকে আছে। তারা সিজের আগের চেয়েও গোপন রাখতে চাইছে। নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের স্বপ্ন তাস্তি বেড়ে ফেলেছে। আবার অনেকের ধারণা, ওয়াটারলু যুদ্ধ, ফ্রেন্স রেভল্যুশন থেকে শুরু করে কেনেডির হত্যাকাণ্ড তাদেরই কীর্তি। লিংকন আর কেনেডির দ্বি-একশ বছর পর অ্যাসাসিনের হাতে নিহত হওয়ার ঘটনা আপনাদের কাছে কাকতালিয় বলে মনে হতে পারে, তাদের হত্যাকারীদের পালিয়ে যাওয়ার পদ্ধতির মিল দেখেও অবাক হতে পারেন। তবে আমি অবাক হই না। আমি অন্য কিছুতে বিশ্বাস করি।”

আহহের সাথে তার দিকে তাকিয়ে আছে জিয়া আর আসিফ।

মাথা নাড়লেন ডক্টর। “আমি বিশ্বাস করি ইলুমিনাতিরা তাদের থিম বজায় রেখে এগিয়ে আসছে আজও, তবে ভিন্ন নামে। এটা যে শুধু আমার অনুমান, তা ভাববেন না। ভেঙে পড়া ইলুমিনাতিদের অনেকেই যোগ দিয়েছিলেন ফ্রি মেসনারিতে, এর যথেষ্ট উদাহরণ আছে। ভাইসার্ট গোষ্ঠি ছিলো ইলুমিনাতি। ভাইসার্টের ইচ্ছেতেই মে মাসের এক তারিখে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো ইলুমিনাতি। সেই ভাইসার্টই জার্মান মেসনিক লজে যোগ দিলেন। ফ্রি মেসনারির নাম তো শুনেছেন?”

মাথা চুলকাল আসিফ, শব্দটা বেশ চেনা চেনা ঠেকছে। “ভাসা ভাসা শুনেছি, তারা শয়তানের পূজারি।”

আসিফের কথা শুনে হেসে ফেললেন ডক্টর। “ঠিক তা নয়। প্রচলিত এক ভ্রান্ত ধারণা এটা। তবে অনেক ফ্রি মেসনই স্যাটানিজমের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন, এটাও সত্য। যাই হোক, ফ্রিমেসনারির প্রতিষ্ঠা কিন্তু ইলুমিনাতিদেরও আগে। জানেন তো, ওরা নিজেদের গোপন রাখতে পছন্দ করে। তবুও প্রথমবারের মতো এমন একটা সংগঠনের অস্তিত্ব পাওয়া যায় ১৪২৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে। ইলুমিনাতিদের আসতে তখনও তিনশ বছর দেরি। চৌদ্দদশ শতকের দিকে প্রথম ধারণা পাওয়া গেছে ঠিক, তবে ফ্রি মেসনারির জন্ম সম্ভবত কয়েক হাজার বছর আগে!”

হাত তুলল আসিফ। “এক সেকেন্ড! আপনি এইমাত্র বললেন আপনার ধারণা ইলুমিনাতিরা এগিয়ে আসছে ফ্রি মেসনদের আড়ালে? সেটা কিভাবে সম্ভব? আপনিই বলেছেন, ফ্রি মেসনারির প্রতিষ্ঠা হাজার বছর আগে?”

“ফ্রি মেসনারি—একটা অনেক বড় ধারণা। ইলুমিনাতিদের থেকেও বড়। এবং গোপন। টের পাওয়া যায়, তাদের আকার-বিস্তার অনেক অনেক বেশি, আর তারা যথেষ্ট সফলও। ইলুমিনাতিদের থেকেও। পৃথিবীর রাজনীতি থেকে শুরু করে অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের বড় পরিকল্পনা তাদের হাতে। ইলুমিনাতিদের মতো উৎখাত তাদের হতে হয়নি। তাছাড়া তাদের মৌলিক গঠনে মিল রয়েছে, মিল রয়েছে বিশ্বাসে। সবচেয়ে বড় কথা কী জানেন, ফ্রি মেসনারিতে যোগদানের ক্ষেত্রে তারা বেশ উদার মনোভাব বজায় রাখে।”

“ওদার্যের সাথে তারা টেনে নেয় ইলুমিনাতিদেরও। তাই বলতে চাইছেন?”

মাথা ঝাঁকালেন ডক্টর খান। “শুধু ইলুমিনাতিদের নয়, নতুন সদস্য গ্রহণে তাদের কোন সীমারেখা নেই। মুসলিম, খ্রিস্টান, হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ—যেকোন ধর্মালম্বীই পারে ফ্রি মেসনারিতে যোগ দিতে। শর্ত কিছু আছে। শর্ত হিসেবে বলা চলে, মেসনিক লজে যোগ দিতে ইচ্ছুক সদস্যের সুপ্রিম বিইংয়ের প্রতি বিশ্বাস থাকা চাই। তাকে হতে হবে মুক্তমনা, হতে হবে সচ্চরিত্র। কিছু কিছু লজ অবশ্য বিশেষ একটি ধর্মবিশ্বাস ছাড়া কাউকে মেম্বারশিপ দেয় না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান লজ শুধুমাত্র খ্রিস্টান ধর্মালম্বীদের গ্রহণ করে।”

মনোযোগ দিয়ে শুনছে দু-জনেই, প্রায় একইসাথে জানতে চায় আসিফ আর জিয়া—“লজ? মেসনিক লজ?”

“শব্দটা নতুন ঠেকছে?” এমনভাবে তাকালেন ডক্টর খান, যেন শব্দটা নতুন ঠেকা একটা বড় মাপের অপরাধ ছাড়া আর কিছুই না। “পরিবার যেমন সমাজের একক, কোষ যেমন জীবদেহের একক, তেমনই মেসনিক লজ হলো ফ্রি মেসনারির একক। ফ্রি মেসনারির অর্গানাইজেশনাল ইউনিট হলো এক একটি মেসনিক লজ। মেসনিক লজগুলোতে নিয়মিত মিটিং ডাকা হয়। সংস্থাটির সবধরনের কার্যক্রম এই মেসনিক লজই ঠিক করে। সবচেয়ে মজার কথা, পৃথিবীব্যাপি লজগুলো যে একটা আরেকটার সাথে ইন্টারকানেক্টেড—তা কিন্তু নয়। প্রতিটি লজের একটি নিজস্ব এলাকা থাকে। ওই এলাকাতে সেই লজের রীতিনীতি প্রচলিত হবে। লজটি অবশ্যই ফ্রি মেসনারির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে। কিন্তু এছাড়া আর সব বিষয়ে তাদের স্বাধীনতা আছে। তাদের কার্যপ্রণালী স্বাধীন, এমনকি তাদের রিচুয়ালের মন্ত্রগুলো কি হবে সে-ব্যাপারেও প্রতিটি লজের স্বাধীনতা রয়েছে। একটি লজের প্রতি অন্য লজের আছে শ্রদ্ধা।”

“হুম। লজ হলো ফ্রি মেসনারি ইউনিট। বুঝলাম,” মাথা দোলাল জিয়া। “তবে একই এলাকায় দুটি লজ গড়ে উঠলে কি হবে? জনগণ কোন লজের বিশ্বাস বহন করবে? লজের কর্মীরাই বা কোন ঘাঁচে কাজ করবে?”

কপাল চুলকাশেন ডক্টর খান। “এখানে ব্যাপার আছে। রেগুলারিটির ব্যাপার আছে। অ্যামিটি আছে।”

“রেগুলারিটি? অ্যামিটি?” আসিফ বুঝলো না।

“রেগুলারিটি হলো, ল্যান্ডমার্কের প্রতি আনুগত্য। যখন একাধিক লজকে একটি লজ নিয়ন্ত্রণ করে তাকে বলা হয় মেসনিক গ্র্যান্ড লজ। একটি গ্র্যান্ড লজের ল্যান্ডমার্ক তাদের কাছে রেগুলার। ল্যান্ডমার্ক বলতে আমি বোঝাচ্ছি—নতুন মেম্বার যোগ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতাগুলো, মতবাদ, ক্র্যাফটের রিচুয়ালের প্রণালী।

ল্যান্ডমার্ক লজ বাই লজ ভিন্ন হতে পারে। তবে যে গ্র্যান্ড লজের ল্যান্ডমার্ক যে গ্র্যান্ড সেটাই তাদের রেগুলার। আর অন্যান্য সকল লজের প্রণালী তাদের কাছে প্রণালী। একই এলাকায় দুটো লজ পড়ে গেলে এভাবে মানিয়ে নিতে হয়। অন্যটা অ্যামিটি। দুটো লজ যখন একে অন্যকে গ্রহণ করে নেয়—পাশাপাশি এক এলাকায় তাদের কার্যক্রম চালাতে চায়—সেটাকে বলে অ্যামিটি।”

“হুম...লজ বাই লজ এত দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও ফ্রি মেসনারি টিকে আছে?” বিড় বিড় করে বলল জিয়া।

“ওদের মূলমন্ত্রই তো ওটা। মুক্ত মন। কেউ কারও ভেদাভেদ নিয়ে মাথা ঘামাবে না। ঘামালে আর ফ্রি শব্দটা রাখার কোন মানে হয় না। প্রথম শর্তই হলো মুক্তমনা হওয়া।”

জুতো ঠুকল আসিফ মাটির সাথে। “মেসনিক লজ বা গ্র্যান্ড লজের ব্যাপার নিয়ে আমরা কেন আলোচনা করছি? বাংলাদেশে আমার জানামতে কোন ফ্রি মেসনারি লজ নেই। গ্র্যান্ড লজ দূরের কথা। থাকলে আমার কানে আসার কথা ছিলো। সিক্রেট

সোসাইটি নিয়ে ডিপার্টমেন্টের অগ্রহ আছে। প্রফেসর তানভীর জালালের মৃত্যুর সাথে এর কি সম্পর্ক?”

একটি শিশু অযৌক্তিক কথা বললে তার দিকে যেভাবে তাকায় প্রাপ্তবয়স্ক একজন মানুষ, সেভাবে আসিফের দিকে তাকালেন ডক্টর খান। “বাংলাদেশের মাটিতে প্রথম মেসনিক লজ বানানো হয়েছিলো সেই ১৯১০ সালে, ডিটেক্টিভ। আপনাকে আমি লোকেশনও জানাতে পারবো। আমি নিজে গিয়ে দেখে এসেছি ওটা।”

স্তুভিত হয়ে ডক্টরের দিকে তাকিয়ে রইল আসিফ আর জিয়া। আমেরিকাতে ফ্রি মেসনারির বিস্তার আছে বলে অনেকেই জানে। তাই বলে বাংলাদেশে? ব্রিটিশ আমলে ফ্রি মেসনারির প্রভাব পড়াটা অবশ্য অস্বাভাবিক কোন ব্যাপার নয়। তবে আজকের যুগে কটরপন্থি মুসলিম রাষ্ট্রে মেসনিক লজের অবস্থান থাকলে চমকাতেই হবে।

ওদের চমকে দিতে পেরে সমুদ্র হলেন ডক্টর, স্পষ্ট কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন এবার, “আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস ডক্টর তানভীর জালাল শুধু একজন অ্যালকেমিস্টই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন ফ্রি মেসনও। আর সেটার প্রমাণ দেওয়ার জন্যই ল্যাব থেকে বেরিয়ে এসেছি আমি।”

আকাশে প্রায় পূর্ণ একটি চাঁদ উঠেছে। চারপাশে বলমল করছে রূপালি আলো। অথচ ওদের মনে হয় আলোর খুব অভাব। অন্ধকার যেন রাজত্ব করছে সবখানে।

“আপনি বলছেন প্রফেসর তানভীর জালাল ফ্রি মেসনারিতে যোগ দিয়েছিলেন?”  
গিলাশের মতো প্রশ্ন করলো আসিফ।

মাথা দোলালেন ডক্টর খান।

“ফ্রি মেসনারির সদস্য হতে হলে প্রথমেই যেটা থাকা লাগবে বলেছিলাম,”  
আগের কথাতে ফিরে আসেন ডক্টর খান, “সদস্য হতে ইচ্ছুক মানুষটিকে হতে হবে সুপ্রিম বিইংয়ে বিশ্বাসি একজন। আশা করি আপনাদের জানা আছে সুপ্রিম বিইং কাকে বলা হয়?”

মাথা দোলাল আসিফ। “সর্বময় ক্ষমতাবান। অর্থাৎ আমাদের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী সুপ্রিম বিইং হলেন আল্লাহ।”

মাথা দোলালেন ডক্টর খান। “অথবা খ্রিস্টানদের জন্য গড...হলি ট্রিনিটি-মানে, গড, জাইস্ট আর হলি স্পিরিট। হিন্দু এবং বৈষ্ণবদের জন্য বিষ্ণু হলেন সুপ্রিম বিইং, শৈব ধর্মে শিব। ডিস্টরা আরও এককাঠি এগিয়ে, তাদের সুপ্রিম বিইং ডিভাইন। ফ্রেঞ্চ রেভুলুশনের পর কান্ট অফ দ্য সুপ্রিম বিইং তো রাষ্ট্রজুড়ে ধর্মে পরিণত হয়েছিলো।”

ডক্টরের খনখনে হাসির সাথে অবশ্য ওরা যোগ দিল না, বরং প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল আসিফ, “শয়তানের ব্যাপারটা কিভাবে আসলো এখানে?”

“বলছি, আগে চলুন পৃথিবীতে ফ্রি মেসনদের অবস্থান জানা যাক। এছাড়া বাংলাদেশে তাদের পটভূমি বুঝবেন না। ফ্রি মেসনদের লজের ক্ষেত্রে তারা যদি কোন লজকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে তাহলে সেটা হলো লন্ডনের ফ্রি মেসন'স হল। এটা ওখানকার গ্র্যান্ড লজ। শুধু লন্ডন বা ইংল্যান্ড নয়, গোটা পৃথিবী এদের মেনে চলতে আহঁহি। মানে, পৃথিবী জুড়ে থাকা ফ্রি মেসনরা।”

“ইংল্যান্ডে?” অবাক হলো মনে হয় আসিফ। “অথচ যতদূর জানি সবজায়গাতে আমেরিকাকে ফ্রি মেসনারির জন্য প্রাধান্য দেওয়া হয়।”

“আমেরিকার আলাদা গুরুত্ব অবশ্যই আছে। আমেরিকা হলো পৃথিবীর একমাত্র ফ্রি মেসনিক রাষ্ট্র। আমেরিকার জন্মটাই ফ্রি মেসনদের সূত্রের টানে হয়েছে। বোদানন্দুতে ওরা রেখেছিলো আব্রাহাম লিংকনকে। আমরা জানি নিচু একটা স্থান কোন্‌ দাপে ধাপে কিভাবে উঠে এসেছেন তিনি। তবে এই প্রেসিডেন্টের আরও একটি জীবন ছিলো লোকচক্ষুর আড়ালে। এ জীবনটা তিনি সুইস গোপনীয়তার সাথে লুকিয়ে রেখেছিলেন। নিজের স্ত্রির কাছেও প্রকাশ হতে দেননি। ব্যাপারটা অনেকে আঁচ করেছে। অনেক ইতিহাসবিদ মাথা খুঁড়েছে জানার জন্য কিন্তু জানতে পারেনি। জন্ম নিয়েছে অনেক কিংবদন্তি।”

“এসব কিংবদন্তির একটা থেকেই তাহলে আব্রাহাম লিংকন দ্য ভ্যাম্পায়ার হান্টার আইডিয়াটা এসেছে?”

আব্রাহাম লিংকন-যাকে আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা বলা চলে-তিনি রাতের বেলায় কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। অনেক ইতিহাসবিদই এমনটা বলে থাকেন। আর তার ওপর ভিত্তি করে হলিউডে একটি মুভি বানানো হয়েছে ‘আব্রাহাম লিংকন দ্য ভ্যাম্পায়ার হান্টার’ নামে। মুভিতে দেখানো হয়েছে, আমেরিকার প্রথম এই প্রেসিডেন্ট রাতের বেলায় ভ্যাম্পায়ারদের হত্যা করতে বের হতেন। প্রচুর জনপ্রিয়তা পেয়েছে মুভিটি। তবে, ডক্টর খান বাস্তবধর্মী চিন্তা করতে চাচ্ছেন। আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট ওই রাতগুলো ভ্যাম্পায়ার হত্যা না করে ফ্রি মেসনারির কোন দায়িত্ব পালন করেছিলেন বলে ভাবছেন তিনি। ক্লাস, মিটিং অথবা রিচুয়াল।

আসিফের কথায় হাসলেন না ডক্টর খান, বললেন, “খুব সম্ভব, সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, আব্রাহাম লিংকন কিন্তু স্বীকৃত ফ্রি মেসন নন। স্প্রিংফিল্ডের টিরিয়ান লর্জে অ্যাপ্লাই করেছিলেন ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে। খেয়াল করবেন, অ্যাপ্লাই করেছিলেন, যোগ কিছু দেননি। পরবর্তিতে তিনি প্রত্যাহার করে নেন সেই আবেদন। ইতিহাসবিদদের ধারণা, আব্রাহাম লিংকন নিজের মেসনিক পরিচয় স্বীকার করে নিতে চেয়েছিলেন। তারপর রাজনৈতিক জটিলতার কথা ভেবে পিছিয়ে আসেন। অথচ একুশ বছরে পা রাখার পর থেকে এই প্রেসিডেন্টের জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ধরে নেওয়া হয়, তাকে সে সময় ‘রিট্রুট’ করা হয়েছিলো। রাতারাতি বিপুল জনপ্রিয় রাজনীতিবিদে রূপান্তরিত হলেন তিনি। পরবর্তিতে ফ্রি মেসনদের প্রতি সমর্থন বোঝায় তিনি এই বিশ্বাসের প্রতি অনুগত ছিলেন। তবে স্বীকৃতি টিরিয়ান লর্জ তাকে ঠিকই দিয়েছিল। সর্বোচ্চ সম্মাননা জানায় তারা আব্রাহাম লিংকনের প্রতি, তবে সেটা অনেক অনেক পরের কথা। তারা এটাও ঘোষণা করে, ‘মেসনিক মেম্বার হিসেবে লিখিত কিছু না রাখাটা আব্রাহাম লিংকনের জন্য ছিলো একটি বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত, যেটা ফ্রি মেসনারি এবং তার নিজের জন্য দরকার ছিলো।’ আমেরিকান ডলারের গায়ে একসময় ফ্রি মেসনারির প্রতীক ছাপানো হতো। এ থেকে বোঝাই যায় দেশটার কত গভীর পর্যন্ত ফ্রি মেসনারি প্রোথিত। তবে প্রথা অনুযায়ী তারা যতটুকুই প্রকাশ করেছে, রেখেছে গোপনীয়তার জালে মুড়ে। এটা তাদের জন্য একটা ভাল দিক।”

পানিতে প্রতিফলিত হচ্ছে আকাশের তারা। সেদিকে একটুকরো টিল ছুঁড়ে মারলেন ডক্টর। হালকা একটা স্রোত ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। জে দেখতে দেখতেই আগের প্রসঙ্গে ফিরে গেলো আসিফ।

“অথচ আপনি বলেছিলেন ব্রিটিশরা মেসনিক লর্জদের নেতৃত্ব দিচ্ছে?”

“ঠিকই বলেছিলাম তখন,” নিজের কথায় অটল থাকলেন ডক্টর, “ইংল্যান্ডের গ্র্যান্ড লর্জ শুধু তার অধীনস্থ লর্জগুলো নয়, নিয়ন্ত্রণ করছে আজকের ফ্রি মেসনারি। ইতিহাসে এটাই প্রথম গ্র্যান্ড লর্জ। এর আগে একাধিক লর্জকে একটি বড় লর্জ নিয়ন্ত্রণ করবে এমন ধারণা ছিলো না। প্রথমে লন্ডন আর ওয়েস্টমিনস্টারকে নিয়ন্ত্রণ করতো



গ্র্যান্ড লজ অব ইংল্যান্ড। এখন অসংখ্য লজ আছে এদের আভারে। ফ্রি মেসনারিকে বলা চলে একধরনের ধর্ম, যার কোন সীমা-পরিসীমা নেই, কিছু মৌলিক নীতি বাদে এর বিস্তৃতির কোন শেষ নেই। সবচেয়ে বড় সমস্যা, এদের মাঝে যারা পরকালে বিশ্বাস করে তারা পরিণতিটা নিজেদের মনমতো বানিয়ে নিতে চায়। সমাজটির সম্মতবাদি হয়ে ওঠার পেছনে এটাও বেশ ভূমিকা রাখছে। অন্যান্য ধর্মের সাথে জার্মানিস্টদেরও ছড়াছড়ি আছে ফ্রি মেসনারিতে।”

“মাথা ইহুদিদের একটি নিজস্বভূমির সমর্থক এবং তাদের একতার জন্য কাজ করতে চান তারাই তো জার্মানিস্ট?”

“এভাবেও বলা চলে। যাই হোক, ফ্রি মেসনের সাথে ধর্মের সম্পর্ক নেই—এটা বলে তারা শুরু থেকেই সমানে ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু অতি প্রাচীন আমল থেকে চলে আসা রিচুয়াল তারা কিভাবে করে? একটা ভিত্তি তো তাদের আছেই। এই ভিত্তিটা যতদূর বোঝা যায় প্যাগান ধর্মবিশ্বাস থেকে আসা। প্রাচীন মিশরিয়দের থেকেও ওতে প্রভাব পড়তে পারে।”

ডিয়া অন্যপাশ থেকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, “ফ্রি মেসনদের কি আলাদা ধর্ম আছে?”

মাথা নাড়লেন ডক্টর খান। “এখানে ফ্রি মেসনদের আলাদা করে কিছু বলা সম্ভব না। শুধু যে বর্ণোচ্ছ, লজ বাই লজেই অনেক পার্থক্য আছে। বেশিরভাগই ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলবে। তবে অনেকের ধারণা, ফ্রি মেসনারির প্রতিষ্ঠা বিশেষ একটি উদ্দেশ্যে হয়েছে। তারা ইলুমিনাতিদের মতোই নিজেদের মতবাদের ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে চায়। প্রতিষ্ঠা করতে চায় ‘ওয়ান ওয়ার্ল্ড অর্ডার’। এতটুকু অবশ্য স্বাভাবিক। কিন্তু বিশ্বব্যাপি পরিবর্তন আনার জন্য কি দরকার, বলতে পারেন?”

শূন্য দৃষ্টিতে তাকালো আসিফ। “আগের বিশ্বটিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে ফেলা?”

“অবশ্যই। ওটার ধ্বংসস্তুপ থেকে নতুন পৃথিবীকে বের করে আনা যাবে। পৃথিবীর এই পরিবর্তনে ফ্রি মেসনারির সাফল্য তখনই আসবে, যখন প্রতিটি রাষ্ট্রপ্রধান হবেন একজন ফ্রি মেসন অথবা একজন ফ্রি মেসন হবেন রাষ্ট্রপতিদের নিয়ন্ত্রক। তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী রাষ্ট্রগুলো পরিচালিত হবে। প্রতিষ্ঠা হবে ‘ওয়ান ওয়ার্ল্ড অর্ডার’।” অন্ধকার পার্নার দিকে তাকিয়ে থাকলেন ডক্টর খান।

এবারের টিলটি ছুঁড়লো আসিফ, চাঁদের আলোয় পানিতে স্নেহ উঠলো আবারও। ডক্টরের দিকে তাকালো সে। “প্যাগান ধর্মবিশ্বাস আর মিশরিয়দের নিয়ে কিছু বর্ণোচ্ছন আপনি?”

দাঁড়িতে হাত বোলালেন ডক্টর খান। “শুধু মিশরিয় না, সেমিটিক আর মেসোপটেমিয়ার বিশ্বাসও এখানে অন্তর্নিহিত। প্যাগানরা একেবারে পাথরের যুগ থেকে চলে আসছে। ওদের বিশ্বাস সম্পর্কে কি বলব—তারা একেশ্বরবাদি ছিলো না। প্যাগানদের ধর্ম ছিলো বহু আকৃতির ঈশ্বরে বিশ্বাস করা। তবে তাই বলে এদের সাথে

সনাতন ধর্ম, মানে হিন্দু-ইজমের মিল খোঁজার চেষ্টা করা বৃথা। হিন্দু-ইজমে দেবতাদের নির্দিষ্ট কাজ আছে, আকার আছে। আর আছেন একমাত্র ভগবান। প্যাগানদের ‘ভগবান’-এর অভাব ছিলো না। যেকোন শক্তি তাদের উপকারে আসলেই সেটাকে তারা ঈশ্বর বিবেচনা করে মাথা পেতে দিত। আলাদা করে একেকজন দেবতার কাজ নির্ধারণ করেনি তারা। প্যাগানদের ঠিক উল্টো মতবাদ নিয়ে এলো খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাস। প্রথমে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলো প্যাগানবাহিনী। তারপর খ্রিস্টানরা ফ্রন্টফুটে খেলার সুযোগ পেতেই পাণ্টা আঘাত হানে প্যাগান বিশ্বাসিদের প্রতি। ইতিহাসে প্রচুর রক্ত ঝরেছে এ নিয়ে। প্যাগানদের স্বর্গ-নরকে কোন বিশ্বাস ছিলো না। পুণর্জন্ম ছিলো বিশ্বাস, তাদের মাঝে ছিলো বিকলাঙ্গ শিশুকে পানিতে ডুবিয়ে মারার প্রথা। বিয়ের বালাইও ছিলো না, পর্নোসোসাইটি ছিলো তাদের। যে যার সাথে পারে শুয়ে পড়ত। মোটকথা, খ্রিস্ট সমাজের গায়ে লাগার মতো ব্যাপার তো বটেই। প্যাগানদের বিশ্বাস অনুযায়ী পৃথিবীর প্রধান উপাদান চারটি—মাটি, পানি, বায়ু আর আগুন।”

উত্তেজনা ছুঁয়ে গেলো আসিফকে। “ইলুমিনাতিদের প্রথম বিশ্বাসও এটাই!”

মৃদু হাসলেন ডক্টর খান। “প্যাগানদের ধারণা ছিলো মাটি হলো মাতৃরূপ। পুণর্জন্মের ফলে বার বার তার গর্ভেই আমরা প্রস্তুত হই। বাতাসের ব্যাপারেও ছিলো তাদের পজিটিভ ধারণা, যেমন বাতাস সমস্যা দূরে নিয়ে যায়, দরকারি চিন্তাগুলো কাছে এনে দেয়, আগুন ধ্বংস করতে পারে আবার গড়তেও পারে—তাই আগুনের ভূমিকা তাদের কাছে এত বেশি ছিলো। আর পানি, এর আছে সুস্থকরণ ক্ষমতা, বিশুদ্ধতা আর প্রাণের উৎস। প্যাগানদের থেকেই এসেছে ইলুমিনাতি আর ফ্রি মেসনারি। শুধু এ দুটো নয়, অসংখ্য গুপ্ত বিশ্বাসগোষ্ঠি এদের থেকে জন্ম নিয়েছে। পরবর্তিতে ফ্রি মেসন হিসেবে যোগ দেওয়া মানুষগুলোর ধর্মীয় বিশ্বাস প্রভাবিত হয়েছে। শুধু ফ্রি মেসনারি কেন—খ্রিস্টান ধর্মবিশ্বাসেও তার প্রভাব কিছুটা কম পড়েনি।”

“প্যাগানদের উৎসাহ করা হয়েছিলো রক্তগঙ্গার মধ্যদিয়ে, যতদূর শুনেছি। খ্রিস্টান সম্রাটরাই এই কাজ করেছিলেন একটা সময়?” প্রশ্ন করল জিয়া মিত্রালজি আর প্রাচীন বিশ্বাসের ওপর এই ছেলের বিশেষ আগ্রহ আছে, সেটা জানে আসিফ।

“সেটা মোটেও ভাল কিছু হয়নি। খ্রিস্ট আর রোমান সাম্রাজ্যে এই প্যাগানদের আধিক্য ছিলো—কিন্তু রোমে খ্রিস্টানদের প্রবেশের পর সেটা ভুমকি মুখে পড়ে। অবস্থা আরও করুণ হয়ে গেলো যখন স্থানীয় অনেক সামন্ত খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে নিলেন। তারা চাইলেন জনগণও সেদিকে ধাবিত হোক যেন তারা অধীকার করলো তাদের ওপর নির্বিচারে অত্যাচার চালালেন রাজ্যস্বামীগণ। শক্ত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তারা তখন নবদীক্ষিত ধর্মের আগুনে বলিয়ান—টিকতেই পারলো না প্যাগানরা। জ্ঞান বিজ্ঞানে প্যাগানরাই এগিয়ে ছিলো অনেক বেশি। মুসার সময়েও এই ধরনের বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসি মানুষ আমরা দেখেছি। বনি ইসরাইল গোত্রে প্রেরণ করা হয়েছিলো মুসাকে। বহু

ঈশ্বরে পূজার বাতিক তাদের ছিলো। সিনাই পর্বতে মুসা গিয়েছিলেন, এই ফাঁকে বনি ইসরাইল এক গরুকে খোদা বানিয়ে পূজা শুরু করে দিয়েছিলো। অথচ, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সেই ইহুদিরা অনেকটা এগিয়ে গেছে আজকের পৃথিবীতে। মনে করা হয় খ্রিস্টানদের সেসব আক্রমণের কারণ ছিলো এটাই। প্যাগানদের সাথে জ্ঞানে পেরে উঠছিলো না তারা।”

বোঝার চেষ্টা করলো আসিফ। “তাহলে খ্রিস্টধর্ম আর প্যাগানদের মাঝে তো বিস্তার ফারাক হবার কথা। তাদের সম্পর্কটা ছিলো, আমার ভুল না-হয়ে থাকলে, শত্রুতাপূর্ণ। খ্রিস্টধর্মে এর প্রভাব কিভাবে পড়ল তাহলে?”

গাল চুলকালেন ডক্টর। “প্যাগান অধ্যুষিত এলাকায় প্যাগান প্রভাব বেশি হবে সেটা তো স্বাভাবিক। হাজার হাজার বছর ধরে ওসবে তারা অভ্যস্ত। এখন মাঝে হুট করে খ্রিস্টানধর্ম চলে আসলে সেটা মিশবে না? ইংরেজি শব্দ ‘ভেরাডা’ কিভাবে বাংলাতে ‘বারান্দা’ হয়েছে সেটা খেয়াল করেছেন তো? অনেক শব্দ এভাবে ঢুকে যাওয়ার উদাহরণ আছে। ভাষার ক্ষেত্রে এমনটা হলে ধর্মের ক্ষেত্রে কেন হবে না?”

“এমন কি কি ঢুকেছে খ্রিস্ট ধর্মে?” আগ্রহ নিয়ে জিয়া জানতে চাইল।

“জিশু খ্রিস্টের জন্মদিন পালন করা হয় ডিসেম্বরের ২৫ তারিখ। অথচ ওটা প্যাগানদের উৎসবের দিন। জিশুর জন্ম কিন্তু মোটেও শীতকালে না। তার জন্ম হওয়ার কথা ছিলো এপ্রিলের দিকে। অথচ কিভাবে প্যাগানদের উৎসবের দিনটাই আজ সমগ্র খ্রিস্টানজগত পালন করছে দেখুন। এখানেই শেষ না-খ্রিস্টানদের প্রার্থনাভঙ্গি একেবারেই প্যাগানদের প্রার্থনাভঙ্গির অনুরূপ। তাছাড়া, প্যাগানদের ধর্মীয় ক্রশ ছিলো একটা। হালকা বাঁকানো ক্রশটা সামান্য পরিবর্তিত হয়ে আজ হয়েছে খ্রিস্টানদের ক্রশ। জিশুকে হত্যা করা হলো যা দিয়ে তা কেন এত সম্মান করা হবে? বস্তুটাকে না ঘৃণা করা উচিত ছিলো তাদের? খ্রিস্টানরা যুক্তি হিসেবে বলেন জিশুর রক্ত সেই ক্রশে লেগেছিলো বলেই তার মর্যাদা দেওয়া হয়। তবে আমার তেমনটা মনে হয় না। প্যাগানদের ক্রশ তারা অজান্তেই গ্রহণ করেছে।”

রাতের আকাশ দেখলো আসিফ। ডক্টরের কথা সত্য হলে প্রাচীন এই বহুশ্বরবাদি ধর্ম আজকের প্রচলিত একেশ্বরবাদি ধর্মগুলোতে ভালই প্রভাব বিস্তার করেছে।

“যাই হোক, প্যাগানদের কথা তোলার উদ্দেশ্য হলো, এটা কিন্তু একটি মাত্র ধর্ম নয়। অসংখ্য কাছাকাছি বিশ্বাস ছিলো সে-সময়, তাদের একত্র করে আজ আমরা প্যাগানিজম বলি। এই অসংখ্য বিশ্বাসের কোন একটা পালক, অথবা বলা যায় বিবর্তিত হয়ে ফ্রি মেসনারিতে রূপ নিয়েছে। প্যাগানরা যেমন শত বিশ্বাস সাম্যবাহ্যতে রেখেছিলো, মেসনরাও তাই করেছে। এই পর্যায়ে সুপ্রিম বিইং নিয়ে কথা বলা যেতে পারে। একটু আগে ফ্রি মেসনারিতে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সুপ্রিম বিইংয়ে বিশ্বাস নিয়ে একটা কিছু বলেছিলাম, মনে আছে তো?”

উৎসাহি ছাত্রের মতো জিয়া পুনরাবৃত্তি করলো, “অবশ্যই সুপ্রিম বিইংয়ে বিশ্বাসি হতে হবে, বলেছিলেন আপনি।”

মাথা দোলালেন ডক্টর। “চমৎকার। বিশ্বাস তাদের অবশ্যই রাখতে হবে তবে সুপ্রিম বিইংয়ে বিশ্বাসি ফ্রি মেসনকে সেই সুপ্রিম বিইংয়েরই অনুগত হতে হবে, তা কিন্তু নয়। তার অথবা তাদের অ্যান্টি-বিইংয়ের অনুগত হলেও চলবে। কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য রাখুন, অ্যান্টি-বিইংয়ের ওপর বিশ্বাস রাখার জন্য সুপ্রিম বিইংয়ে বিশ্বাস রাখাটা অবশ্যই জরুরি।”

নিজের ওজন শরীরের অন্যদিকে চাপিয়ে বসলো আসিফ। “মানে, শয়তানের পূজা করার জন্য আল্লাহের ওপর বিশ্বাস আনতে হবে আপনাকে?”

সরাসরি উত্তর দিলেন না ডক্টর। “প্রাথমিকভাবে, মেসনিক লজে সবাই শুধু প্রার্থনা আর জ্ঞানচর্চা করতে যেত। জ্ঞানচর্চার প্রয়োজন ছিলো ওদের। ফ্রি মেসনারির আল্টিমেট গোল পৃথিবী জুড়ে ওয়ান ওয়ার্ল্ড অর্ডার সৃষ্টি। জ্ঞানের চূড়ায় উঠতে না পারলে পৃথিবীর রাজনীতি আর অর্থনীতির সূতো সবার চোখের সামনে, অথচ সবার চোখের আড়ালে টেনে যাওয়া তাদের পক্ষে কোনদিনও সম্ভব হবে না। জ্ঞানচর্চা করার ক্ষেত্রে অনেকে হাত বাড়ালো শয়তানের দিকে। ‘শয়তান ওদের টেলে দেবে জ্ঞান’ এমন একটা বিশ্বাস তাদের ছিলো।”

“শয়তান জ্ঞান দিয়ে বেড়ায় ওদের?” অবিশ্বাসে বলে উঠলো আসিফ।

“ডিটেক্টিভ, আজকের যুগে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয় এমন অনেক জ্ঞানীশুণী ব্যক্তিই ছিলেন স্যাটানিস্ট। আইজ্যাক নিউটনের দিকেই তাকান, তার সাথে আমাদের পরিচিত ভদ্রলোক তানভীর জালালের যথেষ্ট মিল আছে। দু-জনেই ফ্রি মেসন এবং দু-জনেই অ্যালকেমিস্ট। অ্যালকেমি আর কেমিস্ট্রির পার্থক্য কি বলেছিলাম মনে করে দেখুন।”

“অলৌকিক শক্তি—”

“এক্সট্রাক্ট। অলৌকিক শক্তির উপস্থিতি সেখানে থাকতেই হবে। এখন আমরা যা জানি, এই শক্তি দু-দিক থেকেই কেবল পাওয়া যায়—পজেটিভ শক্তি খোদাপ্রদত্ত—আর নেগেটিভটা আসে সরাসরি শয়তানের কাছ থেকে।”

উঠে দাঁড়াল আসিফ। “জাস্ট অ্যা মিনিট। আপনি এইমাত্র নিউটনকে ফ্রি মেসন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এর ভিত্তি কতটুকু?”

“মেম্বারশিপ আছে তার বেশ কিছু লজের সাথে। একটির নাম আপনাকে বলতে পারি—গ্র্যান্ড লজ অব ইংল্যান্ড।”

“মাই গড!” বিড় বিড় করে বলল আসিফ।

দু-হাতের তালু এক করে বসের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে জিয়া, তারপর নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল সে, “যথেষ্ট জ্ঞানী তার তবুও সমর্থন করছেন ফ্রি মেসনারিকে। সত্যি করে বললে, শয়তানের পূজায় কণ্ঠ ছিলেন। পরকালের ব্যাপারে তাদের কি পরিকল্পনা ছিলো সেটাই ভাবছি।”

“তাদের পরিকল্পনা তো কিছু ছিলোই। জ্ঞানের ক্ষেত্রে আপোষহীন মানুষ এরা। শয়তানের কাছে হাত পেতে হলেও জ্ঞান অর্জনে শটকাট বেছে নিয়েছিলেন। সব

ধর্মেই বিশ্বাস করা হয়, বেহেশত থেকে বিতাড়িত করার সময় শয়তানকে দু-হাত ভরে ক্ষমতা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিলো। আদম সন্তানদের বিপথগামি করার জন্যই দেওয়া হয়েছিলো এই ক্ষমতা। সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে শয়তানের সরাসরি চ্যালেঞ্জ-পারলে এদের বিপথগামি করে দেখাও! এজন্যেই সম্ভবত ফ্রি মেসনে নাস্তিকদের প্রবেশাধিকার নেই। নাস্তিক স্বীকার করে না সুপ্রিম বিইংয়ের অস্তিত্ব। কাজেই তারা স্বীকার করে না শয়তানের অস্তিত্ব। আর শয়তানের সাহায্য ছাড়া দ্রুত জ্ঞানের ক্ষেত্রে আগানো সম্ভব নয় বলেই এই সব জ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন। দ্রুত জ্ঞানের পথে এগিয়ে যেতে না পারলে পৃথিবী করায়ত্ত করা ফ্রি মেসনের পক্ষে সম্ভব হবে না।”

“আপনার কি মনে হয়, শয়তান তাদের আসলেই সাহায্য করে?”

জিয়ার প্রশ্ন শুনে কাঁধ ঝাঁকালেন ডক্টর। “হয়তো বা তাদের উদ্দীপনা বাড়ে। সাইকোলজিক্যালি তারা শক্তিশালি হয়ে ওঠে। তারা যেহেতু বিশ্বাস করে পেছনে শয়তানের সাহায্য পাচ্ছে, ব্যর্থতার চিন্তাটুকুও তাদের কল্পনায় আসে না। এমন বেপরোয়া আত্মবিশ্বাসি মানুষ সফলতা পাবেন এটাই তো স্বাভাবিক। হয়তো শয়তানের প্রভাবে না, ওই উদ্দীপনা থেকেই দ্রুত কাজ করতে পারেন তারা। সাইকোলজিক্যাল মোটিভেশন। অথবা, আক্ষরিক অর্থেই স্বয়ং শয়তান তাদের সাহায্য করে। আমি ঠিক বলতে পারবো না।”

“জিয়ার কথায় যুক্তি আছে। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তা আছেন। তারা জানে একদিন মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে। পরকালে স্বর্গ অথবা নরক তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। তারা বিশ্বাস এসবে করলে শয়তানে পূজা করবে কেন? শয়তান তো লুজিং সাইড। এটা সব ধর্মবিশ্বাসিই বিশ্বাস করেন। সৃষ্টিকর্তাই সর্বশক্তিমান। মৃত্যুর পরের জীবনে শয়তানের ক্ষমতা থাকবে না। তাহলে জ্ঞান-বিজ্ঞানে এগিয়ে থাকা এই মানুষগুলো কেন শয়তানের পূজায় নিজেদের নিয়োজিত রাখবেন? তাদের পরকাল নিয়ে কোন পরিকল্পনা ছিলো না এ আমি বিশ্বাস করি না। নরকে যাওয়ার ইচ্ছে তাদের থাকার কথা নয়।”

মুচকি হাসলেন ডক্টর। যেন মনের মতো একটা প্রশ্ন পেয়েছেন অনেকক্ষণ পর। “এটা সম্পর্কে জানতে হলে ইসলামি ফ্রি মেসন নিষেধাজ্ঞার দিকে চোখ ঝেঁলাতে হবে। ইসলাম কেন ফ্রি মেসনারিকে ঘৃণা করে তা কি আপনাদের জানা আছে?”

আন্দাজে ঢিল ছুঁড়লো আসিফ, “শয়তানে বিশ্বাসটাই তো যথেষ্ট হওয়ার কথা। আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ এখানে সরাসরি হচ্ছে।”

“তার থেকেও বড় ব্যাপার আছে। আচ্ছা, বলুন তো এই জ্ঞানী মানুষেরা কেন সব জেনেও শয়তানের পূজা করতে যাবে? শয়তানে বিশ্বাস থাকা মানে তাদের আল্লাহর প্রতিও বিশ্বাস আছে। আর সেক্ষেত্রে নিজেদের পায়ে কুড়াল কেন মারছে তারা? পরকালের শাস্তির ব্যাপারে কেন ভয় করছে না?”

“সেটাই আমার প্রশ্ন ছিলো,” আন্তে করে বলল আসিফ।

“দাজ্জালের ব্যাপারে তো জানেন?”

“অবশ্যই,” জিয়া বলল।

“আমাকে বলুন আগে। আপনাদের কতটুকু ধারণা আছে সে-ব্যাপারে শুনে নেই। তারপর আমি শূন্যস্থান পূরণ করবো।”

গলা খাঁকারি দিল জিয়া। “দাজ্জাল হলো একটা ফেশ্বনা। কেয়ামত যখন নিকটবর্তি হবে, হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর প্রফেসি অনুযায়ী কেয়ামতের আলামতগুলো যখন ফলতে শুরু করবে, তখনই সে আত্মপ্রকাশ করবে। দাজ্জাল একজন ব্যক্তি, যে নিজেকে শেষ নবী বলে দাবি করবে। অলৌকিক হাজারটা জিনিস সে করে দেখাবে, দু-টুকরো হয়ে যাওয়া মৃত মানুষকেও সে বাঁচিয়ে তুলতে পারবে। যাই হোক, কথা হলো তার মাঝে সবাই শান্তিপূর্ণ কিছুই দেখতে পাবে। শুধুমাত্র প্রকৃত জ্ঞানীরাই মানুষটার ভণ্ডামি ধরতে পারবে। দাজ্জাল নামের এই মানুষের ডান চোখ হবে অন্ধ। তার দলে যারা শাস্তির আশায় যোগ দেবে তারা ভুল পথে থাকার কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যারা দাজ্জালের আসল রূপ চিনতে পেরে তার বিরুদ্ধে চলে যাবে, তাদের জন্য সফলতার সুসংবাদ আছে। এই দাজ্জাল দূটো বড় বাহিনীর সাহায্য পাবে। প্রথমটি ইরান থেকে, শিয়াদের সংগঠিত এক বাহিনী, অন্য বাহিনীটি হবে ইহুদিদের ভেতর থেকে। বিশাল বাহিনী নিয়ে দাজ্জাল তার মতবাদ প্রচার করে বেড়াবে। খ্রিস্টানরা জিশু খ্রিস্ট বলে যাকে মেনে চলে-তার ব্যাপারে কিন্তু ইসলাম একই রকম ধারণা রাখে না। খ্রিস্টধর্ম অনুযায়ী কুমারি মেরির গর্ভে জিশুর খ্রিস্টের জন্ম আর তিনি মারা গেছেন ক্রুশবিদ্ধ হয়ে। নিজের জীবনকালের চল্লিশ বছর বয়সে।”

আসিফ কেড়ে নিল কথাটা। “খ্রিস্টধর্মের প্রথম বাইবেলে যারা বিশ্বাস করেন তারা এটা বলবেন। পরে মানব-পরিবর্তিত বাইবেল যখন এলো, তারা কিন্তু মেরিকে মানুষের সঙ্গে যৌন সংস্রব না থাকার কারণে কুমারি বলে স্বীকার করে। অথচ তাদের বিশ্বাস-গড হিমসেলফ ইজ দ্য ফাদার অব জেসাস! যার অর্থ গড এবং মেরির যৌনক্রিয়ার ফলে জন্মেছেন জিশু। হলি ট্রিনিটির ধারণা ওখানেই, ফাদার, সান অ্যান্ড দ্য হোলি স্পিরিট! ইসলাম এ ধরনের মতবাদকে অস্বীকার করে।”

ডক্টর খান মাথা নাড়লেন। “তা ঠিক আছে। তবে, কুমারির গর্ভে সন্তানের ব্যাপারটা কিন্তু আগের অনেক বিশ্বাসেরও অন্তর্গত। গ্রিক মিথোলজি বলে, কুমারি পাখি নিক্সের গর্ভে আসা ডিম থেকে প্রাণের সৃষ্টি। হিন্দুদের বিশ্বাস অনুযায়ী কৃষ্ণের জন্মও কিন্তু সেরকমভাবেই। মানে, এখানে ঠিক কুমারি নন কৃষ্ণের মা। দেবকির গর্ভে জন্ম নেওয়া সন্তান কৃষ্ণ অষ্টম সন্তান। তবে যদি যৌনসংস্রব ছাড়াই সন্তান উৎপাদনের দিক বিবেচনা করলে কৃষ্ণের জন্মও জিশু খ্রিস্টের বিশ্বাসের মতোই। মানে, নিউ টেস্টামেন্ট অনুযায়ী খ্রিস্টানদের বিশ্বাস যেমনটা। কৃষ্ণের জন্মের আগেই কংস জানেন দেবকির অষ্টম পুত্র হবে তার হস্তারক। এই পুত্রের যাতে জন্ম হয় সেজন্য দেবকি ও তার স্বামী বসুদেবকে কারারুদ্ধ করেন তিনি। দেবকির জীবিত ছয় পুত্রকে হত্যাও করেন। বসুদেব দূরে বন্দি থেকে স্ত্রী দেবকির সাথে শুধু মনোঃসংযোগ স্থাপন করে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে গর্ভবতি করলেন স্ত্রীকে। কোন পুরুষ সংস্রব ছাড়া যে সন্তান হতে পারে, সৃষ্টিকর্তা পুরুষ ও নারীর যৌন সম্পর্ক ছাড়াও প্রাণের সঞ্চার করতে পারে, সেটা মেনে

নিতে হিন্দু-ইজমের মতো এমনকি আজকের খ্রিস্টানরাও রাজি নয়। তারা স্বয়ং গডকে টেনে এনেছে এর ভেতর।”

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জিয়া। “তা ঠিক। ইসলামের বিশ্বাস অনুযায়ী খ্রিস্টানদের মাতা মেরি তথা বিবি মরিয়মের গর্ভে জিও তথা ঈসা এসেছিলেন কোন পুরুষসংস্রব ছাড়াই। আর সৃষ্টিকর্তা, অর্থাৎ আল্লাহ কামনা-বাসনা থেকে, সকল জৈবিক ক্রিয়াকর্ম থেকে মুক্ত ও পবিত্র। সূরা এখলাসে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে এ ব্যাপারে। তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। কাজেই বিবি মারিয়মের গর্ভে জন্ম নেওয়া ঈসা আল্লাহর কুদরতেরই খেলা বলে মুসলিমদের বিশ্বাস। দাজ্জালের প্রসঙ্গে ফিরে যাই আমি। নবুয়্যত প্রাপ্তির পর ঈসা যখন সর্বশেষ নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত, অর্থাৎ অনুসারীদের জন্য বিভিন্ন সুসংবাদ শোনে, তিনি বেশ আকৃষ্ট হন। শবে কদরের ফজিলত শুনে এই শেষ নবীর উম্মত হওয়ার ইচ্ছে জেগেছিলো তার। আল্লাহর কাছে তিনি প্রার্থনা জানান, যাতে মুহম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত হিসেবে তাকে পাঠানো হয়। নবী হিসেবে নয়, শুধুমাত্র একজন অনুসারি হিসেবে। মুসলিম ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী, উনার প্রার্থনা কবুল হয়েছিলো। যখন ঈসাকে হত্যা করতে হত্যাকারি ঘরে প্রবেশ করেছিলো তার বয়স তখন চল্লিশের মতো। আল্লাহর কুদরতে হত্যাকারির চেহারা অবিকল ঈসার মতো করে দেওয়া হয়, আর সরাসরি চতুর্থ আসমানে তুলে নেওয়া হয় আসল নবীকে। ঈসার বিরোধিপক্ষ ঘর থেকে তাদের দলের হত্যাকারিকে বের হয়ে আসতে দেখে মনে করে নবী স্বয়ং বের হয়ে এসেছেন। তাকে ধরে ফেলে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করে ওরা। খ্রিস্টানরা অবশ্য সেই হত্যাকারিকেই নবী বলে স্বীকার করে আসছে আজতক।”

আসিফ অন্ধকারের দিকে তাকালো। “দাজ্জালের সাথে তার সম্পর্কটা তো জানো?”

“ইসলামের বিশ্বাস, ঈসা নবীকে হযরত মুহম্মদের উম্মত হিসেবে প্রেরণ করা হবে দাজ্জালের আবির্ভাবের সময়। দামেস্ক নগরির পূর্বে অবতরণ করবেন তিনি। আজকের খ্রিস্টানরাও দাজ্জালের আবির্ভাব সম্পর্কে জানে। তারা তাকে ‘অ্যান্টিক্রাইস্ট’ বলে ডেকে থাকে। দাজ্জালের ব্যাপারে প্রত্যেক ধর্মপ্রচারকই তাদের অনুসারীদের সতর্ক করে দিয়ে গেছেন। দাজ্জালের ব্যাপারে যদি আর বলতে হয়, তো মহানবীর ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী, এই ঈসার হাতেই আজকের সিরিয়ার কাছে লুদ নামক স্থানে নিহত হবে দাজ্জাল-সর্বনিকৃষ্ট ভন্ড নবী বা ভন্ড মেসিয়াহ।”

“চমৎকার বলেছেন,” মাথা দুলিয়ে দু-জনের প্রশংসা করলেন ডক্টর, “প্রফেসি অনুযায়ী দাজ্জাল বের হয়ে আসবে যে-সময়ে, তখনকার পৃথিবীর লক্ষণ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা তো জানেন?”

“মানুষ ধর্মবিমুখ হয়ে পড়বে। গান-বাজনায় মত্ত থাকবে। মসজিদে বসে দুনিয়াদারির কথাবার্তায় লিপ্ত থাকবে। একে অপরের প্রতি সম্প্রীতিবোধ হারাবে। ঘন ঘন ভূমিকম্প দেখা যাবে। ক্লাইমেট চেঞ্জ হবে চোখে পড়ার মতো। রাষ্ট্র পরিচালনায় অযোগ্য লোককে নিযুক্ত করা হবে। ছেলেরা মেয়েদের বেশভূষা বেছে নেবে, মেয়েরা

ছেলেদের মতো পোশাক-আচরণকে আধুনিকতা মনে করবে। এরকম আরও অনেক লক্ষণ আছে। বর্তমান যুগের সাথে খুব মিলে যায় এগুলো,” হতাশ কণ্ঠে বলল জিয়া।

“ফ্রি মেসনের স্যাটানিস্ট অংশটুকু চায় সেসব লক্ষণকে দ্রুত পৃথিবীতে ফুটিয়ে তুলতে। তারা যতদ্রুত সম্ভব দাজ্জালকে পৃথিবীর বুকে দেখতে চায়,” ঠাণ্ডা গলায় বললেন রমিজ খান।

হিসেব অবশ্য মেলে না আসিসফের। “তারা শয়তানের পক্ষে দাজ্জালের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে কেন?”

“সঠিক প্রশ্ন করেছেন,” খুশি হলেন ডক্টর খান, “ওই যে, তাদের পরকালে বিশ্বাস আছে। আপনার এই প্রশ্নটাই উত্তর, কেন তারা পরকালের ভয় পায় না। তাদের বিশ্বাস, দাজ্জাল যেহেতু শয়তানের পক্ষে কাজ করছে এবং পৃথিবীতে শয়তানের একমাত্র দৃশ্যমান প্রতিনিধি সে, তার মাধ্যমে শয়তানকে ঈশ্বরের সাথে লড়াই করার মতো যথেষ্ট শক্তি প্রদান করতে হবে। তারা প্রফেসিটিকে ভুল প্রমাণ করতে চায় শুধু। অর্থাৎ, যে দাজ্জাল অসীম ক্ষমতা নিয়ে আসবে, তাকে জীবিত রাখতে তারা ব্যাকুল। তারা চায় দাজ্জালের সাথে যোগ দিতে এবং ঈসা নবীর সাথে সম্মুখ সমরে দাজ্জালকে জয় করতে। গোটা পৃথিবী নিয়ে তারা অ্যান্টিক্রাইস্টের পাশে থাকতে চায়। প্রফেসি বলছে দাজ্জাল মারা যাবে ঈসার হাতে। কিন্তু মেসনরা চায় উল্টোটা ঘটতে। যেহেতু আল্লাহ বলেছেন দাজ্জাল নিহত হবে, এটা ভুল হতে পারে না। মেসনদের উদ্দেশ্য এই উক্তিটিকে ভুল প্রমাণ করে দেওয়া। শয়তান তাহলে চ্যালেঞ্জে জিতে যাচ্ছে। শয়তান চ্যালেঞ্জে জিতে গেলে নরক বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না আর। পরকালে শাস্তির ভয়ও থাকবে না। এজন্যে এই মানুষগুলো শয়তানের কাছে নিজেদের উৎসর্গ করতে দ্বিধা করেনি।”

“তাহলে ফ্রি মেসনদের সুপ্রিম বিইং শয়তান?” ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করলো আসিফ।

“সবার জন্য না। তবে অনেকেই বেছে নিয়েছে তাকে,” জানালেন ডক্টর, “শয়তানের বর্তমান উপাসকরা—তা সে ফ্রি মেসন হোক অথবা না হোক—তাদের চিহ্ন পৃথিবীর চারপাশে ছড়িয়ে দিতে আগ্রহী। যাতে তাদের ‘মেসিয়াহ’ দাজ্জাল আসলে তা দেখে বুঝতে পারে তার প্রকৃত সমর্থক কারা ছিলো এবং তাদের পুরুষত্ব করার পাশাপাশি মনোবলে শক্তিশালি হয়ে উঠতে পারে। পরবর্তিতে ঈসা নবীকে যুদ্ধে পরাজিত করতে এই মনোবল কাজে লাগাতে পারবে সে। দাজ্জালের জন্য অপেক্ষা করতে থাকা এসব মানুষের চিহ্নের অভাব নেই। তবে সব জায়গাতে একটি জিনিস মোটামুটি কমন—একটি চোখ। একটি নিগুসজ চোখ তাকিয়ে আছে—এটা দাজ্জালের সার্বজনীন প্রতীক। তবে পরিপূর্ণতা দিতে পারে একটি মুকুটের দু-পাশে দুটো প্রাণির অর্ধনত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ভঙ্গি এবং মুকুটের ঠিক নিচে ‘মেসিয়াহ’ দাজ্জালের একটি চোখ—যে চোখটি আলো ছড়াচ্ছে দীপ্তির সাথে। ইলুমিনাতিদের ধারণার সাথেও সিঁদুলগুলো ম্যাচ করে। আপনাকে কি আমি ছবিটা স্পষ্ট করে দিতে পেরেছি?”

মাথা দোলাল আসিফ আর জিয়া। তাদের চোখের বিস্ময়ভাব দেখে আরেকটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন অনুভব করলেন ডক্টর খান। একদিনের জন্য যথেষ্ট জ্ঞানদান হয়ে



যাচ্ছে। তবে নিজেকে সামলাতে পারলেন না। কথাগুলো বলার জন্য কতদিন ধরে উত্সাহি শ্রোতা খুঁজেছেন তিনি!

“ফ্রি মেসনারির আমেরিকান লজগুলোর সিম্বলটাই এখন সবচেয়ে জনপ্রিয়। একটি পিরামিডের ওপর মেসিয়াহ দাজ্জালের চোখ। যেটা আপনি পাবেন প্রাক্তন আমেরিকান এক ডলারের ওপর। নেমে আসছে ওপরের পিরামিডের টুকরোটি—তাতে জ্বলজ্বল করতে থাকা একটি চোখ। দাঁড়ান, আপনাদেরকে ছবিটা দেখাই,” পকেট থেকে মার্টিফোন বের করলেন ডক্টর। কিছুক্ষণ পর সেটা বাঁড়িয়ে দিলেন আসিফের দিকে।

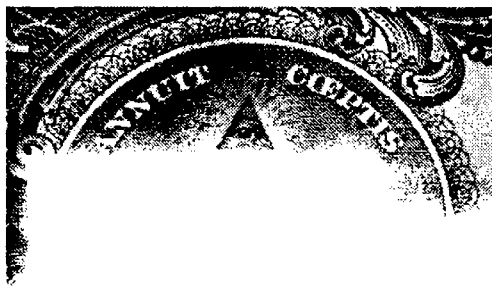
“আমেরিকান ডলারে ফ্রি মেসনদের এই প্রতীকটা আপনি দেখতে পাবেন। পানির মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা পিরামিডটা হলো তাদের মেসিয়াহ দাজ্জালের এখনকার অবস্থান। নেমে আসতে থাকা অংশটা লেগে গেলেই মুক্তি পাবে দাজ্জাল। দীপ্তিমান সত্তা।”

ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো আসিফ। শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকালো তারপর। ডক্টর খান দেখা যাচ্ছে একফোঁটাও বাড়িয়ে বলেননি।

সামনের জলাশয়টার ওপাড়ে প্রফেসর তানভীর জালালের ল্যাব দেখা যাচ্ছে। অল্পত রকমের পঞ্চদ্ব্যাকৃতির ল্যাবটিকে এখন দেখাচ্ছে একটা পিরামিডের মতোই। অন্যপাশে হারিয়ে গেছে একটি কোণ। ভেন্টিলেশনের জন্য পঞ্চাশ ফিট উঁচু ল্যাবের ঠিক বারো ফিট নীচে ছিলো শূন্যস্থান—সেই জায়গাটা প্রতীকটির পিরামিডের মাঝখানের খাঁড়িত অংশের প্রতিনিধিত্ব করছে।

আর যেটা আগে খেয়াল করেনি আসিফ—ওপরের চূড়োর অংশটা ঠিক মাঝখানে তৃতীয় তলার জানালাগুলো যেন এক চোখের প্রতিনিধিত্ব করছে। মাঝের জানালাটা যেন চোখের মণি। সরাসরি ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ল্যাবটাকে এখন রাতের অন্ধকারে অশুভ এক সত্তা বলে মনে হচ্ছে। যেন কোন এক দুর্ঘটনার জন্য অপেক্ষা করছে ওখানে। এত টাকা খরচ করে এমন একটি স্থাপনা নির্মাণের অর্থ কি?

ডক্টর রমিজ খান একটা কথাও ভুল বলেননি তাহলে। খুন হয়ে যাওয়া প্রফেসর তানভীর জালাল আসলেই একজন ফ্রি মেসন ছিলেন!



মোটাসোটা ফাইলটা নিয়ে চিলেকোঠায় চলে এলো ডিটেক্টিভ আসিফ আহমেদ। গাজীপুর থেকে রাতেই ফিরে এসেছে বাসায়। কিন্তু আলোচনার পর নতুন সম্ভাবনাটি খতিয়ে দেখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ডক্টর খানকে নিজ বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে ওরা। ফাইলটা হাতে পেয়েছে রাত চারটায়। তৃণা তার কথা রেখেছে, কিডন্যাপারের পরিচয় জোগাড় করার পর পরই বাড়ির ঠিকানায় ফাইল পাঠিয়ে দিয়েছে। অল্প সময়ে অনেক দিকে পা বাড়াতে হচ্ছে আসিফকে। মনোযোগ এক বিষয়ের ওপর ধরে রাখা কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

পুরো ব্যাপারটাই এখন পর্যন্ত ধোঁয়াশা। ডক্টর তানভীর জালাল, যিনি প্রফেসর জালাল নামেই বেশি পরিচিত এদেশে, নিজের ল্যাবে খুন হয়েছেন। একই দিনে অপহৃত হয়েছে তার একমাত্র ছেলে বিজয়। সেই সাথে উধাও হয়ে গেছে প্রফেসরের আঙটি। বাড়ির অধিবাসিদের সবাই কম-বেশি সন্দেহভাজন। প্রফেসরের একান্ত বিশ্বস্ত সহকারি এবং এক রকম উত্তরাধিকারি রিয়াজুল করিম। সম্পদের নয়, প্রফেসর জালালের প্রজ্ঞার। ডানা বাতশিভা একজন উচ্চমানের শেফ হয়েও প্রফেসরের বাড়িতে বছরের পর বছর পড়ে আছে। যে গল্পটি ফেঁদেছে তা আসিফের কাছে খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। নামটিও কেমন যেন অদ্ভুত। ইন্টারনেট ঘেঁটে দেখেছে ডানা অর্থ 'বিচারক' আর বাথশেভা ছিলেন সম্রাট ডেভিডের স্ত্রী। নামটা ইহুদি। মেয়েটার জার্মান বাবা কি ইহুদি ধর্মালম্বি ছিলেন? আবার প্রফেসর একজন শয়তানের উপাসক অথবা দাজ্জালপন্থি মানুষ হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছেন। এতগুলো টাকা খরচ করে ল্যাবের গঠনে মেসনিক সিম্বল রাখার মতো খামখেয়ালিপনা অথথা করেননি নিশ্চয়।

করণীয় দুটো কাজই দেখতে পাচ্ছে আসিফ। প্রথমত, রক্ষণশীল মুসলিম দেশ বাংলাদেশে সিক্রেট সোসাইটি ফ্রি মেসনারির কোন লজ খুঁজে বের করাটা কঠিন। এখানে তারা নিজেদের গোপন রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করবে। তবে এদের অ্যান্টি-সোসাইটি আছে কি-না তা খতিয়ে দেখা যেতে পারে। এ কাজে লাগিয়েছে তৃণাকে। একটু ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখুক। হতে পারে অ্যান্টি-সোসাইটির রোমান্স পড়েছিলেন ডক্টর তানভীর জালাল। ফ্রি মেসন-বিরোধি কোন সংঘ তাকে হত্যা করে থাকতে পারে। প্রফেসর অত্যন্ত মেধাবি ছিলেন, এধরণের মানুষগুলো সামান্য পাগলাটে হয়ে থাকে। তারর পাগলামি হয়তো শয়তানের উপাসনার দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়েছিলো তাকে।

দ্বিতীয় কাজটা এখন বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অপহৃত রিক্সাকে খুঁজে বের করতে হবে। আর সেটা করার চাবিকাঠি আছে হাতের এই ফাইলে। ক্যামেরায় ধরা পড়া যুবকটির পরিচয় সহজেই বের করা গেছে। কয়েক মাস আগে এক শপিংমলে তাণ্ডব চালিয়েছিলো এই লোক। সেখানকার কিছু ফুটেজ আছে।

ইরফান।

নামটার আগে বা পরে কিছু জানা যায়নি। সম্ভবত ছদ্মনাম, আসিফ ভাবলো। একটা সময় আন্ডারওয়ার্ল্ডে ছিলো। পরবর্তিতে ভিন্ন পেশায় চলে গেছে—কিডন্যাপিং। কিডন্যাপিংয়ে এই কুখ্যাত অপরাধির রেকর্ড সুবিধার নয়। কোনবারই একে সামান্যতম ট্রেস করা সম্ভব হয়নি। অতিমাত্রায় ধূর্ত ছিলো লোকটা। বেশিরভাগ সময় যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ইন্টারনেট ব্যবহার করতো। মোবাইলফোন ট্রেস করার চেয়ে ইন্টারনেট কল ট্রেস করা অনেক কঠিন আর সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে একের পর এক অপহরণ করে গেছে। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য ‘ফ্যান্টম ইরফান’ বলেও ডাকা হয় তাকে।

ইরফানের ফাইল এত মোটাসোটা হওয়াতে অবাক হলো না আসিফ। আত্মহের সাথে নিজের নাম ছড়িয়েছে এই অপরাধি। ডিটেইল রিপোর্ট পড়ে জানতে পারলো কিডন্যাপ-ভিক্টিমের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে প্রথমেই ‘ইরফান’ নামে নিজের পরিচয় দেয় সে।

আমি ইরফান বলছি।

চেয়ারে হেলান দিয়ে আসিফ ভাবছে। নিজের নাম ঢাক পিটিয়ে প্রচারের কারণটা কি? নিশ্চয় ক্লায়েন্ট জোগাড় করা? দক্ষভাবে কিডন্যাপ করতে পারে এমন মানুষের চাহিদা এ শহরে আছে। বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য, কোন কিছুতে রাজি করানোর বেলায় কিংবা শুধুই টাকার জন্য কিডন্যাপ করা হয়ে থাকে। কিন্তু চাইলেই কাঙ্ক্ষিত মানুষটিকে হুট করে উদ্ধাও করে দেয়া সম্ভব নয়। সেজন্য চাই একজন দক্ষ কিডন্যাপার। বিভিন্ন কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার ছেলেমেয়েদের লিস্ট আছে ফাইলে। এরা সবাই ইরফানের হাতে কিডন্যাপড হয়েছিলো। টাকার পাশাপাশি কিছু দাবি জুড়ে দিয়ে মুক্তিপণ চেয়েছিলো সে। অন্য কোন ক্লায়েন্টের স্বার্থ রক্ষা করছিলো সম্ভবত। এতে উভয়পক্ষকই লাভবান হয়। কিডন্যাপার ইরফান জানতে পারছে কাকে উদ্ধাও করে দিতে পারলে তার পকেট ভরার সম্ভাবনা আছে, আর এই তথ্য তাকে জানাচ্ছে ক্লায়েন্ট। আবার কিডন্যাপ করে আনা মানুষটাকে ব্যবহার করে ক্লায়েন্টও নিজের কার্জসিদ্ধি করছে।

ফাইলে ডুবে গেলো আসিফ। প্রতিটি কিডন্যাপের পুলিশ রিপোর্ট এখানে আছে। বিভিন্ন থানার আন্ডারে হয়েছে সেসব। জোগাড় করে এনেছে তপস্বী একটা জিনিস লক্ষ্য করলো সে, প্রতিটি কিডন্যাপ করা হয়েছে ঢাকার ভেতরে। যুক্তিও অবশ্য তাই বলে। একজন কিডন্যাপারের প্রে-গ্রাউন্ড হিসেবে বাংলাদেশে টাকার চেয়ে ভাল জায়গা আর কি হতে পারে? তবে যতই জানছে ততই অবাক হচ্ছে। কিডন্যাপিংকে ইরফান আর্টের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। পেশাদার খুনি অথবা চোরাচালানিই প্রধান সমস্যা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর জন্য। সেক্ষেত্রে পেশাদার অপহরণকারি একটু অভিনবই বটে। এমন শ্রেণি এদেশে একেবারেই নতুন। হয়তো একারণে পুলিশ এই অপরাধির ধারে কাছেও পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে।

কিডন্যাপিং কেসগুলো পার করে ফেলার পরও ফাইলের বড় একটা অংশ বাকি থেকে গেছে। শুরুতে লাল কালিতে বড় বড় করে লেখা হয়েছে :

পরবর্তি অংশে উল্লেখিত প্রতীতি তথ্যের  
ভেরিফিকেশন প্রয়োজন। তথ্যগুলোকে শুধুমাত্র  
অনুমানের ওপর ভিত্তি করে এই ফাইলে  
অন্বেষণ করা হয়েছে।

ফাইলের এ অংশের মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী প্রথমবারের মতো এই পেশাদার অপহরণকারির ব্যাপারে নির্রেট তথ্য পেয়েছে। শতভাগ নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই, তবে অনুমানের পেছনে শক্ত ভিত্তি আছে বলে জানিয়েছে আর্কাইভস ডিপার্টমেন্ট। ফাইলের শেষ অংশে যে তথ্যগুলো আছে তা আসলেই চমকপ্রদ। এর আগে পর্যন্ত ইরফানের নাম আর ভিক্টিমের বর্ণনা ছিলো। এখান থেকে ইরফান সম্পর্কিত ব্যক্তিগত তথ্য পাওয়া গেলো।

তিন বছর আগে পর্যন্ত ঢাকার একমাত্র মাফিয়া অর্গানাইজেশন ছিলো ‘রাবেক।’ ইরফানের সংবাবা সেই প্রতিষ্ঠানের প্রধান ছিলেন। সজ্জাটির নামকরণও হয়েছিলো তার নামের আদ্যক্ষর তিনটি নিয়ে। রাফসান বেগ কবীরের ছবি ফাইলে সংযুক্ত করা আছে। নির্ধূর প্রকৃতির একজন মানুষ এই রাফসান কবীর বেগ, ছবি দেখেও তেমন মনে হলো আসিফের। যতদূর জানা যায়, ইরফানের আপন মাকে হত্যা করেছিলো এই লোক। অর্গানাইজেশনের এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে চরমতম ভুল করেছিলেন মহিলা। ভাল ধরণের গ্যাড়াকলে পড়ে গেছিলো রাবেক। মাত্রই ‘সামান্য কোন ভুলের শাস্তিও মৃত্যুদণ্ড’ নীতিমালা নিয়েছে তখন সংগঠনটি। নিজের স্ত্রিকেও ‘নিয়মের’ উর্ধ্বে রাখেনি রাবেক। হত্যা করেছিলো নির্মমভাবে। এরপর দ্রুত গতিতে এগিয়ে যায় অর্গানাইজেশনটি।

ঢাকার প্রতিটি শপিং কমপ্লেক্স থেকে শুরু করে সিনেমা হল পর্যন্ত লাভের নির্দিষ্ট অংশ বখরা দিত রাবেককে। দিতে অস্বীকার করলে মৃত্যু ছিলো অবধারিত। ফাইলে রাবেকের বিরুদ্ধে অনেকগুলো কেস দেখা যাচ্ছে। বিশদ নেই তবে মতের সাথে উল্লেখ করেছে তৃণা। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো—পুলিশ কোনধরণের সন্দেহ নেয়নি। ঢাকার ব্যাপার এখানে আছে, আসিফ অনুমান করলো, আর আছে ভীতি। থানার মধ্যে পুলিশ হত্যার রিপোর্ট যোগ করেছে তৃণা। ভীতির জগৎ এখানেই সম্ভবত। থানার ভেতরে লাশ হয়ে যাওয়ার জন্য পুলিশের চাকরি নেয় না কেউ। স্বভাবতই রাবেকের বিরুদ্ধে ডায়েরি করে কাজ হয়নি। রাবেকের উৎপাত শেষের দিকে খুবই বেড়েছিলো। অতিষ্ঠ হয়ে সেনাবাহিনীর কথা বিবেচনা করা হচ্ছিলো, তখনই প্রেক্ষাপট পাল্টে যেতে শুরু করে।

ফাইলের শেষ প্রান্তে রাবেক সাম্রাজ্যের পতনের পরিষ্কার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

ইরফানের সংবান ঈশিতাকে অর্গানাইজেশনে ঢোকানোর ইচ্ছে ছিলো রাবেকের। ব্যাপারটা ইরফান মেনে নিতে পারেনি। এই ইস্যু নিয়ে কয়েকবার ছোটখাটো টক্কর লাগে ইরফান-রাবেকের। পরবর্তিতে রাবেকবাহিনী যুদ্ধঘোষণা করে ইরফানের বিরুদ্ধে। চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলো ইরফানও। এখানেই লোকটার ব্যাপারে চমকপ্রদ তথ্য জানতে পারলো আসিফ। ছেলেটা একাই ঠিকিয়ে দিয়েছিলো রাবেক বাহিনীকে!

জনশ্রুতি আছে, ইরফানের গুলিতে মৃত্যু হয় রাবেকের। এরপর থেকে সে চলে গেছে রাডারের নিচে। কেউ কেউ বলে ছেলেটা রাবেকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষের পর রাবেককে হত্যা করেছে ঠিকই তবে ওখান থেকে প্রাণ নিয়ে বের হয়ে আসতে পারেনি। রাবেকবাহিনীর কেউ তাকে নিকেশ করে দিয়েছে। আবার কেউ বলে, রাবেকের সাম্রাজ্য ধ্বংস করতে অনেক বেশি হিট নিতে হয়েছে তাকে। আলোচনায় উঠে এসেছিলো সে, তার জন্য এমনটা ক্ষতিকর। তাই পরবর্তিতে একজন ‘ফ্যান্টম’-এর মতোই দৃশ্যপট থেকে উধাও হয়ে নিজের নামের সার্থকতা রেখেছে।

রাবেকের সাম্রাজ্য চিরতরে ধ্বংস হওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগে একটি শপিং মলে প্রচণ্ড গানফাইট হয়। মিরপুর ১০-এর কাছে এমবিকে মলে। নিহতের সংখ্যা দশ। ইরফান রাবেক যুদ্ধ তখন পুরোদমে চলছে। কাজেই ধারণা করা হয় কাজটা ইরফানেরই ছিলো। শপিং কমপ্লেক্সের মেইনগেটে বসানো সিসিক্যাম ফুটেজে তাণ্ডনের পর ইরফানকে বের হতে দেখা গেছিলো। ঢোকানোর সময় তার সাথে একজন সহকারি ছিলো বলে অনুমান করা হয়। ধারণা করা হয়, নিহতদের মধ্যে সহকারিটির মৃত্যু ঘটেছিলো।

সিসিক্যামে ধরা পড়া ইরফানের একটি স্থিরচিত্র অ্যাটাচ করেছে তৃণা। পিস্তল হাতে বের হচ্ছে সে, চোখে সানগ্লাস। আসিফ অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো, ইরফান একা নয়, তার হাতে ধরা ছিলো অন্য একটি মেয়ের হাত। ঐ মেয়ের চোখেও সানগ্লাস। রাবেকের সঙ্গে মবওয়ার চলছিলো তার, এর মাঝে হয়তো শপিং কমপ্লেক্স থেকে মেয়েটিকে কিডন্যাপ করতে এসেছিলো। তারপর ফাঁদে পড়ে যায়। গানফাইটের সূত্রপাত এভাবে হতে পারে।

পরক্ষণেই সম্ভাবনাটা নাকচ করে দিল আসিফ। ইরফান কিডন্যাপের কাজে আর কারও সাহায্য নিয়েছে বলে শোনা যায়নি। সহকারি নিয়ে শপিংমলে প্রবেশের কারণটা কি হতে পারে?

বিশিক্ষণ ভাবতে হলো না তাকে। ধরে ফেলেছে। কিডন্যাপ নয়, মেয়েটিকে ওখান থেকে উদ্ধার করতে এসেছিলো ইরফান!

এর একটাই অর্থ দাঁড়াচ্ছে, ইরফানের জীবনে ঐ মেয়ের গুরুত্ব আছে। ইরফানকে আড়াল থেকে বের করার উপায় এখন ও জানে। জানে কিভাবে তার ‘ফ্যান্টম’ খেতাবকে মিথ্যে প্রমাণ করা সম্ভব।

সারাদিন টানা পরিশ্রম করার পর একটুকরো হাসি ফুটে উঠলো আসিফের মুখে। “মেয়েটার পরিচয় জানতে পারলেই তোমাকে পাওয়া যাবে...বাস্টার্ড!”

মাত্র দু-ঘণ্টা ঘুমিয়ে উঠে ডিপার্টমেন্টে চলে এসেছে ডিটেক্টিভ আসিফ আহমেদ। বুটের শব্দ তুলে লিফটের দিকে লম্বা পায়ে হেটে যাচ্ছে এখন। সাড়ে সাতটা বাজে কেবল, এত সকালে অফিস খালি থাকে সাধারণত। তৃণাকে চলে আসার জন্য একটা মেসেজ দিয়ে বের হয়েছে আসিফ। মেয়েটাকে কিছু কাজ বুঝিয়ে দিয়ে ছোট্টাছুটি করতে হবে ওকে।

ওপর তলায় লিফট পৌছানোর পর অফিসটাকে মোটেও মরা মরা দেখতে পায় না আসিফ। মনে হয় সবাই চলে এসেছে আজ। প্রচণ্ড ব্যস্ততা নিয়ে কাজ চলছে। কমিউনিকেশনস রুমের পাশ দিয়ে নিজের রুমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো সে, আচমকা দরজা খুলে গেলো। ওর এক হাত খামচে ধরে কেউ টেনে নিয়ে গেলো রুমের ভেতরে।

তৃণা।

“কি হয়েছে?” ভারি ক্লি চালেই জানতে চাইল আসিফ, মেয়েটা ইদানিং সুযোগ পেলেই এমন আচরণ করছে, আসিফের কাছে লক্ষণ সুবিধার মনে হচ্ছে না।

“ট্রাফিক ক্যামে আটকা পড়েছে ইরফান আর বিজয়। এটাই দ্বিতীয় ম্যাচ। টেকনিক্যালের কাছে,” ফিস ফিস করে জানালো তৃণা।

“সেটার ছবি আমার ডেস্কে পাঠিয়ে দাও, ভিডিও টেপটা জোগাড় করো। ওদের ট্রেনিং আমি নিজে ফলো করতে চাচ্ছি,” প্রফেশনাল ভঙ্গিটা ঠিক রেখে বলল আসিফ, তারপর এগিয়ে গেলো দরজার দিকে।

খপ্প করে ওর হাত ধরে ফেললো তৃণা, সুন্দর মুখটাতে জমে আছে রাজ্যের উৎকর্ষা। “কেসটা এখন আপনার হাতে নেই, স্যার। প্রিজ, ট্রাই টু আভারস্ট্যান্ড! টেক দিস অ্যান্ড ট্রাই সলভি দ্য কেস।”

জোর করে ওর হাতে একটা খাম গুঁজে দিল তৃণা। ওটার দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালো আসিফ, ওর লক্ষ্য কুঁচকে গেছে। মেয়েটার দিকে ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকালো, “কি বললে?”

উত্তেজনায় মৃদু হাঁপাচ্ছে মেয়েটি। “স্যার, আপনি আপনার রুম চলে যান, প্রিজ। খারাপ কিছু একটা ঘটছে। এসব আমার ভাল লাগছে না। আপনাকে আরেকজনের কেসের ডাটা হাতে এখানে দেখলে সমস্যা হতে পারে।”

“প্রফেসর তানভীর জালালের কেসটা আমার ছিলো। এখন সেটা কার?”

“ডিটেক্টিভ রেজাকে দেয়া হয়েছে।”

মুখ বেঁকে গেলো আসিফের। “হিটলার!”

“হিটলারকে দোষারোপ করবেন না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব জানতে পারবেন। চোখ-কান খোলা রাখুন। আপনাকে সরিয়ে দেয়াটা অদ্ভুত লাগলো আমার কাছে।

একটা কথা দিতে পারি, যেকোন ধরনের টেকনিক্যাল আপডেট আমার কাছ থেকে পাবেন। আমরা আপনাকেও চিনি, ডিটেক্টিভ রেজাকেও চিনি।”

মাথা দুলিয়ে বের হয়ে এলো আসিফ, এক হাতে ধরে রেখেছে খামটা। সরাসরি এগিয়ে যাচ্ছে কমিশনারের রুমের দিকে। কপালের রূপগুলো তীব্র ক্রোধে ফুটে উঠেছে, গলার কাছে টানটান হয়ে আছে চামড়া। লিফটের দরজা খুলে গেলো, ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে জিয়া। স্যারের রুদ্রমূর্তি দেখে ওখানেই থমকে রইলো সে। বের হবে কি-না বুঝতে পারলো না। ওকে নিয়েই আবার লেগে গেলো লিফটের দরজা।

তিন বছর ধরে হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টে আছে আসিফ, অথচ এই প্রথম নিজের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। কমিশনার শাহেদ জামানের রুমে ঢোকার সময় দরজায় যথেষ্ট শব্দ করলো, অনুমতি প্রার্থনার ধারে কাছেও গেলো না।

ভেতরের তিনটি মাথা শব্দের উত্থসের দিকে ঘুরে তাকালো। তিনজোড়া চোখেই প্রশ্নবোধক দৃষ্টি। দু-জন সাদা চামড়া এবং দু-জোড়া বাদামি চোখকে উপেক্ষা করে শাহেদ জামানের দিকে হুঙ্কার ছাড়লো ও।

“স্যার, আই ওয়ান্ট অ্যান এক্সপ্লেনেশন!”

“বিহেইভ ইওর-সেলফ, আসিফ।” এতটুকুই বললেন কমিশনার, আজ তার মুখে স্বাভাবিক হাসি নেই, অধীনস্থদের দেয়া নামটির সার্থকতা প্রমাণে যেন ব্যস্ত তিনি। সামনের দুই বিদেশির দিকে তাকালেন, “বেস্ট অব লাক, ফ্রেন্ডস।”

মনে মনে হিটলারের পিভি চটকালো আসিফ। বিদেশিদের তেলানো হচ্ছে!

আসিফ ঢোকার সময় তিনজনই দাঁড়িয়েছিলেন, সম্ভবত এফবিআই-র এজেন্টদ্বয়কে ব্রিফ দেয়া মাত্র শেষ হয়েছে। আসিফকে পাশ কাটিয়ে বের হয়ে যেতে থাকা এজেন্টদুটোর দিকে বিরক্তির চাহনি দিলে ওরাও পাল্টা দৃষ্টি হানে, তবে সেখানে বিদ্বেষ নয় বন্ধুত্বের ছাপ দেখতে পেলো সে।

“আসিফ, আমার লোকেরা প্রফেশনাল লাইফের ওপর ইমোশনকে প্রাধান্য দিলে আমি কিন্তু লজ্জায় পড়ে যাবো,” কমিশনার শাহেদের কথা শুনে কয়েক মুহূর্তের জন্য মাথা নীচু হয়ে গেলো আসিফের।

“স্যার, প্রফেসর তানভীর জালালের কেসটা আমাদের ছিলো। আমাদের জুরিসডিকশনের বাইরের কেস ছিলো এটা, মনে আছে আপনার মিস্টার স্পেশাল রিকমেন্ডেশন দিয়েছিলেন জেনারেল জাহিদ ফরমান, সেজন্যেই এটা আমার—”

“জেনারেল জাহিদ ফরমান এখন আমাদের আর কোন রিকমেন্ডেশন দিচ্ছেন না। শুধু এফবিআই-র অতিথিদের সাহায্য করতে বলা হয়েছে আমাদের।”

“আর সেটা করার ক্ষেত্রে আমার পূর্ণ আত্মবিশ্বাস আছে,” সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল আসিফ, “একজন ডিটেক্টিভের কেস মাঝপথে কেড়ে নেয়ার নিয়ম আছে বলে জানতাম না।”

কানে তুললেন না কমিশনার, নিজের কথা শেষ করলেন, “এফবিআই টিম লিডার এজেন্ট অ্যাডামস চেয়েছেন তার এদেশি অ্যাসিস্ট টিম হবে ডিটেক্টিভ রেজা।”

থমকে গেলো আসিফ। এফবিআই ডিটেক্টিভ রেজাকে চেয়েছে? তার রেকর্ডের অবস্থা খুব ভাল নয়। কেসে সাফল্য থেকে গুরু করে সব ধরনের ট্রেনিং রেজাল্টে আসিফের পেছনে পড়ে যাওয়ার কথা। এফবিআই কেন চাইবে তাকে? হোমিসাইডে আসার আগে রেজা অবশ্য দুটো কিডন্যাপ কেস নিয়ে কাজ করেছিলো—হয়তো এটা তাদের আকৃষ্ট করেছে। আসিফ এখন পর্যন্ত কোন কিডন্যাপ কেসে কাজ করার সুযোগ পায়নি।

“আমি চাই, কনফারেন্স রুমে এখনকার পরিস্থিতি সম্পর্কে ওদেরকে ব্রিফ করবে। প্রফেসর তানভীর জালালের কেস সম্পর্কে যা যা জেনেছো তা শুছিয়ে নাও। আমি ওদের বলেছি সকাল নয়টায় কনফারেন্স রুমে মিট করতে।”

একটু দ্বিধা করে মেনে নিল আসিফ, “ওকে, স্যার।”

এই মুহূর্তে আর কিছু করারও নেই অবশ্যই। এফবিআই-র টিম যদি নিজেরাই সঙ্গি নির্বাচন করে সেখানে কমিশনার শাহেদের কী করার থাকতে পারে। ওদিকে বাংলাদেশ সরকার হোমিসাইডকে যে কোন সহযোগিতা করতে বলেছে। সহযোগিতা যদি লিয়াঁজোতে আসিফের বদলে রেজাকে দেওয়ার মাধ্যমে করা সম্ভব হয়, তো সেটাই করতে হবে! ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করলো মস্তিষ্কের বাস্তবতা মেনে নিতে শেখা অংশটি।

“রেজার কেসটা তোমাকে হ্যান্ডওভার করছি, আসিফ। কনফারেন্স রুমে তোমাদের ব্রিফ করবে সে।”

“ঠিক আছে, স্যার।”

মাথা নীচু করে নিজের রুমে ফিরে এসে জিয়াকে দেখতে পেলো। ওর জন্যই অপেক্ষা করেছে ছেলেটা। ওকে দেখে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো সে।

“স্যার! আই ক্যান্ট বিলিভ—”

আসিফ হাত তুলে থামালো ওকে। “বাস্তবতা এখন এটাই। নয়টার দিকে কনফারেন্স রুমে গিয়ে নতুন কেসটা আমরা নেবো। সো-কলড ‘ভ্যাম্পায়ার মার্ডারার’ সময় খুব একটা খারাপ যাবে বলে মনে হয় না। ভুলে যাচ্ছো, ডিপার্টমেন্টের হটস্ট কেস এটা।” চোখ টিপলো ও।

অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকালো জিয়া। ছেলেটা বিশ্বাসই করতে পারছে না আসিফ অনায়াসে মেনে নিয়েছে পুরো ব্যাপারটা। পরক্ষণেই অপমান থেকে আসা রাগটা ভেদ করে স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা ফিরে পেলো সে। স্যার এখন মেনে নিয়েছেন, কিছু ব্যাপার তো আছেই।

জিয়াকে একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করলো আসিফ, “ঠিকভাবে বলতে গেলে, এফবিআই হ্যান্ড কিকড আস আউট।”

মাথা নীচু করে শুনলো জিয়া। তৃণার দেওয়া খামটা আসিফ খুলে ফেলেছে এর মাঝে। ভেতর থেকে একটা ছবি আর ছোট সাইজের পেনড্রাইভ। সম্ভবত পেনড্রাইভে ট্রাফিক ক্যামের ফুটেজ কপি করে দিয়েছে মেয়েটা।



“আমি মনে করি এখানে অনেক বড় কিছু আছে, তানভীর জালালের কেসে ব্যক্তিগতভাবে এগিয়ে যেতে চাই আমি। তবে আমার সাথে আসার জন্য তোমাকে কোন ধরনের চাপ দেবো না।”

মনে মনে হাসলো জিয়া। গতকাল সকালে যেমনটা ভেবেছিলো, কেসটা তার হাতে না থাকলেও গাজীপুর চলে যাবে আসিফ। বেগার খেটেও আনন্দ পাবে খুব! তাই হতে চলেছে এখন। ডিটেক্টিভ রেজাকে কেসটা হ্যান্ডওভার করে দেওয়ার পরও কেসটা নিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আসিফ।

মুখে শুধু বলল, “একজন ডিটেক্টিভের চলমান কেসে অন্য একজন ডিটেক্টিভের নাক গলানো তিন মাস বিনা বেতনে সাসপেন্ড হওয়ার মতো অপরাধ। তবে আপনার সাথে আমি আছি।”

“এই পর্যায়ে এসে তানভীর জালালের কেসে আমাদের কোন্ কোন্ দিকে ফোকাস করা উচিত বলে তোমার মনে হয়?” শিষ্যের মুখ থেকে শোনার আশায় বলল আসিফ। কম্পিউটারে পেনড্রাইভ সংযুক্ত করেছে।

“আমার মনে হয় বিজয়ের কিডন্যাপিং নিয়ে ভাবা উচিত আমাদের। কিডন্যাপারই খুনটা করেছে। অন্তত আমার সে-রকমই মনে হচ্ছে।”

“সম্ভাবনা ওটারই বেশি। তবে যুক্তিতে সেটা মেলে না। ইরফান ছেলেটাকে কিডন্যাপ করে ঢাকা পর্যন্ত চলে এসেছে। আমি এমন কোন কারণ দেখছি না যে খুনটাও ওকে করতে হবে। প্রফেসরের ডেডবডি বাসায় থাকলে ধরে নিতাম কিডন্যাপ করার সময় বাধা দেয়ার কারণে খুনটা করা হয়েছে। কিন্তু তা-ও হয়নি, প্রফেসর মারা গেছেন ল্যাভে। তাছাড়া, তাকে আক্রমণই করা হয়নি, বিম্বপ্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে। বিম্বপ্রয়োগের জন্য একজন কিডন্যাপারের যথেষ্ট সময় পাওয়ার কথা নয়।”

“তা-ও ঠিক। যাই হোক, কিডন্যাপার আর ছেলেটাকে দ্রুত খুঁজে বের করা আমাদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত, স্যার।”

মাথা দোলাল আসিফ। “ঠিক তাই মনে করি আমিও। তবে একটু ভিন্ন দিক থেকে আগাবো। ইরফানকে খুঁজতে হলে আমাদের কি করা উচিত বলে মনে করো?”

একটু ভেবে জিয়া বলল, “প্রফেসরের বাড়ি থেকে তাকে দেখা গেছে আশুলিয়ার এক হোটেলে। কাজেই এর পর ইরফান কোথায় ছিলো সেটার ট্রেস বের করতে হবে আমাদের।”

“ভালো, জিয়া। অনেক ডিটেক্টিভই এই ফুট-স্টেপ ট্রেসিং পদ্ধতি বের করবে। অনেক অপরাধিকেই এভাবে ধরা গেছে আগে। ভাল একটা পদ্ধতি। কিন্তু—”

আসিফের ‘কিন্তু’ শুনে তার দিকে তাকালো জিয়া।

“—ইরফানের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি খাটবে বলে মনে হয় না। আগেও ওর পেছনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নানা শাখার লোক লেগেছিলো। কোনবারই তার ধারেকাছেও পৌছানো যায়নি। কাজেই ভিন্ন কোনদিক থেকে আগাচ্ছি আমরা।”

জিয়া প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকলো। আসিফ অবশ্য তার কথাটা

খোলাসা করে বলল না, সামান্য আভাস দিল শুধু। “ইদুর মারার জন্য বিস্কুটের গুঁড়ার ওপর হাতুড়ি ধরে থাকার পদ্ধতিটা ভালো। তবে নিশ্চিতভাবে ইদুর মারা যাবে তার গর্তটা খুঁজে বের করতে পারলে। ইরফান প্রসঙ্গ আপাতত তুলে রাখলেও চলবে। আর কোনদিক দিয়ে এগুনো যায় প্রফেসরের কেস নিয়ে?”

“ডানা। প্রফেসরের ব্যাপারে মেয়েটা অনেক জানে। স্যাটানিস্ট আর যাই হোক, তার কিছু না কিছু জানার কথা। সে নিজেও জড়িত থাকতে পারে এসব কর্মকাণ্ডে।”

“ঠিক। গতকাল অনেক রাত ছিলো দেখে আর ঘাঁটাইনি। না-হলে ডানার আরেকটা ইন্টারভিউ নিতাম। তুমি কি রিয়াজুল করিমের ব্যাপারে কিছু ভেবেছ?”

“রিয়াজুল করিমের কোন লাভ হচ্ছে না প্রফেসরের মৃত্যুতে।”

“তাই? কি-কার্ড একমাত্র তার কাছেই ছিলো—” মোবাইলে মেসেজ আসতে খেমে গেলো আসিফ। তোফায়েলের মেসেজ দেখে অবাক হলো সে। ইংরেজি হরফে বাংলায় লিখেছে সে।

ইনসুলিন। অদ্ভুত সম্ভাবনা। এফুগি মর্গে চলে আসুন।

Insulin. Strange possibility. Come at once at mrt.

“জিয়া, মর্গে যেতে হবে একবার,” আর কোন ব্যাখ্যা না দিয়ে উঠে দাঁড়ায় আসিফ।

কম্পিউটারের মনিটর বন্ধ করে ঘর থেকে বের হয়ে গেলো ওরা। লাশ পাওয়ার পর একদিন হয়ে গেছে। মেডিকেল এক্সামিনার তোফায়েল ওদেরকে মরচুয়ারিতে আসতে বলছে কেন? পোস্ট মর্টেম নিশ্চয় শেষ। একটা রিপোর্ট পাঠিয়ে দিলেই হয়। তা-না করে কেন সশরীরে উপস্থিত হতে বলছে?

এ প্রশ্নের উত্তর ডিটেক্টিভ আসিফের জানা নেই।

BanglaBook.org

“ভিক্টিমের ডায়াবেটিস ছিলো না,” নাটকীয়ভাবে ঘোষণা করলো তোফায়েল।

আসিফ আর জিয়া একবার নিজেদের মাঝে দৃষ্টি বিনিময় করলো শুধু। কথাটার তাৎপর্য খুব একটা বুঝতে পেরেছে এমনটা নয়।

“আরেকটু ব্যাখ্যা করতে পারো কি?” জানতে চাইল আসিফ। “এখানে আমরা কেউ মেডিকেলের ছাত্র নই।”

মিটিমিটি হাসছে তোফায়েল। আর কিছু বলছে না দেখে বিরক্ত বোধ করছে আসিফ। এই লোকের মাথায় একটু সমস্যা আছে। মৃত্যুর যত জটিলতম কারণ বের করতে পারে ততই খুশি হয়ে ওঠে যেন!

“ইনসুলিন-অগ্ন্যাশয় এই হরমোনের ক্ষরণ করে। যাদের ডায়াবেটিস থাকে তাদের ইনসুলিন উৎপাদন ক্ষমতা থাকে না। অথবা একেবারে নগণ্য পরিমাণে নিঃসৃত হয় ওই হরমোন। তখন তাদের বাইরে থেকে ইনসুলিন দিতে হয়।”

“ডায়াবেটিস নতুন কোন সমস্যা নয় এদেশে। ভিক্টিমের কি হয়েছে সেটা জানাও।” অধৈর্য আসিফ জানতে চাইল। আশঙ্কা করছে যেকোন সময় হাজির হতে পারে ডিটেক্টিভ রেজা। তার কেসে আসিফ এখনও নাক ডুবিয়ে রেখেছে জানতে পারলে সতর্ক হয়ে যাবে সে, এই কেসে আর নাক গলাতে দেবে না তাকে।

“প্রথম চেকেই ডক্টরের টিস্যুগুলোতে ইনসুলিনের আধিক্য দেখতে পেয়েছিলাম আমি কিন্তু রিপোর্ট করিনি, আমার জানার দরকার ছিলো উনার সিস্টেমে ইনসুলিন দুর্ঘটনাবশত এসেছে নাকি গোলমাল কিছু আছে। যদি ডক্টরের ডায়াবেটিস থেকে থাকে তাহলে ধরে নিতে পারতাম ঘটনাটা ঘটেছে স্রেফ অধিক পরিমাণে ইনসুলিন নেওয়ার জন্যে। কিন্তু পরে জানতে পারলাম ডক্টরের ডায়াবেটিস ছিলো না।”

“কিভাবে জানলেন?” জিয়া জানতে চাইল।

“ডক্টরের ব্যক্তিগত চিকিৎসককে খুঁজে বের করেছি। ভদ্রলোক জানালেন ডক্টরের ডায়াবেটিসের সমস্যা ছিলো না। এটা একটা বিশ্বয় বলতে হবে। এই বয়সে সবাই কম বেশি ডায়াবেটিক হয়ে পড়েন। তবে ডায়াবেটিক না হওয়া সত্ত্বেও তার শরীরে ইনসুলিনের আধিক্যের মানে বুঝতে পারছেন তো?”

“ডক্টরকে খুন করা হয়েছে,” মাথা দোলাল আসিফ। “কিন্তু শরীরে ঢুকেছিলো এই ইনসুলিন, তা কি জানা গেছে?”

“ইনজেক্টেড। বামহাতে চিহ্ন পেয়েছি।”

“কেউ জোর করে ঢুকিয়েছে, নাকি অন্য কোন মেডিকেশন নেওয়ার ফাঁকে এটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে?”

মাথা নাড়লো তোফায়েল। “ভিক্টিমের পার্সোনাল ফিজিশিয়ান ডক্টর তারেকের

সাথে আমার কথা হয়েছে, উনি জানিয়েছেন ইনজেক্ট করে কোন মেডিকেশন নিতেন না ডক্টর।”

চুপ হয়ে গেলো ওরা। এটা রহস্যময়। ডক্টর যদি আগে ইনজেক্টেড কোন মেডিকেশন না নিয়ে থাকেন তাহলে হঠাৎ করে তার শরীরে ইনসুলিন প্রবেশ করাতে খুনির নিশ্চয় আর কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়েছে।

“জোর করে ঢুকিয়ে দেয়া হয়নি তো?” ইতস্তত করে বলেই ফেলল জিয়া।

“তা কি করে হয়?” আসিফ নিজেই প্রতিবাদ করলো, “যদি ডক্টরকে ইনসুলিন পুশ করার পর ছেড়ে দেওয়া হয় তিনি নিশ্চয় ল্যাভে গিয়ে ঢুকবেন না? দ্রুত যোগাযোগ করবেন কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। তোমাকে কেউ ইনসুলিন পুশ করে দিলে তুমি নিশ্চয় ঘরে ফিরে লেপের নিচে ঢুকে পড়বে না?”

চুপ হয়ে গেলো জিয়া। আসিফের কথায় যুক্তি আছে।

“অজ্ঞান করে তাকে ওটা দেওয়া হতে পারে...ক্রোরোফর্ম বা এ জাতীয় কিছু দিয়ে...” ধারণা করে বলল তোফায়েল।

“সম্ভব না। ডক্টরের লাশ যেখানে ছিলো সেটা একটা ল্যাভ। ওটার সিকিউরিটি কি পরিমাণে ছিলো সেটা তোমাদের জানা আছে।”

“এখানে রিয়াজুল করিমকে ছাড়া আর কাউকে অপরাধি ভাবতে পারছি না,” বলেই ফেলল জিয়া।

“না, সন্দেহ করার মতো আরেকজনকে অন্তত আমি দেখতে পাচ্ছি,” বিড় বিড় করে বলল আসিফ।

“জি, স্যার?” হতচকিত হয়ে গেলো জিয়া।

থমথমে মুখে ওর দিকে তাকাল আসিফ। “বলছিলাম, রিয়াজুল করিমের সাথে আরেকবার কথা বলতে হবে আমাদের। তিনি প্রথমবার আমাদের কাছে কিছু তথ্য গোপন করেছিলেন, কারণটা জানা দরকার।”

“ডেডবডি দেখার দরকার থাকলে দেখে নিন, স্যার। পরে ডিটেক্টিভ রেজার জন্য এর ধারেকাঁছেও ঘেষতে পারবেন বলে মনে হয় না। উনিও বেশিক্ষণ পাবেন না বলে মনে হয় না। দু-দিন হয়ে গেছে। লাশ মি. রিয়াজের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে।”

“তুমি জানতে কেসটা ডিটেক্টিভ রেজাকে হ্যান্ডওভার করা হয়েছে?” অবাক হলো আসিফ। “তাহলে আমাদের ডাকলে যে?”

“স্যার, কেসটা আমাদের তিনজনের ছিলো, ক্রাইম-সিনে আমরাই ছিলাম। ডিটেক্টিভ রেজা না। আমি ভেবেছিলাম আপনি দেখতে চাইবেন বিষয়টা।”

তোফায়েল এরকম একটা ব্যাখ্যা দিলেও আসিফ কারনটা বুঝতে পারলো আসিফ। অল্পবয়সি এই ডাক্তার ডিটেক্টিভ আসিফকে পছন্দ করে। সব সময় সহকর্মীদের সাথে বন্ধুসুলভ ব্যবহারের জন্য ডিপার্টমেন্টের সবাই ওকে শ্রদ্ধা করে। সিনিয়র অফিসারদের মাঝে যে-রকম ইগো দেখা যায় তা আসিফের নেই। কিন্তু ডিটেক্টিভ রেজার বেলায় সেটা বলার উপায় নেই।

“ধন্যবাদ, তোফায়েল,” ওর কাঁধে দু-বার টোকা দিয়ে বলল আসিফ।

মর্গ থেকে বের হয়ে এসেছে ওরা। মাথা চুলকালো জিয়া। “স্যার, প্রফেসরের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ব্যাটাকেও ডিপার্টমেন্টে ডাকা উচিত না? সবচেয়ে সুবিধেজনক অবস্থানে কিন্তু সে-ই আছে। ইনজেকশন ব্যবহার করে প্রফেসরের শরীরে ইনসুলিন চালান করাটা তার জন্য কঠিন কিছু ছিলো না।”

সম্ভাবনাটা নাকচ করে দিল আসিফ, “ওর মোটিভটা কি হতে পারে এখানে? আমি তো কিছু দেখছি না।”

“খোঁজ নিতে হবে। তৃণাকে বলে রাখবো না-হয় আমি। যদি ডক্টর তারেকের ব্যাপারে কোন সন্দেহ হয়, আমরা ওদিক দিয়ে এগিয়ে যাব।”

“হুম,” বলতে বলতে লিফটে ঢুকে পড়ল আসিফ।

ব্যক্তিগত চিকিৎসককে সন্দেহ করার কোন কারণ দেখতে পাচ্ছে না আসিফ। জিয়ার উত্তেজনা দেখে একটু শঙ্কিত হলো। ছেলেটার এখনও অনেক কিছু শেখার আছে।

একটা খুন হওয়ার পর যত সময় গড়ায়, ট্রেইলগুলো মুছে যেতে থাকে। খুনির কাছাকাছি পৌছানোর জন্য বড়জোর তিনদিন পায় একজন হোমিসাইড ডিটেক্টিভ। যদি সব ধরনের মানুষকে তারা জেরা করতে চায়, তাহলে অন্তত এক সপ্তাহ লেগে যাওয়া স্বাভাবিক। কাজেই, গুরুত্বপূর্ণ আর কম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলোকে আলাদাভাবে চেনার চোখ থাকা চাই। একই কথা ক্রাইম-সিনের বেলায়ও প্রযোজ্য। আনাড়ি ডিটেক্টিভকে দেখা যায় অদরকারি জায়গায় বেশি মনোযোগ দিচ্ছে আবার যেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা একনজর দেখে এড়িয়ে যাচ্ছে। কোনদিকে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন সেটা বোঝাও একজন ভাল গোয়েন্দার প্রথম কাজ।

নিজের রুমে ফিরে যাচ্ছে আসিফ। জিয়াকে হালকাভাবে প্রস্তুত থাকতে বলল। নয়টা বেজে গেছে প্রায়। আর একটু পর রেজার সাথে দুই বিদেশিকে ব্রিফ করতে হবে ওদের। যা বলার আসিফই বলবে। তবে সবকিছু বলার ইচ্ছে ওর নেই। কিছুটা পরিশ্রম করুক বাইরের মেহমানরা। শুধুমাত্র যা ফ্যাক্টস হিসেবে পেয়েছে ঠিক তা-ই জানাবে ওদের। ডক্টর রেজার বক্তব্যগুলো চেপে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে।

সকাল সকাল কেস সরিয়ে দেয়ার মতো অপমানজনক একটা ব্যাপার এমনিতেই মেজাজ খিঁচড়ে রেখেছে। সাধারণত কোন ডিটেক্টিভ একটি কেস সামলানতে না পারলে যোগ্যতর কাউকে সেটা হ্যান্ডওভার করা হয়। অথচ যোগ্যতার দিক থেকে ডিটেক্টিভ রেজার থেকে অনেক ওপরে আসিফের অবস্থান।

নিজের রুমে ফিরে আসতেই অবশ্য অভ্যন্তরীণ কেসলের ব্যাপারটা চলে গেলো আসিফের মাথা থেকে। মর্গে যাওয়ার আগে পেনড্রাইভটা নিজের ডেস্কটপের সাথে লাগিয়ে রেখেছিলো, ওর স্পষ্ট মনে আছে। তবে এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছে সিপিইউয়ের পোর্টে কিছু নেই।

পেনড্রাইভটা!

“ফজর আলী!”

চতুর্থবারের মতো ডেকেও পাভা না পেয়ে মেজাজ খিঁচড়ে যেতে থাকে কলিমুল্লাহ সাহেবের।

ছোট্ট চায়ের দোকানে উপচে পড়া খরিদারদের ভিড়ে একজন কাস্টমারের ডাক শুনতে না পাওয়ার জন্য কেউ ফজর আলীকে দোষ দেবে না। তাছাড়া দরিদ্র এই দোকানি ইশারাতে বুঝিয়েছে সে কলিমুল্লাহ সাহেবের জন্য চা বানাচ্ছে, সামান্য সময় তাকে দিলেই হবে। কলিমুল্লাহ সে ইশারা দেখেও না দেখার ভান করলেন।

দোকানে ছোট্ট ক্যাসেট প্রেয়ারের ভেতর মমতাজের গান বাজছে, তার সাথেই মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে কাজ করছে ফজর আলী। কলিমুল্লাহর মেজাজ আরও খারাপ হতে থাকে। ফজর আলীর মাঝে ভদ্রতা কিছু অবশিষ্ট আছে বলে ভেবেছিলেন। দেখা যাচ্ছে নিতান্তই ভুল ছিলো সে ধারণা।

রীতিমতো পাঁচওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে পড়া মুসল্লি কলিমুল্লাহকে দেখেও গানের ভলিউম তো কমায়ইনি বরং মাথা দোলাচ্ছে! তার ওপর চা দিতে করছে দেরি। দুটো কথা শোনানোর জন্য কলিমুল্লাহর মুখ নিশপিশ করতে থাকে।

নড়ে চড়ে বসে ফজর আলীর দিকে শ্যেনদৃষ্টি মেলে দিলেন তিনি। “গানের সাউন্ড কমাও মিয়া! কি নাফরমানি কাজ শুরু করলা! জবাব কি দিবা?”

থতমত খেয়ে ফজর আলী গান বন্ধ করে দেয়। রিকশাওয়ালা শ্রেণির কিছু মানুষের কাছে ‘মরার কোকিলের’ গান খুবই ভাল লাগেছিলো। তারা এবার বিরক্তির সাথে কলিমুল্লাহর দিকে তাকায়। তিনি এসব গায়ে মাখেন না। শয়তানের দৃষ্টি এমন কিছু আসবেই।

ফজর আলী কাপের তলা মুছে কলিমুল্লাহর দিকে চায়ের কাপ বাড়িয়ে দেয়। হাত বাড়িয়ে তিনি ওটা নিলেন বটে, তবে ফজরকে ছাড়লেন না, একে আরেকটু ডোজ দেওয়ার দরকার আছে। এলাকায় থেকে মুকব্বিলে সন্মান না করলে চলবে কি করে?

“নাম তো বাপ-মায়ে একেবারে ওয়াক্তের সাথে মেলাইয়া রাখছে—ফজরের নামাজ হইছে তো?”

আমতা আমতা করে ফজর আলী। “না, মানে...কালকা দোকান বন্দ করতেই ম্যালা দেরি হই গেছিলো, উঠতে তো পারি নাই ভোররাইতে।”

“নাস্তিকতা ছাড়া, মিয়া। বুঝলা? চায়ের দোকানে পরকালের পুলসিরাত পার করবে না তোমার। নামাজ-কালামের দিকে একটু খেয়াল রাইখো।”

ফজর আলী মাথা দোলায় হালকা। “জে!”

“গান-বাজনা দিলে মরিচা ফালায়। ভাল কথা কানে ঢোকে না তখন মাইনুষের।”

ভাবাচ্যাকা দৃষ্টিটা আরও গাঢ় হয় ফজর আলীর মুখে। “জে?”

“নামাজ পড়বা। তাইলে খারাপ চিন্তা থেকেও বাঁচবা। ভালো কামে মন বসবো।”

“খারাপ চিন্তা থেকে বাঁচা তো সবারই উচিত, চাচা। এক্ষেত্রে ঠিক কথা কইছেন আপনে।” চমৎকার চেহারার মোটামুটি গাধা-টাইপের ছেলেটা মাথা নেড়ে সায় দিল এবার। মফস্বলে এই ছেলে নির্বুদ্ধিতার জন্য প্রসিদ্ধতা পেয়েছে।

কলিমুল্লাহ সাহেব বেলালের ওপর সম্ভ্রষ্ট হন। “তুমি তো বাবা ভাল পোলা, বুঝবান পোলা। এইসব তুমি বুঝবা। ফজর আলীরে বুঝাইও।”

“বোঝাই তো চাচা কত কইরা। আসে না তো,” হতাশ হয়ে বলল বেলাল।

আসরের মধ্যমনি হয়ে হালকা চালে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন কলিমুল্লাহ, “মসজিদের ডাকে তোমারে, যাও না ক্যান, ফজর আলী?”

“বেলাল ভাইয়ে আমারে মসজিদে তো ডাকে নাই।”

অবাক হয়ে বেলালের দিকে তাকিয়ে থাকেন কলিমুল্লাহ সাহেব।

বিজ্ঞের মত হাসে বেলাল। “কলিম চাচা, পেছনের যুগে পইড়া থাইকেন না। আত্মগুপ্তি হইলো গিয়া উদ্দেশ্য। নামাজেই করেন আর অন্য কোন উপায়ে।”

“উপায়টা কি শুনি?” মেঘ জমা গলায় জানতে চান কলিমুল্লাহ।

“ওটোর গুরুদের কাছে দীক্ষা নেওয়া আরেকটা কামের জায়গা, চাচা। চলেন একদিন, নিজেই দেখবেন। ফিরবেন যখন, মনটা ফ্রেশ ফ্রেশ লাগবো।”

“নাস্তিক মুনাসফেক সব ওখানে-তার মাঝে তুমিও ঢুইকা পড়লা?” ফেটে পড়েন কলিমুল্লাহ তীব্র ক্রোধে। “সূর্য পূজা করে ওরা-ঈমানের ভয় নাই তোমার?”

বেলাল আবারও হাসে। “যাওয়ার আগে আমিও হেইডাই ভাবতাম, চাচা। পরে জানছি সূর্যকে ওরা পূজা করে না। জ্ঞানচর্চা করে তো, সূর্য হইল গিয়া জ্ঞানের প্রতীক। শুধুই ভাবে গুরুকম করে ওরা। পূজা করে না।”

‘ওটোর’ গুরুদের পক্ষে কথাগুলো বলেও কোন কাজ হলো না। তীব্র বিরক্তিতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চায়ের কাপটা খটাস করে ফজর আলীর সামনে নামিয়ে রাখলেন কলিমুল্লাহ সাহেব, “বিল রাখো, ফজর। আর বেলাল মিয়া, তোমার বাপেরে আমি কইতেছি আজ বিকেলে। পোলার ঈমানের দিকে খেয়াল নাই-কি জবাব দিবে সে?”

বেলালের মুখটা কাঁচুমাচু হয়ে যায়, ‘বাপকে তার বেশ ভয়।

আত্মপক্ষ সমর্থন করলো সাথে সাথেই। “সিরাজ মাস্টারের পোলায়ে দেখেন না-বুয়েট পাশ দিয়া আইছে, বড় ইঞ্জিনিয়ার মানুষ, এখানে নিয়মিত খাতায়ত করে। উনার মত জ্ঞানীলোক কি আর না জাইনাই যায়? কি যে কন আপনে, কলিম চাচা। ওটোর গুরুরা ভাল কথা কয়, কামের কথা কয়। মনে পাপ আসতে পারে না উনাগো কথা শুনলে। মনে কি যে শান্তি লাগে সেইটা আপনি না বলে বুঝতেন না।”

“নাস্তিক মানুষ তোমার ওই সিরাজ মাস্টারের পোলা। কাঠখোঁটা নাস্তিকদের সাথে গলা মিলাইও না বেলাল। হাশরের দিন পাশে তুলবো আল্লায়!”

“গাড়ি কইরা যে কত বড় বড় অফিসার ওটোতে আসে-সবাই ভুল? না জাইনা কথা কন কেন, চাচা? চলেন একদিন?”

“ন্যাংটা হয়ে পূজা করে যারা তাদের কাছে যাব আমি?” গর্জে ওঠেন কলিমুল্লাহ।

পেছন থেকে শান্ত কিন্তু ভরাট কণ্ঠটা শোনা যায় ঠিক তখনই। “নগ্নতার মাঝেই খারাপ জিনিস লুকিয়ে আছে—তাই ভাবলেন তো? আসলে তা নয়, কলিম চাচা। আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে পবিত্র করে। আমরাই সবকিছুকে অস্বীকার করেছি। নিজেদের স্বাভাবিকত্ব ছুঁড়ে ফেলে অকারণ বিধিনিষেধ গড়েছি। সেজন্য আজ আমাদের কাছে সেসব খারাপ হয়ে দেখা দিয়েছে। নিজেদের আড়ম্বরের জালেই হারিয়েছে আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি।”

যুবকের অর্ধেক কথাই বুঝতে পারেননি কলিমুল্লাহ, তবে মানুষটাকে চিনেছেন। কণ্ঠের মালিক এই মাত্র তিনি যাকে ‘নাস্তিক মানুষ’ বলেছেন, সেই সিরাজ সাহেবের ছেলে রিজভী। খুব সুন্দর করে হাসতে জানে ছেলেটা। ওর কথা শেষ হয়নি এখনও। “সংক্ষেপে বললে, ওটো নোংরামির বিরুদ্ধে। মুক্ত-স্বাধীন যে মনকে আমরা কলুষিত করেছি তাকে আবারও সঠিক পথে ফিরিয়ে আনাই ওটোর কাজ। যার যার ইচ্ছে সে এটা গ্রহণ করবে। যার ইচ্ছে নেই সে করবে না। আমরা কাউকে জোর করি না।”

রিজভী নরম গলায় কথাগুলো বললেও কলিমুল্লাহর মেজাজ শান্ত হয় না। মাটিতে থুতু ফেলে পেছনের দিকে রওনা হয়ে গেলেন তিনি। ‘নাস্তিক’ মানুষের সাথে একটা কথা বলতেও নারাজ।

বেলাল এসে দাঁড়ায় রিজভীর পাশে। “এই পুরান যুগের মানুষগুলারে নিয়াই ঝামেলা, রিজভী ভাই।”

ওর কাঁধে হাত রাখে রিজভী। আড়ষ্ট হয়ে যায় বেলাল। রিজভী শুধু তার কাছে না, এই এলাকার প্রতিটি যুবকের চোখে হিরো। সবাই দলে দলে গিয়ে ওটোতে ঘুরে আসে নি? এসেছে। তার একমাত্র কারণ এই রিজভী।

স্কুল-কলেজ ফাঁকি দিয়ে মেয়েরা পর্যন্ত ওটোতে যায়। এটার কারণও এই রিজভী। রিজভী ভাই যা করেন তাই ঠিক—এমন ধারণাটা আজকের একদিনের নয়। সেই রিজভী ভাই বেলালকে এত আন্তরিকতার সাথে কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়ালে বেলালের বুক গর্বে দু-হাত ফুলবে না?

“ওদের নিয়ে ভাবার দরকার নেই। আমরা কারও সমালোচনা করবো না। সবাই জ্ঞানের আলো পাক। সবাই সঠিক পথে চলুক। কিন্তু আমরা কাউকে জোরদস্তি করি?”

রিজভীর কথা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনে বেলাল। “না, ভাই।”

সমুদ্র হয় রিজভী। “শোনো বেলাল, ভাল খবর আছে। পনের ক্লাসের দিন ঠিক করা হয়ে গেছে। অনেক বড় বড় মানুষ আসবেন। তোমার দায়িত্ব হলো যারা আমাদের লজে নিয়মিত যাওয়া আসা করছে তাদের প্রত্যেককে খবরটা দেওয়া।”

আনন্দে বলমল করে ওঠে বেলালের মুখ। “পরের ক্লাস কবে?”

“শনিবার।”

মুখে হাসিটা ধরে রেখেই চায়ের দোকান থেকে বের হয়ে যায় বেলাল। রিজভী ভাই বিশ্বাস করে একটা দায়িত্ব দিয়েছেন। ভালোভাবে পালন করতে হবে না?



ডিটেক্টিভ রেজা যখন গায়ে জ্বালা ধরানো হাসিটি মুখে ঝুলিয়ে বলল, “বেস্ট অফ লাক!” জিয়া অন্য দিকে তাকিয়ে থাকলো।

এই লোকটি হোমিসাইডে যোগ দিয়েছে আসিফেরও এক বছর পরে। রেজা ডিবিতে ছিলো। হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টটা নতুন খোলা হয়েছে, সব ব্রাঞ্চের লোক নেওয়া হয়েছে এখানে। রেজা অনায়াসে নিজের জায়গা করে নিয়েছে এখানে। ডিবির ইতিহাস থেকে দ্রুত পদোন্নতির দেখা পেয়েছে। কিন্তু যে কারণে অল্প বয়সে এত পদোন্নতি তার, সেটা মোটেও বন্ধুভাবাপন্ন কিছু নয়।

প্রতিযোগিতা।

ডিটেক্টিভ রেজা সহকর্মীদের প্রতিদ্বন্দ্বি ছাড়া আর কিছু ভাবে না।

পৃথিবীজুড়ে আলোড়ন তোলা একজন বিজ্ঞানী খুন হয়ে গেছেন। আমেরিকা তো বটেই, ইংল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি উন্নত দেশগুলোও এ নিয়ে খোঁজ-খবর নিচ্ছে। ডক্টর তানভীর জালালের লেখা বেশ কিছু বই দেশগুলোর প্রথম দিকের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলো পাঠ্য। হারভার্ডের ছাত্র-শিক্ষক আজ থেকে কালো ব্যাজ পরেছে হাতে। প্রথম কয়েক ঘণ্টা চেপে রাখা গেলেও বিকের মধ্যে খবরটা মিডিয়ার কাছে চলে গেছিলো। বাংলাদেশের সবগুলো টিভি চ্যানেল ঝাঁপিয়ে পড়েছে প্রফেসরের জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরার জন্য। আলোচনা হচ্ছে, টক শো হচ্ছে। প্রফেসরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মীগণ আজকের পত্রিকায় কলাম লিখেছেন তাকে নিয়ে। ফেসবুক আর অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে বাংলাদেশিরা দুঃখপ্রকাশ করছেন। প্রেসক্লাবের সামনে আগামিকাল সকাল নয়টাতে একটা মানব বন্ধনের জন্য ইভেন্ট খোলা হয়েছে। আসিফ দেখেছে আজ সকালেই-প্রায় দুইলক্ষ গোইং ওতে। উদ্দেশ্য-অবিলম্বে বিজ্ঞানীর হত্যাকারিকে পাকড়াও করা হয় যেন।

এরকম একটি কেস নিয়ে কাজ করার সুযোগ পেয়েছে ডিটেক্টিভ রেজা। তার কাছে হত্যাকারিকে ধরে ফেলাটা বড় ব্যাপার নাকি এই গরম বিষয়ের ওপর কাজ করতে পারাটা-তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের কক্ষের দিকে এগিয়ে গেলো আসিফ, তার পেছনে জিয়া।

একটু আগে ওদের ভ্যাম্পায়ার কেস নিয়ে ব্রিফ দিয়েছে রেজা। ভিক্টিমদের বর্ণনা আর কিছু স্টেটমেন্ট নেওয়া ছাড়া কাজ খুব একটা আগাতে পারেনি সে।

“দুটো খুন। সিরিয়াল কিলার হতে পারে। প্রথম শিকার হরিমোহন কলেজের রসায়নের শিক্ষক আনোয়ার। দ্বিতীয় শিকার পনের বছরের এক কিশোরি, ক্রিশ্চিনা। স্কুলে পড়তো মেয়েটি। দু-জনের গলাতেই চোখা দাঁতের দাগ পাওয়া গেছে।” হালকা মন্তব্য করে আসিফ।

নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলো জিয়া, “কাউন্ট ড্রাকুলার ফ্যান?”

“হতে পারে। অভিনব পদ্ধতির খুনি আমার পছন্দ নয়। কিন্তু এরাই ধরা পড়ে সবচেয়ে সহজে,” আস্তে করে বলল আসিফ।

আসিফের কথায় সত্যতা আছে। বাইরের দেশগুলোতে অভিনব খুনিদের ধরার চেয়ে কঠিন কাজ আর নেই। তবে এদেশের কথা আলাদা। যত ভিন্ন পথ তারা ধরে তত সহজে এক্সপোজড হয়ে যায়। ভুল করার জন্য নয়, এদেশের জনসংখ্যা ঘনত্বের জন্য। অদ্ভুত বিষয়, মানুষ বিশদভাবে মনে রাখে। সেজন্য হোমিসাইড ডিটেক্টিভের জন্য কাজটা হয়ে যায় সহজ।

ডিসকাশন রুমে চলে আসল ওরা। কাজের সুবিধের জন্য এখানে কয়েকটি নকল কিউবিকল প্রস্তুত করা হয়েছে। হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট মানে শুধু একজন ডিটেক্টিভ বা একটি টিম নয়—বেশ কয়েকটি টিম একত্রে কাজ করে। তাদের জন্য আলাদা থাকার ব্যবস্থা করতে এই নকল পার্টিশন। যখন গোটা ডিপার্টমেন্ট কোন বিশেষ কেস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কার্ডবোর্ডের এই পার্টিশনগুলো সরিয়ে ফেলা হয়। এই মুহূর্তে ডিটেক্টিভ রেজার কিউবিকলে ওরা ঢুকেছে। আসিফ আর জিয়ার কিউবিকলে ঢুকবে রেজা, ওই কেসের তথ্যগুলো সেখানে আছে।

রেজার কিউবিকলের হোয়াইট বোর্ডগুলোতে থিওরি আর টেম্পোরারি মার্কার দিয়ে লেখে রাখা মতামতগুলো গোটা কেসটাকে মনে রাখতে আর পরের পদক্ষেপ বুঝতে সাহায্য করবে ওদের।

“প্রথম খুনটা হয়েছে এখানে,” ঢাকা শহরের ম্যাপ ঝোলানো আছে এক কোণে, সেখানে আঙুল রেখে বলল আসিফ, “গলায় ভ্যাম্পায়ারের কামড়ের দাগ নিয়ে ছাদ থেকে পড়ে গেছিলো একজন মানুষ। নিচে থাকা অল্লবয়সি প্রেমিকযুগল খুনিকে স্বচক্ষে দেখেছে। লোকটা বিশালদেহি।”

দ্বিতীয় খুনটা হয়েছে শহরের অন্যপ্রান্তে, সেদিকে তাকালো জিয়া। “আমাদের খুনি অযথা খুন করছে না। কোন কিছু তাকে মোটিভেট করছে। তা না-হলে শহরের দুই প্রান্তে দুটি খুন করার প্রয়োজন হত না।”

তার সাথে সম্পূর্ণ একমত আসিফ। চিত্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইলো বোর্ডের দিকে। “সাক্ষিদের সাথে কথা বলা দরকার। প্রথম লাশটা দেখতে হবে আসিফকে।”

সিএসইউ-এর তোলা ছবিতে লাশের অবস্থান দেখা যাচ্ছে গাড়ির ওপর। তাতে বোঝাই যাচ্ছে ওপর থেকে পড়ে যাওয়া মানুষটার মাথা একেবারে ঠোঁটে গেছিলো। আর এজন্যই সন্দেহ হচ্ছে আসিফের। মনে হচ্ছে কিছু একটা এখানে ঠিক নেই। তোফায়েলকে একটা মেসেজ দিয়ে জানালো, মর্গে আরেকবার আসছে ওরা।

“স্যার, কনফারেন্স রুমে আপনাকে চিত্তিত মনে হচ্ছিলো। কিছু হয়েছে কি?” জানতে চাইল জিয়া।

“তৃণা গোপনে যে পেনড্রাইভটা দিয়েছিলো তা উদ্ধাও হয়ে গেছে আমার অফিস থেকে। ভেতরের কারও কাজ বুঝতেই পারছ। যেটা ভাবছি, ডিটেক্টিভ রেজা কিভাবে বুঝে গেলো জিনিসটা আমার কাছে আছে?”

“তুণাকে আমি বিশ্বাস করি। কাজটা ও করেনি। হয়তো আপনাদের একসাথে কমিউনিকেশন রুম থেকে বের হতে দেখে ফেলেছিলো সে। সেজন্য কৌতুহলি হয়ে এই কাজটা করেছে।”

মাথা দোলাল আসিফ। “হতে পারে।”

“ফুটেজ দেখা তো তাহলে হলো না,” মন খারাপ করে বলল জিয়া।

“ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আমার ড্রপবক্স থেকে ডিলেশনের আগে পাসওয়ার্ড দেওয়া লাগে,” মুচকি হাসলো আসিফ।

কথাটা বুঝতে এক সেকেন্ড লাগলো জিয়ার, তারপর দুশ্চিন্তার মেঘ সরে গিয়ে হাসি ফুটে উঠলো তার মুখে।

আজকের যুগে পেনড্রাইভ বা কোন হার্ডড্রাইভ সরিয়ে একটি ফাইল লুকানো বা মুছে ফেলা সম্ভব নয়। হাজার হাজার অনলাইন সার্ভিস আছে যারা ফাইল নিজেদের অনলাইন ড্রাইভে সেভ করার জন্য সুবিধা দিতে প্রস্তুত। পোর্টেবল ড্রাইভ ঢোকানোর পর অটোমেটিক্যালি আপলোড করে দেবে পিসি। সেটা লগড-ইন কম্পিউটার থেকে ডিলেট করে দেওয়া যায়, তবে পাসওয়ার্ড না দিলে ডিলেট করা যাবে না—এমন সেটিং করে রেখেছিলো আসিফ। রেজার পক্ষে ওর পাসওয়ার্ড জানা সম্ভব নয়।

“কি বুঝলেন তাহলে ভিডিও থেকে?”

“দেখিনি এখনও—দেখবো। তবে যতদূর বুঝেছি মিরপুর দিয়ে ঢুকেছে ইরফান। কল্যাণপুরের দিকে না গিয়ে সোজা পাইকপাড়ার দিকে সরে এসেছে। মাঝে অনেক গলি আছে, আর কোন দিক দিয়ে বের হয়ে গেছে কি না সেটাই ভাবনার বিষয়।”

“তুণাকে বাকি ট্র্যাফিক ক্যামগুলোতে চোখ রাখতে বলা দরকার,” গম্ভীর হয়ে বলল জিয়া।

“চোখ সে রাখছে। ইরফানের সাথে বা বিজয়ের সাথে ম্যাচ খুঁজছে ও। খটকা লাগছে আমার কাছে, ক্যামেরা আছে এমন রাস্তা দিয়ে চলার তো কারণ দেখি না ওর। অনেক চিপা রাস্তা আছে যা দিয়ে মুভ করতে পারতো। আর ওসব দিয়ে বের হয়ে গেলে আমাদের টের পাওয়ার কথাও না। আমি ভাবছি...”

জিয়া উৎসুক হয়ে তাকিয়ে থাকে বসের দিকে।

“...ইরফান ইচ্ছে করে আমাদের হাতে তুলে দেয়নি তো এই ভিডিওটোপে তার ধারণকৃত ছবি? সে কখনও ভুল করে না। ক্যামেরা এড়িয়ে চলা হবে তার জন্য প্রথম কাজ। কোনদিনও তাকে কোন ক্যামেরায় আটকানো যায়নি। প্রাণ নিয়ে চাপে পড়াতে প্রথমবারের মতো আটকেছিলো এক শপিংমলে। অথচ সেই ইরফান এই ছোট্ট একটা কিডন্যাপ করতে গিয়ে যদি দু-বার ক্যামেরায় আটকানো হতো সেটা কেমন হয়ে যায় না? ঠিক মিলছে না ইরফানের সাথে।”

“আপনি বলতে চাইছেন, ইরফান কাজটা ইচ্ছে করে করেছে আমাদের ভুল তথ্য দিতে? আমাদের ইনফর্মার মিরপুরে ঘোরাঘুরি করে মরবে আর ও থাকবে মালিবাগে—এমন কিছু?”

কাঁধ ঝাঁকাল আসিফ। ও আসলে এখনও জানে না ক্যামেরায় এই দুর্বৃত্তের ছবি কেন ধরা পড়েছে। হতে পারে লোকটা চাপের মুখে আছে।

লিফট মাটির নিচে প্রথম তলায় চলে এসেছে। তৃণাকে একটা মেসেজ দিল আসিফ। আজকে মিরপুরে কোন অস্থিরতা ঘটেছে কি-না দেখুক। ওদিকে ইরফান যদি গিয়ে থাকে, কোনকিছু ঘটিয়ে আসতেই পারে। নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই কোন।

মর্গে তোফায়েলকে হাঁড়ির মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলো।

লিফটের বাইরে পা রেখে আসিফ বলল, “কলেজ শিক্ষকের লাশটা দেখাও।”

“ওটা নেই। ফ্যামিলিকে ফিরিয়ে দিতে বলেছিলো ডিটেক্টিভ রেজা। গতকালই দিয়ে দিয়েছি। কবরও হয়ে গেছে মনে হয় এতক্ষণে।”

“মেসেজে জানিয়ে দিলেই পারতে,” বিড় বিড় করে বলল আসিফ।

“ভ্যাম্প ভিক্টিমের অন্য লাশটা তো আছে। ভাবলাম, দেখে যান আপনি। মজার ব্যাপার হলো, রক্ত এদের খাওয়া হয়েছে ঠিক, কিন্তু হত্যা প্রক্রিয়া ওটা নয়।”

মাথা দোলালো আসিফ। “সেটাই স্বাভাবিক। একজন ভ্যাম্পায়ার যদি একেকটা মানুষ থেকে চার লিটার করে রক্ত পান করে তাকে খুন করতে চায় তাহলে তাকে ঘন ঘন বাথরুমে যেতে হবে।”

“কেসটা সহজ। সমাধান করতে আপনাদের বেশিদিন লাগবে বলে মনে হয় না। খুনির স্যালিভা আর ডিএনএ স্যাম্পল পাওয়া গেছে কামড়ের দাগের সাথে।” আত্মবিশ্বাসি মনে হলো তোফায়েলকে।

“রক্তপান যদি কারণ না হয়ে থাকে, হত্যা প্রক্রিয়া কি ছিলো তাহলে?”

“মেয়েটাকে খুন করা হয়েছে ছুরি দিয়ে জবাই করে। ক্লাস নাইনে পড়লেও ভার্জিনিটি বলে কিছু দেখলাম না।” চোখ টিপ দিল তোফায়েল, টেবিলে রাখা ক্রিশ্চিনার লাশের ওপর থেকে কাপড় সরিয়ে দিল সে।

নিষ্পাপ একটা চেহারা। মৃত্যুর পর সৌন্দর্য যেন আরও কয়েকগুণ বেড়ে গেছে মেয়েটির। ওই মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেই জানতে চাইল আসিফ, “আর প্রথম ভিক্টিমের কজ অব ডেথ? যে লাশটি ডিটেক্টিভ রেজার কথামতো ফিরিয়ে দিয়েছ পরিবারের কাছে?”

হাসিটা মুছে গেলো তোফায়েলের মুখ থেকে। “ওটা ছিলো একটা বুলেট উন্ড।”

স্থির দৃষ্টিতে আসিফ তাকিয়ে রইলো তার দিকে।

“গুলি করে মাথার ওপরের দিকটা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো মানুষটার। নাইন মিলিমিটার পিস্তল দিয়ে গুলি করা হয়েছে।”

ওটোর একমাত্র বাংলাদেশি লজটি মির্জাপুরের খানবাড়িতে।

নিজের ডেস্কের পেছনে বসে একমনে পরবর্তি ক্লাস আর লেকচারগুলোর শিডিউল ঠিক করছেন কেনেথ গ্র্যান্ট। মানুষটাকে এই মুহূর্তে দেখলে শান্ত একটি মূর্তি বলে মনে হতে পারে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে দুশ্চিন্তায় ছেঁয়ে আছে তাকে।

বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে কাজ শুরু করার এক বছর পূর্তির পর প্রথমবারের মতো পরিকল্পনার বাইরে গেছে কোনকিছু। কোন নতুন দেশে ওটোর পত্তন ঘটানোর জন্য প্রথমেই দরকার হয় স্থানীয়দের মন জয় করা। এখানেও পরিকল্পনা সেটাই ছিলো। সাবধানে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো পুরো পরিকল্পনাটা। নতুন ধর্ম অথবা নতুন বিশ্বাস—যেকোনটির প্রচারের জন্যই এটা দরকার।

কাজ খারাপ এগিয়েছে তাদের এমনটা নয়। প্রথম বছরটা কোন ধরনের ঝামেলা ছাড়াই পার হয়ে গেছে। স্থানীয়দের মধ্যে অল্প সাড়া পাওয়া গেছে। বেশিরভাগই বয়সে তরুণ। মূলত এদের থেকেই সাড়া পাওয়ার আশা করা হয়। নতুন কিছুকে যাচাই করে তাকে গ্রহণ করার মতো ক্ষমতা তরুণদেরই থাকে। কিন্তু গ্রহণের পর প্রচারের ক্ষেত্রে এদের উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। এধরনের স্পর্শকাতর দেশের জন্য যেটা ওটোর জন্য শুধু ক্ষতির কারণই নয়—ধ্বংসের কারণও হয়ে দাঁড়াতে পারে।

দেয়ালে ঝুলতে থাকা বড় ঘড়িটার দিকে তাকালেন কেনেথ। সময়ানুবর্তিতা প্রথম দিককার একটি গুণ যেটা ওটোর সদস্যদের শেখানো হয়ে থাকে। এর ব্যত্যয় সহ্য করার মতো নয়। অথচ সাড়ে দশটা বেজে দুই মিনিট হয়ে যাচ্ছে।

আর কিছু ভাবার সময় তিনি পেলেন না। ঘড়ি ঘড়ি শব্দ করে বড় দরজাটা খুলে গেলো। সুবিন্যস্ত চুলের সুদর্শন এক যুবক ভেতরে ঢুকলেও মুখ তুললেন না তিনি। একমনে নতুন ক্লাস শিডিউল পরিক্ষা করছেন। মিনিটখানেক পর যখন সম্ভ্রষ্ট হলেন আস্তে করে টেবিলের নীচে থাকা বেল বাজিয়ে ওয়ার্ডেনের কাছে সঙ্কেত পাঠালেন। পেছনের দরজা খুলে বের হয়ে এলো ওয়ার্ডেন। একটা কথাও না বলে কানজিটা নিয়ে বের হয়ে গেলো সে। জানে এটার প্রিন্ট আর ডিস্ট্রিবিউশনের দায়িত্ব এখন তার।

ধৈর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রিজভী। এই দেড়মিনিটে একটা কথাও বলেনি সে।

“এলাকায় আমাদের নিয়ে নেগেটিভ কথা হচ্ছে কেন?” প্রত্যক্ষণে মুখ খুললেন কেনেথ। প্রথমেই চলে এলেন মূল বিষয়ে।

রিজভী জানে কেনেথ গ্র্যান্ট কখনও লজ থেকে বের হন না। বিভিন্ন আদেশ নিতে এই ঘরে আসতে হয় রিজভীকে। বাইরের খবর ইনি কিভাবে জানেন তা তার জানা নেই। লজের বাইরের কেউ হয়তো জানিয়েছে তাকে। “অতি উৎসাহি তরুণদের জন্য এটা হচ্ছে, গ্র্যান্ট। তারা বলাবলি করে বেড়াচ্ছে লজের ব্যাপারে।”

জুঁকুঁচকে গেলো কেনেথের। “শপথ কি নেয়নি তারা?”

শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো রিজভী। “তা নিয়েছে। কিন্তু রাখার ব্যাপারে তেমন সচেতন তো দেখছি না।”

“দু-চারজনকে আইডেনটিফাই করে ফেলো। তারপর মনে রাখার আর শপথ রাখার ব্যাপারে তাদের যেন আর কোন ভুল না হয় সেটা দেখবে।”

“ম্যান অ্যান্ড ব্রাদার ডিগ্রির নিম্নবুদ্ধিসম্পন্ন একজন আছে আমাদের। ঝামেলাটা মূলত ওকে নিয়েই,” ইতস্তত করে বলেই ফেলল রিজভী।

“দৃষ্টান্ত রাখো। আর কেউ যাতে অর্ডারের ক্ষতি না করে সামনে।”

রিজভীর মুখ শক্ত হয়ে গেলো।

আর কিছু বলল না কেনেথ। ব্যস্ত হয়ে পড়ল আবার। সামনে রাখা কম্পিউটারের ওপর ঝুঁকে টাইপ করা শুরু করেছেন তিনি। তার ধারণা, ইন্ডিয়ান মতো সহজ হবে না কাজটা। এখানকার বাৎসরিক রিপোর্ট তাকে ফিলাডেলফিয়ার গ্র্যান্ড লজে পৌঁছে দিতে হবে। কতটুকু বলবেন সেটাই এখন বুঝতে পারছেন না। ইদানিংকালের ব্যর্থতার কথা কি বলা উচিত হবে? নাকি এটা সামাল দেওয়া যাবে?

বাংলাদেশে প্রথম লজ ব্যর্থ হলে পরেরগুলোর কোন সম্ভাবনাই থাকছে না। একবার মিডিয়াতে গেলে তো কথাই নেই। প্রাণ নিয়ে এদেশ ছেড়ে যেতে হবে তখন। রিজভীর ওপর ভরসা রাখা যায়—ভাবলেন তিনি। আপাতত ফিলাডেলফিয়াতে একটা পজিটিভ রিপোর্ট দিলে কেউ মনোক্ষুন্ন হবে বলে মনে হয় না।

রিজভী এখনও দাঁড়িয়ে আছে লক্ষ্য করে হাত নাড়ার ভঙ্গি করলেন কেনেথ। আন্তে করে ঘুরে দাঁড়াল ছেলেটা। ওয়ার্ডেনের সাথে একবার দেখা করা দরকার। ম্যান অ্যান্ড ব্রাদার ডিগ্রিতে কাউকে প্রমোট করার আগে আরও সতর্ক হতে হবে। অন্তত শপথ রক্ষার ব্যাপারটা নিশ্চিত হতে হবে ওদের। আগেই সাবধান করেছিলো ও গ্র্যান্ডকে, এদেশের মানুষের ধাতে ওসব নেই। এরা কথা দিয়ে কথা ভাঙতে পটু। তখন তার কথা কেউ গুরুত্ব দেয়নি।

বেলালের শিশুসুলভ মুখটা ভেসে উঠল রিজভীর চোখে। দৃষ্টান্ত রাখতে হবে—আরএসএসের আদেশ।

গৌরব রায় লোকটাকে শতভাগ প্রভাবিত করা যায়নি। ছোঁক ছোঁক করতে পারে সে। এই লোকের সন্দেহ যাতে ওটোর দিকে না আসে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই যা করার করতে হবে। ওটোর বাইরে কাদের সমর্থন ওরা পেয়েছে আর কাদের সমর্থন পেতে ব্যর্থ হয়েছে, তার সবটুকু রিজভী জানে না। গৌরব রায়ের ব্যাপারে তার ব্যক্তিগত ধারণা ঠিক না-ও হতে পারে। কিন্তু কোন ধরনের ঝুঁকি সে নেবে না। এই কাজটা সামলানো কঠিন হবে না হয়তো। কাজটা করার উপযুক্ত একজনকে সে চেনে। হত্যার ক্ষেত্রে তার চেয়ে দক্ষ এদেশে আর কেউ আছে বলে জানা নেই ওর।

মোবাইলটা আনমনে বের করলো প্রকৌশলী রিজভী।

দেওয়ালগুলো সাদা। সিলিংও। এমনকি সিলিংয়ে ঝুলতে থাকা একমাত্র ফ্যানটাও ধবধবে সাদা।

যেকোন হাসপাতালে ঢুকলে প্রতিবারই এই সাদা রঙ আসিফের কাছে মৃত্যুর প্রতীক বলে মনে হয়। মৌলিক মানসিক গঠনের দিক থেকে প্রায় সব মানুষই একই রকমের হয়ে থাকে। কিছু অনুভূতি সবার জন্য এক। তার মাঝে সাদার সঙ্গে মৃত্যুর যোগসূত্র পাওয়া একটা হলে বেশ সমস্যা হওয়ার কথা। রোগীদের দরকার জীবনের প্রেরণা। মৃত্যুর রঙে তাদের নিমজ্জিত রাখা হলে কি সুবিধাটা তারা পাবে!

সাদা বিছানার মাঝে ছেলেটা যেন মিশে গেছে একেবারে। চোখ দুটো অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেওয়াল থেকে ছাদে। আসিফ আর জিয়াকে নিঃশব্দে ঢুকতে বলে দিয়েছিলেন কর্তব্যরত ডাক্তার। সেভাবেই ঢুকেছে ওরা, তবুও চমকে উঠলো রোগি।

বন্ধুসুলভ হাসি দিল আসিফ, কিন্তু অবস্থার কোনরকম উন্নতি হলো না।

“হ্যালো, মাজহার,” হাসিটি ধরে রেখেই বলল সে, “আমি ডিটেক্টিভ আসিফ আহমেদ। আর ও আমার সহকারি জিয়া। তোমার বান্ধবির ঘটনার তদন্ত আমরাই করছি। এখন কেমন আছো?”

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলো ছেলেটা।

“কয়েকটা প্রশ্ন ছিলো আমাদের,” অগত্যা বলল জিয়া।

মাজহার আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এখনও, মুখে কোন কথা নেই।

এরকমটাই আশা করেছিলো আসিফ। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে একজন কলেজ ছাত্রের কাছ থেকে এর চেয়ে ভাল কিছু আশা করা যায় না।

“ডিটেক্টিভ!” ফ্যাস ফ্যাস কর্তৃক ছেলেটার। “ক্রিচিনা!” বিড়বিড় করে বলল সে।

কিছু বলল না আসিফ। ছেলেটা সম্ভবত এখন স্বাভাবিক নেই। অন্ধকারে তার গলা কামড়ে ধরেছিলো খুনি, তারপর তাকে অকেজো করে দিয়ে তারই চোখের সামনে প্রেমিকাকে জবাই করেছে। জবাই করার আগে গলা কামড়ে মোক্কাটির ও রক্ত খেয়েছে সে। কতটা বিকৃত রুচির হলে একজন মানুষ এমনটা করতে পারে—আসিফ ভেবে পায় না। এই খুনিকে ধরার জন্য ভেতর থেকে তাগাদা অনুভব করেছে। এমন বন্ধ পাগলকে মুক্তভাবে ঘুরতে দেওয়া যায় না।

“খুন...ক্রিচিনা খুন হয়েছে...আগে কেউ বলেনি কেন আমাদের?” থেমে থেমে উচ্চারণ করলো মাজহার।

“আমি সরি, মাজহার,” জিয়া পেছন থেকে বিষন্ন গলায় বলল, “তবে খুনটা যে করেছে তাকে আমরা খুঁজে বের করবোই। তবে আমাদের কিছু তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে হবে তোমাকে।”

ধীরে ধীরে তার দিকে ঘুরে তাকালো মাজহার। “অন্ধকার রাস্তায় অন্ধুত একজন মানুষ যদি আপনার গলা কামড়ে ধরে রক্ত খেতে শুরু করতো, আপনি কি তখন তথ্য সংগ্রহ করার মতো অবস্থায় থাকতে পারতেন?”

“আসলে,” ছেলেটা জিয়াকে ভুল বুঝেছে দেখে এগিয়ে এলো আসিফ, “ও বলতে চেয়েছে, খুনির ব্যাপারে যেকোন তথ্য দিতে পারলে আমাদের উপকার হত।”

“লম্বায় ছ-ফিটের উপরে হবে হারামজাদা!” ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল মাজহার, “বয়রা ঠিকমতো লাগাতে পারি নাই এজন্যেই।”

“বয়রা?” বিড় বিড় করে বলল জিয়া।

“তার মানে তুমি ওকে আঘাত করেছিলে?” আসিফ জানতে চাইল।

কিছু বলল না মাজহার। এমনভাবে তাকালো যেন বোকার মতো প্রশ্ন করেছে।

“চেহারা কেমন ছিলো, বলতে পারবে?”

উদাস দৃষ্টিতে ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে মাজহার। “ফ্যাকাসে সাদা চামড়া। দাঁতগুলো চোখা, অনেকটা কুকুরের মতো। চোখে জাদু আছে। আটকে গেলে নড়া যায় না।”

একে অন্যের দিকে তাকালো আসিফ আর জিয়া। ছেলেটা কি ভ্যাম্পায়ারের গল্প-কাহিনী থেকে বর্ণনা দিচ্ছে নাকি? মাজহার সত্য বলে থাকলে অবশ্য একটা ব্যাখ্যাই আছে—আউটফিট। ছদ্মবেশ নেওয়াটা কঠিন কিছু না।

“তখন ক্রিশ্চিনা কি করছিলো?” জানতে চাইল আসিফ। “লোকটাকে আক্রমণ করেছিলে তুমি? সেটা কি লোকটা ক্রিশ্চিনাকে আক্রমণ করার আগে না পরে?”

“আমাকে আগে আক্রমণ করে হারামজাদা,” গর গর করে উঠলো মাজহার।

“তারপর পাল্টা আক্রমণ করলে তুমি,” মাথা দোলাল জিয়া, “ক্রিশ্চিনা সাথেই ছিলো তখন, নাকি ঘটনাচক্রে চলে আসে ওখানে?” জিয়া নিশ্চিত হতে চাইছে, টার্গেট ক্রিশ্চিনাই ছিলো। মাজহার নয়।

“ও আমার সাথেই ছিলো।”

“তোমাকে নিদ্রিত করার পর ওকে ধরেছিলো?”

“হঁ।” নিজীবের মতো সায় দিল মাজহার।

আশা নিয়ে তাকালো জিয়া। “কোন কথা কি সে বলেছে?”

একটু ভেবে নিল মাজহার। “মনে নেই। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না...মানে...কি দেখছি বা কি ঘটছে...”

“প্লিজ, মনে করার চেষ্টা করো। ক্রিশ্চিনাকে বা তোমাকে কিছু বলেছিলো সে?”

চুপ হয়ে গেলো মাজহার। কালো অন্ধকার। ক্রিশ্চিনার ঠোঁটের মাতাল আহ্বান। আচমকা পেছন থেকে আসুরিক টান। তারপর গলায় নোংরা একটা স্পর্শ, ধারালো দাঁতগুলোর কচ কচ করে ঢুকে যাওয়ার অনুভূতি। চোখ বন্ধ করে ফেলল সে।

“ওকে বিশ্রাম নিতে দিন আপনারা,” এইমাত্র ঢুকে পড়া নার্সের কথায় চমকে উঠলো ওরা।



তার মাঝেই ফিস ফিস করে উঠলো মাজহার, “একটা নাম...”  
আহ্নাহের সাথে ঝুঁকে এলো আসিফ। “একটা নাম বলেছিলো খুনি?”  
“হুম। একটা মেয়ের নাম।”  
“নামটা মনে করতে পারবে?”

কিছুক্ষণ চুপ থেকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল ছেলেটা, সেই সাথে একটা দীর্ঘশ্বাস। দু-পাশে হালকা মাথা নাড়লো।

মানসিক ধাক্কাটা কাটাতে পারেনি সে, আসিফ সেটা বোঝে। নার্সের কুঁচকে থাকা ক্রুর দিকে তাকালো একবার অসহায়ভাবে। বের হয়ে যেতে ইশারা করছে। জিয়ার কনুইয়ে টোকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল আসিফ।

“অনেক ধন্যবাদ, মাজহার তোমাকে। কার্ডটা রাখো। কোন ধরনের তথ্য দিতে পারবে মনে করলে শুধু একটা ফোন দেবে। অথবা মেসেজ।”

নিজের কন্ট্যাক্ট নম্বরসহ কার্ডটা আন্তে করে ছোট টেবিলটার ওপর রাখলো আসিফ, তারপর জিয়াকে নিয়ে বের হয়ে এলো ওখান থেকে।

“ভ্যাম্পায়ার থিওরিতে কতটুকু বিশ্বাস করছেন?” বাইরে এসে জিয়ার প্রথম প্রশ্ন।

“লোকটা খুবই চালাক। নিজের পরিচয় গোপন করতে ভাল কাজ দেখিয়েছে।”

“মানে, ছদ্মবেশ?”

মাথা দোলাল আসিফ, “অবশ্যই! ভেবে দেখ-আমরা যার কাছেই তার বর্ণনা জানতে চেয়ে প্রশ্ন করবো, সেই জানাবে চোখা দাঁত আর ফ্যাকাসের মুখের কথা। অথচ সে হয়তো দেখতে তোমার বা আমার মতো। আসল চেহারা লুকিয়ে ক্রাইম করতে পারলে অপরাধির আর কি লাগে? এখানে করা হয়েছে মার্ডার। সেটা লুকোতেই এর দরকার ছিলো মানুষটার।”

আসিফের হাত খামচে ধরল জিয়া, “দেখুন!”

ওয়েটিং রুমের টিভিটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে, তাতে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে ইরফান আর বিজয়ের ছবি। রেস্টুরেন্টের ক্যামেরা থেকে যে ছবি উদ্ধার করা হয়েছিলো সেগুলোই। সংবাদ-পাঠিকা বলে যাচ্ছে তানভীর জালালের হত্যাকাণ্ডের নতুন খবর। গোপন ক্যামেরা থেকে খুনির ছবি উদ্ধার করা গেছে। সেটাই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে জানাচ্ছে সে। সবশেষে এই চেহারার কাউকে দেখা গেলেই ফোর্মিসাইড ডিপার্টমেন্টকে ফোন দিতে বলা হয়েছে। নম্বরগুলো ভেসে উঠলো টিভির পর্দায়।

“ডিটেক্টিভ রেজা দেখা যাচ্ছে মিডিয়ার সাহায্য নিচ্ছে। বোকাচোদা! ইরফানকে খুনি ঠাউরেছে লোকটা,” তিক্ত গলায় বলল আসিফ।

বসের গলায় তিক্ততা আসার কারণ জিয়া বোঝে। মিডিয়াকে দুই চোখে দেখতে পারে না। নিজের নাম প্রচারের জন্যই হোক আর অপরাধিকে ট্রেস করতে, কখনই তাদের সাহায্য নেয়নি। আসিফ মনে করে, এতে খুনি আরও সাবধান হয়ে যায়।

তবে ব্যক্তিগত জীবনের তিক্ততা থেকেই যে তার মিডিয়ার প্রতি বিরক্তি সেটা জিয়া জানে। সাংবাদিক শ্রেণিকে দেখতে পারে না ডিটেক্টিভ আসিফ আহমেদ। এই মুহূর্তে মোবাইল বের করে কানে ধরেছে সে। তৃণাকে দরকার।

মেয়েটা ফোন ধরতেই নির্দেশনা দিল, “ক্রিস্টিনার দিকে মনোযোগ দাও। ভ্যাম্প কেসের দ্বিতীয় ভিক্টিম। তার পরিচিতদের প্রত্যেকের ব্যাপারে খোঁজ নাও। ক্লাসমেট, ফ্রেন্ড, রিলেটিভ। পুরুষদের বাদ দাও লিস্ট থেকে, শুধু মেয়েদের ব্যাপারে সার্চ দেবে। বয়স চৌদ্দ থেকে ত্রিশ। এদের কারও কোন ক্রাইম রেকর্ড থাকলে সেটা বের করো। মাজহার ছাড়া আর কোন বয়ফ্রেন্ড আছে কি-না সেটাও দেখবে। প্রথম ভিক্টিমের সাথে কার কার লিংক আছে তা আলাদা করে আমাদের জানাও।”

ফোন রেখে সহকারির দিকে তাকালো। “খুনি প্রতিশোধ নিতে খুনগুলো করেছে। এটা কোন সাইকো কিলিং না। সম্ভবত প্রতিশোধের নেশায় পাগল হয়ে মাঠে নেমেছে আমাদের এই খুনি। নির্দিষ্ট কারণ চেয়েছিলে তুমি-এটাই তোমার কারণ। আগে কোনদিন খুনোখুনি করেনি এই লোক। করলে সাক্ষি রেখে আসতো না। কলেজ লেকচারার আনোয়ার আর মাজহারের গার্লফ্রেন্ড ক্রিস্টিনা-একই সুতোতে গাঁথা।”

বস্ কিভাবে এত নিশ্চিত হলেন সেটা ভাবতে ভাবতে তাকে অনুসরণ করলো সন্নিধ জিয়া। আসিফ কোনদিকে না তাকিয়ে উঠে এলো ওর গাড়িতে। ইঞ্জিন স্টার্ট নিতে নিতে মনের চোখে দেখতে পেল ইরফানকে। সারাদেশে তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে একজন মানুষকে নিয়ে-এই চাপ মাথায় নিয়ে তার পরবর্তি প্ল্যান কি হতে পারে?

কোথায় লুকিয়ে থাকতে পারে মানুষটা? কি করছে এখন ইরফান?

“গ্রেট জব, তৃণা। ফ্যান্টাস্টিক! লোকেশনটা আমাকে জানাও।”

ফোনটা ড্যাশবোর্ডের ওপর রেখে হাসিমুখে স্টিয়ারিং হুইল আঁকড়ে ধরলো আসিফ আহমেদ। সামনের পেটমোটা মাইক্রোটাকে সতর্কতার সাথে ওভারটেক করে পাশে বসে থাকা জিয়ার দিকে তাকালো।

“পেয়ে গেছি। কলেজ শিক্ষক আনোয়ার বাসায় প্রাইভেট পড়াতো!”

বুঝতে পারলো না জিয়া। “খুনির সম্পর্ক জানা যাচ্ছে কিভাবে তাহলে?”

“ক্রিশ্চিনার সহপাঠি ইভা মারা গেছে গত সপ্তাহে। ইভার সঙ্গে রিলেটেড আমাদের দুই ভিক্টিম। আনোয়ারের কাছে প্রাইভেট পড়তো ইভা। ক্রিশ্চিনা ছিলো তার বেস্ট ফ্রেন্ড। ইভা কিভাবে মারা গেছে অনুমান করতে পারো?”

অনুমান-অনুমান খেলার মুড়ে নেই জিয়া, জানতে চাইল সে, “কিভাবে?”

“জবাই করা হয়েছিলো মেয়েটাকে। ঠিক ক্রিশ্চিনার মতোই।”

উত্তেজিত হয়ে উঠলো জিয়া। “তাহলে ইভার পরিচিত কেউ এখন তার প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছে। কোন কারণে নিশ্চয় এই কেমিস্ট্রি টিচার আর বান্ধবিকে সন্দেহ করেছে সে। এই লোকই আমাদের খুনি! ইভার বয়সফ্রেন্ড?”

“ভাই। আলসাবা সৈকত। পঁচিশ বছর বয়স। বিএসসি গ্র্যাজুয়েট, কম্পিউটার সায়েন্স। ইউল্যাব ইউনিভার্সিটি।”

হা-হয়ে থাকলো জিয়া। এতকিছু জানলো কিভাবে তার বস? আর যদি এসব অনুমান সত্যি হতে থাকে তাহলে কেস হাতে পাওয়ামাত্র চার ঘণ্টার মধ্যেই মার্ডার কেস সল্ভ করে ফেলেছে ওরা। তৃণাকে খোঁজ নিতে বলে নাস্তা করতে গেছিলো ওরা। তারপর ইরফান আর প্রফেসরের কেস নিয়ে নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ আলোচনা করেছে। তৃণার ফোনটা এসেছে তারপরই, এটা একটা রেকর্ড হতে পারে। এতো অল্প সময়ে আগে কখনও জোড়া মার্ডার কেস সল্ভ করা হয়েছিলো বলে জিয়ার জানা নেই। আসিফ ঠিকই বলেছিলো, অভিনব খুনগুলোর অপরাধিকে ধরে ফেলাটা সহজ হয়। শুধু তাদের অভিনবত্বের ভেতর দিয়ে তাকাতে জানতে হয়। ধীরে ধীরে আসে সহজ স্বাভাবিক পার্থিব কোন সত্য।

“এতসব অনুমান করলেন কিভাবে?”

হাসিটা ধরে রেখেছে আসিফ। “অনুমান করিনি। আমি নিশ্চিত।”

আরও অবাক হলো জিয়া, এতকিছু কিভাবে নিশ্চিত হলো স্যার? মাত্র একজন সাক্ষির সাথে কথা হয়েছে ওদের!

ওর দিকে তাকিয়ে চোখ মটকালো আসিফ। “ভ্যাম্প সৈকত বলে ভার্সিটিতে ডাকা হত ছেলেটাকে। কারণ তো কিছু আছেই, তাই না?”

এবার বুঝতে পারলো জিয়া। আসলেই আনাড়ি একজন হত্যাকারির মতো কাজ করেছে ছেলেটা। নিজের পূর্ব-জীবনের বৈশিষ্ট্য খুনগুলোতেও ধরে রেখেছে। তবুও খুঁত খুঁত করে ওর মনটা।

“এমন কি হতে পারে না-খুনটা আর কেউ করেছে। সেটা এভাবে সাজিয়েছে যাতে সৈকতের ওপর দোষ চাপানো যায়?”

মাথা নাড়লো আসিফ। “মাথা গরমের খেলা এটা। খুনি রাগের মাথায় কাজ করেছে, যথেষ্ট সতর্ক থাকতে পারেনি। তাছাড়া, ইভার প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে আসবে এমন আর কোন সাবজেক্ট দেখলাম না। মেয়েটার কোন বয়ফ্রেন্ড ছিলো না। ইভার সহপাঠীদের সাথে তৃণা কথা বলেছে।”

“তাহলে...আমরা এখন যাচ্ছি কোথায়?”

“জনৈক মুরসালিনের কাছে। সৈকতের কাছের বন্ধু ছিলো ভার্টিসি লাইফে। দেখা যাক, মানুষটার ব্যাপারে কতটুকু বলতে পারে ও। ভাল কথা, মিরপুরের দিকে খবর নিতে বলেছিলাম তৃণাকে। অস্বাভাবিক কিছু পেলে জানাতে বলেছিলাম।”

“কিছু জানা গেলো?” অগ্রহ নিয়ে তাকাল জিয়া।

“মিরপুরের দিকে গতকাল রাতে ব্যাপক গোলাগুলি হয়েছে। এলাকাবাসি জানিয়েছে স্ট্রিট ফাইট হয়েছে সেখানে। ঠিক সিনেমার মতো ব্যাপার-স্যাপার। রাস্তা থেকে পুলিশ শুধু একটা পিস্তল উদ্ধার করতে পেরেছে। কালপ্রিটরা পুলিশ আসার আগেই কেটে পড়েছে।”

“ইরফানের সাথে সম্পর্ক আছে মনে করছেন?”

“একটা ছবির কথা বলেছিলাম না? এক মেয়ের সাথে ইরফানের স্টিল ফটো আমাদের ফাইলে ছিলো। শপিংমল থেকে বের হচ্ছিলো সে, তার হাতে ছিলো একটা গুলক-২৩।”

“মিরপুরের উদ্ধার করা পিস্তলটা?”

নিঃশব্দে হাসি দিল আসিফ।

স্পষ্ট হয়ে গেলো জিয়ার কাছে। আর কিছু প্রশ্ন জমে থাকলেও করলো না। ড্রাইভিংয়ের মাঝে ডুবে গেছে তার বস। প্রশ্নটা মাথা থেকে সরাতে পারছে না।

ইরফান কাদের সাথে গানফাইট করছিলো?

\*

একঘণ্টা পর শেখেরটেকে চমৎকার এক বাড়ির সামনে যখন দাঁড়িয়ে আছে ওরা। ভেতরে পা বাড়াতেই দারোয়ান পথরোধ করলো। ব্যাজ দেখাতে অবশ্য গোমড়া হয়ে গেলো তার মুখ। সেই সাথে চোখে ফুটে উঠলো ভীতি। এই বাড়িতে হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট কেন?

বাড়িতে খুন হলে দোষ-দায়ভার সবই যে তার ঘাড়ে চাপবে সেটা বুঝতে কোন

রকম ভুল হয়নি মানুষটার। তাকে আশ্বস্ত করে আসিফ জানালো এখানে কোন খুন হয়নি, বরং অন্য একটি খুন নিয়ে এখানকার একজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। চাঁদের মতো হাসি প্রদর্শন করলো দারোয়ান।

পাঁচতলায় উঠে আসলো ওরা। মোবাইল বের করে তৃণার মেসেজটা আরেকবার দেখলো : ৫-এ। ঠিকই আছে।

কলিংবেলে একবার চাপতেই দরজা খুলে গেলো। এখানে আসার পথে গাড়িতে বসেই ফোন করে এর কাছ থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া হয়েছে।

আবু মুরসালিন নিলয়, ইউল্যাব ইউনিভার্সিটিতে এই ছেলে সৈকতের সাথেই পড়ত কম্পিউটার সায়েন্সে। এই মুহূর্তে মাঝারি আকারের চশমার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

“ডিটেক্টিভ আসিফ এবং জিয়া?” জানতে চাইল ছেলেটা।

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিতে ব্যস্ত হয়ে ওদের ভেতরে নিয়ে এলো সে। একঝলক দেখেই বোঝা যায়, এই অ্যাপার্টমেন্টে কয়েকজন ব্যাচেলর থাকে। রুমগুলো ভাগ করে নিয়েছে ওরা। প্রথমেই ডানদিকের ঘরটা নিলয়ের। মেঝেতে ফ্লোরিং করা। টেবিলের ওপর একটা ল্যাপটপ। র‍্যাকে কিছু বই। বেশিরভাগই ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ওপর। তাছাড়াও কিছু বাংলা আর ইংরেজি উপন্যাসের বই দেখা যাচ্ছে। রুমের মেঝেতে ধুলোর আস্তর পড়ে আছে। কতদিন মোছা হয় না কে জানে!

“বলুন, আপনাদের কিভাবে সাহায্য করতে পারি?” সবাই বসে পড়ার পর জানতে চাইল নিলয়। চমৎকার হাসি ছেলেটার।

পাল্টা হাসি দিল আসিফও। “আসলে আপনার এক পুরনো বন্ধুর ব্যাপারে একটু জানতে চাইছিলাম।”

“ফোনেই বলেছেন,” হাসিটি মিইয়ে যায় এবার নিলয়ের মুখ থেকে, “আলসাবা সৈকতের ব্যাপারে জানতে চান তো? কতদূর সাহায্য করতে পারবো ঠিক বুঝতে পারছি না।”

আসিফের মুখ থেকেও হাসি মুছে গেলো। সহযোগিতার হাত না বাড়ালে একে ডিপার্টমেন্টে ডেকে আনার ব্যবস্থা করা লাগবে বলে মনে হচ্ছে। তবে তার চেহারার পরিবর্তন দেখেই যা বোঝার বুঝে ফেলে তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পাল্টে ফেললো নিলয়।

“ভুল বুঝবেন না, খুবই আইসোলেটেড একটা ছেলে ছিলো সৈকত। আর অদ্ভুত ধরনের আচার আচরণ। এজন্য কেউই মিশতো না ওর সাথে। আমি ওর সবচেয়ে কাছের বন্ধু ছিলাম, অথচ ওর ব্যাপারে খুব বেশি জানি না। চুপচাপ থাকতে পছন্দ করতো। বাই দ্য ওয়ে, ঠিক কি বিষয়ে ওর ব্যাপারে জানতে চান আপনি?”

“ছেলেটা আমাদের একটা ডাবল মার্ভার কেসের প্রাইম সাসপেক্ট,” লুকোছাপা না করে সত্যটা বলে দিল আসিফ।

চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেলো নিলয়ের। “অ্যাবসার্ড! কিছুটা অদ্ভুত ছিলো সে, কিছুটা পাগলাটেও, তাই বলে খুন করার মতো কাজ তার পক্ষে করা অসম্ভব।”

তার দিকে তাকিয়ে রইলো আসিফ। “অনেক নিরীহ চেহারার অনেক খুনি আছে। যাকগে, আপনার কাছে তার ব্যাপারে শোনা আমাদের জন্য খুবই জরুরি।”

“এর সাথে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা জড়িত,” ফট করে বলে দিল জিয়া।

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার কথা শুনে নিলয়ের মুখটা চিমসে হয়ে গেলো। ছোট ছোট মুখ করে বলল, “বুঝতে পেরেছি।”

আগের প্রসঙ্গ তুললো আসিফ, “বললেন, একটু অদ্ভুত আর পাগলাটে ছিলো সৈকত। আরেকটু খুলে বলবেন কি?”

আমতা আমতা করলো নিলয়। “কতটুকু বিশ্বাস করবেন, বুঝতে পারছি না।”

“আপনি যেভাবে যা দেখেছেন, বুঝেছেন সেভাবেই বলুন। আমাদের জন্য সেটাই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।”

কিছুক্ষণের জন্য চুপ হয়ে গেলো ছেলেটা। অযথাই চশমাটা হাতে নিয়ে মুছল। ভাবছে ঠিক কোথা থেকে শুরু করবে, তারপর মনস্থির করে চশমা চোখে দিল আবার।

“সৈকতের সাথে আমার যে বন্ধুত্ব ছিলো, তাকে স্বাভাবিক বন্ধুত্ব বলা চলে না। অবাধ হবেন হয়তো, কারণ একটু আগেই বলেছি, গোটা ভার্শিটিতে আমার সাথেই সবচেয়ে ভাল সম্পর্ক ছিলো ওর। অথচ আমার সাথে কথা হত কালে-ভদ্রে। ওটাই সৈকতের সাথে ভাল বন্ধুত্বের জন্য যথেষ্ট-কারণ আর কোন ছেলেমেয়ের সাথে ও একেবারেই কথা বলত না।”

অবাক হলো আসিফ। “ইউনিভার্সিটি লাইফে এভাবেও কেউ থাকে নাকি?”

বিস্মল একটা দৃষ্টি দিল নিলয়। “শুধু তাই না-মোটা কাপড়ে শরীর ঢেকে রাখত। হুড-যুক্ত জামা ছাড়া তাকে আমরা ক্যাম্পাসে কোনদিন দেখিনি। এটা অবশ্য তখন একটা ফ্যাশন ছিলো, কিন্তু ফ্যাশনেবল ছেলেরা হুডটা মাথায় তুলে রাখত না, রাখত সৈকত। অতি গরমেও তার মাঝে এটা দেখা যেত। অনেকে প্রথমে মজা করতো তা নিয়ে, গায়ে মাখেনি ছেলেটা। এমনকি যে মজা করত তার দিকে তাকাতো না পর্যন্ত। একতরফা ট্রোলিং চলে না। তাই কিছুদিনের মাঝেই ওসব থেমে গেছিলো।”

“ও কেন এরকম পোশাক পরে তা জানতে চাননি আপনি কখনও?” জিয়া দ্রুত এইমাত্র জানতে পারা তথ্যগুলো মোবাইলের নোটপ্যাডে তুলে নিয়ে প্রশ্ন করলো।

“চেয়েছিলাম, ও বলেছিলো, ওর স্কিন রোদ সহ্য করতে পারে না। আমিও বিশ্বাস করেছিলাম। ছেলেটা অবশ্য ক্লাসরুমে ঢুকে হুড খুলে ফেলতো।”

একে অন্যের দিকে তাকালো আসিফ আর জিয়া। ভ্যাম্পায়ার রোদের সংস্পর্শে আসলে ত্বক পুড়ে যায়। সৈকতের মধ্যে এরকম সমস্যা ছিলো তাহলে?

“ভার্শিটিতে ওকে ‘ভ্যাম্প বয়’ নিক দেয়া হয়েছিলো, এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারেন? এই রোদ-সমস্যার কারণেই কি এমন নাম দেয়া হয়?”

অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো নিলয়। আসিফ এত তথ্য কোথেকে পেল ভাবছে হয়ত, তারপর মাথা নাড়লো। “আমি ওসবে বিশ্বাস করি না। মানুষের সমস্যা থাকতেই পারে। কত বিরল জাতের রোগ আছে! তবে ওটাই নয় শুধু, সৈকতের

দাঁতগুলো ছিলো অস্বাভাবিক চোখা। ওর জন্য আমার মায়া হত। আয়নাকে ও এড়িয়ে চলত। ইংলিশ স্পোকেন প্র্যাক্টিসের জন্য একটা আলাদা হলঘর ছিলো, ও ঘরে আয়না থাকায় সে কখনও যায়নি। কাজেই গুজব ছড়িয়ে পড়তে থাকে, ছেলেটা ভ্যাম্পায়ার। শ্লেহা নামে আমাদের এক বান্ধবি একদিন ওর দিকে রসুনের কোয়া ছুঁড়ে মেরেছিলো। শুধু মজা করাই উদ্দেশ্য ছিলো—কিন্তু সৈকতের প্রতিক্রিয়া ছিলো দেখার মতো।”

থেমে যায় নিলয়, চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে সোনালী বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের কিছু দৃশ্য। কয়েক সেকেন্ড পর ধীরে ধীরে বলল, “ছিটকে উঠে গেছিলো ও ক্লাসরুমে অন্য প্রান্তে। এতটাই জোরে, বসে থাকা বেষ্টটা ভেঙে যায় সেদিন। এটা ছিলো ওর ইস্ট্যান্ট রিঅ্যাকশন। ক্লাসরুমে যারা ছিলো কথাটা ছড়িয়ে দিতে ভোলেনি। ভার্শিটিতে ভ্যাম্প বয় হিসেবে ওর নিক সেদিন থেকেই।”

“গোটা ভার্শিটি বিশ্বাস করতে থাকে ছেলেটা ভ্যাম্পায়ার? আজকের যুগে?” মেনে নিতে পারলো না আসিফ।

আসিফের কথাটা শুনে একটু হাসলো নিলয়। “আরে নাহ্। কেউই ওকে ভ্যাম্পায়ার ভাবত না। তবে আচার-আচরণে ওই কল্লকথার প্রাণিটার মতো কাণ্ড করতো সৈকত, তাই ও নামে ডাকা হত। কিছু মেয়ে এজন্যে ওর ওপর ত্রাশ খায়নি তা বলব না।” আলতো করে চোখ টিপে বলল ও, “কিন্তু বাকি সবাই মনে করত ব্যাপারটা শুধুই ওর অভিনয়। থাকে না কিছু উন্মাদ—কাজী আনোয়ার হোসেনের বই পড়ে নিজেকে মাসুদ রানা মনে করে, অথবা কিশোর পাশা মনে করে তিন গোয়েন্দার ভক্ত বলে? সৈকতকে ওরকম এক উন্মাদ ভাবা হত ক্যাম্পাসে। সবাই ধরে নিয়েছিলো, টোয়াইলাইট বা এ জাতীয় মুভিগুলো দেখে ভ্যাম্পায়ারের মতো চলাফেরা করে আনন্দ পায় সে।”

“হুম।” শব্দটা মুখে করলো ঠিকই, তবে আসিফ মনে মনে ভাবছে অন্য কথা।

সৈকতকে আর যে যা-ই ভেবে থাকুক—মানুষটা শুধুই ভ্যাম্পায়ারদের কল্লকথার ভক্ত ছিলো না। আসলেই একাধিক মানুষকে সে কামড়েছে, রক্ত পান করেছে। তারপর হত্যা করেছে অন্তত দু-জন মানুষকে। এদের সে ভেবেছে তার ছোটখাটো হত্যাকারি।

লোকটাকে থামানো না গেলে সে যাদেরকে দায়ি বলে মনে করবে প্রত্যেককেই হত্যা করবে কোন না কোন সময়!

পিস্তলের নলটা সরাসরি মেঝের দিকে তাক করা। ওটা ওভাবে ধরে রেখেই আসিফকে হালকা ইঙ্গিত দিল জিয়া।

এক পা সামনে বড়লো আসিফ, শক্ত করে রেখেছে কাঁধ। নব আছে দরজায়। এধরণের দরজা কিভাবে খুলতে হয় তার ওপর আলাদা একটা ট্রেনিং নিতে হয়েছে ওদের। কাঠের দরজা যথেষ্ট শক্ত। এক ধাক্কায় কিছু হবে না। চলচ্চিত্রে অনেক সময় দেখা যায় এক লাথিতেই নব ছুটিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ছে নায়ক বা খলনায়ক। আপাতদৃষ্টে এটা অসম্ভব মনে হলেও থিওরেটিক্যালি সম্ভব যদি নবগুলো দুর্বল থাকে।

নব আছে এমন যেকোন দরজায় একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থাকে। ওই বিন্দুতে ধাক্কা দেওয়া হলে পুরো চাপটা পড়ে নবের ওপর। বলবিদ্যার ব্যাপার। শুধু হিসেব করে বিন্দুটিকে বের করে নিতে হয়, তখন আর দরজা ভাঙাটা খুব কঠিন কাজ থাকে না। চোখ দিয়ে আসিফ মেপে নিচ্ছে এই দরজার বিন্দুটি কোথায় হতে পারে, তারপর কাঁধ দিয়ে প্রচণ্ড ধাক্কা দিতেই বিকট শব্দে খুলে গেলো ওটা।

পিস্তল সামনে তুলে লাফিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল জিয়া, শক্ত গলায় হুঙ্কার দিল, “পুলিশ!”

আসিফের হাতেও বের হয়ে এসেছে অস্ত্র। ছুটে ঢুকে পড়েছে জিয়ার পেছন পেছন। সতর্ক দৃষ্টি চোখে। বাসাটা সৈকতের, আর তাকে ছোট করে দেখার কিছু নেই। ওর কাছে পিস্তল থাকার কথা। প্রথম খুনের সময় অস্ত্রটা ব্যবহার করেছিলো।

সতর্ক পায়ে ছোট বাসাটা ঘুরে দেখলো ওরা। এই অ্যাপার্টমেন্টে মাত্র দুটি ঘর। ঘরগুলোতে তেমন আসবাব নেই। শেষ বারান্দাটা ঘুরে এসে ঘোষণা দিল আসিফ, “ক্রিয়ার!”

কিছুটা হতাশ হয়েছে ও। আশা করেছিলো সৈকতকে বাড়িতেই পাওয়া যাবে। দিনের এই সময়ে তাকে কখনও বাইরে দেখা যায়নি। সৈকত-ইভা দুই ভাইবোন থাকত এখানে। ওদের বাবার মৃত্যুর দশ বছর হতে চলল। দ্বিতীয় বিয়ের পর থেকে ওদের মা থাকেন আমেরিকায়। প্রবাসি বাংলাদেশির ঘর করছেন এখন।

“আমরা যে আসছি, জেনে ফেলেছিলো মনে হচ্ছে,” মন্তব্য করল জিয়া।

“আমার সেটা মনে হচ্ছে না। তবে আমাদেরকে বারান্দা থেকে দেখে ফেলেনি তো?” বারান্দার দরজায় দাঁড়িয়ে বলল আসিফ। এখান থেকে বাড়ির প্রবেশপথ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। “তা-ই যদি হবে, বের হলো কোন্‌দিক দিয়ে?”

“স্যার! একটু এদিকে আসুন।”

জিয়ার কণ্ঠে কিছু একটা ছিলো, ওর দিকে এগিয়ে গেলো আসিফ। জানালার পর্দা সরিয়ে ফেলেছে সে। খোলা জানালার একটা গরাদের সাথে বাঁধা হয়েছে দড়ি।



সোজা নেমে গেছে ওটা নিচে। একটা গরাদ কেটে যথেষ্ট ফাঁক করে রাখা হয়েছিলো আগে থেকে। পূর্ববয়স্ক যে কেউ বের হয়ে যেতে পারবে ওদিক দিয়ে।

বিমর্ষমুখে মাথা নাড়লো আসিফ। এই সম্ভাবনার কথা আগেই ভাবা উচিত ছিলো। পেছনে জিয়াকে দাঁড় করিয়ে রেখে তারপর ঢোকা উচিত ছিলো তার। ফোর্স নিয়ে আসলে আরও ভাল হত। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ভুল হয়ে গেছে। পালিয়ে গেছে জোড়া খুনের খুনি সৈকত!

বের হয়ে সৈকতকে খোঁজার ইচ্ছায় হস্তদন্ত হয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো জিয়া। পেছন থেকে ওকে থামাল আসিফ। এখন আর লাভ নেই। অসংখ্য অলিগলি এদিকটায়। যেকোন দিক দিয়ে কেটে পড়তে পারে মানুষটা।

“সার্চ করো, জিয়া। এই ঘরটা তুমি দেখ-আমি যাচ্ছি ওটাতে,” ছোট ঘরটার দিকে ইঙ্গিত করে দেখাল আসিফ।

বসের কথার তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করলো ছেলেট। মাথা দুলিয়ে সুরুত করে বড় ঘরটায় ঢুকে পড়ল সে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে অন্য ঘরে চলে গেলো আসিফ। যে ব্যাটা গেছে সে তো গেছেই। এখান থেকে কিছু সূত্র পাওয়া গেলে সেটা কাজে দিতে পারে। ফোন বের করে তৃণাকে বলল ফোর্স পাঠাতে। সম্ভাব্য পলায়নপথ বর্ণনা করে ওদিকে কোন টহল গাড়ি আছে কি-না দেখতে বলল। শুধুই ফর্মালিটি। সৈকতকে তারা ধরতে পারবে বলে মনে হয় না। কথা শেষ করলো সৈকতের ঠিকানায় ক্রাইম-সিন ইউনিট পাঠাতে বলে।

ঘরে পা রেখেই বুঝতে পারলো, এর বাসিন্দা ছিলো কোন এক কিশোরি। এক্ষেত্রে, কিশোরিটি নিশ্চয় সৈকতের ছোটবোন ইভা। পরম যত্নের সাথে গুছিয়ে রাখা হয়েছে প্রতিটি জিনিস। পড়ার টেবিলে প্রতিটি বই সাজানো আছে। দেখে মনে হচ্ছে কোনটাই স্পর্শ করা হয়নি। পকেট থেকে পাতলা গ্রাভস দুটো বের করে পরে ফেলল আসিফ। বইগুলো উলটে পাল্টে দেখলো। দেখে মনে হচ্ছে কোনটাই পড়া হয়নি।

খাতাগুলো খুলতে অবশ্য ধারণাটা পাল্টে গেলো। প্রতিটি অধ্যায়ের নোট করেছে ইভা। প্রথমে সূচিপত্র। বোঝা গেলো, যথেষ্ট এগিয়েছে সে ক্লাসের সাথে। অর্থাৎ সবগুলো বই-ই ভালোমতোই পড়েছিলো মেয়েটি।

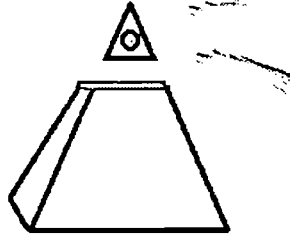
দেয়ালে ইভার একটি ছবি ঝুলছে। চমৎকার দেখতে ছিলো মেয়েটি। দাঁত বের করে হাসছে। ভায়ের মতো চোখা ছিলো না তার দাঁত। বড় বড় পিঁপড়ির আড়ালে চোখগুলো ঢাকা পড়ে গেছে। নিষ্পাপ একটা সৌন্দর্য ছড়িয়ে দিয়েছে শিশুতোষ মুখটাতে। সদ্য কৈশোরে পা রাখা মেয়েটি হারিয়ে গেছিলো। তারপর তাকে পাওয়া যায় আমিনবাজারের এক কানাগলিতে। জবাই হয়ে পোকা মেয়েটার লাশ পুলিশ পেয়েছিলো, তবে ওটাকে র্যান্ডম ঘটনা বলে চালিয়ে দিয়েছে। রাতের বেলায় ওই গলির দুর্নাম আজকে থেকে নয়। সাধারণ ছিনতাইকারীদের দায়ি করেছে পুলিশ। ক্ষমতালি কারও হাত না থাকলে এই কেস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে পছন্দ করে না তারা। এই ভাই-বোনের সাথে ক্ষমতার কলকজা ছিলো না। কাজেই এ নিয়ে খুব

বেশি মাথা ঘামায়নি কেউ। হোমিসাইডেও পাঠানোর কথা ভাবেনি। আজকে খবর নিতে গিয়ে এসব জানতে পেরেছে তৃণা। মেয়েটির আত্মীয়স্বজনও এ নিয়ে উঠেপড়ে লাগেনি। লাশ পুলিশের কাছ থেকে এনে চুপচাপ শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করেছে সৈকত।

কারণটা এখন আসিফ আঁচ করতে পারে। দায়িদের নিজ হাতে শাস্তা করতে চেয়েছিলো সে।

ফটোগ্রাফটা সাবধানে খুলে নিল আসিফ। কি মায়াবিই না ছিলো মেয়েটি! দুই সেকেন্ড ছবিটার দিকে অপলক তাকিয়ে রইল সে। সৈকতের চেহারার বর্ণনার সাথে এর চেহারার মিল খুঁজে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে হলো। মোটেও ফ্যাকাসে চামড়া ছিলো না ইভার। সহজাত স্বাভাবিক দৃষ্টি, চোখে কৈশরের আনন্দ। সব মিলিয়ে আর দশটি কিশোরির মতোই মনে হচ্ছে দেখে। খুব চেনা চেনা লাগলো ওকে আসিফের। ইভার ছবি হাতে নিয়ে আয়রনিটা দেখতে পেলো সে। গোটা হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট চেষ্টা করেও সৈকতের কোন পরিষ্কার ছবি খুঁজে পায়নি। তার একমাত্র ছবি পাওয়া যায় এসএসসির রেজিস্ট্রেশন কার্ডে-ক্লাস নাইনের ছবি। জিয়া ঠাট্ট করে বলেছিলো, ক্লাস নাইনের পরই ভ্যাম্পায়ার হয়ে গেছিলো তাই কোন ছবি তুলতে পারেনি আর।

ইভার ছবিটা আবারও আগের জায়গায় বুলিয়ে রাখতে যাবে তখনই দেয়ালে আঁকা চিত্রটার দিকে প্রথমবারের মতো চোখ পড়ল তার। ছবির আড়ালে থাকায় দেয়ালের ওই অংশটা এতক্ষণ দেখতে পায়নি। আসিফ টের পেল ওর শরীর বেয়ে ইলেকট্রিক শক বয়ে যাচ্ছে যেন। এ জিনিস আর যেখানেই হোক এখানে আশা করেনি!



ছবিটা খুবই সাধারণ পেন্সিলে আঁকা। আসিফের জন্য সেটা নতুন কিছু নয়। আমেরিকান ডলারের গায়ে এ ছবি সে দেখেছে।

“মাই গড!” বিড় বিড় করে বলল সে, তারপরই ডেকে উঠলো, “জিয়া!”

হস্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো সহকারি। দেয়ালের দিকে না তাকিয়েই হরবর করে বলল, “স্যার! আপনি এটা দেখতে চাইবেন!” তারপর খেয়াল করলো দেয়ালের দিকে। “মেয়েটাও!”

“মেয়েটাও?” অবাক হলো আসিফ।

কিছু না বলে বের হয়ে গেলো জিয়া। তার পেছন পেছন গেলো আসিফ। অন্য

ঘরটায় একবার উঁকি দিয়েই দেখতে পেল খাটের নীচ থেকে একটা বড় বাস্ক খুঁজে পেয়েছে জিয়া। এখন ওটার মুখ খোলা। দেখার সুবিধার জন্য ভেতরের সবকিছু মেঝেতে ছড়িয়ে দিয়েছে সহকারি। ওর হাতেও এখন পাতলা গ্লাভস। কারও ছাপ নষ্ট করতে চায় না। মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা কাগজগুলো দেখতে আসিফের মোটেও অসুবিধে হলো না।

ফ্রি মেসনারির ওপর রিসার্চের ফলাফল সেখানে। মেসনদের গ্রেডাল সিস্টেম। গ্রেড, ডিগ্রি-সারা বিশ্বের মেসনিক লজগুলোর অবস্থান আর ছবি। একটা পর একটা কাগজ দেখতে থাকল আসিফ। তাদের রিচুয়াল, সিঘলিজম, সোশাল ক্যালেন্ডার, ল্যান্ডমার্ক, চ্যারিটি প্ল্যান, জুরিসডিকশন!

আহ্নহের সাথে প্রতিটি পাতা উল্টে চলল সে। তথ্য! অসীম তথ্যে ঠাসা এসব কাগজ। পাগলের মতো পড়াশোনা করেছে কেউ ফ্রি মেসনদের নিয়ে। তার চোখ আতিপাতি করে খুঁজছে নির্দিষ্ট একটি তথ্য। বাংলাদেশ সম্পর্কিত কিছু। বাংলাদেশের লজের অবস্থান সম্পর্কে একটু ধারণা! কিন্তু খুঁজে পেল না কিছুই।

“এই লোকটাও ফ্রি মেসন ছিলো,” পেছন থেকে মন্তব্য করল জিয়া।

মাথা দুলিয়ে আসিফ তার সহকারির ধারণাটি বাতিল করে দিল। “না...ইভা।”

“এত অল্প বয়সিদের তারা নেয় তা জানতাম না,” বিড় বিড় করে বলল জিয়া।

মাথা তুলে ওর দিকে তাকাল আসিফ। “আমি সেটা বলিনি। ইভা কিভাবে মারা গেছে সেটা এখন স্পষ্ট। মেসনদের হাতে নিহত হয়েছে ও। আমাদের সৈকত এখন মেসনদের খুঁজে বেড়াচ্ছে...আমাদের মতোই হন্যে হয়ে।”

চমকে গেলো জিয়া। “বলেন কি! আপনার কি ধারণা মেসনদের সাথে কোন কারণে মনোমালিন্য হওয়াতেই সরিয়ে দেয়া হয়েছে ডক্টর তানভীর জালালকে?”

“হয়তো, যতই এগিয়ে যাচ্ছি এই সম্ভাবনাটাকে ততই যৌক্তিক বলে মনে হচ্ছে,” পাতাগুলো ওল্টাতে ওল্টাতে বলল আসিফ। তারপরই থমকে গেলো সে।

বাংলাদেশের একটিমাত্র লোকেশন চিহ্নিত করেছিলো সৈকত। কলম দিয়ে তিনটি মাত্র অক্ষর লেখা হয়েছে সেখানে। বড় বড় চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকলো আসিফ।

O.T.O

“ওটো!” আনমনেই উচ্চারণ করল আসিফ। “এর কি মানে হতে পারে?”

দিনটি চমৎকার। রোদ ঝলমলে। হাইওয়েটাও এজন্যে ব্যস্ত। গাড়ি ছুটে চলেছে সমান তালে। রাস্তার দু-পাশে কোন গাছ নেই।

শক্ত রাস্তায় পা ঠুকলো বেলাল। হাতে লাল রঙের এক ছোট খাম। চারপাশে আরেকবার তাকালো সে। ঘড়ি বের করে সময় দেখতে গিয়ে সূর্যের তীব্র আলোর প্রতিফলন এসে পড়ল তার চোখে। ঠিক বারোটা বাজে। সময় হয়ে গেছে, কিন্তু রিসিভার কোথায়?

রিজভী ভাইকে অসীম শ্রদ্ধা বেলালের। লোকটা মানুষ নাকি সাক্ষাৎ দেবদূত, তাই ভেবে পায় না। বুয়েটে পড়াশোনা করেছে, স্থাপত্য নিয়ে অনেক জ্ঞান তার। শুনেছে শততলার বিল্ডিং বানানোর কায়দা-কানুনও জানে এই ভাই। বড় ইঞ্জিনিয়ার।

বড় ইঞ্জিনিয়ারদের দেশে খুঁজে পাওয়া যায় না। তারা চলে যায় বিদেশে। এই রিজভী ভাইও গেছিলো। আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া বলে কোন এক জায়গাতে, তবে থাকেনি বেশিদিন। পড়াশোনা শেষ করে আবার চলে এসেছে দেশে। এমনটা করে কয়জন? সবাই তো আমেরিকান ডলারের গন্ধে মজে যায়। রিজভী ভাই মজেনি। এরকম মানুষকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায়? কিছু বড় ইঞ্জিনিয়ার আবার দেশে ফিরে বড় বড় জায়গায় কাজ করে। রিজভী ভাইয়ের মতো নিজের গ্রামে ফিরে আসে কেউ? ওয়াল্টনে চাকরি নেয় নিজের গ্রামের বাড়িতে থাকার জন্য?

একটা প্রশ্ন বেলালের মাথায় আগেও এসেছিলো, রিজভী ভাইকে করার সাহস পায় নি। ওয়াল্টন অনেক কিছু বানায় কিন্তু বিল্ডিং তো বানায় না। ওখানে রিজভী ভাই করেটা কি? প্রশ্নটা মুখে করতে হয়নি ওকে। রিজভী নিজেই একবার বলেছিলো।

“বুঝলে বেলাল, পড়লাম আর্কিটেকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং আর করছি ইলেক্ট্রিক্যালের কাজ। এই দেশে এই হলো সমস্যা।”

উনি অবশ্য বুঝিয়ে বলেছিলেন কিভাবে প্রতিটি ইঞ্জিনিয়ারকেই সব রকম ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়তে হয়। কিন্তু সেই সাথে আক্ষেপও করেছিলেন নিজের বিষয়ের কাজ এই দেশে নেই বলে। অতসব মাথায় ঢোকে না বেলালের। সে শুধু জানে রিজভী ভাই মহান একজন লোক। এতটা ভালবাসা সাধারণ মানুষদের প্রতি থাকে না কারও। পড়াশোনা করে ‘শিক্ষিত’ হয়ে গেলে তো আরও থাকে না। রিজভী ভাইয়ের আছে। আর এজন্যেই তার কথায় প্রাণ দেওয়া যায়।

উনার কথা অনুযায়ী এখানে রিসিভারের আসার কথা ছিলো ঠিক দুপুর বারোটায়। খামটা তাকে দেওয়ার জন্য এখানে এসেছে বেলাল। আরেকবার হাতঘড়ি দেখলো সে। বারোটা পাঁচ। দেরি হচ্ছে কেন কে জানে!

বড় ট্রাকটা যখন ছুটে এসে বেলালকে চাপা দিয়ে গেলো, জানতেও পারলো না তার শেষ হচ্ছে পূরণ হয়ে গেছে!

“ডানার সাথে দেখা করতে যাচ্ছি আমরা। প্রফেসরে ব্যাপারে আরও জানা দরকার। এখনই।”

গাড়ির দরজা সশব্দে বন্ধ করে দিল আসিফ। শক্ত করে সিটবেল্ট বাঁধলো জিয়া। বাড়ির বাইরে এখন একটা পুলিশের গাড়ি। সিএসইউয়ের সাদা ভ্যানও চলে এসেছে, ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে তারা। ওদিকে একবার তাকিয়ে নিজের মোবাইলটা জিয়ার দিকে ছুঁড়ে মারল আসিফ। উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সহকারি।

“ড্রপবক্সে ঢুকে পড়। সব ভিডিও চেক করে দেখ। সকাল থেকে দৌড়ের ওপর আছি, দেখার সময় পেলাম কোথায়?”

ফাইলগুলো মোবাইলে ডাউনলোড হয়ে গেছে। ড্যাশবোর্ড থেকে ইয়ারফোন বের করে কানে চাপালো জিয়া।

“স্যার, কেস দুটো তাহলে ইন্টারকানেক্টেড?”

“অবশ্যই। তোমার ফোনটা দাও।” একহাতে জিয়ার ফোন নিয়ে স্পিড ডায়াল থেকে তৃণার নাম্বারে ফোন করলো আসিফ। অন্যপাশে রিং হবার সময় জিয়ার সাথে কথা চালিয়ে গেলো, “আমি শুধু ভাবছি এতদিন পর মেসনদের জন্য খুনের ঘটনা কেন ঘটছে? ওরা অনেক দিন ধরেই বাংলাদেশে আছে, কেউ তাদের কথা জানতো না। আর গত কয়েকদিনে কিনা বেশ কয়েকটা লাশ পড়ে গেলো। কেন?”

প্রশ্নটার উত্তর জানা নেই জিয়ারও, তাই চুপচাপ ভিডিওগুলো দেখে গেলো।

“তৃণা,” ফোন রিসিভ করতেই বলে উঠলো আসিফ, “ডানাকে আমি কাস্টডিতে এনেছিলাম। এখনও কি আছে নাকি?”

“না, স্যার। আপনার ইন্টেরোগেশনের পরই আমরা গুকে ছেড়ে দিয়েছি।”

“ডানার ফোন নম্বর ম্যানেজ করো। জানাও আমি আর জিয়া আসছি। বিজয়ের ব্যাপারে কোন আপডেট আছে?”

“গুকে, স্যার। বিজয়ের ব্যাপারে নতুন কোন আপডেট নেই,” তৃণা বলল।

“আরেকটা ছোট হেল্প করা লাগবে। ফ্রি মেসন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, কোম্পানিটার ব্যাপারে খোঁজ নাও। তারপর ডক্টর রমিজ খানকে ফোন দাও। জানাও আমাদের কথা। বলে দেখ দুপুর চারটার দিকে তার সময় হবে কিনা। আর আমাদের ফার্স্ট ভিক্টিম আনোয়ারের ব্যাপারে খোঁজ নিও, ফ্রি মেসনার সাথে তার সামান্য সংশ্লিষ্টতা পেলেই আমাদের জানাবে।”

“স্যার?” ইতস্তত করল তৃণা।

“কি!”

“আপনি এখনও ওই কেস নিয়ে কাজ করছেন? ওটা তো এখন ডিটেক্টিভ রেজার। এফবিআই চাইবে না কেউ ওদের কেসে নাক গলাক।”

“একটা কথা জানানো হয়নি তোমাকে। আমাদের কেসটা রেজার কেসের সাথে ক্রস করেছে। আমি ওদের কেসে নাক গলাচ্ছি না, নিজের কেসটা সামলানোর চেষ্টা করছি শুধু।”

বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চুপ হয়ে থাকল তৃণা, তবে বাড়তি প্রশ্ন করলো না, শুধু বলল, “বেস্ট অব লাক, স্যার।”

কল কেটে দিয়ে জিয়াকে ফোন ফিরিয়ে দিল আসিফ।

“ফ্রি মেসন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড। নামটা কোথাও শুনেছি?” বলল জিয়া। চোখ মোবাইল স্ক্রিনে। ভিডিও দেখছে।

“শোননি, দেখেছো। এতক্ষণে মনে করতে পারলাম, সেজন্য আমার স্মৃতিশক্তি দায়ি। প্রফেসরের ল্যাবের থার্ড কম্পার্টমেন্টের কথা মনে আছে?”

মাথা দোলাল জিয়া।

“প্রতিটি কন্টেইনার সাপ্লাই দিয়েছিলো একটি কোম্পানি। তখন আমলে নেইনি। ফ্রি মেসন নিয়ে কিছু জানতাম না। এখন মনে পড়ল।”

“ওরা...এরকম কোম্পানিও চালায়?” অবাক হলো সহকারি।

একটু হাসলো আসিফ। “চালায় তো অনেক কিছুই। অনেক দেশও তাদের নিয়ন্ত্রণে। তবে নিজেদের নামে কোম্পানি খুলে বসে আছে, এটা কে জানতো? সাপ্লাই নেওয়ার সময় প্রফেসর নিজেদের কোম্পানি ব্যবহার করেছেন আর কি।”

জিয়া আর কিছু বলল না। বসের মাথায় এখন চিন্তার ঝড় চলছে। সে ঝড়ে সামিল হওয়ার উপায় নেই। ভিডিওতে মন দিতে হবে। তৃণা প্রফেসরের বাসার ক্যামেরাগুলোর রেকর্ডিংও পাঠিয়েছে। সে রাতের ভিডিও ফুটেজ। সব কিছু স্বাভাবিক এবং শান্ত সেখানে। প্রতিটি ক্যামেরার জন্য আলাদা ফাইল। একে একে দেখে চলেছে ও। কোনটাতে অস্বাভাবিক কিছু পেলে সূত্র হাতে আসতেও পারে।

ফ্রন্টগেট, ল্যাব এন্ট্রান্স, গার্ডেন-সবখানে একটা করে ক্যামেরা ছিলো। ছিলো না বাড়ির ভেতরে। তবে বাড়ির ভেতরে ক্যামেরা থাকলেও কোন উপকারে আসবে না সেটা। প্রফেসরের মার্ডার নিয়ে ভিডিওতে কিছু খুঁজছে না। কারণটা জানা হয়ে গেছে। ইনসুলিন।

এই জিনিস কেউ ক্যামেরার সামনে দেয় না। ওটা দেয়া হয়েছে আড়ালে। জিয়া এখন ভিডিওতে অন্য জিনিস খুঁজছে। বিজয় ছেনেটা উধাও হয়ে যাওয়ার কোনধরনের ক্লু। বিশেষ কিছু দেখতে পায়নি এখনও, সবকিছু নিস্তব্ধ। গাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে মাঝে মাঝে। টহলে কোন বিরাম নেই।

ভিডিও স্পিড তিনগুণ করে বাড়িয়ে দেখছে জিয়া। দু-ঘণ্টার ভিডিও পার হয়ে এলো চল্লিশ মিনিটে। কিছু পাওয়া গেলো না এর মধ্যে। এরইমধ্যে তৃণা টেক্সট পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছে ডানার এখন প্রফেসরের বাড়িতে নেই। আজ সকালে নতুন এক বাসা ভাড়া নিয়েছে সে। মৃত প্রফেসরের স্মৃতি বিজরিত বাড়িতে সে থাকতে চায়নি। আজ সারা সকাল বাসা পাল্টাতে ব্যস্ত ছিলো।

তৃণা জানালো মোবাইলে মেয়েটার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে পারেনি। সম্ভবত নতুন বাসা গোছাচ্ছে, মোবাইলের দিকে খেয়াল নেই। অথবা অনলাইনে ক্লাস নিতে ব্যস্ত। এই সময়টায় তার ক্লাস থাকে। তবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া দু-জন হোমিসাইড ইনভেস্টিগেটর দোরগোড়ায় উপস্থিত হলে ডানা মাইন্ড করবে বলেও মনে করে না তৃণা।

থমথমে মুখে ড্রাইভ করছে আসিফ। জট পাকাচ্ছে রহস্য। অথবা খুলছে! কোনটা হচ্ছে সে জানে না। তবে তদন্ত বেশ ভালই এগিয়ে গেছে। মাত্র দু-রাত আগে খুন হয়েছেন প্রফেসর তানভীর জালাল আর কেমিস্ট্রি টিচার আনোয়ার। একই রাতে কেন? এ প্রশ্নের জবাব এখনও সে জানে না।

পরের রাতেই দ্বিতীয়বার আঘাত করেছে ভ্যাম্পায়ারের ভেক ধরে থাকা খুনি। মারা গেছে নিরীহ একটি মেয়ে। তাকে জবাই করার পেছনে খুনির কি কারণ থাকতে পারে? আরও ভালমত বলতে গেলে, ইভার মৃত্যুর সাথে ক্রিস্টিনার সম্পর্ক কোথায়? নিহতদের প্রত্যেকের মধ্যে একটি জিনিস ছিলো কমন-সম্ভবত তারা সবাই ছিলো ফ্রি মেসনারির সদস্য।

আসিফ ফ্রি মেসনদের পেছনে লাগতে চাচ্ছে না। তারা তাদের গোপন স্বার্থ নিয়ে কাজ করে গেলে তার কি মাথাব্যথা? কিন্তু মেসন হোক বা না হোক, যেকোন মানুষের হত্যাকারিকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব তার। সৈকত প্রতিশোধ নিতে খুন করেছে না নিজের স্বার্থে-এসব জানার কোন প্রয়োজন নেই। খুনিকে শাস্তি পেতেই হবে। যে উদ্দেশ্যেই করে থাকুক না কেন কাজটা।

ডানার বাসা পাল্টে ফেলার সময়টাও অদ্ভুত। মাত্র গতকাল সকালে প্রফেসরের লাশ পাওয়া গেছে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ওই বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছে মেয়েটা? গৌরব রায় কি করছিলো ওখানে? ফরহাদের কথা সে আসিফকে জানায়নি। ডানাই বা কিভাবে গৌরবের নাকের সামনে দিয়ে এভিডেন্স বাড়ি থেকে নিজের মালপত্র তুলে এনে আরেক বাসাতে চলে যেতে পারে?

এর মাঝে ইরফান এসে জুটেছে কেন তা ঠিক বোধগম্য নয়। ছেলেটা কিডন্যাপ করে বেড়াক তা আসিফের জন্য চিন্তার কারণ ন। কিডন্যাপিং কেসে অ্যান্টি-টেররিজমের দায়িত্ব। কিন্তু এই মার্ডার কেসে বিজয়ের অপহরণ ঠিক আছে না। এইসব হত্যাকাণ্ডের মধ্যে একটি কিডন্যাপ কি কারণে হতে পারে?

প্রথমেই যে সম্ভাবনাটা আসিফের মাথায় এলো-ছেলেটাকে কিডন্যাপ করেছে ইরফান। তারপর প্রফেসরকে ফোন করে নিজেকে ইনসুলিন নিতে বাধ্য করেছে। ছেলের নিরাপত্তার জন্য সবকিছু করতে পারতেন ডক্টর। এভাবেই সংঘটিত হয়েছে একটি হত্যাকাণ্ড। যেটাকে বলা হয় 'পরোক্ষ হত্যাকাণ্ড।' খুনি এখানে প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা রাখে না। পরোক্ষ হত্যাকাণ্ডে খুনি নিজের হাত রক্তে ভেজায় না।

এভাবেই হয়তো সরিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রফেসর তানভীর জালালকে। মোটিভ কি হতে পারে? হতে পারে সৈকতের মতো প্রতিশোধপরায়ণতা। কিংবা কেউ প্রতিশোধের

ঘোরে খুন করেছিলো প্রফেসরকে। দ্বিতীয় আরেকটি মেয়ের সাথে প্রফেসরের ছবি দেখা গেছে। ডক্টর খান দেখিয়েছিলেন। সেই মেয়ে বেঁচে আছে তো?

মেসনদের নির্দেশেও কাজটা করা হতে পারে। মেসনরা নিজেদের গোপনীয়তা বজায় রাখতে অতি উৎসাহি। প্রফেসরের কি তাদের গোপনীয়তা ফাঁস করে দিতে চেয়েছিলেন?

অন্যদিকে চিন্তা করলো আসিফ। সৈকত মেসনদের দু-চারজনকে খুঁজে বের করেছিলো। কিভাবে? তারা গোপনীয়তা পছন্দ করে। ইভার মাধ্যমে হতে পারে। ইভার বান্ধবি ছিলো ক্রিচিনা। ইভার শিক্ষক আবার আনোয়ার। এখানে একটা ভাল কানেকশন দেখা যাচ্ছে। খুব কাছের কেউ না হলে কোনমতেই মেসনদের কারও পরিচয় বের করার সম্ভাবনা সৈকতের ছিলো না। সম্ভব হয়েছে তার বোনও একজন মেসন বলেই। ইভার বয়স খুব কম ছিলো, সেজন্য হয়তো কথাটা গোপন রাখতে পারেনি। ডানার সাথে কথা বলে প্রফেসরের ব্যাপারে আরও কিছু জেনে তারপর এদিকটা নিশ্চিত হওয়া যাবে।

“স্যার, এখানে একটা ঝামেলা হয়ে গেছে,” চিন্তায় ছেদ ঘটাল জিয়া, “কোন ভিডিওতেই দেখলাম না গার্ড ছাড়া আর কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে। সবকিছু ক্লিন।”

“এখানে ঝামেলার কি আছে?” সামনের গাড়িটার জন্য রাস্তা একটু ছেড়ে দিতে দিতে জানতে চাইল আসিফ। “এমনটাই কি হওয়া স্বাভাবিক ছিলো না?”

“মাঝে দু-বার টাইম জাম্প করানো হয়েছে প্রতিটা ক্যামেরায়।”

“কিভাবে?”

“ত্রিশ সেকেন্ড করে নেই। সাড়ে বারোর দিকে একবার...আরেকবার সাড়ে চারটার দিকে।”

ভাববার বিষয়, তবুও অন্যান্য সম্ভাবনার কথা ভেবে দেখল আসিফ। “টেকনিক্যাল এরর? সে সময় ডাটা কালেকশনের জন্য বন্ধ করা হয় না তো?”

বাইরের দিকে তাকাল জিয়া। “এগুলোর ডাটা দিনের বেলায় কালেক্ট করার সম্ভাবনা বেশি না?”

জিয়ার কথায় যুক্তি আছে। আর কিছু বলে না আসিফ শুধু জিজ্ঞাসা চায়, “সময়গুলো জানাও।”

“১২:২৯:১৪ থেকে ১২:২৯: ৪৪ ব্র্যাংক। সরাসরি ব্লক জাম্প করেছে এখান থেকে ওখানে। আরেকটা স্যার, চারটা সাতাশে। দুই সেকেন্ড থেকে ত্রিশ সেকেন্ড।”

“ওই সময়ের মাঝেই বিজয়কে কিডন্যাপ করা হয়েছে, জিয়া। প্রথম ত্রিশ সেকেন্ডে ইরফান ভেতরে ঢুকেছিলো, লুকিয়ে ছিলো সে। তারপর বের হয়ে গেছে সুযোগ বুঝে। তাকে এ ব্যাপারে জানিয়েছো?”

“না, স্যার।”

“টেক্সট কর তাকে।”

“ভিডিও ডিলিট করলো কি করে?” মেসেজে অগ্রগতিটা অপারেটরকে জানাতে



জানাতে নিজেকেই প্রশ্ন করল জিয়া। “ও বাড়িতে আবার ঢুকতে হত সেক্ষেত্রে। ইরফান যদি ভিডিও ডিলেট করে থাকে তাহলে তাকে ফিরে আসতে হয়েছে। সে সময় বিজয়কেই বা কোথায় রেখেছিলো? বেশি সময় তার পাওয়ার কথা নয়। সকাল নয়টার মধ্যে পুলিশ আর আর্মি গিজ গিজ করছিলো ওখানে। থ্যাংকস টু জেনারেল জাহিদ।”

“কাজটা কঠিন ছিলো। ধারণা করতে পারতাম ডিলিটের কাজটা ইরফানই করেছে। কিন্তু এখানে একটা ঝামেলা আছে। সকাল আটটায় আশুলিয়াতে তাকে দেখা গেছে। অর্থাৎ ভিডিও ডিলেট করতে আবার ঢোকা তার জন্য একরকম অসম্ভব ছিলো। আরেকটা সম্ভাবনা থাকতে পারে।”

“কি সেটা, স্যার?” মোবাইলটা রেখে দিয়ে জানতে চাইল জিয়া।

“ত্রিশ সেকেন্ডের গ্যাপ যেটা দেখছো ওটা ইরফান ছিলো না। ওই দুই গ্যাপে আর কেউ বের হয়েছে এবং ঢুকেছে। কিন্তু কিডন্যাপ করেছে ইরফান। ভেতরে কয়েকটা ব্লাইন্ড-স্পট আছে। ক্যামেরা ফাঁকি দেওয়া কঠিন কিছু নয়। খুন করেছে আর কেউ, ইরফান নয়। সে গেছে ক্যামেরার সামনে দিয়ে। তার সহযোগি হয়তো ডিলিটের কাজটা করেছে। ঘরের ইদুর বেড়া কেটেছে।”

একটু কাশলো জিয়া। “আমি তৃতীয় একটি সম্ভাবনাও দেখতে পাচ্ছি, স্যার।”

সম্প্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল আসিফ।

“কিডন্যাপ এবং খুনের পেছনে ইরফানের হাত ছিলো। ভিডিও ডিলিশনের জন্য তাকে ইনসাইড হেল্প নিতে হয়েছে।”

“তা হতে পারে। এখন দেখা যাক, ডানা আমাদের প্রশ্নগুলোর কী উত্তর দেয়। সম্ভ্রষ্ট করতে না পারলে আরেকবার কাস্টডিতে নেব ওকে। এই মেয়ের মধ্যে ঘাপলা আছে, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।”

চমৎকার দোতলা বাড়িটার সামনে এসে গাড়ি থামাল আসিফ। তৃণার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এটাই প্রফেসরের শেফ ডানা বাতশিভার নতুন ঠিকানা। দরজা দুটো লাগিয়ে দিয়ে সেদিকে হটা দিল ওরা। অরক্ষিত একটি বাসা, নতুন বানানো হয়েছে। নিচে কোন সিকিউরিটি গার্ড নেই।

নির্দিষ্ট দোতলায় উঠে এলো ওরা। কলিং বেল একবার চাপ দিয়ে জিয়ার দিকে তাকালো আসিফ। “ফোন করে আসতে পারলে ভাল হত। হ্যারাসমেন্টের অভিযোগ আমাদের ওপর এমনি আসে না।”

বসের দ্বিধার কারণটা জিয়া বোঝে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক করে পাবলিকের বাড়ি-ঘরে হানা দেওয়াটা অন্য ডিটেক্টিভদের অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছে। এজন্যে কম বদনাম হোমিসাইডের হয়নি। এ নিয়ে এক মিটিংয়ে কড়া করে কথাও বলেছিলো আসিফ। যাকে জেরা করতে হবে তাকে একটা ফোন করে নিলেই কেউ অভিযোগ করতে পারে না। মিটিংয়ে যেটার বিরুদ্ধে কথা বলেছিলো, এখন ঠিক সেই কাজটাই করতে হচ্ছে। এজন্যে নিজের ওপর বিরক্তি তার।

দুই মিনিট অপেক্ষা করে দ্বিতীয়বার বেল চাপলো আসিফ। ভেতরে ডানা অনলাইন ক্লাস নিচ্ছে না তো? সেক্ষেত্রে আসিফ আর জিয়া নিশ্চিতভাবেই মামলা খেতে যাচ্ছে। দূরদেশের শিক্ষার্থীরা নিশ্চয় চাইবে না তাদের দীক্ষাগুরু লেসনের মাঝে কলিংবেলের মুহূর্মুহ শব্দ হোক!

তৃতীয়বার বেল চাপার পরও যখন ডানার কোন পাতা পাওয়া গেলো না, আস্তে করে কোটের আড়াল থেকে পিস্তলটা বের করলো আসিফ। চোখের ইশারায় জিয়াকে নির্দেশনা দিল। ও এক পা পিছিয়ে এসেছে। একইসাথে জিয়া এক পা এগিয়ে গেলো। ফলে জিয়াকে তো বটেই, দরজা খোলামাত্র ভেতরটাও কাভার দিতে পারবে আসিফ।

জিয়া এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আচমকা কাঁধের এক ধাক্কায় দরজা খুলে ফেললো ও। লাফিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলো আসিফ। অস্ত্র তুলে রেখেছে দু-হাতে। পেছনে জিয়া এবার ওকে কাভার দিচ্ছে।

“ডানা?” আস্তে করে ডাকলো আসিফ। “মিস ব্যাতিভা?”

কোন সাড়া শব্দ নেই। পা টিপে টিপে ওরা বেডরুমের দিকে এগিয়ে গেলো। প্রতিটি ঘরের মাঝে একবার করে উঁকি দিতে ভুলল না তার আগে। বেডরুমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। খুলতে গিয়ে আসিফ থমকে গেলো।

রিংটোনের শব্দ হচ্ছে আর শব্দটা আসছে আসিফের পকেট থেকে। বাসা কাঁপিয়ে ‘শি ইজ অ্যা পাইরেট বাজছে।’ নিজেকে মনে মনে গালি দিয়ে উঠলো সে। সব সময় ফোনটা ভাইব্রেশনে থাকে। রিংটোনে নিয়ে এলো কে? জিয়ার কাজ নির্ঘাত! ভিডিও দেখার জন্য মোবাইলটা ওর হাতে দিয়েছিলো।

আর লুকোচুরির মানে নেই, রাস্তা থেকেও আসিফের রিংটোন শোনা যাবে। এক লাখি মেরে বেডরুমের দরজা খুলে ফেললো।

জিয়ার পিস্তল ধরা হাত ঝুলে পড়েছে। বিছানার ওপর চাপা দিয়ে রাখা কাগজটার দিকে এগিয়ে গেলো সে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে পকেট থেকে ফোন বের করে রিসিভ করলো আসিফ।

“হ্যা, তৃণা...আমি একটা এনকাউন্টারে ছিলাম। পরে কথা বলি?”

“সরি, স্যার। এটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। আমরা মেয়েটিকে পেয়েছি।”

“কোন মেয়ে?” হতভম্ব হয়ে বলল আসিফ।

“ইরফানের গার্লফ্রেন্ড। নুসাইফা আজমাইন ফারিহা। কাফরুলের কাছে থাকে। মিরপুর চৌদ্দও বলা যায়। রেডফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ইলেকট্রিক্যাল নিয়ে পড়ছে।”

“দেরি না করে টোয়েন্টিফোর-সেভেন সার্ভিল্যান্সার লাপাও ওখানে। ইরফান মনিপুরে ছিলো কাল। কাফরুল থেকে খুব একটা দূরে যা জায়গাটা। এই মুহূর্তে মেয়েটির বাসায়ও থাকতে পারে সে। ফারিহার পূর্ণ ঠিকানা আমাকে টেক্সট করে দাও। আমি যাচ্ছি ওখানে।”

বিছানার তাকিয়ে শান্তকণ্ঠে নির্দেশনা দিয়ে গেলো আসিফ। হতভম্ব হয়ে বসের দিকে তাকালো জিয়া। মানুষটার মাথা কতই না ঠাণ্ডা। কোন উত্তেজনার ছোঁয়া নেই সেখানে।

“ডিটেক্টিভ রেজা আপনার উপস্থিতি ভাল চোখে নাও দেখতে পারে,” সতর্ক করে দিয়ে বলল মেয়েটি।

“রেজার দিকে তাকালে চলবে না, তৃণা। ধরতে হবে ইরফানকে। এখনই। পরে ছেলেটাকে আর পাওয়া যাবে না। সবচেয়ে বড় কথা, রেজা কী চাইছে তা জেনে আমার কাজ নেই। প্রফেসর জালালের মার্ডার কেসটা এখানে ক্রোজড হয়ে গেছে।”

“হত্যাকারি কে সে ব্যাপারে জানতে পেরেছেন?” অগ্রহ থাকলেও নিরুত্তাপ গলাতেই জানতে চাইল অপারেটর।

“প্রফেসরের শরীরে ইনসুলিন পুশ করেছিলো তার কুক ডানা। স্বীকারোক্তিও দিয়েছে সে। ইরফান কি তার সাথে কাজ করছিলো? তা আমরা কোনদিন জানতেও পারবো না।”

“কেন?”

“মেয়েটা সুইসাইড করেছে, তৃণা। ইরফান তার সাথে কাজ করছিলো কি-না এই প্রশ্নটা তাকে সরাসরি করে জেনে নিতে হবে। হারামজাদা এখনও নাগালের বাইরে যেতে পারেনি। সার্ভিল্যান্স বসিয়ে আমাকে লোকেশন টেক্সট করো। আর ডানার ঠিকানায় ক্রাইম-সিন ইউনিট পাঠাও দয়া করে।”

ডানা বাতশিভার পড়ে থাকা হালকা শরীরটার দিকে একবার তাকালো আসিফ। রক্তে ভিজে আছে মেঝে, সেই মেঝেতেই পড়ে আছে মেয়েটা। নিজের বাম হাতের রং কেটে ফেলেছে, তারপর যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে বিছানা থেকে মেঝেতে গড়িয়ে পড়েছে। রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে বেডশিট, বালিশের কভার।

কাজটা করার আগে একটা সুইসাইড নোট লিখে গেছে ডানা। কেন এবং কিভাবে প্রফেসরের ছায়ায় সে বেড়ে উঠেছিলো, কিভাবে প্রফেসর নিজের বাসায় তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, বাইরের মানুষজন মনে করতো তাকে বুঝি দত্তক নেওয়া হয়েছিলো। অথচ, শব্দটা দত্তক নয়, ‘রক্ষিতা’ হওয়া উচিত ছিলো বলে মন্তব্য করেছে ডানা। প্রতিরাতে প্রফেসর তাকে কিভাবে উপভোগ করতেন তাও পরিষ্কার লিখে গেছে। পর্ন-ম্যাগাজিনের চেয়ে কম রসালো বর্ণনা নয় সেটা।

প্রফেসরের যৌনজীবন বিকৃত রুচির ছিলো। ডানার ঘরে ক্যামেরা বসিয়েছিলেন তিনি। তার সাথে ডানার সম্পর্কের শুরুটা স্বেচ্ছায় হয়েছিলো, শেষটা ন্যূনতম। মেয়েটা তার জীবন থেকে আর সরে আসতে পারেনি। পরিষ্কার করে বললে, তাকে সরে আসতে দেয়া হয়নি। রেকর্ডকৃত ভিডিও দিয়ে ব্ল্যাকমেইল করতেন প্রফেসর। উপাদেয় সঙ্গিনীকে ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছে তার ছিলো না। এক পর্যায়ে ডানা বুঝে যায় এর হাত থেকে তার মুক্তি নেই। তিলে তিলে জমে ওঠা ঘৃণা সে ধরে রাখতে পারেনি। তাই তাকে অজ্ঞান করে ইনসুলিন পুশ করে দিয়েছিলো। অচেতন দেহটিকে রান্নাঘরের ট্রলিতে তুলে ল্যাভে নিয়ে গেছিলো সে। প্রফেসরের কি-কার্ড ব্যবহার করে ভেতরে লাশটা ফেলে এসেছিলো। কি-কার্ডও রেখে এসেছিলো মৃতদেহের সাথে। ল্যাভে ঢুকতে কি-কার্ড লাগলেও বের হতে এর কোন প্রয়োজন নেই। অথচ খুনের পরেও জীবনে শান্তি ফিরে আসেনি তার। প্রথমে ভেবেছিলো একই বাড়িতে একই

বেডরুমে থাকতে গিয়ে এমনটা লাগছে। কাছেই নতুন এক বাড়ি হচ্ছিলো, কয়েকদিন ধরেই এতে টু-লেট দেখেছে সে। একদিনের নোটিশে বাসাটা ভাড়া করে এখানে চলে এসেছে। কিন্তু শূন্যতা কাটাতে পারেনি। তার সর্বাঙ্গ গ্রাস করে নিয়েছে সে শূন্যতা।

ছোট করে ডানা লিখেছে, সম্ভবত সে প্রফেসরের প্রেমে পড়েছিলো। বিবেকের কাছে হার মেনেছে প্রেম। হত্যা করতে তার দ্বিধা হয়নি। কিন্তু এখন প্রেমের কাছে হার মানতে চলেছে বিবেক। কাজেই আরেকটি প্রাণ সে নিচ্ছে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঘন কালো চুল রক্তের ওপর এলোমেলোভাবে বিছিয়ে আছে। খোলা চোখদুটোর গাঢ় নীল মণিগুলো বাইরের আলো প্রতিফলিত করছে অবিরাম। অপার্থিব সৌন্দর্য নিয়ে অপার্থিব যন্ত্রণায় মারা যাওয়া মেয়েটার হাতের কাছে রক্ত দিয়ে দুটো অক্ষর লেখা।

XO

কিস অ্যান্ড হাগ?

মেয়েটি মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যে এই গভির ভালবাসা কার উদ্দেশ্যে দেখিয়েছিলো?

প্রফেসর তানভীর জালালকে?

নাকি মৃত্যুকে?

BanglaBook.org

অদ্ভুত আকৃতির বাড়িটা চোখে পড়তে গাড়ির গতি কিছুটা কমালো আসিফ।

চারপাশে বিস্তর জায়গা পড়ে আছে। এটাকে মাঠ বলবে না মঠ বলবে তা নিয়ে দ্বিধায় ভুগতে শুরু করার আগেই চিত্তার গতিরোধ করলো সে। বাড়িটি প্রাচীন ধাঁচে তৈরি, অথচ বয়স খুব বেশি হলে এক বছর হবে। চমৎকার কিছু গাছ দাঁড়িয়ে আছে চারপাশে। সারিবদ্ধতা দেখে বোঝা যায় পরিকল্পনা মারফিক এখানে তাদের লাগানো হয়েছিলো। সুন্দর ছায়াঘেরা পরিবেশ, যেখানে আসলেই শান্তির কথা মনে পড়ে যায়। বাড়িটা নতুন হলেও গাছগুলো নিশ্চয় নয়। গেটের ওপরে থাকা তিনটি অক্ষর দেখে সিটের ওপর শক্ত হয়ে বসলো আসিফ।

## O.T.O

অদ্ভুতভাবে বাড়ির সামনে গাড়ি পার্ক করে নেমে এল একপাশের দরজা খুলে। অন্যপাশ দিয়ে জিয়া।

“স্যার, ডানা যদি আমাদের কিলার হয় এখানে কি করতে এসেছি আমরা?”

“আমাদের কেস নিয়ে কাজ করতে। সৈকতের কথা ভুলে যাচ্ছ?”

দু-পাশে মাথা নাড়লো জিয়া। “সৈকত সম্ভবত এদের বিরুদ্ধে কাজ করেছিলো। সেক্ষেত্রে তারা সৈকতকে চিনলেও স্বীকার করবে না। তার বোনের মৃত্যুর পেছনে এদের হাত থাকলে অপরাধ তারাও করেছে।”

“আমার মনে হয়, এরা আমাদের কাজে আসবে। সৈকত এদের মিত্রপক্ষ ভাবেনি তাই বা কিভাবে নিশ্চিত হচ্ছ?”

“ফ্রি মেসনারির বিরুদ্ধ দল?”

পরিবেশটা একবার দেখলো আসিফ। “একই ধারার ধর্মীয় ব্যাপার-স্যাপার যখন, হতে বাঁধা কোথায়?”

দরজা খুলে দিল ফিটফাট পোশাক পরা এক লোক। নতুন মানুষ দেখে চমৎকার হাসি উপহার দিয়ে ঢোকান জায়গা করে সরে দাঁড়ালো একটু।

“ওটোতে আপনাদের স্বাগতম। মিনেরভালদের জন্য নীচতলার ওখ রুমে চলে যেতে হবে।”

“এখানে আমরা দীক্ষা নিতে আসিনি,” ব্যাজ দেখিয়ে বলল আসিফ, “ইনচার্জ কে আছে? তার কাছে নিয়ে চলুন আমাদের।”

মুখের চমৎকার হাসিটি মুছে গেছে মানুষটার। মাথা দুলিয়ে অনিচ্ছায় সম্মতি দিল সে। “একটু বসুন তাহলে এখানে। আমি জানানোর ব্যবস্থা করছি।”

দেয়াল ঘেঁষে চমৎকার একটা কাউচ এখানে। জানালা দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়ছে। বসে পড়ল ওরা।

প্রথমবারের মতো চারপাশে তাকানোর সময় হলো ওদের। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো আসিফ। একটু আলাদা ধাঁচের গঠন এই বাড়িটার। ছানে ছানে পিলার। লম্বা আর ফাঁকা এই ঘরটা। অ্যাসেম্বলি রুমের মতো। এখানে কি করা হয় তা নিয়ে একটা প্রশ্ন জেগেছে ঠিক, তবে সেটা করার মতো কাউকে চোখে পড়ছে না। জনশূন্য ঘর।

শেষ মাথায় বিশাল দরজাটা। ওদের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া লোকটা ওদিক দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো। দরজার ওপর অন্যরকম ফন্টে লেখা :

## Ordo Templi Orientis

ওটোর পূর্ণ নাম সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গেলো ওরা।

হলওয়ে ধরে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে রাখা হয়েছে অদ্ভুত ধরনের কিছু মূর্তি। অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক সিংহ। মিশরের পিরামিডে এধরনের মূর্তি ছিলো বলে মনে পড়ে ওদের। দেওয়াল জুড়ে বিভিন্ন ধরনের পেইন্টিং। কাঁচের তৈরি বেশ কিছু পাত্র দেখা যাচ্ছে দেওয়ালের সাথে থাকা র্যাকগুলোতে। অদ্ভুত ধরনের স্ট্রাকচার-কোনটার কি অর্থ কে জানে! মিনিট পাঁচেক দেখে হাল ছেড়ে দিল আসিফ।

“ফ্রি মেসনদের মতো লুকিয়ে চুরিয়ে থাকার স্বভাব এদের নেই। এটা একটা ভাল দিক।” একটু হাসলো জিয়া।

“হু। ওটোর লজ তো চোখের সামনে বানিয়ে রেখেছে। মেসনদের সাথে যায় না। সম্ভবত এদের উদ্দেশ্য আলাদা।”

মাথা দোলাল জিয়া। “সেটা কতটা সৎ সময়ই বলে দেবে।”

খুঁট করে দূরের দরজাটা খুলে গেলো। আবারও ভেতরে ঢুকেছে সেই লোকটা। এবার মুখের গাঙ্গীর্ঘতা কেটে গিয়ে নির্মল হাসি খেলা করছে সেখানে। “আসুন। অপেক্ষা করছেন আরএসএস। আপনাদের সাথে দেখা করতে রাজি হয়েছেন তিনি।” কাছে এসে জানালো মানুষটা।

মাথার ওপর দিয়ে গেলো ওদের। “আরএসএস?”

“রেক্স সামাস স্যাংকটিসিমাস। আমাদের এখানকার সবচেয়ে উচ্চপদস্থ যিনি।”

“অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে,” কৃতজ্ঞতা জানালো আসিফ।

বড় দরজাটা খুলে ওদের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো এবার। এদিকেও পিলারের ছড়াছড়ি। সংকীর্ণ একটা দরজা খুলে আহ্বান জানালো পৃথিবীদর্শক মানুষটি। ওদিকে ঢুকে চিকন সিঁড়িটা চোখে পড়ল। দেয়ালে আছে পেইন্টিং। একটা পেইন্টিং হোল্ডার মেরামত করছে বয়স্ক এক লোক। ওদের দেখে জড়োসরো হয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকলো। আলতো করে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো লোকটা।

“নিম্নপদস্থরা দেখা যাচ্ছে কোন এক কারণে ভয়ে সিঁটিয়ে আছে,” মন্তব্যের সুরে খোঁচা মারলো আসিফ।

“ভয় নয়, শ্রদ্ধা। এখানে একে অন্যকে শ্রদ্ধা করার ব্যাপারটা পাবেন। ও ছাড়া মানব সমাজ অচল, মিস্টার-?” প্রশ্নবোধক দৃষ্টি মেলে একবার পেছনের দিকে তাকালো লোকটা।

“আসিফ আহমেদ। আপনার নাম জানতে চাওয়া কি ওটো লজের নিয়মের বাইরে পড়বে?”

মাথা দোলালো সে। “তা কেন হবে? আমার নাম এরাশ।”

এরাশ কোন জাতের নাম? অথবা আদৌ আসল নাম কি-না তা নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়ল ও। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। “আপনিও নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ কোন পদে আছেন? আপনাদের লজের ব্যাপারে আলোকপাত করলে খুশি হতাম। এর আগে কোন ওটোতে পা রাখার সৌভাগ্য হয়নি।”

মুচকি হাসলো এরাশ। “আমাকে রাঘব বোয়াল ভাববেন না। শুধুই একজন পিআই আমি।”

“প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর?” অবাক হয়ে গেলো জিয়া।

“পারফেক্ট ইনিশিয়েট। তবে আমার নিচেও অনেক স্তর আছে। ধীরে ধীরে উন্নতি হয় সাধকের।”

“ঠিক কি নিয়ে সাধনা করছেন আপনারা?”

সিঁড়ি ভাঙা শেষ। লম্বা হলুদে ধরে হাটছে এখন ওরা। কোমর থেকে একটা চাবি বের করতে করতে জবাব দিল এরাশ, “সূর্যকে জ্ঞানের আধার বিবেচনা করে আত্মশুদ্ধি অর্জনের চেষ্টা করি আমরা।”

“আত্মশুদ্ধি?”

“ইসলামে যেমন বলে নফ্‌সের নিয়ন্ত্রণ-ঠিক তাই।” বন্ধ দরজার নবে চাবি ঢুকিয়ে দিল সে। “ভাববেন না, আপনাদের সব প্রশ্নের জবাব দেবেন আরএসএস।”

কেন এখানে দু-জন হোমিসাইড ডিটেক্টিভ এসেছে তা নিয়ে একটা প্রশ্নও করেনি মানুষটা, দেখে সম্ভ্রষ্ট হলো আসিফ। সম্ভবত এরা বাড়তি কৌতুহল দেখানোর ক্ষেত্রেও নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখে।

ঘড়ঘড়ে একটা শব্দ করে বিশাল দরজাটা খুলে গেলো। প্রথমে নজরেই এলো না, অন্ধকার সয়ে যেতে বড় ঘরটার শেষ মাথায় একটি মাত্র নিঃসঙ্গ টেবিল দৃষ্টিগোচর হলো। দরজা বাদে প্রতিটি দেওয়াল বইয়ের তাক দিয়ে সাজানো লাইব্রেরিগুলোর মতো। ভারি মলাটের বইগুলো প্রাচীন। টেবিলের ওপর প্রাচীন বইয়ের দোয়াত আর কালি রাখা। তবে ঘরের সবচেয়ে প্রাচীন যিনি তিনি বসে আছেন ডেস্কের অপর প্রান্তে। মনোযোগ দিয়ে কিছু একটা লিখছেন।

দু-পা এগিয়ে আসিফ আর জিয়া ঢুকে পড়ল, পেছনে ঘড়ঘড়ে শব্দে লেগে গেলো দরজা, তবুও মুখ তুলে তাকালেন না বয়স্ক মানুষটি। ইনিই এখানকার আরএসএস হবেন-অনুমান করলো আসিফ।

ডেস্কের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। এতক্ষণে দোয়াতে কলমটা রেখে হাসিমুখে

তাদের দিকে তাকালেন আরএসএস। তারপর আঙুল করে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখালেন।

“আপনাদের অর্ডো টেমপলি ওরিয়েন্টিস বাংলাদেশ লজে স্বাগতম। বসুন।”

চটজলদি বসে পড়ল ওরা। আসিফ দুই হাত এক করে এনেছে ডেকের ওপরে, “ধন্যবাদ। এদেশে আপনাদের একটাই লজ তাহলে?”

বুড়ো মানুষটা মাথা দোলালেন। “আপাতত। ভক্ত আর অনুসারীদের সংখ্যার ওপর নির্ভর করবে আমাদের কিস্তার। বাই দ্য ওয়ে, আমি কেনেথ গ্র্যান্ট।”

“ডিটেক্টিভ আসিফ আহমেদ। এ আমার সহকারি ডিটেক্টিভ জিয়া।”

কেনেথ গ্র্যান্ট চোখ কুচকালেন, “বেশ, কিন্তু হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট থেকে দু-জন ডিটেক্টিভ যদি দীক্ষা নিতে না এসে থাকেন তাহলে কেন এসেছেন তা আমার ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না।”

“একাধিক মার্ডার কেস নিয়ে কাজ করছি আমরা। একটা পর্যায়ে আপনাদের ব্যাপারে আমাদের কৌতূহল হতে হয়েছে,” এটুকুই বলল আসিফ। এসেছে ওয়ারেন্ট ছাড়া। ঘাড় ধরে বের করে দিলে কিছুই বলার থাকবে না।

দুর্ব্যবহারের কোন লক্ষণ কেনেথের চোখেমুখে দেখা যাচ্ছে না, অমায়িক হাসিটা ফিরে এসেছে মুখে। “এখানে ধর্মিক আত্মাদের বসবাস, স্যার। সবাই নিজেকে পরিশুদ্ধির কাজে ব্যস্ত। খুন তো দূরের কথা, অন্য কারও ক্ষতির চিন্তাও এদের মাথায় আসতে পারে না। আমাদের শিষ্যদের কথা বলছি।”

মাথা নাড়ল আসিফ। “আপনাকে সম্ভবত আমি পরিষ্কার করে বোঝাতে পারিনি। আমরা আপনাদের লজের কাউকে খুনগুলোর জন্য সন্দেহভাজন মনে করছি না। তবে আমাদের কিছু তথ্য প্রয়োজন। আপনাদের বিশ্বাস সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে।”

“কারণটা জানতে পারি কি?” কপালে ভাঁজ ফেলে তাকালেন আরএসএস।

“হতে পারে আমাদের খুনি আপনাদের বিশ্বাসে বিশ্বাসি। অথবা তার বিশ্বাস আপনাদের ঠিক বিপরীত। তবে ওটো লজের মূল বিশ্বাসটুকু জানতে না পারলে একটা সিদ্ধান্তে আমরা আসতে পারছি না।”

একটু চিন্তা করলেন কেনেথ, তারপর অস্বস্তির সাথে শীর্ণ হাত দিয়ে কপাল ঘষলেন কয়েকবার। “আপনাকে আমি তথ্য সাহায্য না করলে নিশ্চয় চূপচাপ ফিরে যাবেন, এরপর ওয়ারেন্টসহ ফিরে এসে জোর খাটাবেন? আমরা আপনাদের বিশ্বাসের ব্যাপারে বাইরের কারও সাথে কথা বলি না। আপনাকে অর্ডো দীক্ষা নিতে হবে। আমাদের একজন হলে আপনাকে সব জানাতে কোন আপত্তি থাকবে না।”

“তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে, দীক্ষা নেওয়ার আগে আপনাকে তাহলে শুধু ‘পরিশুদ্ধি’ বলেই আমাকে বুঝ দেবেন?” ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল আসিফ।

“ঠিক তা নয়। আপনারা মানবজাতির মঙ্গলের জন্য কাজ করছেন। হত্যাযজ্ঞ আমাদের নিয়মের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। একজন খুনির শাস্তির প্রয়োজন আছে। তাছাড়া আমাদের বিশ্বাসের ব্যাপারে বাইরের কাউকে কেন জানাতে অগ্রহি নই আমরা তা



আপনিও জানেন, ডিটেস্টেড। এদেশের মানুষ খুব একটা সহনশীল নয়। একেশ্বরবাদের বিপরীতে আর কিছু দেখলে তারা বাঁধা দিতে এগিয়ে আসে। অথচ ধর্মপ্রচারে সবারই স্বাধীনতা থাকা উচিত, তাই না?”

এর কোন উত্তর দিতে পারলো না আসিফ। আসলে মেজরিটি বাংলাদেশিদের কটুর মনোভাবের জন্য সব সময় লজ্জাবোধ করে এসেছে সে। আরএসএস ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছে তা সে বুঝেছে। এখানে আসলেই বলার মতো কিছু নেই। বহিরাগতদের সাথে গোপনীয়তার নীতি নেওয়ার পেছনে ওটো প্রধানের যথেষ্ট কারণ আছে।

নীরবতা ভাঙলেন আরএসএস। “আমাদের বিশ্বাসের ব্যাপারে বলতে পারি, তবে এই ঘরের বাইরে একটি শব্দও যেন না যায় সে কথা দিতে হবে।”

“আমরা কোথাও মাইকিং করতে যাচ্ছি না,” প্রথমবারের মত মুখ খোলে জিয়া।

“বিশ্বাস কিভাবে করবো? আমাদের ব্যাপারে অবিশ্বাসিরা এমনতেই পেছনে লেগে আছে, অথচ আমরা ঝামেলা চাই না। নিজ নিজ বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার এদেশের নাগরিকের আছে।”

“তা আছে। আর সেটাকে সম্মান করেই আপনাদের ব্যাপারে কথা ছড়িয়ে বেড়ানোর ইচ্ছে আমার নেই। একটাই শর্ত, আইনবিরুদ্ধ কিছু করছেন না এখানে, এই নিশ্চয়তা যদি দিতে পারেন, তাহলে এ ঘরের বাইরে কোন কথা যাবে না।”

আসিফের গলার দৃঢ়তাটুকু স্পর্শ করলো বৃদ্ধকে। খুঁটিয়ে একবার ওর মুখ দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। “আপনার কথা আমার পছন্দ হয়েছে, মি. আসিফ। মিছে প্রতিজ্ঞা করার লোক আপনি নন। মি. জিয়াকেও সেরকম কেউ বলে মনে হচ্ছে না। তাহলে আমরা একে অপরকে বিশ্বাস করতে পারি? আপনাদের কেসের উপকারে আসার জন্য আমাদের বিশ্বাস নিয়ে মুখ খুলছি আমি।”

“ঠিক আছে।”

দু-হাত খুতনিতে ঠিকালেন কেনেথ গ্র্যান্ট। ভাবছেন ঠিক কোথা থেকে শুরু করবেন। ত্রিশ সেকেন্ড পর মনস্থির করে মুখ তুললেন আবার। “অর্ডো টেমপলি ওরিয়েন্টিস-শব্দ তিনটির ইংরেজি করলে দাঁড়াবে অর্ডার অব দ্য টেম্পল অব দ্য ইস্ট। বেশিদিন আগে এর প্রতিষ্ঠা হয়নি। এই বিংশ শতাব্দীতেই অ্যাথিস্টদের ক্রাউলির হত ধরে ওটোর যাত্রা শুরু। নস্টিসিজমের সাথে আমাদের খুব একটা পার্থক্য নেই। তবে অনেক জায়গায় মতভেদ আছেও।”

“নস্টিসিজম শব্দটা আমার কাছে নতুন—”

আসিফ বাক্য শেষ করার আগেই জিয়া মুখ খুলল, “নস্টিসিজমের মূল ধারণা হলো জ্ঞানার্জন, তাই তো? স্রষ্টাকে পেতে হলে আমে দরকার যথেষ্ট জ্ঞান—এমনটাই মনে করে তারা। তবে এটা খ্রিস্টান ধর্মের সমান্তরালে চলে আসে না? ওটো কি এক প্রকার মিশনারি মিশনে আছে তাহলে?”

জিয়াকে উত্তেজিত হতে দেখে একটু হাসলেন কেনেথ। “নস্টিসিজমকে মাঝে

লম্বা একটা সময় খ্রিস্টান ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত বলে মনে করা হয়েছে। কারণ ছিলো অবশ্য। তাছাড়া এই বিশ্বাসের ছড়াছড়ি দেখা গেছে খ্রিস্টধর্মের প্রচলনের ঠিক পর থেকে। এর আগে নস্টিকদের কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। তাই বলে খ্রিস্টান ধর্ম আর নস্টিক বিশ্বাস মোটেও একরকম নয়।”

কালির দোয়াতটা একপাশে সরিয়ে রাখলেন লজের আরএসএস। “খ্রিস্টান ধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে ঈশ্বরের নির্দেশে। আর নস্টিক বিশ্বাসে আছে অন্য রকম ধারণা। এই এক উদাহরণেই আপনাদের প্রমাণ দিতে পারবো নস্টিক বিশ্বাস মোটেও খ্রিস্টানদের সাথে যায় না। দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। নস্টিসিজমের ধারণা, দুটো ভিন্ন ধরণের জগত আছে এখানে। আপার ওয়ার্ল্ড বলে যেটাকে তারা চেনে সেখানেই গডের বসবাস। আত্মা আর বিশুদ্ধতার জগত ওটা। ইসলামে যেমন বলা হয় আল্লাহ তার আরশে বসে ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করেন—সেই জগতটা কিন্তু আমাদের মাটির পৃথিবী নয়। আর দ্বিতীয় জগতটা হলো লোয়ার ওয়ার্ল্ড। এটা রক্ত-মাংসের জগত। আমাদের পৃথিবী বা সমগ্র ইউনিভার্স। আপনাদের বিশ্বাস অনুযায়ী প্রথম আকাশের নিচে যা আছে—সবই।”

একটু ভাবলো আসিফ। “এরকম তো সব ধর্মবিশ্বাসেই আছে বোধহয়। হিন্দুদের দেবলোক, মুসলিমদের ক্ষেত্রে সাত আসমান, প্রথম আসমান বাদে বাকিগুলো আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। আপার ওয়ার্ল্ড-লোয়ার ওয়ার্ল্ডে ক্লাসিফিকেশন করতে থাকলে এরকমটা সবার ক্ষেত্রেই পাওয়া যাবে। খ্রিস্টান ধর্ম থেকে নস্টিসিজমের উৎপত্তিতে অবাক হওয়ার কিছু দেখছি না।”

কেনেথ একটু হাসলেন। “ডেমিয়ার্জ কাকে বলা হয় তা কি জানেন আপনারা?”

চুপ হয়ে গেলো আসিফ। জিয়াও ফেল মেরেছে এবার। হাঁড়ির মতো মুখ করে বসে থাকলো প্রাচীন ধর্ম নিয়ে শখেরবশে ঘাঁটাঘাঁটি করা গোয়েন্দা।

“সুপ্রিম বিইং বলা হয় সর্বময় ক্ষমতার অধিকারিকে। একেক ধর্মে একেক নামে এই সুপ্রিম বিইংকে ডাকা হয়। ভগবান, ঈশ্বর, আল্লাহ বা যাই বলেন না কেন, ওই হলো সর্বশক্তিমান। আর ডেমিয়ার্জ বলা হয় ইন্টারমিডিয়ারি বিইংকে। নস্টিসিজম ইন্টারমিডিয়ারি বিইংয়ে বিশ্বাস করে। খ্রিস্টানরা তা করে না। পার্থক্যটা দেখতে পাচ্ছেন?”

“ইন্টারমিডিয়ারি?”

“সরাসরি কাজ করেন না সুপ্রিম বিইং, ইন্টারমিডিয়ারি বিইংকে দিয়ে করান। এটা ছিলো নস্টিক বিশ্বাস। আর এই ডেমিয়ার্জ হিসেবে তারা বিশ্বাস করতো শয়তানকে।”

শরীর শক্ত হয়ে গেলো আসিফ আর জিয়ার। দ্বি মেনসনের মাঝে শয়তানকে ক্ষমতাময় ভাবার প্রবণতা আছে। এখানেও বিষয়টা ধীরে ধীরে ঘুরে যাচ্ছে সেদিকে। সৈকত কেন এদের নাম লেখেছিলো তার রিসার্চ লিস্টে? কষ্ট করে কেন ঠিকানা জোগাড় করেছিলো সে? চিন্তাগুলো পাখা মেলতে চাইলেও জোর করে থামিয়ে রাখলো

আসিফ। আগেই একটা সিদ্ধান্ত হুট করে নেওয়ার ফলে কানাগলিতে ঢুকে পড়তে হতে পারে।

“এই বিশ্বাস অনেকের পাগলামিতে রূপ নেয়। ধারণা করতে থাকে, ইন্টারমিডিয়েরি বিইংকে সুপ্রিম বিইংয়ের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। শয়তানের পূজা শুরু করে তারা। আর ঠিক যে কারণে নস্টিসিজমের গড়ে ওঠা, জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে লোয়ার ওয়ার্ল্ড থেকে আপার ওয়ার্ল্ডের দিকে যেতে থাকার প্রক্রিয়াটি যায় থেমে। উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যায় তাদের। আমাদের সাথে নস্টিসিজমের বিরোধটা ঠিক এখানেই। ফ্রি মেসনারির সাথেও।”

“ফ্রি মেসনারির সাথে আপনাদের বিরোধ?” এতটাই অবাক হয়েছে আসিফ, মুখ থেকে প্রশ্নটা বেরিয়ে পড়ল অজান্তে।

“অবশ্যই। চমৎকার উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি হওয়া সংঘটা এখন পাগলদের আড্ডাতে পরিণত হয়েছে। জ্ঞানের দিকে বেড়ে ওঠার কথা তাদের, সেখানে বাড়ছে প্রাচীন অন্ধকার বিশ্বাস। অমানবিকতা আর আত্মধ্বংস।”

চট করে জিয়া প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল, “বাংলাদেশে মেসনদের অস্তিত্ব আছে বলে মনে করেন আপনি?”

মাথা নাড়লেন কেনেথ। “নেই—একথাটা জোর দিয়ে বলতে পারি না। তবে ওরা নিজেদের গোপন রাখতে পছন্দ করে। আলোর পথ থেকে সরে গেলে এমনটা হয়, ডিটেক্টিভ। লুকিয়ে কাজ করার প্রবণতা আসবেই। মেসনিক লজ খুঁজে পাওয়া একটা ঝামেলার কাজ। তারা গ্র্যান্ড লজ ছাড়া আর কোন লজকেই ফোকাসে আনতে চায় না। অথচ, আমাদের লুকানোর কিছু নেই। আমাদের বিশ্বাস, আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে সাথে নিজেদের প্রস্তুত করে তুলতে পারলে একদিন আমরা সৃষ্টিকর্তাকে পাবো। এখানে অযথা শয়তানের দিকে ঝুঁকে পড়ার তো কোন যুক্তি নেই, যুক্তি নেই অযথা ঈশ্বরকে খোঁজার মধ্যেও।”

“আপনারা ঈশ্বরকে খোঁজেন না, অথচ ধর্মীয় চেতনা কিভাবে কাজ করে?”

গম্ভীর হয়ে গেলেন কেনেথ গ্র্যান্ট। “যখন যথেষ্ট জানবেন তখন ঈশ্বরই আপনাকে খুঁজে নেবেন। বাড়াবাড়ি করে ঈশ্বরকে ডাকার কিছু নেই।”

“আপনাদের রিচুয়ালে তাহলে কি হয়?”

“নিজেকে জানার চেষ্টা। ঈশ্বরকে না অবশ্যই। তিনি নিজে থেকে না জানালে আমাদের পক্ষে তার সম্পর্কে জানা তো সম্ভব নয়। খুবই সহজ লজিক। এটাই গ্রহণ করতে চায় না কেউ।”

“প্রাচীন ধর্ম ফেলে নতুন কিছু গ্রহণের ইচ্ছে মানুষের মাঝে পাবেন না বলেই মনে হয়,” নিজস্ব মত দিল জিয়া।

“নতুন কিছু? সভ্যতার আগে থেকে আছে আমাদের এই বিশ্বাস।”

হালকা খোঁচা দিল আসিফ, “এখন এডিট করেছেন তো?”

“না, নস্টিকদের বিশ্বাসের সাথে আমাদের বিশ্বাসের মিল আছে। কিন্তু তাদের

কিছু পাল্টাতে হয়নি আমাদের। খেয়াল করে দেখুন, বলেছিলাম ও জায়গাতে আমাদের সাথে নস্টিকদের বিরোধ। তার অর্থ এমন নয় যে, তাদের থেকে আমরা আলাদা হয়েছি। আমরা স্বতন্ত্র বিশ্বাসি। প্রচলিত বিশ্বাসগুলোর তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন এই বিশ্বাস। আর অপ্রচলিত কিছু সঠিক হলে মানুষ কেন গ্রহণ করবেন না?”

“তাহলে এই গণ্ডগামেও ভালই সাড়া পাচ্ছেন?”

“এখানে তেমন সাড়া পাইনি। তবে ঢাকা থেকে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিত্ব আমাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন, যোগ দিয়েছেন।”

“আপনারা নিশ্চয় বাইরের আদেশ মেনে কাজ করেন এখানে? ইংল্যান্ডের?”

“বাইরের তো বটেই। এদেশে আগে ওটোর কাজ সম্পর্কে বাংলাদেশিরা জানতো না। তবে ইংল্যান্ড নয়, ফিলাডেলফিয়ার লজের আদেশ মেনে চলি আমরা। মেসনদের মতো আমরা ইংল্যান্ডকেন্দ্রিক নই। যাকগে, আমাদের বিশ্বাস তো জেনেছেন। আপনাদের তদন্তের কাজে কতটা উপকার করতে পারলাম জানি না, তবে সাহায্য করতে পেরে ভাল লাগছে।”

আসিফ তার স্মার্টফোন বাড়িয়ে দিল ভদ্রলোকের দিকে। “একে চেনেন?”

খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছে বৃদ্ধের মুখটা। মিথ্যা বললেই ধরে ফেলার ট্রেইনিং ওর আছে। একেবারেই হঠাৎ নাকের সামনে ঠেলে দিয়েছে এখন সৈকতের ছবিটা। প্রতিক্রিয়া দেখতে ইচ্ছুক।

কোন ধরণের চমকে ওঠার লক্ষণ দেখা গেলো না মানুষটার মুখে। স্বাভাবিকভাবেই বললেন, “না। ইনি কি আপনাদের ভিক্টিম?”

“না, কিলার।” চমৎকার হাসিটা দিয়ে বলল আসিফ। “আরেকটা প্রশ্ন, নিজেদের অনেক প্রাচীন বলে ঘোষণা করলেন আপনি। আপনাদের বিশ্বাস কতটা প্রাচীন হতে পারে বলে আপনার ধারণা?”

একটু থমকে গেলেন কেনেথ। “ব্রোঞ্জ যুগের দিকে। সত্যি বলতে কি, খ্রিস্টান ধর্মটি আমাদের বিশ্বাস থেকে এসেছে। আমাদের থেকে চুরি করেই খ্রিস্টান ধর্ম বানিয়েছে ওরা।”

অবাক হলেও আসিফের মাথায় অন্য কিছু গঁথে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। কেনেথ গ্রান্টের মুখের মাংসপেশিগুলোর খুবই হালকা পরিবর্তন দেখেছে এইমাত্র।

“পাগল দেখেছি কিন্তু এর মতো পাগল দেখিনি,” বিড় বিড় করে বলল জিয়া সিঁড়ি পর্যন্ত এসেই।

আসিফ কিছু বলল না অবশ্য। মগ্ন হয়ে আছে চিন্তায়। ফ্রি মেসন নিয়ে ইচ্ছে করেই ঘাঁটায়নি বুড়োকে। তবে তাদের সাথে বিরোধ যে আছে এদের তা মোটামুটি স্পষ্ট। সেক্ষেত্রে জল ঘোলা হচ্ছে। ফ্রি মেসনদের অ্যান্টিপার্টির সাথে সৈকত যোগাযোগ করতে চেয়েছিলো কেন? এদের সাহায্য পাবে বলে বিশ্বাস ছিলো ওর? হতে পারে। যদিও কেনেথ গ্র্যান্ট মেসনদের অবস্থান সম্পর্কে কিছু জানেন বলে মনে হয়নি ওর।

“ডানার ব্যাপারে কি করবো আমরা, স্যার?”

“নাথিং। ডিটেক্টিভ রেজার কেস ওটা। আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই।”

“তাহলে এখানে এলাম কি করতে?”

“সৈকতের কেসটা আমাদের,” মনে করিয়ে দিল আসিফ। ছেলেটা বার বার প্রফেসরের কেসে ঢুকে যাচ্ছে। ওটা ওদের হাতে নেই—মানতেই পারছে না যেন।

বড় হলঘরে নেমে এসে চারপাশে তাকাল আসিফ। একেবারেই ফাঁকা এখন জায়গাটা। অস্বাভাবিক কিছুই গন্ধ পাচ্ছে ও।

“বড় বেশি চুপচাপ সবকিছু। ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছে না,” আন্তে করে জিয়াকে বলল।

কিছু না বলে খেয়াল করার চেষ্টা করলো জিয়া। কোথাও কোন শব্দ নেই আসলেই। পেইন্টিংগুলো যেন ওদের দিকে তাকিয়ে আছে বিদ্রূপের দৃষ্টি নিয়ে। নড়ছে না একটা কাঁচশিল্পও। বাইরের জানালা দিয়ে আসা আলোতে গাছের ছায়া মৃদু কাঁপছে। সাবধানে বড় দরজাটার দিকে এগিয়ে গেলো দু-জনে। বের হতেই পুলিশের গাড়ি তিনটা চোখে পড়ল ওদের। হুইসল দিতে দিতে ছুটে আসছে এদিকেই। ব্রেক কষে থেমে গেলো সবগুলো। হুঁমুর করে নেমে এলো কিছু পুলিশ। সবার পেছনে নেমে এলেন যে মানুষটি তাকে আসিফ চেনে। লম্বা পায়ে এগিয়ে গেলো সেদিকে।

“মি. গৌরব...আবার দেখা হয়ে গেলো।”

আসিফের দিকে চোখ কুচকে তাকালো ওসি, “আপনিও এখানে? কেস রিলেটেড কিছুর?”

“না, এমনিই এলাম। কিছু ইনফরমেশন দরকার ছিলো। আপনারা?”

“চোর ঢুকেছিলো লজে। ফোন দিয়ে জানালো রিজভী।”

“রিজভী?”

“লোকাল লিটারেট ফিগার। বুয়েট স্টুডেন্ট। ওয়াল্টনে জব করে।”

“বাহ্!” বিড় বিড় করে বলল আসিফ, “শিক্ষিত সমাজের ব্যাপারে দেখি ভুল কিছু বলেননি কেনেথ।”

আসিফের মৃদুস্বরে বলা কথাগুলো গৌরবের কানে গেলো না। ওর কাঁধে একটা চাপড় দিলেন। “ভেতরে যাচ্ছি। দেখা যাক কি খোয়া গেলো। আপনারা আসবেন?”

মাথা নাড়লো আসিফ। “না, আমাদের যেতে হবে। অন্য একটা কেস নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। এদিকে চুরি-চামারি মাঝে মাঝেই হয় নাকি?”

“তেমন একটা না। তবে লজের বাড়িটা নতুন-দান মারার আশায় হয়তো ঢুকেছিলো চোর।”

“একটা উপকার করতে পারবেন? কি খোয়া গেছে সেটুকু জানতে পারলে আমাকে একটা মেসেজ দেবেন?”

আসিফকে আশ্বস্ত করলো গৌরব, “শিওর। ভাবছেন আপনাদের কেস রিলেটেড কিছু?”

“নিশ্চিত হবার উপায় নেই। লজ সম্পর্কে আগ্রহি কারও ব্যাপারে আমরা আগ্রহি।”

“কিছু জানলে জানাব। প্রফেসরের কেসটার ওখানে ছিলাম। আমাদের কিছু লোক এখন ক্রাইম-সিন পাহারা দিচ্ছে, মেয়েটার লাশ নিয়ে গেলো আপনারা ডিপার্টমেন্ট। কুক মেয়েটার মধ্যেই সমস্যা ছিলো শেষে, তাই না?” আলতো করে দু-পাশে মাথা নাড়লো ওসি, হতাশার ভঙ্গিতে।

“আপাতদৃষ্টিতে সে-রকমই মনে হচ্ছে। কার মনে কি আছে, বলা যায় না।” দীর্ঘশ্বাস ফেললো আসিফ। ডানা বাতশিভার লাশ এরমধ্যে তাহলে ডিটেক্টিভ রেজার জিম্মায় চলে গেছে, ভাবল মনে মনে। “মনের কথা যখন উঠলোই, একটা প্রশ্নের উত্তর জানার ছিলো আমার।”

“শিওর। বলুন, কি জানতে চান?” অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়েছে গৌরব।

“প্রফেসর জালাল আপনার থানায় এসে চুরির অভিযোগ লিপিবদ্ধ করতে এসেছিলেন। আপনার সঙ্গে ছেলেসহ দেখাও করেছিলেন তিনি, তাই না?”

“ঠিক তাই। এটা নিয়ে তো আপনার সঙ্গে আগেও কথা হয়েছে। আমিই আপনাকে জানিয়েছিলাম। আবারও জানতে চাইছেন কেন বুঝতে পারলাম না।”

মানুষটাকে বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে। আসিফ সামান্য দ্বিধায় ভুগলো। “তাহলে ডক্টরের বাড়ির সিকিউরিটি ক্যামেরায় ধরা পড়া মানুষটি যে ডক্টর খানের ডানহাত ফরহাদের, সেটা আমার কাছে গোপন করলেন কেন?”

বিস্ময়ে হা হয়ে গেলো গৌরব। “ডক্টর খান আর কার কে?”

“কি আশ্চর্য! আপনার সঙ্গেই না দেখা করেছিলেন প্রফেসর জালাল। আপনি তার স্টেটমেন্ট নিয়েছেন চুরির ব্যাপারে?” মনে করিয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল আসিফ।

মেঘ দূর হয়ে গেলো ওসির মুখ থেকে। “ওহ্, তাই বলুন। আপনাদের বলেছিলাম থানায় আমার সঙ্গে উনাদের দেখা হয়েছিলো, একটা চুরির ব্যাপারে

রিপোর্ট করতে এসেছিলেন তিনি। কিন্তু স্টেটমেন্ট তো আমি নেইনি, নিয়েছিলো কসটেবল শাহদাত। থানার ওসিরা জিডির ফর্মফিলাপের কাজ করে না, এটা তো জানেন? প্রফেসর বলেছিলেন ঘটনাটা নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। তার সঙ্গে ক্যাজুয়াল আলাপ হয়েছিলো। চুরির ঘটনার ডিটেইলস বললেও কোন ব্যক্তিবিশেষের ওপর দোষ চাপাননি। স্টেটমেন্টে লিখেছিলেন কি-না আমি নিশ্চিত নই।”

চুপসে গেলো আসিফ। পরিষ্কার ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়েছে ওরা। একজন কসটেবলের কাছে জিডি করানোর পর ওসির সামনে আরেকজন বিজ্ঞানীর নামে দুর্নাম করার মতো দুর্বল ব্যক্তিত্ব প্রফেসরের ছিলো না।

“ওহ্। আসলে আমিই ভুল বুঝেছিলাম আপনাকে,” একটু হেসে বলল আসিফ। প্রফেসরের কেসটা মিটে গেছে, এ নিয়ে কলহ রাখারও মানে হয় না।

ওসির সাথে হাত মিলিয়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় আসিফের কপালের ভাঁজ বেড়ে গেলো। ওটো লজে এই সময়েই চুরি হলো কেন? বিষয়টা কি সৈকতের এনকোয়ারির সাথে সম্পর্কিত? ছেলেটাকে নিজের বাসায় পাওয়া যায়নি। এমন কি হতে পারে না, ওখান থেকে সরাসরি লজে এসে গেছে সে? লজ লোকেশন বের করে রেখেছিলো সৈকত। এখান থেকে কিছু একটা কালেক্ট করার জন্য যদি সে আসে, তবে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকে না। এখন অবশ্য শুধু অপেক্ষার পালা কখন গৌরব আপডেট দেয়।

“খেয়াল করেছেন, চুরির ব্যাপারে আমাদের কিছু জানাননি কেনেথ গ্র্যান্ট।”

বিচলিত হলো না আসিফ। “আমরা যখন আলোচনা করছি, তখনই হয়তো নিম্নপদস্থ কেউ খেয়াল করেছে ব্যাপারটা। হেডকে বিরক্ত না করে নিজে থেকেই জানিয়েছে পুলিশকে। এটা অস্বাভাবিক কিছু না।”

গাড়ি চলছে, ফোন বের করে তৃণাকে কল দিল সে। জিয়া তার বসকে এই একটা নিয়মই ভঙ্গ করতে কোনদিনও দ্বিধা করতে দেখেনি। ড্রাইভিংয়ের সময় ফোনে কথা বলা। অকাজের কথা কখনই বলে না অবশ্য সে। আসিফের ‘একাক’ থিওরি আছে। একসাথে কাজ করা। এক ঘটনার কথা জিয়ার মনে পড়ল, ডেস্কে বসে দারুণ এক আবিষ্কার করেছিলো আসিফ। তৃণাকে একটা লোকেশন বের করে দেওয়ার জন্য বলতে হত, সেই সাথে ছুটেতে হত সেই লোকেশনে। সেদিন হলওয়েতে মেয়েটার সামনে পড়ে গেছিলো আসিফ। অথচ তার সঙ্গে একটা বাক্যও বিনিময় না করে মোবাইল বের করতে করতে লিফটের দিকে এগিয়েছিলো। কনস্টান্ট জং নামক কুখ্যাত এক সন্ত্রাসিকে হ্রেষতার করতে যাচ্ছিলো ওরা। হলওয়ের শ্রম মাথায় পৌঁছেছে ওরা, তৃণার ফোনে রিং বেজে উঠেছিলো। অবাক হয়ে ফোন রিসিভ করেছিলো মেয়েটা। চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে এমন দূরত্বে থেকে ফোন করার দরকারটা তখন সে বোঝেনি। আসিফ হলওয়েতে থেমেই তৃণাকে বিস্তারিত বলতে পারতো, তবে একাজটি করতে হলে সে আরও পনের সেকেন্ড পর গাড়িতে উঠে বসতো। ফোনে কথাটি বলে ফেলায় একই সময়ে আসিফও গ্যারেজের দিকে এগিয়েছে, তৃণার সাথে

কথাও বলেছে। সেদিন মাত্র দশ সেকেন্ডের জন্য রক্তম জংকে ধরে ফেলেছিলো ওরা। হাইড-আউট থেকে বের হয়ে গেছিলো লোকটা, আরেকটু হলোই নকল লাইসেন্স প্রুট লাগানো গাড়িতে উঠে উধাও হয়ে যেত চিরতরের জন্য!

কাজেই, ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করে ফোনে কথা বলতে কোনদিনও অপরাধবোধ হয়নি আসিফের। এখন ঠিক সেই কাজটা করছে। তৃণার উদ্দেশ্যে হাই-হ্যালো না বলে একটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, “ডক্টর রমিজের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা গেলো?”

তৃণার মিষ্টি গলাটা অন্যপাশ থেকে ভেসে এলো, “উনি আপনার সাথে দেখা করতে আশ্রহি। তবে এই মুহূর্তে ব্যস্ত আছেন। আপনাকে রাতে নিজের বাসায় ডিনারের জন্য ডেকেছেন।”

“ঠিক আছে। ডক্টরকে জানিয়ে দাও, আমরা আসছি।”

“আরেকটা ব্যাপার, স্যার। ডানার সুইসাইড নোটটা চেক করা হয়েছে। ওর অন্যান্য লেখার সাথে মিলিয়ে দেখা হলো। ফরেনসিক এক্সপার্ট বলেছে, একেবারে স্বাভাবিক লেখা ওটা। কোন ধরনের চাপ প্রয়োগের চিহ্ন নেই সেখানে।”

“মানে, স্বেচ্ছায় চিঠিটা লিখেছিলো?”

“তাই তো মনে হচ্ছে।”

“হুম।”

“আর ভিডিওর টাইম জাম্পের ব্যাপারটা টেক টিমকে জানিয়েছি। ওরা দেখছে। আপডেট দেব আপনাকে।”

“গ্রেট!”

“ভিডিওর কথা যখন উঠলোই, মার্ডারের সময় ডক্টর খানের ল্যাবের ক্যামেরাগুলো বলেছিলো উনি আর উনার সহকারি ল্যাবেই আছেন। আমাদের টেক-টিম জানিয়েছে ভিডিওগুলো অথেনটিক। ডক্টর খানের অ্যালিবাই রক সলিড হয়ে গেলো। অবশ্য এখন এটা আর কোন গুরুত্ব রাখে না। কেসটা ক্লোজড হয়ে যাচ্ছে।”

“ধন্যবাদ, তৃণা।” ফোনটা রেখে ড্রাইভিংয়ে মনোযোগ দিল সে।

বেশ কিছুক্ষণ একেবারে চুপ থেকে মুখ খুলল জিয়া, “ডানার ব্যাপারে আপনার ধারণা কি, আসলেই সুইসাইড করেছে মেয়েটা, নাকি খুনির আরেকটা চিঠি লিখতে তাকে এমনভাবে বাধ্য করেছে যাতে আমাদের চোখে ধুলো পড়ে, আসল খুনি থেকে যায় চোখের আড়ালে?”

“সবকিছুই সম্ভব। প্রফেসর তানভীর জালালের কেসটা এক সহজে সমাধান হয়ে যাবে ভাবতে পারছি না। কিন্তু একই সাথে এটাও মাথায় রাখতে হবে, এরকম অপ্রত্যাশিত সমাধান মাঝে মাঝেই হয়ে থাকে হোমিসাইডে। আমরা কোন উপন্যাসের চরিত্র না যে, নিদারুণ টুইস্টের পর অপরাধিকে ধরবো।”

হালকা মাথা দোলাল জিয়া, বসের কথা পুরোপুরি মেনে নিতে পারছে না সে। “ওটোর আরএসএস যা বলল—আপনার কি মনে হয়, আমাদের ভুল পথে চালানোর জন্য বলেছে?”



“এখন পর্যন্ত তাকে দেখে মনে হয়নি কোন ধরনের মিথ্যা বলার কারণ তার আছে। নিজে যেটা বিশ্বাস করে তাই বলেছে আমাদের।”

নাক কোঁচকান জিয়া প্রচণ্ড বিরজিতে। “খ্রিস্টান ধর্ম এসেছে ওটো-বিশ্বাস থেকে—এটা যার বিশ্বাস তার সাথে তর্ক করতে যাওয়া কোন যুক্তিবাদি মানুষের কাজ হতে পারে না।”

“বিশ্বাস আপেক্ষিক বিষয়, জিয়া। ধর্মবিশ্বাস যার যার থাকতেই পারে, তার ওপর ভিত্তি করে কাউকে অপরাধির কাতারে দাঁড় করানো বড় একটা ভুল। কথা হলো, মেসনরা এখনও চোখের আড়ালে থেকে গেছে। তাদের সাথে প্রফেসরের যোগাযোগ ছিলো, ওটোর সাথে নয়। তবে ওটোর সাথে মেসনদের বিরোধকে কেন্দ্র করে সৈকত এদেরকে আগ্রহের তালিকায় রেখেছিলো। ফ্যাক্টস ধরে যদি আগাই...ঘটনাপ্রবাহে এরপরই চুরি হলো লজে।”

“আমরা তার হাইড-আউটে হানা দেওয়ায় তাড়াহুড়ো করে কাজটা তাকে করতে হয়েছে মনে হয়,” টুকরোগুলো মেলানোর চেষ্টা করলো জিয়া।

“এটা একটা ভাল দিক। চাপে পড়েছে মানুষটা,” মুচকি হাসলো আসিফ।

“যা দরকার তা নিয়ে সরে গেছে লোকটা, আমাদের এখানে দ্রুত এগুনো উচিত, স্যার।”

“চাপে পড়ে দ্রুত অ্যাকশনে যাচ্ছে আমাদের সাসপেক্ট। আর এতে করেই ভুল করবে সে।”

“এরপর সে কোথায় যেতে পারে বলে মনে হয় আপনার?”

“লজ থেকে কি খোঁজা গেছে জানার আগে বলার উপায় নেই। আশা করছি ওদিক থেকে ভাল কোন ক্লু পাওয়া যাবে।”

মেইন রোড থেকে গাড়ি নামালো আসিফ। জিয়ার প্রশ্নবোধক দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বলল, “মিডল চেম্বার একেবারে ফাঁকা হয়ে আছে। লাঞ্চটা এখানে করে নেওয়া যেতে পারে।”

জানালা দিয়ে তাকিয়ে হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টটার নাম দেখে নিল জিয়া : গ্র্যান্ড ডি-সিলভা। ঠোঁট চেপে একটু হেসে তাকাল আসিফের দিকে। তার মুখে হাসি নেই। ভাবছে কিছু একটা।

“তাহলে,” গাড়ি থেকে নেমে বলল জিয়া, “বিজয়কে কিডন্যাপ করে এখানেই এসেছিলো ইরফান।”

“তা ঠিক,” দরজা লাগিয়ে বলল আসিফ।

“হু। মিডল চেম্বার ভর্তি করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য!” বিড় বিড় করতে করতে আসিফের পেছন পেছন ঢুকে পড়ল তার সহকারি।

রেস্টুরেন্টের বয়স বেশি নয়—সেটা ভেতরে পা রেখেই বোঝা যায়। হালকা খয়েরি রঙের পোশাকে আবৃত ওয়েটাররা বেশ ব্যস্ত। দুপুর বলে ভেতরে কাস্টমারের অভাব নেই। জানালার কাছে একটা ফাঁকা টেবিল দেখে সেদিকে এগিয়ে গেলো আসিফ।

খাবারের সুঘ্রাণ আসছে চারপাশ থেকে। এই প্রথমবারের মতো পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো জিয়ার। সকাল থেকে নিজের কেসেই অসম্মানজনক অব্যাহতির পর বিরক্তিকর ডিটেক্টিভ রেজার কাছে কেস হ্যান্ডওভার, তারপর ডানার মৃতদেহ উদ্ধারের পর ওটো লঞ্জে খোঁজ নেয়া। সাড়ে তিনটা বেজে গেলেও খাবার পেটে পড়েনি ওদের।

ডিটেক্টিভ রেজা এখন কোথায়? প্রশ্নটা এলেও সাথে সাথেই চলে গেলো জিয়ার মাথা থেকে। প্রচুর ছোট্টাছুটি হয়েছে আজকেও। গতকাল রাতেও ঘুমানোর জন্য বেশি সময় পাওয়া যায়নি। প্রথমবারের মতো উপলব্ধি করলো ওরা ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে। লম্বা মেনুটা হাত বাড়িয়ে আশ্রয়ের সাথে তুলে নিল। ওয়েটার এসে অর্ডার নিয়ে যাওয়ার পরও কথা বলল না কেউ। একটু পর খাবার এসে পড়তে টু শব্দটাও করলো না ওরা। চিকন চালের ভাত, মিক্স ভেজিটেবলস, গরুর ভূনা, ডিমের কারি আর স্পেশাল ডালের ওপর বাঁপিয়ে পড়ল নিঃশব্দে। প্লেটের অর্ধেক উধাও হওয়ার পর প্রথম কথা বলল আসিফ।

“ক্যামেরা, আমাদের পেছনে একটা, সামনে, বামদিকে আরেকটা। এ দুটো দিয়ে আমাদের আইভেন্টিফাই করা যাবে।”

“অ্যা?” মুখে ভাত নিয়ে এতটুকুই বলতে পারলো জিয়া। সাবধানে লক্ষ্য করেও ক্যামেরাটা খুঁজে বের করতে বেশ সময় লাগলো তার।

“ইরফান আমাদের সহজেই ব্রাফ দিতে পারতো। ক্যামেরাগুলো মিস করার কথা না তার। এমন একটা টেবিল বাছাই করার কথা, যেন ক্যামেরায় সে ধরা না পড়ে। এতদিন ধরে তো তাকে কোথাও আটকানো যায়নি। আজ কেন? এটা আমাদের জানতে হবে।”

এখানে আসার কারণটা এতক্ষণে বুঝতে পারলো জিয়া। বস নিশ্চিত হতে চাইছে। বিজয়ের কোন খবর এখনও পাওয়া যায়নি কোথাও। ছেলেটা কি স্রেফ উধাও হয়ে গেছে কি-না কে জানে। কেসটা ডিটেক্টিভ রেজার হাতে যেতে পারে, ডানা বাতশিভার সুইসাইডাল নোট ওরা পেতে পারে, কিন্তু পায়নি বিজয়কে। ছেলেটা যেন স্রেফ বাতাসে মিলিয়ে গেছে! ঠিক যেমন বাতাসে মিলিয়ে গেছে ইরফান! ব্যক্তিগতভাবে এনকোয়ারি করতে এখানে থেমেছেন স্যার!

“ইরফান ঠিক ওখানে বসেছিলো,” চোখের ইশারায় অন্য কোণের টেবিলটা দেখালো জিয়া। তারপর খুঁজে বের করলো কোন ক্যামেরার ফুটেজ থেকে তাদের ছবিটা পাঠানো হয়। খুঁজে পেতে দেরি হলো না। “ছবিটা অ্যাংগেল থেকে বোঝা যাচ্ছে, ওই কর্নারের ক্যামেরায় ধরা পড়েছিলো ইরফান।”

“অথচ আর কোন ক্যামেরায় ধরা পড়ার কথা না ওখানে বসলে। এই ক্যামেরাটা কি তার চোখ এড়িয়ে গেছিলো, নাকি ইচ্ছে করেই নিজেকে দেখিয়েছে সে?” বিড় বিড় করে বলল আসিফ।

প্রশ্নটার জবাব জানার উপায় নেই। চুপচাপ খাবারের দিকে মন দিল জিয়া। এই

মুহূর্তে সৈকতের পেছনে যাওয়ার লাগার মতো কোন ক্ল হাতে নেই। আসিফ আশাবাদি-অচিরেই সেরকম কিছু পাওয়া যাবে। গৌরব রায় নিশ্চয় জানাবে কিছু। তার আগে পর্যন্ত ফ্রি সময়টুকু বিজয়ের অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে ভাবা যেতেই পারে। আসিফও একেবারে চুপ এখন। তাকে দেখলে মনে হবে খাওয়ার জন্য পৃথিবীতে এসেছে। তবে জিয়া বসের এই মূর্তি চেনে। শুধু ইরফান নয়, প্রতিটি ঘটনা থেকে একটিমাত্র কানেকশন বের করার চেষ্টা করছেন তার বস।

“ইরফান বিজয়কে কিডন্যাপ করলো কেন? মুক্তিপণ তো চায়নি এখনও। চাইলে তৃণা জানাতো আমাদের। ডানা যদি প্রফেসরকে হত্যা করে থাকে তাহলে বিজয়ের ভূমিকা এখানে কি?”

একটু ভাবলো জিয়া। “কোন যোগসূত্র দেখতে পাচ্ছি না আমিও।”

“তুমি যদি একজন প্রফেশনাল কিডন্যাপার হও, বিনা কারণে কেন একটা ছেলেকে কিডন্যাপ করতে যাবে? পেছনে কেউ টাকা ঢালছিলো নিশ্চয়?”

জবাব দিতে পারলো না সহকারি।

খাওয়া শেষ হলে ওয়েটারকে বিল হাতে এগিয়ে আসতে দেখে নিজের ব্যাজ বের করলো আসিফ। “আমি একজন সরকারি গোয়েন্দা। কৌতুহল হলো একটা ব্যাপারে, ঐ কোনের ক্যামেরাটা নতুন মনে হচ্ছে। কোন ধরনের রিপ্রেসেন্ট হয়েছে নাকি?”

মৃদু হাসরো ওয়েটার। “ঠিক তা নয়, স্যার। তবে ড্যামেজ হয়েছিলো ওটা পাশের পেইন্টিংটা ঝোলাতে গিয়ে। কাভারটা পাল্টাতে হয়েছে।”

একটু হাসলো আসিফ। “ড্যামেজ?”

“কাভার ভেঙে পড়ে গেছিলো। ওভাবেই ছিলো কয়েক মাস। দেখে মনে হতো নষ্ট, তবে কাজ করতে ঠিকমতই, সেজন্য পাল্টানো হয়নি। গতকাল কাভার ঠিক করা হয়েছে।”

মোটা অংকের টিপস দিল আসিফ বিলের সাথে। “অসংখ্য ধন্যবাদ।”

টাকা পেয়ে ফোলাতে ছাড়লো না লোকটা। “ক্যামেরা দেখেই যদি বুঝে ফেলেন সেটা নষ্ট হয়েছিলো, স্বীকার করতেই হবে, নিজের কাজে খুব দক্ষ আপনি, স্যার।”

জিয়া একটু ভদ্রতার হাসি দিয়ে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো আসিফের দিকে। এজন্যেই ইরফান প্রথম ভুলটা করেছিলো!

আসিফের মাথায় ঘুরছে অন্য চিন্তা। প্রফেসরের ডানহাত রিয়াজুল করিমের সাথে দেখা করাটা দরকার ছিলো। ডিটেক্টিভ রেজার হাতে চলে গেছে এখন সব। বার বার একই ডিপার্টমেন্টের ভিন্ন ভিন্ন গোয়েন্দা এসে একজনকে জেরা করতে পারে না। রেজার কানে চলে যাবে বিষয়টা। অথচ রেজাকে এড়িয়ে আরেকবার রিয়াজের সাথে দেখা করা দরকার।

অন্য কোন উপায় বের করতে হবে। আর সে-রকম একটা প্ল্যান এই মুহূর্তে মাথার ভেতর খোঁচাখুঁচি করছে ওর।

“সেমিনারে? তা-ও কিসের ওপরে-ডিরেক্ট মেজারমেন্ট অব প্রোটিন ট্রান্সো-ট্রান্স-”

“ট্রান্সলোকেশন অ্যাক্সেস মেমব্রেনস,” মুচকি হেসে জিয়াকে সাহায্য করলো আসিফ।

“আর এতে আমার মত মোটা মাথার একজন ডিটেক্টিভ কিভাবে ঢুকবে সেটাই ভাবছি। ডানদিক দিয়ে ঢুকলে আমাকে বামদিক দিয়ে তো বের করে দেওয়ার কথা,” বিড় বিড় করে বলল জিয়া গোমড়া মুখে।

কথাটা শুনে হেসে ফেলল আসিফ। “রিয়াজুল করিমকে বের করে দেবে না ওরা। এতটুকুই যথেষ্ট। ওখানে আশা করি ডিটেক্টিভ রেজা ছোক ছোক করবে না।”

নীরবে একমত হলো জিয়া। ঢাকায় ফিরে এসেছে ওরা। এখন আসিফের রুমে এসে বসে আছে, অপেক্ষা করছে একটু ডিটেইলসের। মির্জাপুরের ওসি গৌরব রায় জানিয়েছে কি চুরি হয়েছে। আসিফ বা জিয়াকে মোটেও অবাক করেনি সেটা।

ওটো লজের ভেতরে একমাত্র আর্কাইভস রুমের সবগুলো কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক খুলে নিয়ে গেছে কেউ। আরএসএস জানিয়েছেন তিনি উদ্বিগ্ন নন, মূল্যবান তথ্য বের করতে হলে চোরকে অবশ্যই কয়েক প্রস্থ সিকিউরিটি ব্রেক করতে হবে। তবে এই চুরির মাধ্যমে ওটোর প্রতি জনবিদ্বেষ ছড়ানোর ষড়যন্ত্রের ভয় তিনি পাচ্ছেন। ধর্মের প্রতি এদেশের মানুষের প্রবল টান আছে। নতুন কোন বিশ্বাস নিয়ে একদল মানুষ এদেশে এসেছে জানতে পারলে জনতার রোষানলে পড়তে হতে পারে-এই ভয় থেকেই পুলিশের হেল্প চেয়েছেন তিনি।

চালটা খারাপ না, পুলিশ কয়েকটা হার্ডড্রাইভ চুরি সামলাতে পারবে বলে আসিফের বিশ্বাস আছে। বাংলাদেশের জনতা জানে পুলিশ কোন কাজের না। কিন্তু তাদের অনেকেই যেটা জানে না, একহাজার টাকা দামের সস্তা মোবাইল ফোনও যদি চুরি হয় পুলিশ সেটা বেলা পেরুনোর আগেই বের করতে পারে। তবে এই ঝামেলায় গিয়ে তাদের বাড়তি লাভটা কোথায়? অনেক অনেক কেস জমে তো থাকেই, সরাসরি নতুন আসা কেসে কেন হাত দেবে তারা? স্বাভাবিকভাবে অনেক সমস্যা লাগে। বেলা পেরুনোর হিসেব সেখানে খাটে না। সেজন্যই এদিক ওদিক কিছু টাকা ঢালতে হয়। তাহলে যে কোন পুলিশ টাস্ক হয়ে যায় সময়ের ব্যাপার।

ওটোর মতো বিদেশি প্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে টাকার ব্যাপারটা আসে না। নিজেদের রেপুটেশনের ভয়েই কাজ করবে মির্জাপুরের পুলিশ, সমস্যা আগেই এই কেসটা নিয়ে লাগবে তারা। ভাগ্য ভাল হলে উদ্ধার করেও দেবে হার্ড ড্রাইভ।

“ভাবছি ডিটেক্টিভ রেজা আর এফবিআই এখন কি করছে,” মৃদু হাসি মুখে ধরে রেখে বলল আসিফ।

হাসলো জিয়াও। “সম্ভবত এদিক ওদিক টক্কর খেয়ে বেড়াচ্ছে ওরা। আমাদের ওপর হস্তিহিংস্র করতেও চাইতে পারে। ডানার লাশ আমরা কেন উদ্ধার করলাম তা নিয়ে প্যান প্যান করার সুযোগ রেজা ছেড়ে দেবে বলে মনে হয় না।”

“আল্লাহ জানে, কোন গর্দভদের হাতে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিজয়কে যদি ওরা ট্রেসটুকুও করতে পারে তো আমি তিনজনকেই গোল্ড মেডেল দেব। মার্ভার কেস ডিল করার চেয়ে কিডন্যাপ কেস সল্ভ করা অনেক কঠিন কাজ।”

মাথা নাড়লো জিয়া। “ওদের দিয়ে এই কাজ উদ্ধারের আশা করতে পারছি না, স্যার। আমাদের ব্যক্তিগতভাবে এগিয়ে যাওয়া উচিত। রেজার কেস দেখে সরে থাকলে ছেলেটার বড় ধরনের কোন ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। তিনদিন হয়ে গেলো।”

“মাত্র দু-দিনে আমাদের প্রফ্রেস দেখেছে? ভাগ্য ভাল হলে, আর দু-দিনের মধ্যেই মোটামুটি গুছিয়ে আনব সবকিছু। বিজয়কে উদ্ধার করবো, ইরফানকেও হাজতের ভাত খাইয়ে ছাড়বো। এরইমধ্যে বিজয়ের কোন ক্ষতি না-হলেই হয়।”

আয়েশ করে চেয়ারে হেলান দিল আসিফ। ভাবনা চলছে তার মাথায়। হার্ড ড্রাইভ চুরির পর সৈকত কোনদিকে রওনা হতে পারে তা নিয়ে ভাবছে। বসের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো জিয়া। এই প্রথমবারের মতো খেয়াল করলো, প্রফেসরের মার্ভারের পর মাত্র দুটো দিন পার হয়েছে। এর মধ্যে একবারও তাড়াহুড়ো করতে দেখেনি আসিফকে। দেখেনি উদ্বিগ্ন হতে। এরইমধ্যে অনেক কিছু করে ফেলেছে। প্রফেসর তানভীর জালালের কেসটা একরকম ক্লোজড এখন।

লিফটের দরজা খুলে গেলো ঠিক তখনই। গ্লাসের ভেতর দিয়ে দেখা গেলো ভেতর থেকে লম্বা পায়ে বের হয়ে আসছে ডিটেক্টিভ রেজা। পেছনে ছায়ার মতো লেগে আছে দুই এফবিআই এজেন্ট। টকটকে লালমুখে আসিফের রুমে মাথা গলিয়ে দিল রেজা।

“নিজের চরকায় তেল না দিয়ে আমাদের কেসে নাক গলানো উচিত হয়নি তোমার, আসিফ। এর জন্য পস্তাবে!”

আসিফের মুখটাও গম্ভীর হয়ে গেলো। “আমি তো ভাবছি শুধু শুধু তোমাকে বেতন দেয়ার জন্য ডিপার্টমেন্ট একদিন পস্তাবে।”

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিটা আরও এক ডিগ্রি বেড়ে গেলো রেজার। “মরা উদ্ধার সবাই করতে পারে। ওটুকু করে কৃতিত্ব দেখানোর কিছু নেই। বরং আমাদের বাস্তব চলে আসাটা তোমাদের জন্য অশোভন ছিলো।”

রেজার কথা এখন আর ওদের স্পর্শ করছে না। আসিফ আর জিয়ার চেহারা দেখলে তৃণা নির্ঘাত আঁতকে উঠতো। হা হয়ে গেছে দু-জনেই। নিচের চোয়াল একেবারে ঝুলে পড়েছে। জিয়ার কান দুটো একবার নড়লো। কান নড়াবার ব্যাপারে ডিপার্টমেন্টে বরাবরই সুনাম আছে ওর।

চতুর্থ মানুষটা লিফট থেকে সাবধানে বের হয়ে এসেছে।

বিজয়।

“কথ্যাচুলেশনস!” হঠাৎ ভাষা খুঁজে পেয়েছে যেন আসিফ, হাত বাড়িয়ে দিয়েছে রেজার দিকে। “তা একদিনের কম সময়ে দেশসেরা কিডন্যাপারের হাতে অপহৃত হওয়া ছেলেকে উদ্ধার করে ফেললে দেখছি?”

চোখ কুঁচকে তাকালো রেজা। “রেকর্ড ব্রেক করেছি সেটা জানি আমি।”

“আমার তো মনে হয় ছেলেটা কোনভাবে পালিয়ে গেছিলো। তোমরা শুধু তাকে পিক করেছে।”

“যা খুশি ভাবতে পারো,” হাত নেড়ে কথাটা বলেই বের হয়ে গেলো রেজা।

জিয়ার দিকে একবার তাকিয়ে চোখের ইশারায় এগিয়ে আসতে বলল আসিফ। কমিশনার স্যারকে টাকা দিতে হবে। আর টাকাটা দিতে হবে জোরে। ইন্টেরোগেশন চেম্বারে না হলেও ওয়েইটিং রুমে একবার বিজয়ের সাথে কথা বলতে চায় ও। হিটলারকে কেস দুটোর ইন্টারকানেকশন বোঝাতে হবে সেজন্যে। এখন পর্যন্ত শাহেদ জামানের সঙ্গে এ নিয়ে কথা হয়নি।

দরজার বাইরে এসে একবার উঁকি দিল ও। এখনও দুই এফবিআই এজেন্ট ভেতরে ঢুকে বসে আছে। তবে সকালের তো অনিয়ন্ত্রিত আচরণ করলো না আসিফ। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলো শেষ বিকেলের পড়ন্ত আলো। একদিনের জন্য যথেষ্ট চমক হয়েছে। সৈকতের পরিচয় বের করা, ডানার মৃতদেহ আবিষ্কার, বিজয়ের ফিরে আসা!

প্রফেসরের ছেলের সাথে কথা বলে সোজা বাসায় ফিরে যেতে হবে। দিন শেষে একটা হট শাওয়ারের চিন্তা করেই মন ভাল হয়ে গেলো আসিফের। জিয়া অবশ্য ক্র কুঁচকে তাকিয়ে আছে দরজার দিকে। এটোর ওপাশেই ওদের অপেক্ষা করিয়ে রাখা দুই বহিরাগত আছে। এফবিআই-র সাথে বিরোধ নেই আসিফের। তবে নিজের কেস থেকে বের হয়ে যেতে হয়েছে তাকে, এটাই বিরাগের কারণ।

অবশেষে যেন এক যুগ পরে চকচকে সুট পরিহিত লোক দুটো বের হয়ে এলো। তাদের দিকে তাকিয়েও কোন রকম সম্ভাষণ জানালো না আসিফ। একই রকম শীতল ব্যবহার পাওয়া গেলো ওদের থেকেও। আগের বন্ধুসুলভ দৃষ্টি পাওয়া গেলো না। ডিটেক্টিভ রেজা কি লাগিয়েছে কে জানে! ওরা বের হতেই কমিশনারের রুমে মাথা গলিয়ে দিল আসিফ। অনুমতি চাওয়ার আগেই মিলে গেলো আজ শাহেদ জামান দুর্দান্ত মুডে আছেন।

“অত্যন্ত সফল দুটো দিন, মাই বয়। প্রফেসরের মৃত্যুর রহস্য কাল প্রেসের সামনে খুলে দেব আমরা। আর বিজয়কে ফিরে পাওয়াতে জিনিসটা হচ্ছে টেন আউট অব টেন,” স্বভাবসুলভ হাসিমুখে জানালেন শাহেদ।

“বিজয়ের ব্যাপারেই কথা বলতে এসেছিলাম, স্যার। ছেলেটাকে আমাদের দরকার। আধঘন্টা হলেও তার সাথে কথা বলার প্রয়োজন অনুভব করছি।”

“কেন?” অবাক হলেন শাহেদ জামান, “ভালো কথা, রহস্যময় ভ্যাম্পায়ারের কেসটা তোমাদের ছিলো। কতদূর এগোলো?”

বিশ্ব কাঁপানো তানভীর জালালের কেসটা নিজের ডিপার্টমেন্টে পেয়ে ওদের কেসটার ব্যাপারে মনে হয় কমিশনার ভুলেই গেছিলেন। আসিফ আর জিয়ার মুখ নিচু হয়ে গেলো। এটা একরকম পরোক্ষ অপমান। এফবিআই-র ওপর প্রবল বিরক্তি ধরে গেলো আসিফের। এটাই শেষ কেস-এর পর এরকম টেকওভারের ঘটনা ঘটলে চাকরির মায়া আর করবে না। সোজা রিজাইন দিয়ে দেবে।

“কেসটা তানভীর জালালের কেসের সাথে ইন্টারনালি কানেক্টেড, স্যার। আমাদের বিশ্বাস, প্রফেসর জালালের নিজস্ব কিছু বিশ্বাস ছিলো। একটি সোসাইটির সাথে যুক্ত ছিলেন তিনি। একই সোসাইটির সাথে যুক্ত ছিলো আমাদের দুই ভিক্টিমও। এই বিশ্বাসের জন্যই মারা গেছেন তারা। খুনি টার্গেট করেছে সোসাইটিটাকে।”

“খুনির মোটিভ কি?”

“পার্সোনাল। ছোটবোন এদের কারণেই মারা গেছিলো বলে তার বিশ্বাস।”

বিরক্ত দেখাল কমিশনারকে। “এখানে বেশ কিছু বিশ্বাসের ব্যাপার-স্বাপার দেখা যাচ্ছে। তোমাদের বিশ্বাস এক ধরনের। তোমাদের মার্ডারারের বিশ্বাস আরেকরকম। আবার ভিক্টিমদের বিশ্বাস! বলো তো, এগুলো কি প্রমাণিত তথ্য?”

ভয়ে ভয়ে বলেই ফেলল আসিফ, “হাইপোথিসিস, স্যার।”

“কাম অন! এখন বলবে প্রফেসরের মার্ডার কেসটাও তোমাদের সিক্রেট সোসাইটির কারণে হয়েছে। অথচ সব কিছু এখন স্পষ্ট। মেয়ের বয়সি শেফের সাথে অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক রেখেছিলেন প্রফেসর, তারপর সেটার ভিডিও করে ব্ল্যাকমেইল! ডানা বাতশিভা সেটা সহ্য করেনি। নিজেকে মুক্ত করতে হত্যা করেছে তাকে। পরে সেটাও সহ্য করতে পারেনি। প্রথম খুনের ক্ষেত্রে এমনটা হওয়া স্বাভাবিক। আমেরিকার এক গবেষণায় দেখা গেছে জীবনের প্রথম খুন করার পর ৩৭% নবীন খুনির মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা জাগে। অনিশ্চিত জীবনের চাপ তারা নিতে পারে না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আত্মহত্যা করেও ফেলে। সাইকোলজি এটা বিশ্বাস করে। স্ট্যাটিকসও আমাদের পক্ষে কথা বলছে। সবকিছু স্পষ্ট এই কেসটার ব্যাপারে। সব প্রশ্নের উত্তর মিলে গেছে।”

“বিজয়ের ব্যাপারটা? তাকে কিডন্যাপ করা হলো কেন? ইরফানের কি স্বার্থ ছিলো তাকে কিডন্যাপ করার?”

“আমরা এখনও জানি না। ইরফানকে একবার ধরে ফেলতে পারলে সেটা বের করা হবে সময়ের ব্যাপার। আর ওই ছেলে ধরা পড়বেই। এফবিআই দারুণ কাজ দেখিয়েছে। আশা করা যায় আরেকবার দেখাবে। যেহেতু বিজয় আমাদের মধ্যে নিরাপদে আছে, এটা কোন বড় ব্যাপার হবে না। বিজয়কে খুঁজে না পাওয়া গেলে আলাদা কথা ছিলো।”

“আমার খটকা ওখানেই, স্যার।” সামনে ঝুঁকে এলো আসিফ, “বিজয়কে উদ্ধার করতে পারলো আর ইরফানকে ধরতে পারলো না?”

“আসলে,” খুক করে কাশলেন শাহেদ জামান, “ছেলেটা স্লিপ করেছিলো।”

“মানে, ইরফানকে ধোঁকা দিয়ে বের হয়ে গেছে সে? এফবিআই দারুণ কাজ দেখিয়েছে তাহলে, স্বীকার করতেই হবে।” মুচকি হাসলো আসিফ।

“তবুও তো ওরা ফ্যাক্টস নিয়ে কাজ করছে। তোমাদের মতো ইমাজিনারি কিছু নিয়ে নয়। আসিফ, এই কেসে আশার আলো দেখতে হলে হাইপোথিসিস থেকে তোমাকে বের হতে হবে। নইলে ডিটেক্টিভ রেজা এখন ফ্রি আছে, তাকে দায়িত্বটা দেয়া যেতে পারে।”

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো আসিফ। “আমার বিশ্বাস বা হাইপোথিসিসে কিছু আসে যায় না, সেটা জানি। কিন্তু তানভীর জালাল কি বিশ্বাস করতেন আর আমাদের সাসপেক্ট কি বিশ্বাস করে তার ওপর নির্ভর করে তাদের কাজের ধারা। কাজেই একেবারে ফেলে দিতে পারছি না ব্যাপারটা। তাছাড়া, আমার ধারণা ঠিক হলে এত সহজে প্রফেসরের খুনের পেছনে কে আছে তা নিশ্চিত হওয়া ঠিক হচ্ছে না।”

অধৈর্য ভঙ্গিতে কম্পিউটারের মনিটরের দিকে তাকালেন তিনি। “মেয়েটা স্বাভাবিকভাবে লিখেছিলো সুইসাইডাল নোট। তারই হাতের লেখা ওটা। তার আগের হাতের লেখার সাথে মেলানো হয়েছে ওই চিঠি। এই কেসটা ক্রোজড, আসিফ। এটা নিয়ে আর লাভ নেই। বিজয়ের সাথে কথা বলতে চাইলে রেজার সাথে যোগাযোগ করো। এখন যদি আর কোন কিছু বলার না থাকে তাহলে আমাকে ক্ষমা করো। কিছু ফোন করতে হবে।”

হতাশ হয়ে উঠে দাঁড়ালো ওরা। ডিটেক্টিভ রেজার কাছে গিয়ে বিজয়ের সাথে কথা বলার জন্য অনুমতি চাওয়াটা আসিফের জন্য কতটা বিরক্তিকর কাজ হবে সেটা জিয়া বোঝে। তবুও তার চেহারার দিকে তাকিয়ে টের পেলো, রেজার কাছে অনুমতি চাইতেই যাচ্ছে সে। রাগে টকটকে লাল হয়ে আছে আসিফের মুখ।

ডিটেক্টিভ রেজার ডেস্কটা ডিপার্টমেন্টের অন্য কোণে। বেশ কিছু কিউরিয়স গুরে সেদিকে পৌছানোর জন্য পা বাড়ালো ওরা। সেখানে যাবার আগেই নিজের জায়গা থেকে উঠে এলো তৃণা। বড় বড় চোখ দুটোতে এই মুহূর্তে উত্তেজনা।

“স্যার! ইরফানকে পাওয়া গেছে,” চাপা গলায় জানালো মেয়েটি।

বাট করে ওর দিকে ঘুরে দাঁড়ালো আসিফ। “কোথায়?”

“ফারিহার অ্যাপার্টমেন্টে যাচ্ছিলো, আমাদের স্যুপারভাইজার তাকে ইন্টারসেপ্ট করে—”

“ইডিয়ট!” বিড় বিড় করে বলল আসিফ।

“তাকে আক্রমণ করে বাইকে নিয়ে বের হয়ে গেছে ইরফান।”

ইঙ্গিতে অন্যপাশটা দেখালো আসিফ। “ডিটেক্টিভ রেজা জানে?”



“তারা তো কয়েক মিনিট আগেই বের হয়ে গেছে। আপনারা স্যারের রুমে ছিলেন তখন। নইলে আগেই জানাতাম।”

কমিশনার কোথায় ফোন করতে যাচ্ছিলেন এবার বুঝতে পারলো আসিফ। সিকিউরিটি অ্যালার্ট করে দেওয়ার কথা সব জায়গায়। হোমিসাইডের এত লোকবল না থাকলেও লোকাল পুলিশ সাহায্য করতে পারবে।

সহকারিকে ডাকলো ও। “আমার সাথে আসো, জিয়া!”

বিশ্বশ সহকারি তার পাশে এসে দাঁড়াতেই লিফটের বোতামে চাপ দিল আসিফ।

“আমরা যাচ্ছি কোথায়? আগামি এক বছরেও ফারিহার অ্যাপার্টমেন্টের ধারেকাছে ঘেঁষবে না ইরফান।”

“তা আমি জানি। তুণাকে ফোন দাও।”

অবাক হলো জিয়া। “এই মাত্র না তার সাথে কথা বললাম আমরা?”

হাত নাড়লো আসিফ ব্যস্ত ভঙ্গিতে। “আমরা যেতে যেতে কথা বলতে পারি। ইরফান ইজ অন দ্য রান। এখন নষ্ট করার মতো সময় নেই।”

গ্যারাজে এসে গাড়ির দিকে ছুটে গেলো আসিফ। দরজা খুলে উঠে বসেই স্টার্ট দিল ইঞ্জিন। জিয়া দরজা লাগানোর আগেই ছুটতে শুরু করে দিল গাড়িটা।

“স্যার, তুণা লাইনে আছে।”

“ওর কাছে জানতে চাও, রেডফোর্ড ইউনিভার্সিটির দিকে যাওয়ার সবচেয়ে সহজ রাস্তা কোন্টা হতে পারে। আমার ম্যাপটা ব্যবহার করতে বলো।”

“রেডফোর্ড ইউনিভার্সিটি?”

মাথা নাড়লো আসিফ। “ফারিহা ওখানেই পড়ে। ইরফান ওকে রেখে বাতাসে মিলিয়ে যাবে না।”

মেনে নিতে পারে না জিয়া। “এখন ইরফান ফারিহার কাছে আশ্রয় নিয়েছে। মেয়েটা এই সময় ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস করতে যাবে?”

“ইরফান এমনটা চাইবে না। ফারিহা ক্লাস না করে ওই বাসায় বসে থাকলে সন্দেহ জাগবে অনেকের। অস্বাভাবিকতা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।”

আর কিছু না বলে ড্রাইভিংয়ে মন দিল আসিফ। ওর দৃঢ় বিশ্বাস ইরফানকে ওখানেই পাওয়া যাবে। রকেটের মতো ছোটাচ্ছে গাড়ি। তৃণার পাঠানো ডিরেকশন দিয়ে সাহায্য করতে থাকে জিয়া। ভয়ে ভয়ে একবার আসিফের দিকে তাকালো ও। এভাবে ট্রাফিক আইনের সব নিয়ম ভেঙে ছুটতে দেখেনি কখনও বসকে। এ যেন তার অন্য এক চেহারা।

কপালের রং ফুলে আছে আসিফের। ঝাঁকুনির সাথে চোখের ওপর কিছু চুল এসে পড়েছে। ওগুলো সরানোর ঝামেলায় না গিয়ে সহকারির দিকে তাকালো। “ওর আগেই আমরা পৌঁছে যাবো। আমাদের দিক থেকে রেডফোর্ড কাছে। এবার কোন দিকে?”

“বামে যান, স্যার।”

অলিগলি দিয়ে ছুটে যাচ্ছে ওরা। তারপর লাফিয়ে বের হয়ে এলো বড় রাস্তাতে। আবারও ওটা পার করে আরেক গলিতে ঢুকে পড়ল। ট্রাফিক সিগন্যাল আর জ্যামকে এড়িয়ে সব গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পৌঁছানোর জন্য একটা করে ম্যাপ ডিরেকশন প্রস্তুত করেছিলো আসিফ। ‘অলি-গলির ম্যাপ’ বলে ব্যঙ্গ করেছিলো ডিটেক্টিভ রেজা, ওটা এখন কাজে লাগছে। রেজা ভুল কিছু বলেনি, আসলেই অলিগলি ব্যবহার করা হয়েছে এই ম্যাপে। বড় রাস্তাগুলো অক্সিজেনের রোড হিসেবে দেখানো হয়েছে। এতে ঘুরে যেতে হয়, দূরত্বটা কিছুটা বাড়ে কিন্তু কোন ট্রাফিক জ্যামে ঘণ্টাখানেক বসে থাকতে হয় না। হোমিসাইড বেশ কয়েকটা অ্যারেস্টের ক্ষেত্রে এই সিস্টেমটুকু নিয়েছে। আজকে আরও একবার কাজে লাগছে ম্যাপটা।

আলো জ্বলে উঠলো মোবাইলে। তৃণার ফোন দেখে বিস্মিত করে কানে ঠেকালো জিয়া, কিছুক্ষণের মধ্যেই রেখে দিয়ে আসিফের দিকে ফিরলো সে। “ওদের ভার্সিটিতে বাইক আর গাড়ির জন্য আলাদা পার্কিংলট আছে। আমাদের হেটে যেতে হবে।”

মাথা নাড়লো আসিফ। “শুধু আমি...তুমি গাড়িতে থাকবে।”

প্রতিবাদ করলো জিয়া সাথে সাথেই, “সাবজেক্টের কাছে অস্ত্র আছে। খুবই

বিপজ্জনক সে। আপনি তার ফাইল পড়েছেন। একাই যে মারফিয়ার সাথে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা রাখে তাকে হালকাভাবে নেবেন না, প্রিজ।”

বিরক্ত হয়ে শিষ্যের দিকে তাকালো আসিফ। “আমি কাউকে হালকাভাবে নিচ্ছি না। এজন্যেই তুমি গাড়িতে থাকবে। আমার ব্যাকআপ লাগতে পারে। একসাথে দু-জনের এগিয়ে যাওয়ার কোন মানে হয় না।”

রাস্তার ওপরেই পার্ক করলো আসিফ। প্রায় সাথে সাথে ইউনিফর্ম পরে থাকা সিকিউরিটি চলে এলো তাদের কাছে। পার্কিংলটে গাড়ি রাখতে হবে। ভার্শিটির সামনে কোন গাড়ি পার্ক করা যাবে না। জিয়া বের না হয়েই একটা ব্যাজ দেখিয়ে দিতেই শান্ত হয়ে গেলো বেচারী।

“এখানেই থাকো তুমি। আমার কোন ঝামেলা হলেই জানাবো আমি,” ইয়ারসেটের একটা কানে গুঁজে দিতে দিতে বলল আসিফ। গাড়িতে কিছু ইকুয়েপমেন্ট রাখে ওরা, হঠাৎ কাজে লাগে। যেমনটা লাগছে আজ।

শোল্ডার হোলস্টারে একবার পিস্তলটা অনুভব করে সামনের দিকে পা বাড়ালো আসিফ। মোটরসাইকেল পার্কিংলটটা চোখে পড়েছে। ধীরে ধীরে আশেপাশের প্রতিটি ডিটেইল লক্ষ্য করলো সে। চারপাশে দেয়ালের বালাই নেই। কয়েক সারি পিলার আছে ওখানে। অর্ধেক পার্কিংলটে ছাদ আছে, বাকি অর্ধেক খোলা। কাছেই খোলা আকাশের নিচে একটা সিগারেটের দোকান। ওখানে উচ্চস্বরে হাসাহাসি চলছে। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া একদল তরুণ-তরুণি আড্ডা দিচ্ছে। টিশার্ট আর জিন্স পরা লাল চুলের তরুণি হাসতে হাসতেই আসিফের দিকে তাকালো। তারপর চোখ টিপ দিল আলগোছে। সুদর্শন ছেলেদের ইশারা দেওয়ার সুযোগ এধরণের ফাজিল-টাইপ মেয়েরা ছাড়ে না কখনও।

চোখ সরিয়ে নিয়ে পিলারগুলোর দিকে এগিয়ে গেলো আসিফ। একটা আড়াল দরকার। সেটাও বেশি দূরে হলে সমস্যা। অ্যামবুশ করতে চাইছে ও। ইরফান এখানে নামার আগেই পজিশনে নিতে হবে। পিলারগুলোর কাছে পৌঁছে গেছে যখন তখনই আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটাকে প্রথমবার চোখে পড়ল ওর।

মেয়েটা পাঁচ ফিট ছয়ের মতো হবে। বড় বড় চোখ, কপালে ঐশি পড়া চুলগুলোতে একেবারে রাজকন্যার মতো লাগছে। চেহারা অদ্ভুত রকমের এক অভিজাত্য। ছায়াতেও তার চামড়া জ্বল জ্বল করছে, এতটাই উজ্জ্বল। এখানকার যে কয়টি মেয়ে এখন পর্যন্ত চোখে পড়েছে তাদের মধ্যে উজ্জ্বলতার কোন লক্ষণ নেই। শান্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। আসিফকে দেখে একবার নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাকালো শুধু, তারপর অন্যদিকে সরিয়ে নিল দৃষ্টি।

তার দিকে সরাসরি হেটে গেলো আসিফ। ইরফানের ফাইলে যে ছবিতে ওর চোখ আটকে গেছিলো সেটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে মনের চোখে।

“মিস নুসাইফা আজমাইন?” আসিফের প্রশ্নটা শুনে চমকে ফিরে তাকালো মেয়েটা। “নুসাইফা আজমাইন ফারিহা?”

“আপনি?”

প্রশ্নটা শুনে নয়, প্রশ্নের উৎস মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে পরের পিলারের পাশেই; তার কাছ থেকে আসা একটা হালকা ক্লিক শব্দ শুনে থমকে গেলো আসিফ। ওটা পিস্তলের সেফটি ক্যাচ অফ করার শব্দ। আন্তে করে হাতদুটো সামান্য তুলে ধরলো ডিটেক্টিভ।

“পাগলামি করবে না, ইরফান। আমি একা নই। তুমি এখানে আমাকে গুলি করলে আমার সহযোগিরাও ফায়ার করবে। ট্রান্সফারারের গল্প হয়ে যাবে একদম। লোকে হাসবে খুব। এরচেয়ে বরং অস্ত্রটা ফেলে দাও।”

একটা শব্দও ইরফানের কানে গেলো কি না তা নিয়ে আসিফের সন্দেহ আছে, শান্ত গলায় ফারিহার সাথে কথা বলছে ছেলেটা।

“ধীরে ধীরে এদিকে চলে আসো, বেবি। মোটরসাইকেল স্টার্ট দিতে পারবে তো?”

ফারিহা সামনে থেকে সরে গেলো। চাবির উড়ন্ত ঝংকার শুনতে পেল আসিফ। চোখের কোণে দেখলো, ফারিহার দিকে নিজের বাইকের চাবি ছুঁড়ে মেরেছে। তবে আসিফের দিক থেকে চোখ সরায়নি সে। লোকটার হাতে আগ্নেয়াস্ত্র, তবে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল না। বেশ খানিক দূরে দাঁড়ানো ছেলেমেয়েগুলো তা দেখতে পায়নি। পিলারের আড়ালে দাঁড়ানোর সুযোগ নিয়েছে ইরফান।

মেয়েটা একটা কথাও বলেনি এতক্ষণ। রিপোর্টের কথা মনে পড়ে গেলো ওর—এই মেয়েকে নিয়ে অসংখ্যবার ঝামেলায় জড়িয়েছে ইরফান। শিল্পপতি বাবার একমাত্র মেয়ে ফারিহাকে কিডন্যাপ করার প্ল্যান করেছিলো সে, ফাইলে যতটুকু জানা যায়। তারপর মেয়েটাকে একদিনের ব্যবধানে মুক্তিপণ ছাড়াই ফিরে পাওয়া গেছিলো। আসিফের ধারণা, সেখান থেকেই এরা একে অন্যের জীবনের সাথে জড়িয়ে গেছে। ফারিহা এই মুহূর্তে যাচ্ছে মোটরসাইকেলটার দিকে।

“আমাকে গুলি করতে পারো না তুমি, ইরফান,” আন্তে করে ওর দিকে ঘুরে দাঁড়ালো আসিফ।

“পারি, মিস্টার। আপনার কৌতুহল বেশি থাকলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।”

“আগেই বলেছি, আমার সহকর্মীরা আশেপাশেই আছে। গুলি তুমি ছুঁড়তে পারো, কিন্তু পাল্টা গুলি তোমাকেই হজম করতে হবে।”

মুচকি হাসলো ইরফান। “প্রথমবারের মতো ঘটছে না সেটা।”

মোটরসাইকেল স্টার্ট নেওয়ার মৃদু শব্দটা শোনা গেলো আসিফ। একটু ঘাড় ফেরাচ্ছিল ইরফান সেদিকে, আচমকা সামনে বাদলো আসিফ। দুই পায়ে নয়, মাটিতে খুব দ্রুত একবার ডিগবাজি খেয়ে। ইরফানের প্রত্যাশার তুলনায় স্বাভাবিক মুভমেন্ট না এটা। অবাক হয়েছে ইরফান, তবে একই সাথে দ্রুত ঘূর্ণায়মান আসিফের দিকে অস্ত্রটা তুলে ধরতে শুরু করেছে। তবে একটু দেরি হয়ে গেলো।

আসিফ সোজা হয়ে দাঁড়ায়নি, দু-হাতে ভর করে ওপরের দিকে পা চালিয়ে

দিয়েছে। বেমক্কা লাখিটা ইরফানের কজির ঠিক নীচে পড়েছে, ছিটকে উড়ে যাওয়ার আগমুহূর্তে ওটাকে চিনতে পারলো আসিফ।

একটা লেডি হক।

পিস্তলটা মেয়েদের জন্য তৈরি করা হয়। ইরফানের হাতে এই জিনিস কেন? ওসব নিয়ে ভাবার সময় অবশ্য এখন পাওয়া গেলো না। ঘটনা নতুন দিকে মোড় নিয়েছে। পিস্তলের পতনের সাথে ইরফানের লড়াইয়ের সমাপ্তি হবে এমনটা আশা করেনি ও।

সারথ্রাইজ এলিমেন্ট শেষ। আসিফ সোজা হওয়ার আগেই সামলে নিল ইরফান। দাঁড়ানোর সাথে সাথে আক্রমণ করে বসল সে। প্রচণ্ড জোরে আসিফের দিকে হাত চালানো, ঝাট করে আঘাতটা এড়িয়ে গেলো আসিফ। একই সাথে ফসকে যাওয়া ঘুমির দমকে কিছুটা বেসামাল ইরফানের বুকের ওপর আঘাত করার জন্য হাত তুললো কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে বুঝতে পারলো ভুল হয়ে গেছে।

আসিফ ঘুমিটা এড়িয়ে যাবে এবং এভাবে আক্রমণ করতে আসবে তাকে—দুটোই ইরফান আগে থেকে বুঝে গেছিল। ইচ্ছে করেই বেসামাল হয়ে যাওয়ার ভান করেছে ইরফান। এবার আসিফের হাত নিজের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে ঝাট করে অন্য হাতটা তুলে বেমক্কা এক ঘুমি মেরে বসলো ওর মুখে।

মনে হলো হাতুড়ির বাড়ি পড়েছে। নাক থেকে সাথে সাথে রক্ত বের হয়ে এলো আসিফের। মাথা ঝাড়া দিয়ে ঘুমির ধাক্কাটা সামলানোর চেষ্টা করলো সে, ইরফানের হাতটা আরও একবার এগিয়ে আসতে দেখলো, বামহাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কোনমতে ঠেকালো ওটা। পরক্ষণেই বাতাসে একটা বৃত্তাচাপ কেটে ছুটে এলো ইরফানের পা।

মুখের একপাশে যেন আগুন ধরে গেছে—ছিটকে শক্ত মাটিতে আছড়ে পড়ল আসিফ। শুয়ে শুয়েই দেখতে পেল ইরফান তার মোটরসাইকেলের দিকে ছুটে যাচ্ছে। যাওয়ার পথে কুড়িয়ে নিচ্ছে লেডি হকটা।

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালো আসিফ, তারপর ছুটে গিয়ে তার পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হাত থেকে পিস্তলটা ছিটকে গেলো ইরফানের। কয়েক ফিট দূরে গিয়ে ওটা পড়ে থাকলো। কনুই দিয়ে একটা আঘাত করে আসিফকে পিঠের ওপর থেকে ফেলে দিল ইরফান, দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল ওর দিকে। যথেষ্ট সময় নিয়ে প্রথম ঘুমিটা বসাল আসিফ, ছিটকে পিলারের সাথে ধাক্কা খেলো কিডন্যাপার। এবার এক পা এগিয়ে এসে দমাদম কয়েকটা ঘুমি মারলো ইরফানের বুকে আর পেটে। পরক্ষণেই ওপাশ থেকে শক্তিশালি পাঞ্চ খেয়ে পিছিয়েও গেলো দুই পা।

“আমার পথ থেকে সরে দাঁড়াও, ডিটেক্টিভ। হোমিসাইডের সাথে আমার কোন ঝামেলা নেই,” হিস হিস করে বলল ইরফান।

আবার এগিয়ে এলো আসিফ, পা চালিয়ে দিল সজোরে। “আমার পরিচয় জানলে কিভাবে?”

আসিফের লাথিটা এড়িয়ে গিয়ে আরেকবার ওর নাকে ঘৃষি মারলো ইরফান—ডিটেক্টিভ রক্তের নোনতা স্বাদ পাচ্ছে বুঝতে পেরে খুশি হয়ে উঠলো সে।

“কারণ, তুমি ছাড়া আর কেউ আমার পেছনে মরিয়া হয়ে লেগে আছে বলে জানা নেই।,” হাঁফাতে হাঁফাতে উত্তর দিল ইরফান।

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে নাকের নিচ থেকে রক্তটুকু মুছে নিয়ে সাবধানে এগিয়ে এলো আসিফ আবারও। এখন ওরা বৃত্তাকারে ঘুরছে। একজন আরেকজন থেকে সমান দূরত্ব রেখেছে, বস্ত্রারদের মতো। ইরফান খেয়াল করলো আশেপাশের ছাত্রছাত্রীরা কৌতূহলি হয়ে উঠছে। যথেষ্ট দূরে বলে ঘটনা ঠিকমত এখনও বুঝে ওঠেনি। এই ফাঁকে আসিফ হঠাৎ সামনে এসে পড়ল, সরে গিয়ে আঘাত এড়ানোর চেষ্টা করলো ইরফান, ব্যালাসড পায়ে আচমকা এক লাথি বসিয়ে দিল আসিফ। হুড়মুড় করে মাটিতে আছড়ে পড়ল সে। ব্যথায় ককিয়ে উঠলো। মনে হচ্ছে পুরাতন কোন ক্ষতের ওপর লেগেছে।

“ডিটেক্টিভ ছাড়াও আরও একপাল জনতা তোমার পেছনে আছে, ইরফান। তোমার জনপ্রিয়তা দেখে ঈর্ষা হবে যে কারও,” গোঙানিতে কান না দিয়ে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে ফেলেছে আসিফ, “তোমাকে অ্যারেস্ট করা—”

হাতের তালুতে ভর দিয়ে চোখের পলকে পা চালিয়ে দিল ইরফান, মাটিতে আছড়ে পড়ল আসিফ। উঠে দাঁড়াল ইরফান। তিন হাত দূরে ছিটকে পড়েছে আসিফের পিস্তল।

“আর কে আছে আমার পেছনে?”

লাফিয়ে উঠলো আসিফ, “তোমার কোন ধারণা নেই? ধরে নাও এফবিআই?”

“ফালতু কথা!” আগের মতোই বৃত্তাকারে ঘুরছে ইরফান। তবে এবার ওর ইচ্ছে নিজের পিস্তলটার দিকে ফিরে আসা। আসিফের পেছনে আছে ওটা।

“ওটার কথা ভেবো না,” নাকের আরেক ফোঁটা রক্ত মুছে মাইন্ড রিডারের মতো বলল আসিফ। এক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থাকলো ইরফান। সামনের লোকটা প্রাণ থাকতে তাকে এখান থেকে পালাতে দেবে না বুঝতে পারছে।

তারপরই দাঁতে দাঁত চেপে একে অন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা। প্রথম গুলিটার শব্দ যতক্ষণে হয়েছে ততক্ষণে ইরফানের দুটো নাকের ফুটো থেকেই সমানে রক্ত গড়াচ্ছে, শার্টের ওপরের তিনটা বোতাম হয়ে গেছে উধাও। কপালে জুতোর লাথির চিহ্ন দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। আসিফের অবস্থাও এর চেয়ে খুব ভাল নয়। পার্থক্য বলতে ডান গালটা বিচ্ছিন্নভাবে কেটে গেছে ওর, কোটের হাতা কনুই পর্যন্ত ছিঁড়েছে—চুল হয়ে গেছে এলোমেলো।

দ্বিতীয় গুলির শব্দের সাথে সাথে স্প্রিংয়ের মতো সোজা হয়ে গেলো দু-জনেই। দূরে ছুটে আসতে দেখা গেলো কালো কোটক পরা একজনকে। পিস্তল তুলে নির্দিধায় গোলাগুলি শুরু করে দিয়েছে এখানে, কিন্তু পিস্তলের পেছনের লোকটা একজন বিদেশি!

পার্কিংলটের যে প্রান্তে ওরা লড়ছে তার অন্য পাশ থেকে ক্ষেপা যাঁড়ের মতো ছুটে আসছে অ্যাডামস। সিনেমার ভিলেনের মতো পিস্তল উঁচিয়ে রেখেছে নাকের ডগায়।

চোখের ইশারা করল আসিফ। “শয়তানের নাম নিতে না নিতেই...”

যে যার পিস্তলের দিকে বাঁপিয়ে পড়ল ওরা। কাছেই কোথাও একটা গাড়ির পাগলা গর্জন শোনা যাচ্ছে। পরক্ষণেই মোটরসাইকেল স্ট্যান্ডের প্রায় সবগুলো মোটরসাইকেল ফেলে দিতে দিতে ছুটে থাকা আসিফের গাড়িটা চোখে পড়ল ওদের। ইরফানের মোটরসাইকেলের সামনে থেকে সময়মত লাফিয়ে সরে গেছে ফারাহ। ওটার ওপর একটা পালসারকে আছড়ে পড়তে দেখল আসিফ। সেই সাথে দেখলো ইরফান নিজের পিস্তল থেকে মাত্র দুই ফিট দূরে।

নিজের পিস্তলের সেফটি ক্যাচ অফ করলো আসিফ। “ভুলেও এটা কোরো না। তোমাকে আমার জীবিত দরকার। তার অর্থ এই না পায়ে দিকে গুলি করতে দু-বার চিন্তা করবো!”

থেমে গেলো ইরফান। থেমে গেলো পেছনের গাড়িটাও। ভেতর থেকে মাথা বের করে দিল জিয়া।

“স্যার, আমাকে রেডিওতে জানালে ভাল হত না?”

“ভেবেছিলাম একাই সামলাতে পারবো,” সবগুলো দাঁত বের করে হাসার চেষ্টা করল আসিফ কিন্তু আহত মুখে জমলো না সেটা।

দু-হাত ভুলে দাঁড়িয়ে আছে ইরফান। এফবিআই-র এজেন্ট ওদেরকে গাড়িটার জন্য পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছে না।

গলার রগ ফুলিয়ে হুঙ্কার দিল আসিফ, “ফারিহা, ফ্রন্ট সিটে উঠে পড়। ইরফান, আমার সাথে ব্যাকসিটে। কোন রকম চালাকি কোরো না!”

আবারও গুলির শব্দ শোনা গেলো। এখনও কিছুটা দূরে আছে এজেন্ট। তাছাড়া গাড়ির জন্য শরীরের অর্ধেক অংশ আড়ালে আছে ওদের। কাছেই এই বুলেটটা কাউকে আঘাত করলো না। গুলির শব্দটা মস্তিষ্ক থেকে সরে যাওয়ার আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ইরফান, শেষবারের মতো পড়ে থাকা লেডি হকটার দিকে তাকিয়ে উঠে বসলো গাড়িতে, ওর পাশে বসে পড়ল আসিফও। এফবিআই এজেন্ট দাঁড়িয়ে চলে এসেছে, খোলা জানালা দিয়ে তার দিকে ধাঁই ধাঁই করে কয়েকটা গুলি মেরে বসল সামান্য ওপরে লক্ষ্য করে। লোকটাকে আহত করা ওর উদ্দেশ্য নয়।

আড়াল নিতে বাধ্য হলো এফবিআই এজেন্ট, চোঁচিয়ে উঠলো আসিফ, “গুডবাই, মি. অ্যাডামস!”

গাড়ি ঘুরিয়ে ফেলেছে জিয়া দ্রুত। এখানে অ্যাডামস আছে, তার মানে আশেপাশে ডিটেক্টিভ রেজাও আছে। একগাদা হতচকিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর মাঝ দিয়ে ছুটে বের হয়ে এলো ওদের গাড়ি।

“আমার সম্ভবত ওদের কাস্টডিতে থাকার কথা,” অনুযোগের সুরে বলল ইরফান।

“ওদের সাথে এ নিয়ে আলাপ করার সময় আমাদের নেই,” সাফ সাফ জানিয়ে দিল জিয়া।

“তার মানে আমার কেসটা আপনাদের হাতে নেই। তাহলে আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছেন? ক্রসফায়ারে দেবেন নাকি?”

ইরফানের কথা শুনে বোঝা গেলো, এই ছেলে কিছুটা হলেও বুদ্ধি রাখে। তার দিক থেকে একমুহূর্তের জন্যও চোখ সরায়নি এতক্ষণ, এবার সরাসরি তাকালো আসিফ। “একটু আগে যেটা দেখছিলে সেটাকে ক্রসফায়ার বলতে পারো। এখন দয়া করে একটু চুপ হয়ে থাকো।”

“আপনাদের অফিসে নিয়ে যাচ্ছেন তো? এফবিআই’র জন্য আপনাদের হাত থেকে আমাকে বের করে নিয়ে যাওয়া মোটেও কঠিন কিছু হবে না।”

কথাটার সত্যতা জানা আছে আসিফের, তিন্ত হাসি হাসলো সে। “কে বলল তোমাকে আমাদের ডিপার্টমেন্টে নিয়ে যাবো?”

অবাক হয়ে ফিরে তাকাল জিয়া। “স্যার?”



“ফারিহাকে যেতে দিন। ও এসবের মধ্যে প্রথম থেকেই নেই। ছিলোও না কখনও।” অনেকক্ষণ পর গাড়ির ভেতরের নিস্তব্ধতা ভাঙল ইরফান।

কিছু না বলে ড্রাইভ করছে জিয়া। আসিফ আড়চোখে তার দিকে নজর রাখছে। দু-জনের মধ্যে কথাটা কোন পরিবর্তন আনলো না। এমনকি ফারিহা পর্যন্ত ফিরে তাকালো না ওর দিকে। একবার করে সবার দিকে বিরক্ত হয়ে তাকাল ইরফান। কথাটা কি কারও কান দিয়ে ঢুকল না?

আসিফের পিস্তলটা এখনও ওর দিকে সরাসরি তাক করা, এই মুহূর্তের জন্য এটুকু তথ্যই যথেষ্ট ছিলো হয়তো, কিন্তু ফারিহার নিরাপত্তার কথা ভেবে চুপ থাকা সম্ভব হলো না।

“আপনার মোটা মাথাটা একবার খাটান, ডিটেক্টিভ! ফারিহা এখানে ইনভলভড না। এতটুকু বুঝতে তো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। ওকে ধরে নিয়ে যাওয়ার মানে আপনি আইনের লোক হয়ে একজন নাগরিককে অপহরণ করছেন।”

“আমাদের সাথে ও নিরাপদ থাকবে,” ছোট্ট করে উত্তর দিল আসিফ।

“আপনাকে আমি বিশ্বাস করি না,” সোজাসুজি বলে দিল ইরফান।

মুচকি হাসলো আসিফ। “কেন?”

বিরক্তিতে মুখ কোঁচকাল ইরফান। “আপনি একজন মেসন নন তার গ্যারান্টি কে দিচ্ছে?”

আসিফের মুখের হাসি মুছে গেলো। ইরফান কথাটা বলেছে যথেষ্ট সিরিয়াস হয়ে। গলার সুরেই ও বুঝতে পারল এর পছন্দের তালিকায় ঠাঁই পাবে না মেসনরা। এই ছেলেটার মেসন-বিরোধিতার কারণ কি হতে পারে? টাকার জন্য বিজয়কে কিডন্যাপ করেছিলো—নাকি আরো কিছু আছে? তাছাড়া, এফবিআই-র ওরাও যে তার মতো চিন্তা করে রেডফোর্ড পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারবে, এটা বোঝা উচিত ছিলো ওর। ওদের আভারএস্টিমেট করার মতো বোকামি হতে পারে না আর।

টিটকিরির সুরে আসিফ বলল, “সেটা তো বটেই। আমি হলাম এদেশের একমাত্র গ্র্যান্ড লজের মাস্টার মেসন। এই যে ড্রাইভ করতে থাকা জিয়াকে দেখছেন, ও একজন ওয়ার্ডেন। আর আমাদের এফবিআই এজেন্ট অ্যাডামস হলো একজন ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান।”

ইরফান এবার চুপ হয়ে গেলো। খতিয়ে দেখছে সম্ভাবনা।

“আমেরিকার নাগরিক ছিলেন প্রফেসর তানভীর জালাল। সেটা বেশ কথা। খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষ ছিলেন তিনি পৃথিবীর জন্য। সেটাও মানার মতো একটি সত্য। তার খুনের তদন্তে আমেরিকা এফবিআইকে পাঠাতেই পারে, আমি এটাও মানতে পারি কিন্তু—”

সামনের সিট থেকে আন্তে করে বাক্য সম্পূর্ণ করে দিল জিয়া, “চোখে পড়ামাত্র নিরস্ত্র সাসপেক্টকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোটা কোন ধরণের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনীর পলিসিতে পড়ে?”

“র‍্যাবের কথাই বলা যায় উদাহরণ হিসেবে,” কৃত্রিম হেসে বলল ইরফান।

সহকারির দিকে একবার তাকালো আসিফ, তারপর ইরফানের দিকে ফিরে এলো ওর দৃষ্টি। “তুমি হয়তো আমাকে বিশ্বাস করো না, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না এফবিআই-কে। একটু আগে যা ঘটেছে, হয়তো আমার হাতে জীবন্ত ধরা পড়ার চেয়ে মৃত ইরফান ওদের জন্য ভাল খবর।”

মৃদু সুরেলা রিংটোনে গাড়ির ভেতরটা ভরে গেলো। চমকে উঠলো আসিফ—একই সাথে নড়ে উঠলো ইরফান। পরক্ষণেই থমকে গেলো। আসিফের মনযোগ কয়েক মুহূর্তের জন্য সরে গেছিলো, তবে পিস্তল সরেনি একচুলও। সব সময় মোবাইলটা ও ভাইব্রেশনে রাখে। এখন রিংটোন বেজে ওঠায় চমকানোটাই স্বাভাবিক। জিয়ার বোকামিতে সেই যে রিংটোন অন করা হয়েছে, এখনও বন্ধ করা হয়নি।

মোবাইল পকেট থেকে বের করলেও ইরফানের উপর থেকে নজর সরাল না ও। স্ক্রিনে আড়চোখে তাকিয়ে দেখল আননোন নম্বরের কল। ডিসপ্লেতে নাম ছাড়াই ভাসছে নাম্বারটা। এমন সময়ে কে ফোন করতে পারে তাকে? অবাক হলেও রিসিভ করলো আসিফ।

“হ্যালো,” সরাসরি ইরফানের চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল।

“স্যার, আমি তৃণা।”

ভয়ানক চমকে গেলোও মুখের ভাব স্বাভাবিক রাখলো সে। তৃণা ওকে অন্য কোন নাম্বার থেকে ফোন করার একটাই অর্থ হতে পারে!

“আমাকে নজরবন্দি করে রাখা হয়েছে। সম্ভবত ডিরেক্ট লাইন ট্যাপ করবে ওরা। একট্রা আনরেজিস্টার্ড সিম থেকে কথা বলছি। ডিপার্টমেন্টের লেডিস রুমে আছি আমি। হাতে সময় নেই বেশি—বুঝতেই পারছেন।”

“কি হয়েছে সেটা জানাও,” ফোনটা শক্ত করে কানে ধরলো আসিফ।

“প্রফেসর তানভীর জালালের ছেলের কিডন্যাপারকে শেলটার দেওয়ার অভিযোগ আনতে যাচ্ছে ওরা আপনার বিরুদ্ধে। অফিস থেকে ফোন আসলে রিসিভ করবেন না। তারা চায় আপনি ডিপার্টমেন্টে এসে নিজে ব্যাখ্যা দেবেন। তারপর থাকবেন নজরবন্দি। আপনার সাথে জিয়াও।”

“চমৎকার!”

“আসলেই কি ইরফান আপনাদের হাতে?”

“ছিলো। ছেলেটা আমাদের উপর হামলা করে ওর গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। কিন্তু তুমি আমাদের সাহায্য করছো কেন?”

অবাক হলো তৃণা। “পালিয়েছে?”

“ইরফানের বৈশিষ্ট্যই ওটা। আমরা আভার-এস্টিমেট করেছিলাম ওকে। যাক

গে, আমার প্রশ্নের জবাব তো দিলে না।” এই মুহূর্তে ডিপার্টমেন্টে তৃণার মাধ্যমে একটা মেসেজ পৌঁছাতে চাইছে আসিফ।

“ডিটেক্টিভ রেজার গতিবিধি আমার কাছে সন্দেহজনক লাগছে। বিদেশি দু-জনেরও। ওদেরকে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, স্যার। তদন্ত সমাধানের চেয়ে তারা অন্য কোন দিকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে মনে হয়।”

“এরকম বললে কেন?” চট করে জানতে চাইল আসিফ।

“শুধুই একটা ফিলিংস। তাছাড়া, লোকাল পুলিশের কাছে খোঁজ নিয়েছিলাম। বিজয়কে যেখানে পেয়েছে বলে তারা জানিয়েছে, স্থানীয় থানার কোন পুলিশ সেটা জানে না। বিজয় যদি ইরফানের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে থাকে, প্রথমে পুলিশের সাথে যোগাযোগ করার কথা না ছেলেরটার? অথচ সে যোগাযোগ করেছে ডিটেক্টিভ রেজার সাথে! আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, বিদেশি এজেন্টদের সাথে। বিজয়ের তো জানার কথা নয় তাদের ব্যাপারে। তার মানে ডিটেক্টিভ রেজা মিথ্যা বলছে। বিজয়কে কোথা থেকে তুলে এনেছে খোদা মালুম!”

“হুম। তাহলে ডিপার্টমেন্টে এসে রিপোর্ট করছি? ভ্যাম্পায়ার কেসটা এখনও কিন্তু আমার।”

চমকে উঠল তৃণা, “ওই কাজ ভুলেও করবেন না। আপনাকে তদন্ত থেকে সরিয়ে ডিটেক্টিভ রেজাকে ওই কেসটা হাতে তুলে দিতে চাইছে হিটলার।”

“তাহলে আমার আর ছোট্টাছুটি করার দরকার কি? সবই তো রেজা করবে, তাই না?” হতাশার সুরে বলল আসিফ।

“রেজার হাতে পড়লে কেসটা আলোর মুখ দেখবে বলে মনে হয় না, স্যার। দেড়দিন সে এটা নিয়ে কাজ করেছে, এক পা-ও এগুতে পারেনি।”

“ঠিক আছে, আপডেট জানিও আমাকে।”

ফোন রেখে দিতেই সামনে থেকে প্রশ্ন করল জিয়া, “বুঝলাম না, স্যার?”

মোবাইলটা পকেটে ঢুকিয়ে পূর্ণ মনোযোগ ইরফানের দিকে দিল আসিফ। “ফিউজিটিভকে সহযোগিতার অভিযোগ এনেছে ওরা আমাদের বিরুদ্ধে। ডিপার্টমেন্ট থেকে আর কোন হেল্প পাবে বলে মনে হয় না। ঐ অ্যাডামস হারামজাদা প্রাণিয়ে দিয়েছে এরইমধ্যে!”

“ফাইন! তাহলে আমাদের কাস্টডিতে কোন অপরাধি থাকছে না?”

খুক করে কাশল ইরফান। “আমাকে আটকে রাখার অধিকার তোমাদের নেই বলে মনে হচ্ছে। অফিসে যেমনটা জানালে, সেটা বাস্তবে ফুটিয়ে তোলা উচিত না? তোমাদের উপর হামলা করে ফারিহাকে নিয়ে...”

মাথা নাড়ল আসিফ। “পালাবার আশা বাদ দাও। বাচ্চাদের কিডন্যাপ করা যার পেশা তাকে সমাজের বুকে মুক্তভাবে ঘুরে বেড়াতে দেব আমি, ভাবলে কি করে? আমার হাতে এখন তোমাকে ধরে রাখার অধিকার নেই, বেশ! দরকার হলে মাথায় একটা বুলেট ঢুকিয়ে ড্রেনে ফেলে দেব তোমাকে। তাতে সমাজের উপকার হবে।”

এতক্ষণে মুখ খুললো ফারিহা, দুই চোখ রাগে জ্বল জ্বল করছে। “আপনাদের মতো লোকেরাই ক্রশফায়ার করে সম্ভবত। একজন মানুষকে কুকুরের মতো গুলি করতে চাইছেন? প্রতিটি মানুষ ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার আছে।”

“শিশু অপহরণকারিকে আমি মানুষ বলে গণ্য করি না।”

মাঝখানে বাঁধা দিল ইরফান। “অপহৃত কারও ক্ষতি করিনি আমি এখনও। আমার ফাইল পড়া থাকলে এতটুকু আপনার জানা থাকার কথা।”

“একজন শিশুকে দুর্বিসহ জীবন উপহার দেওয়াটা কোন ক্ষতি নয়? তোমার কি ধারণা, কিডন্যাপিং সিচুয়েশনে বাচ্চাদের কোন মানসিক চাপ পড়ে না? শারীরিক ক্ষতি হয়তো করোনি, তবে তোমাকে দানব ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না।”

গাড়ির ভেতরে নিরবতা নেমে এলো। ইরফানের চেহারা একবার ভালোমত খেয়াল করল আসিফ। উদ্বেগ বা উৎকর্ষার কোন চিহ্নই নেই তাতে। শান্ত দুটো চোখে স্বচ্ছ হ্রদের গভীরতা। কপালে ছড়িয়ে থাকা চুলগুলোতে বালি লেগে আছে। কৃতিত্বটা আসিফেরই। নাক থেকে কয়েক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে এসেছে ওপরের ঠোঁট পর্যন্ত। একটু বাঁকা হয়ে বসেছে সে, পিঠে ব্যথা থাকলে এভাবে বসে থাকে কেউ। মাটিতে বেকায়দায় পড়ার সময় হয়তো পিঠে লেগেছিলো খুব।

প্রথম দর্শনেই যেকোন মেয়ে প্রেমে পড়ে যাবে এরকম চেহারা আর অত্যন্ত সভ্য ভঙ্গিতে কথা বলা এই যুবকের, অথচ কিভাবে পৃথিবীর সবচেয়ে ঘৃণ্য পেশা বেছে নিল-ভেবে আসিফের মন খারাপ হয়ে গেলো। এরকম স্কিল নিয়ে খুব ভাল একজন ডিটেক্টিভ হতে পারতো সে।

“আমাদের নিয়ে কি করবেন?” শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল ইরফান।

“তোমার সাথে আমার কথা আছে, ইরফান। তারপর তুলে দেব পুলিশের হাতে।” সোজাসুজিই জানিয়ে দিল আসিফ।

“ফাইন। আমাকে ওরা আদালতে নেবে না, সেটা জানেন তো? বুলেট খরচ করবে একটা।”

“মেসনদের অসম্ভব ক্ষমতা থাকতে পারে, তবে পুলিশ কেস লিখে ফেলার পর তোমার কিছু করতে পারবে না তারা। মানুষের সন্দেহ হবে। আদালতে ন্যায়বিচার পাবে তুমি,” আড়চোখে ফারিহার দিকে তাকাল আসিফ, “তবে ওটা কতদূর কাজে আসবে সেটা তুমিই ভাল জানো।”

“কিডন্যাপ কেসগুলোর কথা বলছেন? প্রমাণ করতে পারবেন না কিছু।”

“তাই নাকি?” ছেলেটার কণ্ঠে আত্মবিশ্বাস টের পেয়ে অবাক হলো আসিফ, “ওসব না-হয় বাদ দিলাম। প্রফেসরের তানভীর জালান্ডারের ব্যাপারটা কি বলবে?”

“প্রফেসরের মৃত্যুতে আমার কোন হাত নেই।”

“ডানার সাথে তোমার যোগাযোগ ছিলো, সেটাও অস্বীকার করতে চাও?” আন্দাজে টিল ছুঁড়ল আসিফ।

“ডানা কে?” নির্বিকারভাবেই জানতে চাইল ইরফান।

গাড়ি থামিয়েছে জিয়া। পাশের বিক্ষুব্ধ বাড়িটা দেখে মনে হতে পারে সাধারণ স্কেলের একটা ভূমিকম্প হলেই হুড়মুড় করে পড়ে যাবে। নির্ধাত গত শতাব্দিতে তৈরি করা। আসিফ এই বাড়িটা চেনে। জিয়ার দূর সম্পর্কের নানীর মালিকানায় আছে এটা। ঢাকায় জিয়ার একমাত্র আত্মীয়। আগে কখনও এখানে ঢোকা হয়নি, তবে বছর দুয়েক আগে এপথে যাওয়ার সময় জিয়া বাড়িটা দেখিয়েছিলো। ডিপার্টমেন্টের আর কারও জ্ঞানা থাকার কথা নয়। পার্টনার না হলে আসিফও জানতো কি না কে জানে!

মহিলা একেবারেই মাটির মানুষ, ছেলেমেয়ে সবাই বাইরে উচ্চশিক্ষার জন্য গিয়েছিলো। পারিবারিক ঐতিহ্য। তবে এরা সেই ঐতিহ্য মেনে আর দেশে ফেরেনি। সবাই বিদেশে সেটল্ড। মাকে টানা হ্যাঁচরা করে নিয়ে যেতে চাইলেও আমেরিকা, জার্মানি বা অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে তিনি বাংলাদেশের মাটিতে থাকাই বেছে নিয়েছেন। ছেলেমেয়েরা বছরে একবার করে আসে এখানে। বাকি সময়টা খালিই হয়ে থাকে বাসা। একটু আগে এফবিআই'র দিকে ধুমামুম গুলি চালিয়ে নিজেদের বাড়িতে ওরা ফিরে যেতে পারবে না-নিঃসন্দেহে সম্ভাব্য সবখানে লোক লাগিয়েছে ডিটেক্টিভ রেজা।

হোটেলের ওঠা যেত, তবে ইরফান সঙ্গে আছে। হোটেল রুমে একজনকে পিস্তলের মুখে রেখে চলাফেরা করা যাবে না। এখানে এসে ভালই করেছে জিয়া। মনে মনে ওকে কৃতজ্ঞতা জানালো আসিফ।

একটু হাসলো সে। “আমাদের যাত্রা এখানেই শেষ। যেমনটা বলেছিলাম, তোমার সাথে কথা আছে আমার।”

দরজা খুলে নেমে এলো ফারিহা, মেয়েটার ওপর চোখ রাখলো জিয়া। ইরফানকে বের করে আনছে আসিফ, তার দিকে তাকিয়ে আছে ফারিহা। চোখে অদ্ভুত ধরণের একটা দৃষ্টি। আসিফের মনে হলো চোখের ভাষা পড়তে ওর ভুল হচ্ছে। এক সেকেন্ড পরে ফারিহার প্রশ্নে অবশ্য সেই ধারণা কেটে গেলো।

“অ্যাঁই, ডানা কে?” ইরফানের দিকে কটমট করে তাকিয়ে জানতে চাইল মেয়েটা।

“ডানা বাতশিভা। মেয়েটা ছিলো প্রফেসরের কুক। টিনএজে প্রফেসরের কারণে সাধারণ জীবন ফিরে পেয়েছিলো। কৃতজ্ঞতা থেকে প্রফেসরের সাথে থেকে গেছিলো সে। নিজের দিকটাও মেইনটেইন করতে পারছিল, অনলাইনে কুकिং লেসন দিত সে। বাইরের দেশের অনেক সাবস্ক্রাইবার ছিলো তার। তাছাড়া প্রফেসর ভাল বেতনও দিতেন তাকে। সব মিলিয়ে সন্দেহ করার মত কিছু দেখিনি আমরা তার মাঝে।” নিঃশ্বাস নিতে থাকে আসিফ, “তবে আমার মনে হয় অযথাই তোমাকে এসব শোনাচ্ছি আমরা। তোমার অজানা তথ্য থাকার কথা না কিছুই এর মাঝে। আমাদের খটকা লেগেছিলো ডানার সুইসাইড লেটারটা পড়ে। প্রফেসরের চরিত্র নিয়ে যেমনটা বলা হয়েছে, আমার মনে হয় না ওরকম কিছু করেছিলেন তিনি। সব কিছুই খুব দ্রুত ঘটে গেছে আসলে। বিশ্বাস করতে সেজন্যই সমস্যা হচ্ছে আমার।”

চুপচাপ শুনলো ইরফান। কিছু বলল না। জিয়ার নানী সাফেয়া বেগমের উষ্ণ অভ্যর্থনার পর তিনটি কাজ করেছিলো ওরা। প্রথমেই নানীকে পটিয়ে লিভিংরুমে পাঠিয়েছে জিয়া, বলেছে এখানে খুবই গোপনীয় একটি মিটিং করতে এসেছে ওরা। তারপর ফারিহাকে একটা অ্যাটাচ বাথযুক্ত ঘরে ঢুকিয়ে বাইরের থেকে দরজায় তালা মেরে দিয়েছে, সবশেষে ইরফানকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। একবারও আসিফের লাইন অব ফায়ারের মাঝে চলে আসেনি জিয়া, আসিফ নিজেও স্নায়ুতে সামান্যতম ঢিলও দেয়নি। ইরফান এতক্ষণে বুঝে গেছে—এরা যথেষ্ট প্রফেশনাল। ফোনালাপ শুনে সে বুঝেছে, এরা আর কিছুক্ষণের মাঝেই হয়ত নিজেদের ডিপার্টমেন্ট থেকে তাড়া খেতে চলেছে, তবে সেটার কেয়ারও করে না তারা। নিজস্ব পরিকল্পনা ধরে শান্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে যাচ্ছে। একমাত্র স্বস্তি : মেসনদের সাথে এদের সংশ্লিষ্টতা থাকার মতো কোন সঙ্কেত ষষ্ঠইন্দ্রিয়ে পায়নি সে। গত কয়েক মাস ধরে বাংলাদেশের মেসনদের নিয়ে এত পরিমাণ ঘাঁটাঘাঁটি করেছে ও, খুব সহজে তাদের চিনতে পারে এখন।

এই বাড়িতে ঢোকার পর থেকে এখন পর্যন্ত দুটো কথা বলেছে ইরফান। প্রথমে নানীর উদ্দেশ্যে একটা লম্বা সালাম দিয়েছিলো। তারপর এই ঘরে ওকে ঢোকানো হয়। দরজা লাগিয়ে দিয়েছিলো আসিফ। আর আচমকা ইরফানের হাতে হাতকড়া আটকে জানালার গরাদের সাথে অন্যত্রান্ত আটকে দিয়েছিলো জিয়া। তারপর জানালা বরাবর হুঁড়ে মেরে চাবিটা নিচে ফেলে দিয়েছিলো। অজান্তেই ওর মুখ থেকে দ্বিতীয় বাক্যটা বের হয়ে এসেছিলো, “ওহ্, ফাক!”

এরপর থেকে একেবারে চুপ হয়ে আছে ও, আসিফের লম্বা চওড়া লেকচার চলছে প্রায় দশমিনিট ধরে—তবুও টু শব্দটাও করেনি। আসিফের জন্য ব্যাপারটা অপমানজনক। তার সাসপেক্টের সাথে সে কথা বলেছে অথচ অন্যপাশ থেকে উত্তর আসেনি, এমনটা খুব কমই হয়েছে। অনেক শব্দ পাত্র দেখেছে জীবনে। দোষি সাব্যস্ত

করার পর তাদের মুখ থেকে সত্য-মিথ্যা কিছুই বের করা যায় না। অথচ প্রত্যেককে ক্র্যাক করেছে ও। গায়ের জোরে নয়, কথার প্যাচে। ইন্টেরোগেশনে আসিফের অভিজ্ঞতা ডিপার্টমেন্টের অন্যান্যদের জন্য ঈর্ষণীয়। ইরফানকেও কথা বলতে হবে। সময় নষ্ট করছে ছোকরা—এই যা।

ওদের হাতে অবশ্য অফুরন্ত সময় আছে। বিজয়কে ফিরে পাওয়া গেছে, কাজেই কারও জীবন নিয়ে আর ভাবতে হচ্ছে না এই কেসে। আসিফ বা জিয়ার মাথা থেকে ভ্যাম্পায়ার কেসটা মুছে যায় নি, তবে তার সাথেও মেসনরা সম্পর্কযুক্ত। ইরফানকে ভালোভাবে জেরা না করে সৈকতের দিকে এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না বলে ওরা একটু আগে একমত হয়েছে। এই ছেলে যত সামান্য কিডন্যাপারই হোক, তার কাছে তথ্য আছে।

তথ্য-যেগুলো জানতে ডক্টর রমিজ খানও সাহায্য করতে পারবেন না আসিফকে। এতক্ষণে একটা বিষয় ওরা বুঝতে পেরেছে, ইরফান টাকার জন্য কিডন্যাপ করেনি। তাহলে তিনদিন চুপ করে বসে থাকত না, মুক্তিপণ সে চায়নি। বিষয়টা আশ্চর্যজনক। এর মাঝে ছেলেটার ক্ষতিও করেনি সে। অর্থাৎ ভিন্ন কোন কারণে তাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিলো। এই পর্যন্ত ইরফানের করা সবচেয়ে অযৌক্তিক কাজ সম্ভবত এটাই। তবে পেছনে ভাল কোন যুক্তি না থেকে যায় না। এ জাতীয় মানুষ নিজেদের স্বার্থ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যে এক পা-ও বাড়ায় না। টাকা না হলেও, স্বার্থ তার কিছু ছিলো। এটাই বের করতে হবে ওদের।

“ফারিহা কোথায়? ওকেও আটকে রেখেছ নিশ্চয়?” বিদ্রূপের সুরে জানতে চায় ইরফান। ফারিহা বন্দির কাজটা ওর চোখের সামনে করা হয়নি।

ছেলেটাকে মুখ খুলতে দেখে নড়েচড়ে বসে আসিফ, “নিরাপদেই আছে ও। তবে তোমার আশেপাশে তাকে রাখা যাবে না। আবেগের বশে তোমাকে মুক্ত করার চেষ্টা সে করবেই। ওই ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না।”

“মেয়েটা ইহুদি। বাংলাদেশি নয়। ইজরায়েলি নাগরিক,” থমথমে মুখে বলল ইরফান।

একে অন্যের দিকে তাকাল আসিফ আর জিয়া। ভীষণ চমকে গেছে ওরা।

“ফারিহার ব্যাপারেও ফাইল আছে, ইরফান। মেয়েটা এদেশেই জন্মেছে। বাবা ছিলেন শিল্পপতি রিজভী আকন্দ। ইহুদি হতেই পারে না সে। বাই বাই ইহুদি না হলে কেউ ওই ধর্মে ঢুকতে পারে না, জানো তো?”

চোখ পিট পিট করল ইরফান। “ফারিহা না, ডানা বাতশিভার কথা বলছি।”

হেসে ফেলল আসিফ। “আমরা নিশ্চয় দারুণ ঝগড়া গুলে আছি। যেখানে ইজরায়েল থেকে মোসাদের এজেন্ট ডানা বাতশিভা এসে মেরে রেখে গেছে প্রফেসরকে। তারপর নিজেও করেছে আত্মহত্যা?”

“বিশ্বাস করতে চাপ দিচ্ছি না তোমাকে। তবে ইহুদি আর জায়নিস্টদের ছাড়া মেসন অচল। অন্তত আজকের মেসনারি। প্রতিটি মেসনই ইজরায়েলকে রাষ্ট্র হিসেবে

পছন্দ করে। বাংলাদেশে ঢুকে পড়ার সময় শুধু নেটিভদের ব্যবহার করতে চায়নি তারা। ডানা বাতশিভা একা নয়—আমার জানামতে আরও তিনজন ইজরায়েলি এই মুহূর্তে বাংলাদেশে অবস্থান করছে।”

“ডানার সাথে আমার কথা হয়েছে। পরিষ্কার বাংলায় কথা বলেছিলো সে।” মাথা নাড়ল আসিফ, “আমি তোমাকে বিশ্বাস করার যুক্তি দেখি না। যেটা বিশ্বাস করছি, প্রথম সুযোগেই মেয়েটা প্রফেসরকে ইনসুলিন পুশ করেছিলো; মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে। অসুস্থ শরীরে ল্যাব পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন প্রফেসর। তারপর মারা গেছেন ওখানে। আর একই সাথে তুমি কিডন্যাপ করেছ বিজয়কে। ত্রিশ সেকেন্ড করে দু-বার ভিডিও ট্রান্সমিশন বন্ধ হয়ে গেছিলো প্রফেসরের বাড়িতে। সেটা করতে নিশ্চয় ডানা তোমাকে সাহায্য করেছিলো? ইনসাইড হেল্প না পেলে কিছু করতে পারতে না তুমি। প্রফেসরের মৃত্যুর ব্যাপারে তুমিও জড়িয়ে গেছো, ইরফান। ধরলাম পৃথিবীতে মেসনরা নেই, তবুও তোমার আচরণের ব্যাখ্যা মেসন-ফ্রি আদালত শুনতে চাইবে। আর ওখানে আমি দেখতে পাচ্ছি, একটা খুনে সাহায্য করেছিলে তুমি।”

আসিফের ভয় ধরানো ঠাণ্ডা গলা শুনে একটুও পাল্টাল না ইরফানের মুখের ভাব, স্বাভাবিক সুরেই আবার বলল, “ডানার চেহারা দেখেছো তুমি। মেয়েটা এদেশি নয়। বাংলা ওরা শেখে। প্লাস্টিক সার্জারিও করেছে দু-জন। এদিককার মতো ফেস-কাটিং থাকলেই আর কেউ সন্দেহ করতে চায় না।”

“প্রমাণ আছে তোমার কাছে?” সোজাসুজি জানতে চাইল আসিফ।

নির্বিকার ভঙ্গিতেই জবাব দিল ইরফান, “হঁ। চাইলে দেখে আসতে পারো।”

“কোথায়?”

“একটা ক্লিনিকের নাম দেবো। তার মর্গে খোঁজ নেবে। মানুষটার চেহারা দেখে আমাকে বলবে, সে বাংলাদেশি ছিলো, ইজরায়েলি না।”

“খুন করেছে তুমি ওকে?”

কাঁধ কাঁকাল ইরফান, যেন এ বিষয়ে কথা বলতে চাইছে না। জানালার পাশে থাকা খাটে বসে ছিলো এতক্ষণ, এবার লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। হাতে হাতকড়া থাকায় খুব একটা সুবিধেজনক হলো না শোয়ার ভঙ্গিটা, পিঠ উঁচু হয়ে আছে। তবুও তার চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই বিন্দুমাত্র অসুবিধা অনুভব করছে। ছোঁষ বন্ধ করে ফেললো সে।

“তোমাদের থেকে আমি অনেক অনেক বেশি জানি, ডিটেক্টিভ। আমার কাছ থেকে তুমি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সব তথ্য পেতে পারো, তবে তার বিনিময়ে আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। ব্যাপারটা নিয়ে ভেবে দেখ—আমি একটু ঘুমিয়ে নেই।”

চোখ কুচকে তার দিকে তাকিয়ে থাকল আসিফ, ছেলের মাথায় সমস্যা আছে মনে হচ্ছে, দৃঢ় গলায় জানিয়ে দিল, “সেটা কখনও হচ্ছে না। তোমার থেকে কয়েক ঘণ্টায় না, কয়েক দিনের মধ্যে তথ্য বের করে নেব এমনিতেই। ছেড়ে দেয়ার প্রশ্নই আসে না।”



চোখ খুলল না ইরফান। “নিরপরাধ একজন মানুষের মৃত্যুর জন্য সেক্ষেত্রে তুমি দায়ি থাকবে।”

“শুনে কষ্ট পেলাম,” মুচকি হাসল আসিফ, “কার কথা বলছো, জানতে পারি? আমি কি এটাকে একটা হুমকি হিসেবে ধরে নেবো?”

“সৈকতের কেসটা নিয়ে তুমিই তদন্ত করছো। কাজেই জানা থাকার কথা, ইভা মারা গেছে। ইভার মৃত্যুর জন্য দায়ি একই শক্তি-যার রহস্য তুমি ভেদ করতে চাও।”

অবাক হলো না আসিফ। “তাহলে তোমরা একে অন্যকে চেনো।”

গাড়িতে বসে ভ্যাম্পায়ার শব্দটা উচ্চারণ করেছিলো আসিফ। সৈকতের নাম সে বলেনি। অথচ কার কথা বলা হয়েছিলো, ইরফান বুঝে গেছে।

“আমাদের কমন এনিমি আছে,” ঘুম ঘুম কণ্ঠে বলল ইরফান।

চেয়ার টেনে বসে পড়ল আসিফ, বিষয়টা আগ্রহোদ্দীপক। “ইভা খুন হয়েছে—সে ব্যাপারে কতটা নিশ্চিত তুমি?”

“শতভাগ।”

“মেসনদের সাথে তোমার বিরোধিতা কোথায়?”

প্রশ্নটা জাগিয়ে তুলল ইরফানকে। উঠে বসে জানালার পাশের দেওয়ালে হেলান দিয়ে তাকাল আসিফের দিকে। “আমার একটা ছোটবোন আছে, মি. ডিটেক্টিভ। ফ্যামিলি মেম্বার বলে কেউ যদি থাকে তবে সে-ই।”

হিসেব মেলানোর চেষ্টা করল আসিফ। “মেয়েটা এখন মেসনদের হাতে? তোমার ধারণা ইভার পরিণতি অপেক্ষা করছে ওর জন্য?”

“তারচেয়ে খারাপ। তবে পনের তারিখের মধ্যে আমি ওকে বের করে আনতে না পারলে মারা যাবে ও।”

“নিরীহ মেয়েদের সাথে মেসনদের কাজটা কি?” অবাক হলো আসিফ।

“নতুন নিয়ম অনুযায়ী, মাস্টার মেসনকে শয়তান সাধনায় ইপসিসিমাস স্তরে যেতে হবে। আর ওই পর্যায়ে পৌছানোর জন্য কুমারি বলি জরুরি।” কয়েক সেকেন্ডের জন্য নিরব হয়ে গেলো ইরফান, তারপর আসিফের দিকে সরাসরি তাকাল। মেসনরা একা নয়, ডিটেক্টিভ। একাধিক গুপ্তসঙ্ঘ একত্র হয়েছে এখানে। নিজেদের একসাথে ‘চক্র’ বলে ওরা। পৃথিবীর অনেক দেশ ওদের হাতের মুঠোতে। তবে বিশ্বকে অধিকার করার জন্য বড় দেশগুলো শুধু নয়—ছোট দেশগুলোতেও ওদের কান্ট্রি থাকতে হবে। ওদের এবারের টার্গেট বাংলাদেশ।”

আসিফ কোন কথা বলল না।

উত্তেজিত হয়ে উঠল ইরফান। “বিশ্বাস করো, চক্রের সম্পর্কে আমি যতদূর জানি, তুমি তার এক শতাংশও জানো না তুমি। আর বাংলাদেশকে নিয়ে ওদের ষড়যন্ত্র যদি নস্যাত্ন করে দিতে চাও, আমার সাহায্য তোমার লাগবেই। ভ্যাম্পায়ার কেস সমাধানে আর প্রফেসরকে কেন মারা যেতে হয়েছে সে-ব্যাপারে জানতেও আমার সাহায্য লাগবে তোমার। এফবিআই থেকে এখানে এজেন্ট কেন পাঠানো হয়েছে—কেন

তারা একের পর এক ট্রেইল মুছে দিয়ে নিজেদের মতো কেস সাজাচ্ছে, কেন মারা গেছে ইভা আর কেনই বা আমি বিনাপারিশ্রমিকে বিজয়কে কিডন্যাপ করে এনেছি, এসব যদি জানতে চাও, আমাকে সহযোগিতা করো। পরে হয়তো আমাকে আবার তুমি অ্যারেস্ট করতে পারবে, কিন্তু চক্রকে থামাতে পারবে না আর। অনেক বেশি শক্তিশালি হয়ে যাবে ওরা। আমার বোনটা মারা যাবে—একদম বেঘোরে!”

চিন্তিতমুখে তাকাল আসিফ, বিবেচনা করছে সম্ভাবনাগুলো। মেসনদের বাংলাদেশে অবস্থান নিয়ে তেমন অগ্রগতি হয়নি, কথাটা সত্য। যতটা জেনেছে, তার চেয়ে বেশি অজানা তথ্য থেকে গেছে। সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলো ও। হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, “নামটা বলা হয়নি—আসিফ আহমেদ।”

বামহাতে হাতকড়া, তবে খোলা ডানহাত দিয়ে সে হাত স্পর্শ করলো ইরফান, “আমার হাতকড়া খুলে দাও। কথা দিচ্ছি, কিছু করবো না। ঈশিতাকে ওদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। তোমার সহযোগিতা পাওয়া গেলে আমার উপকারই হবে।”

কিছুক্ষণ দোটানাতে ভুগলো আসিফ। ভয়ঙ্কর একজন অপরাধিকে ছেড়ে দিতে মন সায় দিচ্ছে না। কিন্তু মনের অন্য একটা অংশ হার মানছে কৌতুহলের কাছে। অনেকগুলো প্রশ্ন জমা হয়ে আছে তার মনে—তার উত্তর জানার আগ পর্যন্ত শান্তি নেই। অবশেষে কৌতুহলের কাছে হার মানলো সতর্কতা। স্প্যার-কি বের করে হাতকড়া খুলে দিল আসিফ। লড়তে লড়তে ক্লান্ত মানুষের মতো দেখাচ্ছে ইরফানকে এখন।

“তাহলে তোমার বোনের নাম ঈশিতা। এবার আমার মনে হয়...কিছু গল্প শোনানোর আছে তোমার—আমাকে।”

## চক্র

প্রফেসর তানভীর জ্বালালের কেসটা হাতে আসার ঠিক আগমুহূর্তে ডিটেক্টিভ আসিফ আহমেদ যখন শাহেদ জামানের সাথে রিপোর্টারদের সামনে পড়ার বিরুদ্ধে তর্কে ব্যস্ত, ঢাকার অন্য কোথাও হোটেল লাউঞ্জ থেকে লিফটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন ছোটখাটো এক ভদ্রলোক। হাতে একটা ব্রিফকেস। পাকানো গৌঁফ আর শক্ত সমর্থ দেহ কেনজানি আর্মিতে থাকা কারও কথা মনে করিয়ে দেয়। ঘন ভ্রুর সাথে বেমানান পাতলা চাপদাঁড়ি ভদ্রলোকের। জলপাই রঙের শার্ট আর জিন্স পরে আছেন—যেকোন তরুণকে মানিয়ে যেতে পারতো, একে মানায় নি।

সানগ্লাসের ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ইরফান। হাতের কাছেই সিঁড়ি, এবার দ্রুত সেদিকে পা বাড়ালো, জলপাই-শার্ট ভদ্রলোকের চেয়ে অনেক দ্রুত গতিতে। ঝড়ের বেগে তিনতলায় উঠে এলো ও, পরিপাটি পোশাকে কোনরকম প্রভাব পড়ে না এতে অবশ্য। করিডোরে বিল্ডিংয়ের দৈর্ঘ অনুযায়ী অর্ধেকটা পার হতে হলো, তারপর সামনে পাওয়া গেলো লিফটের দরজা। ওখানে এসে প্যানেলের নাম্বারে চোখ বোলালো ইরফান, লিফটটাকে নিচতলা থেকে উঠে আসতে দেখা যায়। বড় করে শ্বাস নিতে নিতে ‘আপ’ বাটনে চাপ দিল ও। তিনতলায় এসে লিফটটা খেমে গেছে, ভেতরে ব্রিফকেস হাতে ভদ্রলোক সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। ঝুঁকু দেহে ভেতরে ঢুকে পড়ল ইরফান, লিফটের দরজা বন্ধ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে।

মোবাইল বের করে অযথাই সময় দেখলো ও, তারপর হালকা স্বরে বলল, “অ্যানুয়িট চপটিস।”

তাকায়ও না জলপাই-শার্ট। “নোভেস অর্ডো সেকলোরাম।”

লিফটে দৃষ্টি আটকে রেখেছে ইরফানও, “আপনি খালিদ জাওয়াদ।”

জবাবে বলে খালিদও, “আর আপনি টমাস রেজনভ। আরেকটু বয়স্ক কাউকে আশা করেছিলাম।”

লিফটের চকচকে দরজায় নিজের প্রতিফলন দেখল ইরফান। ঝুঁকুর চেহারায় অভিজ্ঞতার ছাপ পড়েছে। সানগ্লাস হালকা বাদামি চোখদুটো লুকিয়ে রেখেছে। কাজেই সেখানে একরাশ মায়্যা দেখে ফেলার উপায় নেই। ঝুঁকু কপালে পড়ে থাকা চুলগুলো আর গালে চাপদাঁড়ি মুখটাকে ঢেকে ফেলেছে। তবে বয়সে যে সে নিতান্তই তরুণ—সেটা না বোঝার কথা নয়।

বিশেষ করে খালিদের মতো একজন উচ্চপর্যায়ের সাধকের!

“মিটিংয়ের প্রয়োজন হলো কেন?” খালিদের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জানতে চায় ও। লিফট উঠছে এখনও।

দরজার দিকেই তাকিয়ে থাকে খালিদ, “ঝামেলা দেখা দিয়েছে।”

প্রথমবারের মতো তার দিকে তাকায় ইরফান, “মেয়েটা?”

মাথা নেড়ে আশ্বস্ত করে খালিদ, “মেয়েটা ঠিক আছে।”

“তাহলে?” শক্ত মুখে জানতে চায় ইরফান।

“উই’ভ লস্ট দ্য বয়।” থমথমে মুখে জানালো খালিদ।

লিফটের দরজাও খুলে গেছে। ধীর পায়ে বের হয়ে আসে দু-জনেই। সাততলায় এখন ওরা। দু-পাশে সারি দিয়ে চলে গেছে হোটেল রুম। ছয় নম্বর রুমের সামনে এসে থামলো ওরা। পকেট হাতড়ে চাবি বের করে দরজা খুলে ফেললো মানুষটা। একমুহূর্ত ইতস্তত করে ঢুকে পড়ল ইরফানও।

“ছেলেটিকে ছাড়া প্রফেসি কিভাবে সফল হবে?” একমাত্র দরজাটা বন্ধ করে জানতে চাইল ইরফান।

“হবে না। সেক্ষেত্রে... শুরু হওয়ার আগেই হেরে যাবো আমরা। সাউথ এশিয়া আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে।” ভ্রু কুচকে ফেলে খালিদ। টেবিলে ব্রিফকেসটা আস্তে করে রাখে। “একটা উপায় আছে সম্ভবত। ওটা কাজে লাগিয়ে ছেলেটিকে ফিরে পাওয়া হয়তো এখনও সম্ভব।”

ইরফানের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে নিখাদ কৌতুহল-তাকিয়ে থাকলো খালিদের মুখের দিকে। খালিদের অবশ্য সেদিকে খেয়াল আছে বলে মনে হলো না। ঘরের একমাত্র জানালার দিকে এগিয়ে গেলো মানুষটা। পর্দা সরিয়ে খুলে দিল ওটা। ওখানে দাঁড়িয়ে পরের কথাটা উচ্চারণ করলো সে।

“এই মিটিংটা ডাকার কারণ কি, জানেন টমাস?” উত্তরের আশা না করে বলতে লাগল খালিদ, “আমাদের এখানে ছেলেটিকে হারানোর চেয়েও বড় ঝামেলার উৎপত্তি হয়েছে। ছেলেটিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া মানুষটা অ্যালিসের মতো গর্তে নেমে আসতে চাচ্ছে। তবে এখানে অ্যালিসের পা পিছলাবে ঠিকই—”

অতিমাত্রায় শীতল হয়ে গেছে লোকটার মুখ, ঘুরে তাকাল ও সরাসরি ইরফানের দিকে। বাক্যটা শেষ করে ওর চোখে চোখ রাখল।

“তবে পিছলে ওটা খরগোশের গর্তে পড়ছে না। সোজা চলে যাবে কবরে।”

এবার জোর করে কাষ্ঠহাসি দিল ইরফান। “রিচুয়ালের এখনও নয়দিন আছে। ঠিকমত খুঁজলে ছেলেটাকে বের করে ফেলা সম্ভব। তবে ওটা দেখার জন্য আমাদের অর্ডারে যথেষ্ট লোকবল আছে। আমার সাথে আপনার গোপন মিটিংয়ের উদ্দেশ্য সেটা নয় বলেই জানি। আরেকটি লজের প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন, সে ব্যাপারে কাগজপত্র দেখানোর কথা আমাকে। অন্যান্য লজের বু-প্রিন্ট দিয়ে একটি ব্রিফ দেওয়ার কথা।”

পকেট থেকে প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরাল খালিদ, “আপনি কি মনে করেন, এখানে আসার পেছনে আপনার কোন ধরনের গঠনমূলক কাজের সংশ্লিষ্টতা আছে? লজ অথবা আর কোনকিছুর?”

সানগ্লাসটা খুলল ইরফান, চোখে আগের মতো শীতলতা কাজ করছে। “খুব শিঘ্রই সেটা জানতে পারবেন আপনি, মি. খালিদ।”

গল গল করে ধোঁয়া ছাড়ে খালিদ, ঠোঁটের কোণে হালকা হাসি। “আপনাদের মতো অবিশ্বাসীদের কিছু সমস্যা আছে। আপনাদের নিজস্ব বিশ্বাসে এতটাই অটল থাকেন যে, ভুলে যান কার পক্ষে কাজ করি আমরা। ভুলে যান তার ক্ষমতা কতটুকু। সবকিছুই দেখছেন তিনি। সবকিছুই শুনছেন। সর্বজ্ঞ তিনি, মহাজ্ঞানের অধিকারি!”

ইরফানের দিকে তাকিয়ে থেকেই সিগারেটে আরেকটা টান দেওয়ার সময়টুকু নিল খালিদ, তারপর বক্তব্য পূর্ণ করলো, “আপনার এখানে আসার কারণ সম্পর্কেও তিনি অবগত। অথবা আপনার পরিচয় সম্পর্কে। আপনি টমাস রেজনভ নন। আপনার নাম ইরফান। পেশায় একজন কিডন্যাপার। সম্ভবত এ শহরের সবচেয়ে কুখ্যাতজন।”

ইরফান এখন দেরি করার কারণ দেখছে না। চট করে স্যুটের পকেট থেকে ডানহাতে বিশ্বস্ত গ্নক-২৩টা বের করে খালিদের মুখ বরাবর ধরল, বামহাতে তুলে নিল ব্রিফকেস।

“উইকিপিডিয়ার মতো গড় গড় করে তথ্য দিচ্ছেন যখন, এরই মাঝে তাহলে জানেন এখানে আমি এসেছি সাথে করে আপনাকে নিয়ে যেতে। আপনাকে আর আপনার এই বু-প্রিন্ট। এগুলো আমার কাজে আসবে, ধন্যবাদ। এখন ঝামেলা না করে লিফটের দিকে এগুনোটা হবে দ্বিপাক্ষিক মঙ্গল। চলুন।”

সামনে একটা পিস্তল দেখেও নড়লো না খালিদ, বিদ্রূপের হাসি উঠল মুখে। “গড় গড় করে তথ্য দিচ্ছি যখন, আপনার কি মনে হয় এখান থেকে প্রাণ নিয়ে আপনার বের হওয়ার সম্ভাবনা আছে?”

বিদ্রূপের হাসিটা ফেরত দিল ইরফানও। “আমার আছে, আপনার নেই। ছেলেটিকে বের করার একমাত্র পদ্ধতিটির কথা বলেছিলেন একটু আগে। এখন খুব ভালমতই বুঝতে পারছি কী সেটা। আমাকে মেরে ফেলতে নয়—কঠিনমাত্রার প্যাডানি দেওয়ার খায়েশ আছে আপনাদের। প্যাডানির চোটে ছেলেটাকে কোথায় রেখেছি সব গড় গড় করে বলে দেই সেটাই চাইছেন, তাই তো? ওটা পূরণ হবে না বলে দুঃখিত। এখন আমার সাথে কি লিফটে তাশরিফ রাখবেন?”

হালকা গলায় কথা বললেও ভেতরে ভেতরে শঙ্কায় ছেয়ে আছে ইরফানের মন। এই মানুষগুলোকে আভারএস্টিমেট করেছে ও, আরও একবার! আক্ষরিক অর্থেই পৃথিবীতে কখন কোন কাজটা হচ্ছে সে-সম্পর্কে এরা জানে। যেন প্রতিটি মানুষের ওপর একটা করে সার্ভিল্যান্স ক্যামেরা আটকে দিয়েছে! এমনকি মনের মধ্যেও। এমনকি মানুষের উদ্দেশ্য এরা তার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে চুপচুপে বিশ্লেষণ করতে পারে। ছেলেটির ব্যাপারে কারও জানার কথা না। জানার কথা না এখানে ইরফানের আসার উদ্দেশ্য কি ছিলো সেটাও। ভাগ্য ভাল, ছেলেটিকে সরিয়ে কোথায় রেখেছে সেটা এরা জানতে পারেনি। ওটুকু বাদ দিলে পুরোপুরি সর্বজ্ঞের মতো কাজ এদের। শয়তানের সাহায্য এই লোকগুলো কি আসলেই পেয়ে থাকে? এর উত্তর ইরফানের কাছে নেই। তবে ধরে নেওয়া যায় এতক্ষণে বাইরে বেশ মিলিটারি মহড়া চলছে। এই ঘর থেকে বের হলেই আতিথেয়তায় উৎসাহি অনেক লোকের দেখা মিলবে বলে মনে

করে ইরফান। ওধরণের আতিথেয়তায় ইরফানের উৎসাহ নেই। এড়ানোর জন্য সাথে একটা গেট-আউট টিকেট দরকার। খালিদ জাওয়াদ নামক এই স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারকে সে কাজেই ব্যবহার করতে চাচ্ছে ও।

লিফটের দিকে আগানোর ব্যাপারে খালিদের এখন তীব্র অনীহা দেখা যাচ্ছে। সিগারেটে আবারও টান দিল সে।

“আমাকে জোর করলে ফল ভাল হবে না বুঝতেই পারছেন। আমাদের কাছে যেমন মৃত আপনার মূল্য নেই, আপনার কাছেও মৃত আমার কোন মূল্য নেই। কাজেই আমি সম্ভাব্যতার বিবেচনায় নিজের কোন বিপদ দেখতে পাচ্ছি না। নাকের ডগায় একটা পিস্তল না দুলিয়ে ওটা পকেটে রাখুন। আপনাকে নিয়ে আমাদের দূরবর্তি পরিকল্পনা আছে। আপনাকে সম্মানজনক এক ডিগ্রি অফার করতে চাই আমরা। আপনার ভেতরে ট্যালেন্ট আছে।”

হাতে সময় নেই, বাজে কথা শোনার মতো সময় আরও নেই। দ্রুত খালিদের দিকে আগাতে থাকে ইরফান, প্রয়োজনে একে ঘাড় ধরে নিয়ে যেতে হবে। এখনই!

“আপনাদের প্রস্তাব যাই হোক-ওটাকে আমি আঙুল দেখাব।” বামহাতের মধ্যমা সোজা করে দেখিয়ে দিল ইরফান। “কাঁধে বা পেটে বুলেট নিয়েও অনেকক্ষণ কথা বলতে পারে মানুষ, কি বলেন?”

এক মুহূর্ত ইরফানের দিকে তাকিয়ে থেকে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করল খালিদ, তারপরই ধপ করে সামনের মেঝেতে পড়ে গেলো সে। মুখে তরল কিছু একটা এসে পড়েছে। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে সেটা মুছে ফেলল ইরফান, রক্তের ছাপ হাতে উঠেছে, সেটাকে পার করে মাটিতে পড়ে থাকা খালিদের দিকে তাকাল ও। ঘাড়ের দুকে গলা দিয়ে বের হয়ে গেছে ভারি ক্যালিবারের বুলেট-প্রায় দুটুকরো করে ফেলেছে মাথাটা। ইরফানের চমৎকার সাদা শার্টটার দফারফা করে দিয়েছে একই সাথে।

প্রথমেই দ্রুত দুইহাত ডানে সরে এল ইরফান। জানালা ব্যবহার করেছে স্লাইপার। শব্দ শুনতে পায়নি ও। নিশ্চয় একটা সাইলেন্সারের কারসাজি। খালিদকে গুলি করতে চাইতে পারে কে?

তৃতীয় পক্ষ?

সেক্ষেত্রে ইরফানের এক পয়সা দাম নেই তার কাছে। নাগালে গেলেই স্লাইপার খালিদের চেয়ে ভাল কোন অবস্থানে তাকে পাঠাবে-এমনটা ভাবার উপায় নেই। বুকে হেটে জানালাটা পার করলো ইরফান। টেবিলটা অন্যপাশে। ওখান থেকে ব্রিফকেসটা হাত দিয়ে নামিয়ে ফেলল কাছে এসেই। ব্রুপ্রিন্টগুলো আসলেই দরকার ওর।

কম্বিনেশন দেওয়া আছে ওখানে তিনটা ছয় পাশাপাশি বসাল। ভেবেছিলো খুলবে না, তবে ক্লিক করে শব্দ হতেই খুলে গেলো ব্রিফকেসটা। ভেতরে চকচকে মেটাল, প্লাস্টিক আর তারের সমাহার জানিয়ে দিল ওকে কেন এত সহজেই খোলা গেলো ওটা। ব্রিফকেস নয়, বোমা!

এই ঘরে শেষ শব্দটা উচ্চারণ করলো ইরফান, “শিট!”

বুলেটের মতো ঘরটা থেকে বের হয়ে এসেছে ইরফান—পেছনে তীব্র বিস্ফোরণের শব্দে কানে তাল লাগে যায় ওর। একই সাথে শক ওয়েভের ধাক্কা পুরু দেওয়াল ভেদ করেও নাড়া দিয়ে যায় ওকে।

ব্রিফকেসে কি ছিলো সেটা বুঝে ফেলার পর আর স্লাইপারকে নিয়ে ভাবার সময় ছিলো না। উঠে কোনমতে দরজার বাইরে পর্যন্ত আসতে পেরেছে—ফেটে গেছে বোমা।

মগজ নড়ছে শক-ওয়েভের ধাক্কায়, তার মাঝেই দুই সেকেন্ডের টাইমারটা দেওয়ার কারণ কি হতে পারে তা নিয়ে একটু ভাবে ইরফান। সম্ভবত খালিদ লোকটা চায়নি তার উপস্থিতিতে ইরফান ব্রিফকেস খুলে ফেললে ইরফানের সাথেই মই ছাড়া ওপরে উঠে যেতে। সেজন্য ওরকম পরিস্থিতির জন্য এমন একটা টাইমার সেট করেছিলো যাতে প্রয়োজনে নিজে সরে যেতে পারে। চিন্তাটিকে হুগিত করে রাখতে হলো ওকে।

সিঁড়ির গোড়া থেকে লাফিয়ে বের হয়েছে স্যাভোগেঞ্জি পরে থাকা তরুণ, ছোকরার পোশাক-আশাক একেবারেই পছন্দ হলো না ইরফানের। কোমরের কাছে হাত চলে যাচ্ছে তার, বাকিটুকু দেখার জন্য অপেক্ষা করলো না, গুলিটা তুলে একবার মাত্র ফায়ার করে, আবারও সিঁড়িতে লাফিয়ে চলে গেছে তরুণ, গুলিটা সম্ভবত তাকে লাগেনি। শরীর এখনও কাঁপছে ইরফানের। ওভাবেই লিফটের ভেতরে ঢুকে গেলো ও।

বোতাম চেপে লিফটকে নিচের দিকে না নেমে আরও ওপরে ওঠার নির্দেশ দিল। দুটো সমস্যা হয়ে গেছে এখন। ইনফরমেশনের জন্য যাকে দরকার ছিলো সে বেঁচে নেই। দ্বিতীয়ত এখান থেকে খুবই সাবধানে বের হতে হবে ওকে। প্রাণের ভয় আছে তার থেকেও ভয় আছে ট্রাম কার্ড হারানোর। এখান থেকে বের হলে তার পিছু নেওয়া হতে পারে। ওকে উদ্দেশ্য করে স্লাইপারের গুলি না চালানোর পেছনে কারণটা ধরে নিতে পারছে এখন। সম্ভবত ইরফানের হাতে জীবিত অবস্থাতে খালিদ পিছু নেওয়া চায়নি। হয়তো লজের ব্র-প্রিন্ট তার কাছে আসলেই ছিলো ও জিনিস ইরফানের হাতে পড়তে ওরা দেবে না। তবে এখন নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। ইরফান ওদের কাউকে চেনে না ঠিক, তবে ওদের প্রত্যেকের প্রত্যক্ষণে ওর পিতা-পিতৃগণের পরিচয় পর্যন্ত জানে মনে হচ্ছে।

টপফ্লোর দশতলায় লিফট থামতে মেঝেতে শুয়ে পড়ল ও। লিফট ফলো করে বন্ধুরা চলে আসতে পারে। তবে সদ্যখোলা লিফটের ভেতর শত্রুকে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় আশা করার কথা তাদের। শুয়ে থেকে মিলি সেকেন্ড এগিয়ে থাকতে পারবে ইরফান।

টং-জাতীয় মিষ্টি একটা শব্দের সাথে খুলে যায় দরজাটা। বাইরে কেউ নেই। চটপট উঠে দাঁড়ায় ইরফান। সিঁড়ির দিক থেকে হই চই শোনা যাচ্ছে। নিচ থেকে ওরা যে প্রেমের টানে এগিয়ে আসছে না, সেটা ইরফান জানে। কোনঠাসা করে ফেলার ইচ্ছে তাদের। কাজেই দ্রুত চাবিটা বের করে পাঁচ নম্বর দরজাটি খুলে ঢুকে যায় ও। সিঁড়ি আর লিফটের মাঝে ঘরটি।

বেনামে মাত্র একদিন আগে এই রুমটা ভাড়া করেছে ও, খবরটা প্রতিপক্ষ জানে না বলে স্বস্তি অনুভব করছে। দরজার সামনে দিয়ে হুড়মুড় করে লোকগুলো চলে গেছে লিফটের দিকে। মোটা গলাতে কেউ একজন আদেশ দিচ্ছে। আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে খোঁজা শুরু করতে বলছে দ্রুত। খুব শিঘ্রই একনম্বর আর দুইনম্বর রুমে ধুম ধাম নক পড়তে শুরু করলো।

এদের স্পর্শ দেখে ইরফান দুই দিন আগেও অবাক হত। যেরকম আগ্রাসন তারা দেখায় সেরকমটা দেখাতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনীও সাহস করে না। কোন ধরনের কাগজ-পত্র ছাড়াই জোরপূর্বক সার্চ করতে যাচ্ছে তারা। তবে এই নিরীহ বোর্ডারদের সেজন্য কিছুই করার থাকবে না। ক্ষমতার বিচারে এরা অনেক ওপরে। আইনের উর্ধ্বে যদি এখনও দেশে কেউ থেকে থাকে তো এরাই। আগ্রাসি ভূমিকা পালনের বিপক্ষে ওরা কখনও ফোকাসে আসতে চায় না, সব সময় থাকতে চায় রাডারের নিচে। এই বোর্ডারদের কেউ পুলিশে রিপোর্ট করলে সেটা থানা থেকেই উধাও হয়ে যাবে। বোমা বিস্ফোরনের খবরটাও কোন পত্র-পত্রিকায় আসবে না।

ইরফানকে হাতে পাওয়ার জন্য অত্যন্ত মরিয়া মনে হচ্ছে তাদের। বাইরের বাতাসে নাক বের না করলে ওকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, এটা একটা কারণ হতে পারে। তাছাড়া সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন তাদের ফুরিয়েছে। ইরফান ফক্ষে গেলে ওদের অস্তিত্ব বড় ধরনের ধাক্কা লাগবে। কিছুক্ষণের মাঝে ওর দরজাতেও ঘন ঘন আঘাত পড়তে শুরু করলো।

“পুলিশ! দরজা খুলুন!” তারপর আবারও প্রিম প্রিম শব্দ।

ছোট ঘরটাতেই একবার ছোটোছুটি করলো ইরফান। ভুলেও জানালা খোলার চেষ্টা করলো না। এখানে রুম নেওয়ার সময় এক্সেপ গ্যানটিও ঠিক করা ছিলো। জানালাগুলোতে ছিল নেই। কাজেই সেদিক দিয়ে বের হয়ে সহজেই নিচের ফ্লোরের জানালা ভেঙে ঢুকে পড়তে পারবে বলে মনে করেছিলো। কিন্তু এক্ষুণি আগে বাইরে স্লাইপারের অস্তিত্ব এখন ওকে দ্বিধায় ফেলে দিচ্ছে।

দরজায় ধাক্কা দেওয়ার বিরাম নেই। এর মধ্যেই আস্ত করে জানালা খুলে ফেললো ইরফান। একমাত্র নিরাপদ এক্সিট! দরজা দিয়ে বের হলে অন্তত ছয়টি পিস্তলের সামনে পড়তে হবে ওকে। জানালার ক্ষেত্রে, একটা রাইফেলের নল থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। সুযোগটি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ও।

খালিদের রুমটি ছিলো ছয় নম্বর। ওর রুম পাঁচ নম্বর। কাজেই, করিডোরের অন্যপাশে। অর্থাৎ জানালা খুললে বিল্ডিংয়ের অন্যপাশ উন্মোচিত হয়। ও শুধু



এতটুকুই আশা করতে পারে, বিভিন্নয়ের দু-পাশেই স্লাইপার বসায়নি প্রতিপক্ষ। রুমটা রিজার্ভ করা আছে ইরফানের নামে, সেটা জানার কথা না ওদের। সম্ভাব্যতার নক্সই শতাংশ বলে এদিকে স্লাইপার থাকবে না।

খোলা জানালা দিয়ে শরীরটা গলিয়ে দিয়েছে ইরফান-চমৎকার কারুকার্য কিছু খাদ আর চড়াইয়ের সৃষ্টি করেছে মসৃণ দেওয়ালের গায়ে। এই খাঁজগুলোই সম্বল এখন। এগুলোতে আঙুল বাঁধিয়েই ধীরে ধীরে নেমে যেতে হবে ওকে। চুল পরিমাণ এদিক ওদিক হলে একশ ফিট নিচের মাটি অপেক্ষা করেছে।

দরজায় আঘাতের শব্দ পাল্টে গেছে এখন। হাত দিয়ে ধাক্কা দিচ্ছে না ওরা। একসাথে দু-জন মিলে নবের ওপর লাথি কষালে এরকম শব্দ হতে পারে। সন্দেহ থেকে নিশ্চিত হয়েছে তারা। এখন দরজা ভেঙে ঢুকতে চায়! মনে মনে খুশি হয়ে উঠলো ইরফান। আনাড়ি ‘লাথারু’ না হলে দরজা ভাঙতে এতক্ষণ লাগতো না তাদের। ইঞ্চি ইঞ্চি করে নেমে যাচ্ছে ও। জানে, এখন কেউ ছুটে এসে জানালা দিয়ে নিচের দিকে তাকালেই দেখতে পাবে ঝুলন্ত বাবুকে। তারপর কি হতে যাচ্ছে তা অনুমেয়।

ওপরে কেউ নেই। ওপরে কিছু নেই। শুধু এই দেওয়াল আর পনের ফিট নিচের খোলা জানালা! নিজেকে বার বার বলতে বলতে ধীরে ধীরে নেমে চলে ও। নয় তলার জানালাটা বন্ধ। তবে আটতলাতে আবার খোলা আছে ওটা। ওদিক দিয়েই শরীর গলানোর ইচ্ছে ইরফানের। মনে মনে হোটেল নির্মাতাদের ধন্যবাদ আর নিখাদ কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারে না। সেরকম শক্তিশালী নব এবং দরজা লাগানোর জন্য কৃতজ্ঞতাটুকু চলে আসাই স্বাভাবিক।

বিকট শব্দ করে দরজাটা তখনই ভেঙে পড়ল-কানের পাশে আচমকা এরকম শব্দ শোনার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলো না ইরফান। আঙুল ছুটে গেছে খাঁজ থেকে। সোজা নিচের দিকে পড়তে শুরু করেছে ও। বাতাসে বার দুই থাবা মারলো-কিন্তু কিছুই ঠেকলো না যে ওর হাতে!

মাটি থেকে পঁচানক্সই ফুট ওপর থেকে স্রোত খসে পড়েছে ও!

BanglaBook.org

ঝড়ের বেগে পনের ফুট নেমে এসেছে ইরফান। হাত বাড়িয়ে খুলে থাকা জানালাটা সর্বশক্তি দিয়ে আঁকড়ে ধরলো ও।

আশি কেজি চাপিয়ে দিয়েছে, পাল্লাটা সহ্য করতে না পেরে কড়মড় করে উঠলো। শূন্যে ঝুলছে ইরফানের পা দুটো, কবাটে পা বাঁধিয়ে ভেতরে ঢুকে যাওয়ার জন্য বার তিনেক চেষ্টা করলো। চতুর্থবারের মতো চেষ্টা করেও যখন শূন্যেই পাক খেয়ে আসে পা-দিনের প্রথমবারের মত মৃত্যুভয় চেপে ধরে ওকে। দু-হাতে শক্ত করে পাল্লাটা ধরে আছে এই মুহূর্তে। সত্তর ফিট নীচে থেকে সরাসরি ওর দিকেই তাকিয়ে আছে মাটি।

নীচে ঢাকার স্বাভাবিক ব্যস্ততা দেখা যাচ্ছে। ছুটছে সবাই। ঠিক দৌড়ে নয়, তবে হাঁটার গতিবেগ কারও মধুরও নয়। জীবিকা বা অন্য কোন প্রয়োজনে সবাই ব্যস্ত। ধারণক্ষমতার পাঁচগুণ জনসংখ্যা ধরে ঢাকা বুকো। ব্যস্ততা আসাটা স্বাভাবিক।

শহরটার আরেকটা ভাল বৈশিষ্ট্য আছে। অতিব্যস্ত মানুষগুলো কখনও আকাশ দেখার সময় পায় না। মাথা তুলেও তাকায় না কেউ কখনও। একই রাস্তা দিয়ে যে ছেলেটা প্রতিদিন কোচিং করতে যায় তাকে ওই পথের পাশে কোন বিন্দিংয়ের তিনতলাতে থাকা একটা বিউটি পার্লারের নাম করলে চিনতে পারবে না। অথচ নীচতলা আর দোতলাতে যেসব দোকানপাট থেকে শুরু করে সেলুন পর্যন্ত যা আছে সবগুলোই তার মুখস্থ।

ওপরের দিকে তাকানোর সময় বা ইচ্ছে কারোই নেই। এটা সুবিধা কিংবা অসুবিধা দুটোই হতে পারে ইরফানের মতো একজন ঝুলন্ত মানুষের জন্য। রাস্তা চোঁচিয়ে মাথায় তুলছে না কেউ এখনও, কিছুটা হলেও সুবিধে দিচ্ছে ওকে। ওপরের বন্ধুরা যদি টের পেয়ে যায় জানালা গলে প্রতিপক্ষ বেকায়দাতে পড়ে গেছে, গল্পটা এখানেই শেষ হয়ে যাবে। ইরফানের জীবনের গল্প!

তিক্ত একটা হাসি ফুটলো ইরফানের মুখে, ওর সাথে ঈশিতার অগ্নি-ভরসাও শেষ হয়ে যাচ্ছে। কপাল আর নাকে ঘাম জমেছে ওর, এখানে প্রায় মিনিটখানেক ধরে ঝুলে আছে। আর কতক্ষণ পারবে তা জানে না। খুট করে কাছেই কোথাও একটা শব্দ হলো। সেই সাথে সাবান আর পানির মেশানো একটা মিস্তি গন্ধ নাকে এলো। জানালার ফাঁক দিয়ে মোটাসোটা লোকটাকে দেখে খুশিতে চোঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে ইরফানের। আরেকবার চেষ্টা করলো কবাটে পা বাঁধানোর—কিন্তু নাগালের বাইরে ওটা।

“ইয়া আল্লাহ! আপনি ওখানে কি করছেন?” বাথরুম থেকে এইমাত্র বের হওয়া মানুষটা জানালার কাছে ছুটে আসেন।

করণ একটা দৃষ্টি দেয় ইরফান। “টেনে তোলেন ভাই-প্লিজ।”

শরীরের অর্ধেকটা বের করে হাত বাড়িয়ে ইরফানের শার্ট খামচে ধরেন ভদ্রলোক, তারপর ভেতরের দিকে টেনে আনেন ওকে পাল্লাসহ।

আরেকটু কাছে আসতেই পায়ের কাছে পেয়ে যায় ও জানালার কবাট, পা রেখে ভেতরে লাফিয়ে পড়ে সাথে সাথেই। তারপর চিত হয়ে গুয়ে পড়ে মেঝেতেই। বড় করে দম নিচ্ছে।

হাত বাড়িয়ে দেন ভদ্রলোক, ওটা ধরে সোজা হয়ে দাঁড়ায় ও। “আমি ইরফান...সরি ফর ট্রাবলিং ইউ, স্যার।”

শীতল ভঙ্গিতে হাত মেলান ভদ্রলোক, নিজের নাম বললেন না। “ট্রাবলের কথা পরে আসছে। আপনি বাইরে কি করছিলেন? আমার ঘরে চুরি করে ঢুকতে চাইছিলেন কেন?”

ভদ্রলোকের হাত টেলিফোনের দিকে চলে যাচ্ছে, পুলিশকে ফোন দেওয়ার জন্য এর চেয়ে মোক্ষম অভ্যুহাত আর হয় না। তার দিকে দ্রুত নিজের রুমের চাবিটা ছুঁড়ে দেয় ও।

“৯০৫-এ উঠেছিলাম আমি। স্মার্টফোনটা হাত থেকে পড়ে গেলো, ঝুঁকে নিতে গিয়েই-” কথাটা শেষ না করে পকেট থেকে সিগারেট বের করে ফেলে সে। “উড ইউ মাইন্ড?”

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন ভদ্রলোক। “ধরান, সমস্যা নেই। এখন বলুন, জানালার ধারে মোবাইল নিয়ে কি করছিলেন?”

“যেটা করছিলাম সেটা শেষ করার চেষ্টা করছি,” হাসিমুখে সিগারেটের প্যাকেটটা দেখায় ও।

ভালো করে ইরফানের চেহারাটা দেখেন ৭০৫ রুমের বাসিন্দা। সরল একটা মুখে শঠতার চিহ্নও নেই। একই সাথে অদ্ভুত রকমের কঠিন চেহারা আর তার সাথে সম্পূর্ণ বেমানান একজোড়া চোখ। শিশুর দৃষ্টি সেখানে। একই সাথে ওদুটোতে উঁকি দিচ্ছে বুদ্ধিমত্তার ছাপ!

অবশেষে একটা হাসি ফোটে ভদ্রলোকের মুখে। “আনিসুল হক,” হাত বাড়িয়ে বলেন তিনি, “ভাগ্যিস সময়মত বের হয়েছিলাম বাথরুম থেকে।”

হাত মেলায় ইরফান। “এখান থেকে বের হয়েই জানালায় গরাদ দেওয়ার জন্য আবেদন জানাবো আমি। ধন্যবাদ ভাই।”

“বুক কেটে ফেলেছেন দেখছি! রক্ত পড়েছে বেশ!” আঁতকে উঠলেন ভদ্রলোক।

“কমের ওপর দিয়েই গেছে,” খালিদের রক্তের দিকে তাকালো ইরফান, কালচে হয়ে আসছে গুঁকিয়ে। “নিচে পড়ে গেলে আরও দারুণ হত ব্যাপারটা।”

“ফাস্ট এইড-”

“আমার ঘরে আছে। আপনাকে আর কষ্ট দেব না।”

সিগারেটটায় জোরে একটা টান দিয়ে বাইরে বের হয়ে আসে ও। পেছন থেকে অদ্ভুত মানুষটাকে চলে যেতে দেখে হালকা হেসে দরজা লাগিয়ে দিলেন ভদ্রলোক।

ছোটখাটো বোমা বিস্ফোরণের শব্দ এত ওপরে আসেনি মনে হয়। এই আনিসুল হক হোটেল ডেস্কে রিপোর্ট করতে পারেন, তবে তাতে কিছু আসে যায় না। চক্রেণ্ডর ওরা বোমা ফাটিয়ে পার পেয়ে গেলে, ইরফানেরও পাওয়া উচিত। হোটেলটা আজকের জন্য নো-ক্রাইম-জোন।

চোরের মতো পা টিপে কিন্তু দ্রুত গতিতে আবারও সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায় ইরফান। ওপরের ফ্লোরগুলো নিয়ে এতক্ষণে শত্রুপক্ষের চিন্তায় পড়ে যাওয়ার কথা। নিঃসন্দেহে ৫ নম্বর রুমে কাউকে না পেয়ে ঘরটা পরিত্যক্ত ধরে নিয়েছে। কিছুক্ষণ ওদিকেই তাদের মনযোগ আটকে থাকার কথা।

এর অর্থ এটাও না, যে নিচে তাদের কেউ নেই। অবশ্যই হোটেল থেকে বের হওয়ার সবগুলো পথের দিকে চোখ রেখেছে ওরা। কোনদিকে না তাকিয়ে দ্রুত নেমে আসতে থাকে ইরফান। গ্রাউন্ডফ্লোরে পা রাখার কোন মানে হয় না। দোতলা পর্যন্ত এসে করিডোর ধরে লম্বা হাঁটা দেয়।

শেষ মাথার ছোট ঘরটা লক্ষ্য।

সিগারেটটা ফেলে দিয়ে দরজায় বার দুয়েক টোকা দিল। নড়াচড়ার শব্দ হচ্ছে ভেতরে, ভারি গলায় বলল, “রুম সার্ভিস!”

খুঁট করে দরজাটা খুলে যায়, নিষ্পাপ চেহারার মেয়েটিকে দেখে প্রথমেই যে ধারণাটি আসে, এই মেয়ে নির্ধাত বাড়ি থেকে পালিয়েছে! এমন ধারণা কেন এলো সেটা বলা কঠিন। সম্ভবত কিছু মানুষ মুখে ‘ঘরপালানিয়া’ চিহ্ন নিয়েই জন্মে থাকে!

মেয়েটি অবশ্য এত বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে যায় না, চোখ কপালে তুলে বলল, “আমি কোন রুম সার্ভিসকে ডাকিনি তো!”

“রাইট, ম্যাম।”

একাত্মতা প্রকাশের সাথে সাথে প্রচণ্ড এক ধাক্কায় দরজাটা পুরোপুরি খুলে ফেললো ইরফান। তরুণির তীব্র আপত্তি উপেক্ষা করে সোজা হেটে যাচ্ছে জানালার দিকে। শালারা হোটেল বানিয়েছে, বারান্দা রাখেনি! একেবারে ফ্রন্ট রুমগুলো ছাড়া এই জানালাই সম্বল এখানে। জানালার পাল্লা খুলে নিজের শরীরটা ঝুলিয়ে দেয়, কবাটে আটকে আছে হাত। গালির তীব্র বর্ষণ ছুটিয়ে মেয়েটি ছুটে আসছে—তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত পাল্টালো ইরফান, এই মেয়ে কলগার্ল না হয়েই যায় না।

হাতটা আলগোছে ছেড়ে দিতে ধপ্ করে মাটিতে নেমে পড়ে ও। হোটেলের পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে অবশেষে! গালির তুবড়িতে লুপ্ত করেনি মাত্র বারো হাত দূরেই দেওয়ালে হেলান দিয়ে সিগারেট খাচ্ছিল এক যুবক। ইরফানকে নেমে আসতে দেখে মানুষটার চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। চমকেই ইরফানও, তবে চোখ স্থির রেখে। কারণ, তৃতীয় আরেকটা চোখ নজরে পড়েছে ওর—যুবকের বামবাহুতে উষ্ণি আঁকা। একটিমাত্র চোখ কটমট করে তাকিয়ে আছে, বিষয়টা ইরফানের ভাল লাগলো না। ভাল লাগলো না যুবকের তাড়াহড়োর সাথে ছুটে এসে ঘুমি বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টাটাও।

আচমকা সরে গিয়ে আঘাত এড়ায় ও। তবে পাল্টা আঘাত হানার কোন চেষ্টাই করে না। যুবকের নাকের ফুটোদুটো বড় হয়ে গেছে। লম্বা নিঃশ্বাস নিতে নিতে আবারও আক্রমণের চেষ্টা করলো। আবারও সরে গেলো ইরফান। দু-বারই লোকটা ডানহাত ব্যবহার করেছে, লক্ষ্য করেছে ও। যুবকের বামদিকে সরছে একটা ছোট্ট বৃত্তাকার পথ ধরে। বাম হাত দিয়ে আঘাত করলে যুবক সুবিধে করতে পারতো এবার, তবে সেটা খেয়াল না করে আবারও ডানহাতে আক্রমণ চালিয়েছে ছোকরা। আলতো করে আঘাতটা নিজের বাম হাতে লেগে পিছলে যেতে দেয় ইরফান, তারপর দড়াম করে ডান হাতের ঘুষিটা ঠিকমতই বসিয়ে দেয় যুবকের চোয়ালে।

তিনপাক খেয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়া লোকটা আর নড়ে না। নকড আউট!

শরীরটা ডিঙিয়ে প্রাণপণে ছুট লাগায় ও। মাত্র চল্লিশ গজ দূরে রেখে এসেছে ওর মোটরসাইকেল।

হাত নাড়ানোর চেষ্টা বিজয় করছে না। বুদ্ধিমান ছেলে ও, জানে এই চেষ্টা করে লাভ নেই।

খাটের দুই প্রান্তে দুটো হাতকড়ার সাহায্যে আটকে রাখা হয়েছে ওকে। পা দুটো খোলা তবে শয়তান জানে, দুই হাত আটকে ফেললে খোলা পা আর কোন কাজে লাগে না। অহেতুক দাপাদাপি না করে চুপচাপ অপেক্ষা করাটাই কাজের হবে বলে মনে করছে সে। পরে এই শক্তিকে অন্য কোন কাজে আসতে পারে।

গতকাল রাত থেকে আজ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো ঠাণ্ডা মাথায় ভাবার চেষ্টা করে ও। এত দ্রুত ঘটনা ঘটেছে—ঠিকমত কিছু বুঝে উঠতে পারেনি। কালকে রাতেও সবকিছু ঠিক ছিলো। একেবারে বাতাস থেকে বের হয়ে এসেছিলো লোকটা। ঠিক তার ঘরের মাঝখানে। প্রার্থনার মাঝখান থেকে কেউ পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে যাবে এটা স্বপ্নেও ভাবেনি বিজয়। চোঁচাতে পারেনি লোকটার হাতে একটা পিস্তল ছিলো। বাসায় কিভাবে ঢুকলো তা-ও বোঝেনি। তবে এটুকু বুঝেছে—নিজের কাজে খুবই দক্ষ এই লোক।

খুবই ঠাণ্ডাভাবে ওকে হাঁটতে বলেছিলো লোকটা। লক্ষ্য করেছিলো, সতর্কভাবে বাড়ির সীমানায় বসানো ক্যামেরাগুলো এড়িয়ে যায় মানুষটা। তারপর ফোন্ডিং ল্যাডারটাকে দেওয়ালের সাথে দাঁড় করিয়ে রাখতে দেখে আঁতকে ওঠে ও, ইলেকট্রিফাইড এই বেড়া কিভাবে পার হতে চাচ্ছে উন্মাদ এই লোক?

নিচু গলায় বিপদটা সম্পর্কে জানাতে শুরু করতেই তাকে আশ্বস্ত করে লোকটা, বৈদ্যুতিক সংযোগ ওতে নেই। কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করার ব্যবস্থা করেছে সে। হেটে মোটামুটি ত্রিশ গজ দূরে যেতে হলো তারপর। লুকিয়ে রাখা মোটরসাইকেলটা বের করে উঠে বসতে বললে ওর আর কিছু করার থাকে না। ঝড়ের বেগে ছুটিয়ে এনে আশুলিয়াতে এসে একবার থামিয়েছিলো। কিছুক্ষণ কথা হয়েছিলো ওদের, কিডন্যাপার কোন একটা ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করছিলো। কিছুক্ষণের জন্য বিজয়ের মনে হয়েছিলো ওকে ছেড়ে দেবে সে। বুঝে যাবে ভুল মানুষকে বন্দি করেছে। কিন্তু হতাশ হতে হয়েছে, আশুলিয়া থেকে আবারও মোটরসাইকেলে বসিয়ে এখানে এনে ঢুকিয়েছে লোকটা। জায়গাটা কোথায় সঠিক জানে না বিজয়।

ঢাকার অলিগলিতে তেমন ঘোরা হয়নি।

যতটুকু বুঝতে পারছে—বৈদ্যুতিক লাইনে কান্ডসাজি করে হানা দিয়েছিলো লোকটা। বের করে নিয়ে গেছে ওকে। কিন্তু সেই কারসাজি করার জন্য আগে লোকটাকে ভেতরে ঢুকতে হত—সেই কাজটা কিভাবে করেছে এসম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই।

ভেতরের কেউ কি সাহায্য করেছিলো ওকে? জানার উপায় নেই। বাইরে আবারও নেমে এসেছে রাত। ঠাণ্ডা পড়ছে আজকে। সকাল থেকে আর কিছু খায়নি বিজয়। পেটে ভীষণ ক্ষিদে। কিডন্যাপার ব্যাটা কি এখানে ওকে আজীবনের জন্য ফেলে গেলো নাকি? অবশ্য সহসা ফিরে আসার কথাও না। ওকে জায়গামত পাঠিয়ে দিয়েছে বিজয়। সংগঠনের পেছনে লাগার শখ মিটে যাওয়ার কথা চিরেতরে। লোকটা ফিরে আসলেই অবাক হবে বরং।

মুক্তিপণের আশায় ধনী বাবার ছেলেকে কিডন্যাপ করা হয়নি এখানে। তবে যেসব তথ্যের জন্য ওকে ধরা হয়েছে, তার উৎপত্তি কোথায় সেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি বিজয়। এধরনের ঝামেলা বাঁধার কথা ছিলো না। তবুও বেঁধে গেছে।

এই লোক একেবারেই বিনা মেঘে বজ্র্যপাতের মতো আঘাত হেনেছে। এভাবে যদি আর কয়েকটা দিন পার হয়ে যায় তাহলে সর্বনাশের ষোলকলা পূর্ণ হবে। মিথরাস লজের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণই বিজয়ের বিপক্ষে যাবে তখন। ওকে চিরতরে বর্জনও করা হতে পারে। আনুগত্য দেখানোর বেলায় ওরা আপোষহীন।

অন্ধকারে বসে বসে বাইরের কালো আকাশ দেখে বিজয়। চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা জানায় কয়েকবার। এখান থেকে বের হতে হলে সাহায্য দরকার তার। মানুষের সাহায্য পাওয়ার আশা দেখে না। শক্তিমান সত্তা কি তাকে সাহায্য করবেন?

খুঁট করে খুলে গেলো দরজা। ভেতরে ঢোকা লোকটা আলো জ্বালালো না। বিছানার দিকে এগিয়ে দিল প্যাকেটের খাবার। এক হাতের হাতকড়া খুলে দিল। কোনদিকে না তাকিয়ে খেয়ে চলে বিজয়। খাবারটুকুর দরকার ছিলো ওর। কিডন্যাপার মানুষটাকে সামনে দেখে ভয় কাজ করছে না, কাজ করছে বিশ্বাস।

ব্যাটা ফিরে এলো কিভাবে?

খাওয়ার মাঝেই পানির বোতলটা একহাতে খুলে ফেললো ও কসরত করে। মানুষটা ওকে বিন্দুমাত্র সাহায্য করলো না। এমনভাবে তাকিয়ে আছে—যেন বিষাক্ত কিছু দেখছে! অন্ধকারেও জ্বল জ্বল করছে লোকটার চোখ। বেশ কিছুক্ষণ ওভাবেই কাটে, তারপর সামনে ঝুঁকে আসে কিডন্যাপার। কোমর থেকে একটানে ধাক্কা করে এনেছে পিস্তল। শক্ত হাতে বিজয়ের মাথায় ঠেকাল ওটা।

“দ্যাট ওয়াজ ইওর লাস্ট মিল। ইচ্ছে করে একটা ট্র্যাপের দিকে ছুঁড়ে ফেলেছ আমাকে তুমি। শেষবারের মতো জিজ্ঞেস করবো—ঐ বু প্রিন্টটা কোথায় পাবো আমি?”

“রাজউকের কাছে ঢাকার প্রতিটি বিন্দিংয়ের বু প্রিন্ট থাকে,” বিড় বিড় করে বলে বিজয়।

“সেটা আমি জানি। ওদের ডাটাবেজ হ্যাক করার ব্যবস্থা করা হয়েছে, লজ নিয়ে কিছু পাওয়া যায়নি।”

সোজা হয়ে বসে বিজয়, “লজের ব্যাপারে জানতে হলে আপনাকে যেতে হবে খালিদের কাছে। আমি আগেই বলেছিলাম।”

“ওটা একটা ফাঁদ ছিলো, বাস্টার্ড!” ক্ষেপে ওঠে ইরফান, “তোমার বাম হাটু না থাকলেও তো কয়েকদিন বেঁচে থাকবে বলে আশা করা যায়, কি বলো?” ধীরে ধীরে পিস্তলটা নামায় ও বিজয়ের হাটুর দিকে। “তিন সেকেন্ড সময় দিতে পারি। আরেকটা লিংক চাই আমি। এরপর ট্র্যাপে পড়তে চাই না। আর যদি পড়িও, ফিরে এসে হাটুর বদলে মাথায় ঢোকানো পরের বুলেটটা-বুঝেছো?”

ছোট ছেলেটা ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ইরফানের দিকে, কিছু বলে না।

গণনা শুরু করে ইরফান, “ওয়ান!”

শান্ত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে বিজয়, পিস্তলের নলটা যেন সম্মোহিত করে ফেলেছে ওকে।

“টু!”

একটা ছোট শ্বাস ফেলে অপেক্ষা করে বিজয়।

BanglaBook.org



দেড়টা বাজে।

এত রাতে রাস্তায় সাধারণত কেউ বের হয় না। আসার পথে একজন মানুষকেও চোখে পড়েনি ইরফানের। চমৎকার দেখতে বাড়িটা ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে। ওটার চোখা ছাদের দিকে একবার তাকায়। কেউ বলে দেয়নি কিন্তু সে জানে, এটাই গন্তব্য। আগেরবারের কথা এত সহজে ভোলার নয়। মোটরসাইকেলের গতি সামান্যও না কমিয়ে বাড়িটা পার করে চলে গেলো।

তিন ব্লক দূরে যখন ওটা পার্ক করে হেটে ফিরছে অযথাই একধরনের অনুভূতি হয় ওর। যেন কেউ দেখছে! তবে এই অন্ধকারে ওর দিকে তাকানোর জন্য কারও বসে থাকার কথা নয়।

বাড়ির বাসিন্দাকে বাইরে কোথাও ইন্টারসেক্ট করাটা কঠিন। কোন নির্দিষ্ট রুটিন মেনে চলে না এই লোক। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, একে কেউ বের হতে দেখেনি কখনও। কিছুটা দূর থেকে বাসাটা পর্যবেক্ষণ করলো ইরফান। ছিল দেয়া প্রতিটি বারান্দায়। গ্যারাজের সামনে একটা বড় দরজা। সেটা ভেতর থেকে লাগানো। বাথরুমের ছোট জানালাগুলো বন্ধ।

সাধারণত বাথরুমগুলো বিল্ডিংয়ের উইক লিংক হয়ে থাকে। তেমন বড় হয় না জানালাগুলো। শুধুমাত্র গ্যাস নির্গমনের কথা ভেবে বানানো হয়। অনেক বাথরুমেই এজন্য ছিল থাকে না। ওদিক দিয়ে পথ করে নেওয়া যায় গ্রাস সরিয়ে। একটু ঝামেলার কাজ তবে অসম্ভব নয়। এক্ষেত্রে তা করার কোন উপায় নেই।

মোটো পাইপগুলো আগেকার ডিজাইন অনুযায়ী বাড়ির বাইরে দিয়ে গেছে—এটা একটা ভাল দিক। ছাদে উঠে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করা যেতে পারে। ছাদ থেকে যে কোন বিল্ডিংয়ে ঢোকাটা সহজ। দরজা একটা থাকে বটে তাতে তালাও দেওয়া থাকে—তবে দরজার ঠিক পেছনেই কোন মানুষ থাকে না।

একটা হুড়কোই শুধু বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে। ওটা কেটে ফেললেই ঢোকা সম্ভব। হাতদুটো ঘষে গরম করার চেষ্টা করলো ইরফান। ছাদ দিয়েই চেষ্টা করতে হবে মনে হচ্ছে। তার জন্য ঝামেলা আরেকটু আছে। দুটো বিল্ডিংয়ের মাঝে মাত্র দুই ফিট জায়গা রাখা হয়েছে। ওখানে আগে নিজেকে গলাতে হবে সেজন্য একটা চোখা শিকের বেড়া পার হতে হবে।

তিন পা এগিয়েছে সেদিকে, ঘড় ঘড় করে শব্দ শুনে বিশাল গ্যারেজ গেটটা খুলে গেলো। একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো ইরফান। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। একা একা গেট খোলার কোন প্রশ্নই আসে না। নিশ্চয় কোন ধরনের অটোমেটিক মেকানিজমের কারসাজি।

কিন্তু হঠাৎ একটা গেট খুলে যাবে কেন? ওকে ভেতরে ঢোকার আহ্বান জানানো হচ্ছে? কিছুক্ষণ দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগলো, তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো। সাবধানে পা বাড়ালো ওদিকে। হাতে বের হয়ে এসেছে বিশৃঙ্খল গ্রন্থ।

গ্যারাজটা মাঝারি আকারের। টিমটিমে একটা আলো জ্বলছে। ভেতরে এই মুহূর্তে কোন গাড়ি নেই। মাথা গলিয়ে একবার দেখে শরীরটা ঢুকিয়ে নেয় ও। প্রতিটি পেশি সতর্ক হয়ে আছে বিপদের আশঙ্কায়। যদিও মানুষের গন্ধ দূরে থাকুক-ছায়াও নেই কোথাও। ভেতরে চার-পাঁচ কদম ফেলেছে, আবারও ঘড় ঘড় শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেলো গেট। চারপাশে দ্রুত চোখ বোলায় ইরফান। একটা ক্যামেরা থাকতে বাধ্য এখানে। কোথায় সেটা?

চোখে কিছু পড়ল না ওর। ফাঁদে ঢুকে পড়ার অনুভূতি হচ্ছে ভেতর ভেতর, গা ঝাড়া দিয়ে সেটা ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করলো। এখন ওসব ভেবে লাভ নেই। গ্যারাজের এক কোণে মৃদু শব্দ হচ্ছে। শব্দটা যান্ত্রিক।

মেঝের একটা অংশ নিচে নেমে যাচ্ছে-মৃদু আলোতেও দেখা যায়। এক পা এক পা করে ওদিকে এগিয়ে যায় ইরফান। এক চোখ আছে সিঁড়ি আর লিফটের দিকে। এইমাত্র মাটিতে হয়ে যাওয়া গর্তটার দিকে পিস্তল উদ্যত করে রেখেছে।

এক প্রস্থ সিঁড়ি নেমে গেছে দশ ফুট নিচে। এক ধাপ এক ধাপ করে সাবধানে নেমে আসে ও। একটু সামনে একটি মাত্র দরজা। সতর্কভঙ্গিতে ওটাতে হাত রাখতে যাবে, ভেতরে থেকে খুলে গেলো এটাও।

ঝট করে পিস্তল তাক করেছে ইরফান। চোখের সামনে একটা পিস্তল দেখে টাকমাথার লোকটার অবশ্য কোন ভাবান্তর হলো না। মুচকি হাসলেন তিনি। বয়সের ভারে গালের চামড়াগুলো কুচকে গেছে।

“ইরফান! তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। ভেতরে আসো, প্রিজ।”

ইতিউতি তাকায় ও ভেতরের দিকে। ছোট একটা ঘর। দেওয়ালে অদ্ভুত সব চিহ্ন আঁকা। ঘরের এক কোণে টেবিলে একটি কম্পিউটার অন করা। ডেস্কটপ ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা পিরামিডের মতো ছবি। ওপরে নিচে ল্যাটিনে লেখা আছে ওটার। দেওয়ালে ছড়িয়ে থাকা অঙ্কনগুলো বিভিন্ন গ্রহের মতো দেখতে। একেকটার কক্ষপথও নির্বাচন করে দেওয়া হয়েছে ওখানে। তবে পরিচিত সৌরজগতের অন্তর্গত নয় তারা।

টেকো এক বুড়োকে হুমকি মনে হলো না ওর, ভেতরে ঢুকে পড়ল। এর মধ্যে ঘরের অন্যপ্রান্তে চলে গেছে বুড়ো, সুন্দর একটা টেবিল। ছোট ঘোলাকৃতির। ওটার ওপর সাজানো দুটো কাপে কফি ঢালছেন তিনি। তারপর মুখ তুলে ইরফানের দিকে তাকালেন, “বসে পড়ো। কফিতে চিনি কি কম না বেশি?”

কাঁধ ঝাঁকায় ইরফান, যে লোক ক্যামেরা ছাড়াই দেখতে পায় সবকিছু তার জন্য কফিতে ইরফান কি খায় সেটা না জানার কোন কারণ থাকতে পারে না।

“অসপেক্ষ!” বিড় বিড় করে বলে ইরফান।

ফোকলা দাঁতে হাসেন বুড়ো। “হুম। দ্য অসপেক্ষ-দ্যাটস হোয়াট দে কল মি। বসে পড়তে বলছি না, কারণ বললেও তো আর বসবে না, তাই না?”

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ইরফান। এই সেই অসপেক্ষ-যার নাম সে আগেও শুনেছে। ভবিষ্যৎবাণী করে এই লোক। আর তাতে ভুল থাকে না। সব বিষয়ে এটা সে করে না। গত অর্ধশতক ধরে অসপেক্ষের মেসনারি বিষয়ক প্রতিটি ভবিষ্যৎবাণী সফল হয়েছে।

“আপনিই তাহলে ওটা করেছিলেন,” মাথা দোলায় ইরফান ধীরে ধীরে।

কাপটা ইরফানের দিকে এগিয়ে দেন অসপেক্ষ, “ওহ্-প্রফেসির কথা বলছো? হুম। তবে ওটা হতোই। আমি না বললেও হতো।”

“ঘটনা এখন উল্টে যাচ্ছে। আপনি না বললে কি হতো তা বোঝার উপায় নেই। তবে আপনি বলার কারণেই ওটা ঘটতে যাচ্ছে না।” থমথমে মুখে তাকিয়ে থাকে ইরফান, “ছেলেটা কোথাও যাচ্ছে না আটদিনের মধ্যে। দ্য গ্রেট অসপেক্ষ আগে কয়শ’ সফল প্রফেসি ঝেড়েছিলেন-জানি না। তবে এটা সত্যি হতে যাচ্ছে না।”

কফিতে চুমুক দেন বুড়ো অসপেক্ষ, “হয়তো বা। কিন্তু সূর্য আমাদের মাথার ওপর আলো ছড়াবেই।”

ঋকুচকে তাকিয়ে আছে ইরফান, “তার মানে, আপনি জানতেন ছেলেটাকে সরিয়ে নেওয়া হবে। আর আপনার বিশ্বাস, সময়মত পৌছে যাবে ও?”

রহস্যময় হাসি দিলেন অসপেক্ষ।

মাথা নাড়লো ইরফান, “আপনি একজন ফ্রড-অসপেক্ষ। প্রফেসি বলে যা চালাচ্ছেন, তার কোন ভিত্তি আছে বলে মনে করতে পারছি না।”

এবার অসপেক্ষ হেসে ফেললেন। “আমি তো তোমাকে কিছু বিশ্বাস করতে বলছি না। এমনকি আর কাউকেও বলি নি। তারা নিজে থেকেই বিশ্বাস করে। আর না করার যৌক্তিকতা আমি দেখি না।”

“কারণ?”

“আমাকে যিনি এসব জ্ঞান দিচ্ছেন, তিনি অবশ্যই একজন মহাজ্ঞানী। কায়ারীন কায়ার, অন্ধকারের প্রভু, আলোর দিশারি। তার কথায় ভুল থাকতে পারে না। সবাই তার কাছে পৌছতে পারে না এটা তাদের ব্যর্থতা। তবে ভুল হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। সে যাকগে, তুমি তো আমার কাছে প্রফেসির জন্য আসো নি। বলে ফেলো।”

একটু ভাবে ইরফান, চোখ দেওয়ালের গ্রহগুলোর দিকে। “আমার বলার তো প্রয়োজন থাকার কথা নয়, তাই না? ভবিষ্যৎ আপনি দেখতে পান। এরপরে আমি কি বলতে চাইছি সেটা আপনার জানার কথা।”

মাথা নাড়েন বৃদ্ধ, “আমি এইমাত্র বলেছি, আমাকে বিশ্বাস করাটা তোমার জন্য জরুরি না। কাজেই পরীক্ষা করার প্রশ্নও আসছে না।”

“বেশ!” ঘরের মাঝেই হেটে বেড়ায় ইরফান, চোখ বৃদ্ধের দিকে। “তাহলে বলে ফেলুন, লজ লোকেশন এবং ব্রুপ্রিন্ট আমি পাচ্ছি কোথায়?”

আয়েশ করে কাপে চুমুক দেন বৃদ্ধ।

“তোমাকে আমি সেটা বলে দেবো এমনটা ভাবার কারণ ঠিক বুঝলাম না। তবে

জানতে খুব বেশি আগ্রহ থাকলে আমাদের সাথে তোমাকেও সুর মেলাতে হবে। তোমাকে মেরে ফেলার কমপক্ষে এক ডজন সুযোগ পেয়েছিলো আমাদের ছেলেরা। কিন্তু ফুলের টোকাটিও তোমাকে দেওয়া হয়নি। বুঝতে পারছো তো?”

“আমার সঙ্গে পেরে ওঠেনি তারা। এর মধ্যে আর কিছু নেই। নিজেদের অযোগ্যতা ঢাকতে এখন ঢাক পেটাচ্ছেন।” মুখ বাঁকালো ইরফান।

“তোমার মধ্যে ভাল সুযোগ আছে, ইরফান। আর আছে ট্যালেন্ট। জিনিসগুলো নষ্ট করছো।”

“নষ্ট করতে তো খারাপ লাগছে না আমার,” মুচকি হাসে ইরফান, তারপর এক হাতে কফির কাপ ধরে রেখেই আরেকহাতে টান দিয়ে বের করে পিস্তলটা, অসপেক্ষের গলার ভঙ্গি নকল করে বলল, “আপনার মুখ খোলা উচিত কেন, সেটা বুঝতে পারছেন তো?”

সরাসরি অসপেক্ষের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে পিস্তলের নল, সেদিকে তাকিয়ে মৃদু হাসেন তিনি। “মাথা উড়িয়ে দিলে কথা বের হওয়ার কোন মাধ্যম থাকবে না। তুমিও জানো সেটা। অথথা ভারি জিনিসটা হাতে তুলে ধরে না রেখে আমার সাথে কথা বলতে পারো। আমাদের সাথে যোগ দিতে পারো আজ, এখানেই। তোমার ব্যাপারে গ্র্যান্ডকে জানাবো আমি, প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাও। ঈশিতাকে ফিরে পাবে। নতুন একজন ডায়মন্ড খুঁজে নেবো আমরা।”

“কাউকে কিছু জানাচ্ছে না তুমি, গ্র্যান্ডপা। তোমাকে তিন সেকেন্ড সময় দিতে পারি, এরপরই লজ লোকেশন জানাতে ব্যস্ত হয়ে যাবে। বুড়ো বয়সে হাঁড়ের সাথে গুলির সংঘর্ষ খুব যন্ত্রণার হয়ে থাকে।” পিস্তলটা বুড়োর পায়ের দিকে তাক করে সে।

“বেভেকশাহ!” চোঁট কুচকে বলেন বৃদ্ধ।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ইরফান, গালি খেলো নাকি বুঝতে পারছে না। গ্যারাজের দরজাটা খুলে যাচ্ছে—শুনতে পেল ও। পরক্ষণেই ইঞ্জিনের শব্দ বুঝিয়ে দেয় একটা গাড়ি ভেতরে এসে গেছে।

“শিট!” চট করে ঘুরে দাঁড়ায় ইরফান, ফাঁদে পড়ে গেছে। ট্র্যাপডোর দিয়ে বের হয়ে আসলেও সরাসরি গ্যারাজে বের হতে হবে ওকে।

“ফিরে যাওয়ার তাড়া তোমার থাকার কথা নয়, ইরফান,” থেমে থেমে বলেন অসপেক্ষ, “ফিরে গিয়ে তো আর তোমার বন্দিকে পাচ্ছে না তুমি!”

অসপেক্ষ অসুস্থ একটা হাসি দিলেন। বার দুই পেছনে রেখে আসা গ্যারাজের দিকে তাকালো ইরফান। একমাত্র সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলে সরাসরি শত্রুদের মুখে পড়তে হবে। তারা কোথায় অথবা সংখ্যাতে কতজন, এসবের কিছু জানে না ও। না জেনে বের হয়ে আসাটা আত্মহত্যার শামিল হবে। চুপচাপ অপেক্ষা করাই একমাত্র করণীয়!

একে একে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসলো ওরা। মোট তিনজন। প্রত্যেকের হাতেই একটা করে মেশিন পিস্তল।

“অস্ত্র দেখছি এই দেশে রাতারাতি সহজলভ্য হয়ে উঠেছে!” বিদ্রূপ মেশানো কণ্ঠে বলল ইরফান।

থমকে গেলো ওরা। ইরফানের বিদ্রূপ ওদের ঘায়েল করে নি। বৃদ্ধের গলায় চকচকে পিস্তলটা ঠেকিয়ে রেখেছে সুদর্শন ছেলেটা, আড়ালও নিয়েছে অসপেক্ষের শরীরের পেছনে—সেই দৃশ্যই থমকে দেয় ওদের। তারপর স্রেফ কথা বলার জন্যই যেন ঘুরে দাঁড়ালো ওদের একজন। সবার ওপরে থাকা মানুষটাকে বলল, “এমনটা হবে, সেটাই কি বলা হয়নি আমাদের?”

কাঁধ ঝাঁকায় ওপরের লোকটা, “অসপেক্ষের আর কোন মূল্য কি আছে আমাদের কাছে? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রফেসিটা করে ফেলেছেন তিনি।”

মাঝের মানুষটাও ঘরোয়া আলাপে যোগ দিল, “আমাদের কাছে মূল্য থাকা না থাকায় কোন কিছু আসে যায় না। আসল কথা হলো, গ্র্যান্ড মনে করেন না অসপেক্ষের আর কোন মূল্য আছে। কিডন্যাপার হারামজাদা এরমধ্যে তাকে একবার জেরা করে ফেলেছে। এত কাছে যখন ও আসতে পেরেছে, বাকিরাও পারবে। ভালনারেবল ঘুঁটি রাখি না আমরা।”

গলায় থাকা পিস্তলকে পরোয়া না করে ধমকে ওঠেন অসপেক্ষ, “শাট-আপ! গ্র্যান্ডের সাথে তোমাদের সরাসরি যোগাযোগ হয়নি। ওটা শুধু আমার সাথে হয়। বোলচাল না মেরে অর্ডারের ওপর থাকো।”

ওপরের লোকটা নেমে আসে দুই পা। “আমরা অর্ডারের ওপরই আছি, দাদু। আর সেখানে তোমাকেসহ-ই পার করে দিতে বলা হয়েছে চক্রের শত্রুকে।”

“মনে হচ্ছে আমাকে তোমাদের নজরেই পড়ছে না,” শব্দ গলায় বলল ইরফান, অসপেক্ষের আড়াল থেকে দলপতির কপালে পিস্তল তুলল।

এতক্ষণে যেন ইরফানের দিকে চোখ পড়ে লোকটার। ঈগলের মতো বাঁকা নাক আর গালে হালকা ক্ষতচিহ্নটা বাদ দিলে একে সুদর্শনই বলা চলে। ওর দিকে তাকিয়ে বন্ধুসুলভ একটা হাসি দেয় ঈগলনাক, “বুড়োর প্রাণের খুব দাম ভেবে ভুল করেছিলে তুমি, ইরফান। তোমাকে দলে ভেড়ানোর প্রস্তাব তুলে নেওয়া হয়েছে। জানার আগ্রহ খুব বেশি তোমার, বড় বেশি ঝামেলার লোক তুমি! গুডবাই।”

একটা মাত্র ইশারা দেয় লোকটা-দুটো মেশিনপিস্তল সরাসরি তাকায় ওদের দিকে। বুড়ো অসপেক্ষকেসহ-ই মেরে ফেলতে চাচ্ছে তাকে-বুঝতে পেরে একরকম হাল ছেড়ে দিল ইরফান। দ্রুত গুলি করলে কি ওদের দু-জনকে সামলাতে পারবে ও? হাত নড়তে দেখলেই দু-জনই কি একযোগে গুলি চালাবে না? একজনকে তার মাঝেও লাগাতে পারবে, কিন্তু অন্যজন তাকে অন্তত তিনবার বাঁঝরা করতে পারবে। আর যদি এখানেহাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, একই ফলাফল হতে যাচ্ছে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো ইরফান, দাঁতে দাঁত ঠেকিয়ে শক্ত করে পিস্তলের বাটটা চেপে ধরলো। যেতে হবে এখানেই, এই মুহূর্তে-তবে তাই হোক। কিন্তু একা যাবে না সে। সাথে করে ওদের একজনকে নিয়ে যাবে! ঈশিতার জন্য বুকের ভেতরে কোথাও দুমড়ে মুচড়ে যায় ওর-পারলো তো না কিছু করতে!

আততায়ীদের ট্রিগারে থাকা আঙুল ধীরে ধীরে সাদা হয়ে যাচ্ছে-যেকোন মুহূর্তে এক পশলা গুলি বের হয়ে আসবে ওর দিকে-নিজের শরীরের পেশিগুলোকেও টান টান হতে দেয় ইরফান। নিমেষে সাইট অ্যাডজাস্ট করে দুটো বুলেট পাঠাতে হবে।

ঠিক এই সময় ওপর থেকে ভেসে আসল শব্দটা। গলা ফাটিয়ে চৈচাচ্ছে কেউ গ্যারাজে। সেই সাথে ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ। ওরা তাহলে চারজন এসেছিলো? ওপরে একজনকে রেখে আসার কথা অবশ্য। ব্যাকআপ তো থাকবেই। কিন্তু আক্রমণ করলো কে তাকে?

ঝট করে দু-জন ঘুরে গেছে ওদিকে, তৃতীয়জন স্থির হয়ে ইরফানের দিকে অস্ত্রটা তাক করল। সতর্ক ভঙ্গিটা আরও বেড়েছে তার মধ্যে। একটা হালকা ঘড়ঘড়ে শব্দের সাথে থেমে গেলো ওপরের আত্ননাদ। কেউ একজন জবাই হয়ে গেছে!

ঈগলনাক আন্তে করে একজনকে ওপরে ওঠার ইশারা দেয়। অন্যজনকে ইরফানের দিকে ইঙ্গিত করে নিজেও তার পিছু পিছু উঠে গেলো।

বিরক্ত মুখে মাথা নাড়ছেন অসপেক্ষ, “দ্যাট ফাকার এগেইন!”

কৌতুহল বোধ করে ইরফান, এখানে দাঁড়িয়েই আক্রমণকারির ব্যাপারে বুড়ো কি করে জানে? “কে ছিলো ওটা...ওপরে?” জানতে চায় ও।

সবজাত্তার মতো মাথা দোলায় অসপেক্ষ, “ভ্যাম্প বয়।”

সামনে পিস্তল ধরে আছে একজন মানুষ, মৃত্যু পরোয়ানা জারি হয়ে গেছে ইরফানের মাথার ওপর। একজন বুড়োকে হিউম্যান-শিল্ড বানিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখন। আর মাত্র দশ ফিট ওপরে কেউ একজন এইমাত্র জবাই হয়ে গেছে। এরকম গুরুগম্ভীর পরিবেশেও না হেসে পারলো না ইরফান। “কাম অগ্নি!”

গম্ভীর মুখে হাসির শব্দ শুনলেন অসপেক্ষ, “হুসার মতো নয় ব্যাপারটা। ভ্যাম্পায়ারের অস্তিত্ব আছে বলে জানি না। তবে এটা নিঃসন্দেহে তাদের একজন। ওপরের দু-জনও টিকবে না। আর ওরা নিপাত গেলে নিচে নেমে আসবে প্রাণিটা।”

অসপেক্ষের কথা সত্য প্রমাণ করার জন্যই হয়তো ওপরে নরক গুলজার শুরু হয়ে গেলো। মরণ চিৎকার দিচ্ছে ওপর থেকে একজন মানুষ। তার সাথে তাল মিলিয়ে

ঈগলনাকের খিন্টি শোনা যায়। কামানের গোলার মতো শব্দ হচ্ছে নিস্তব্ধ গ্যারাজে।  
অন্ধের মতো গুলি চালাচ্ছে নিশ্চয় লোকটা। চিৎকারের বিরাম নেই!

ইরফানকে চোখে রাখা মানুষটা ফ্যাকাসে মুখে ওদিকে একবার তাকালো।  
সুযোগ চিনতে ভুল করলো না সে। একটিমাত্র গুলির সাহায্যে মেশিনপিস্তলধারির  
মাথার ওপরের অংশটা বিস্ফোরিত করে দিল। দু-হাত বাড়িয়ে কিছু একটা ধরার চেষ্টা  
করতে করতে দেহটা দড়াম করে সিঁড়িতেই পড়ে পিছলে নেমে আসে নিচে।

অতসব দেখছে না ইরফান, একহাতে বুড়োকে টেনে নিয়ে গ্যারাজের দিকে  
এগুতে থাকে। রক্তে পা যেন না পিছলে যায় সেদিকে খেয়াল করে সিঁড়ি বাইতে গুরু  
করলো ওরা। ওপরটা একেবারে রণাঙ্গন হয়ে গেছে—বন্ধিত থাকতে ইরফানের মন  
চায় না। মোট ছয়টা পিলার গ্যারাজে। একটার আড়ালে এখন লুকিয়ে আছে  
ঈগলনাক। মেঝেতে এখানে ওখানে পড়ে আছে দু-জন মানুষের শরীর। অকেজো  
হয়ে আছে তারা—এতটুকু পরিস্কার। মৃত না অজ্ঞান সেটা বোঝার উপায় নেই। এই  
সময় প্রথমবারের মতো ওটাকে দেখলো ইরফান।

কালো একটা ছায়া। বুলেটের গতিতে গ্যারাজের একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্তে  
যাচ্ছে। পা দুটো মাটিতে পড়ছে কি পড়ছে না তার। দূর থেকে দেখে প্রাণিটা উড়ছে  
বলেই ভ্রম হলো ওর।

দুই চোখ বড় বড় হয়ে যায় ঈগলনাকেরও। ইরফান যে বের হয়ে এসেছে  
সেদিকে খেয়ালই নেই। ভ্যাম্পায়ারটাকে দেখছে এখন। তারপরই আড়াল থেকে বের  
হয়ে আসলো লোকটা। গুলি চালাচ্ছে ছুঁস্ত ভ্যাম্পায়ারের দিকে, পেছন থেকে অস্ত্রসহ  
হাতটা লম্বা করলো ইরফান। গুলির ভারি ফায়ারিং নয়জ মেশিনপিস্তলের কর্কশ  
গর্জনের মাঝে বেশ গুরুগম্ভীর একটা শব্দ বলে মনে হলো। তারপরই গ্যারাজটা  
একেবারে শান্ত হয়ে গেলো। বুড়ো অসপেক্ষকে নিয়ে এগিয়ে যায় ইরফান। পড়ে থাকা  
ঈগলনাকের দিকে একবার তাকালো, মাথার পেছন দিয়ে চুকে ডান চোখ দিয়ে বের  
হয়ে গেছে বুলেট। প্রাণ হারিয়েছে সাথে সাথেই।

“ভ্যাম্প বয়!” গ্যারাজ কাঁপিয়ে হুঙ্কার ছাড়ে ইরফান, “যদি তুমি ওদের বিপক্ষের  
কেউ হও তাহলে আমার সাথে তোমার লড়াইটা হবে সেম সাইড!”

গ্যারাজের অন্ধকার কোণ থেকে অমানবিক একটা হিসহিসানি শোনা যায়। নিজের  
অজান্তেই শিউরে ওঠে ইরফান। কালো ছায়া থেকে বের হয়ে আসছে গুলি। ফ্যাকাসে  
মুখ, কালো পোশাকের ভাঁজে আরও বেশি ফ্যাকাসে লাগছে। চোঁটজোড়া তার  
টকটকে লাল। তার মাঝেও বের হয়ে আসা শব্দস্তুদুটোতে হালকা আলো ঝিলিক  
দিচ্ছে।

ধীরে ধীরে ইরফানের দিকে এগিয়ে আসে অন্ধকারের জীবটা।

চার দুর্বৃত্তের গাড়িতে চাবি লাগানোই ছিলো, একটা মোচড় দিয়ে ইঞ্জিন স্টার্ট দেয় ইরফান।

পেছনের সিটে ভ্যাম্পায়ার ছেলেটা বুড়ো অসপেক্ষকে সাথে করে উঠে পড়েছে। ওপরে ছিলো বিল্ডিংয়ের একমাত্র লিফট। সেখান থেকে হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠেছে যন্ত্রটা। গুঞ্জন তুলে নেমে আসছে এখন।

যন্ত্রঘরে করে কতজন নেমে আসছে দেখার জন্য অপেক্ষা করলো না কেউ। পিছিয়ে গাড়িটাকে গ্যারাজ থেকে বের করে ফেলেছে ইরফান। লিফটের দরজা একটা মিষ্টি শব্দ করে খুলে গেলো।

এক পশলা গুলিতে গাড়ির বাম দিকের কাঁচগুলো ভেঙে গেছে, কিন্তু কোনরকম শব্দ শোনা গেলো না। ধাতব শরীরে ঘ্যাঁচাঘ্যাচ বুলেট বেঁধার ভোঁতা শব্দ ছাড়া সবকিছু নীরব। সাইলেন্সার লাগানো সাবমেশিনগান ধরা অবয়বটিকে আরেকবার দেখার চেষ্টা করে ইরফান। অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেছে মানুষটা।

সোজা সামনে গাড়ি ছোটালো ও। পেছনে মৃদু আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। হালকা চালে ফিরে তাকালো সে, “সবাই ঠিক আছে?”

“অসপেক্ষ। ওর ব্রিডিং হচ্ছে,” দাঁতের ফাঁক দিয়ে বলে ভ্যাম্পায়ার।

উৎকর্ষিত হয় ইরফান, একজন জীবিত লিংক দরকার ওদের। “গুলি লেগেছে?”

“না, কাঁচে কেটে গেছে। ক্ষতটা গভির।”

“শার্ট ছিঁড়ে বাঁধুন। আমি দেখছি ধারে কাছে কোন ক্লিনিক পাই কি-না।”

মাথার ভেতরে ম্যাপটা কল্পনা করে একবার, তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। পরের মোড়েই বাম দিকে ঢুকে যায় ওদের গাড়িটা।

\*\*\*

তিনটা কুকুর গুয়ে ছিলো রাস্তায়, ওদের চোখ প্রথমে হেডলাইটের আলোয় ধাঁধিয়ে গেলো, তারপরেই এলো টায়ারের কর্কশ শব্দ। কান ঝালাপালা করে দেওয়া শব্দে গুয়ে থাকা চলে না। ঘুমের আশা বাদ দিয়ে তিনটেই একযোগে চোঁচতে চোঁচতে কোনদিকে যেন সরে যায়।

ব্যথায় বাঁকা হয়ে গেছেন অসপেক্ষ, তাকে একত্রে ধরে নেমে আসে ইরফান। অদ্ভুত আগন্তকের রক্তাক্ত ঠোঁট আর ফ্যাকাসে চেহারা দেখলো। মাথা নাড়লো সে।

“আপনি এখানে থাকুন। এই আউটফিট নিয়ে ক্লিনিকের সামনে দিয়ে ঢুকলে ওরা পেছনদিন দিয়ে বের করে দেবে।”



“এটা রাখুন,” নিজের পকেট থেকে একটা ফোন বের করে দেয় ভ্যাম্পায়ার।

বুঝতে পেরে দ্রুত ওটা নিয়ে নিজের ফোনটা তাকে দিল ইরফান। নম্বর আদান প্রদান করে এক সেকেন্ড নষ্ট করতে নারাজ ওরা। তারপর এগিয়ে গেলো ক্লিনিকের দিকে। তার কাঁধে ভর করে টলছে অসপেক্স।

গাড়ি ক্লিনিকের প্রবেশপথের সামনে আনতে পারেনি। ধাতব শরীরে গুলির ক্ষত না চেনার মতো নয় এখানে কেউ-হলিউডের বদৌলতে সবাই শিখেছে ওসব। সেজন্য ত্রিশগজ দূরেই নেমে পড়েছে ওরা। কাঁচের বড় একটা অংশ ছিটকে পড়ে অসপেক্সের পেটের অনেকাংশ চিরে গেছে। অবিরাম রক্ত ঝড়ছে মানুষটার শরীর থেকে। ভ্যাম্পায়ার ছেলেটা শার্ট বেঁধে সেটা থামানোর চেষ্টা করলেও তেমন কাজে দেয়নি।

হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ে ইমার্জেন্সি কেয়ারের জন্য খোলা আলাদা ইউনিটের দিকে ছুটল ইরফান। বুড়োর চোখ প্রায় বন্ধ হয়ে আছে। টেনে হিঁচড়ে তাকে নিয়ে যাওয়া লাগছে এখন।

আধাঘণ্টা দশ মিনিট পর পর ২১৩ নম্বর রুমে অসপেক্সকে শুইয়ে দেওয়া হলো যখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো ইরফান। ক্লিনিকের ব্যাংকে রক্ত ছিলো-গ্রুপে মিলে গেছে। সেটাই দেওয়া হচ্ছে বুড়োকে। ইরফান জানে এই স্বস্তি সাময়িক। নিজের নম্বরে ডায়াল করলো ও, ভ্যাম্পায়ার লোকটাকে দরকার।

ক্লিনিকের নিচে চমৎকার কালো গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে, তার ভেতরে বসে থাকা ভ্যাম্পায়ারকে দেখে অবাক হয় ইরফান। কিছু না বলে ড্রাইভিং সিটের পাশে উঠে বসে ও।

“আরেকটা গাড়ি?”

“ফুটো নিয়ে ঘোরা যাবে না, লোকের সন্দেহ হবেই।” ছেঁড়া তার জোড়া লাগিয়ে গাড়ি ছেড়ে দেয় লোকটা।

কাঁধ ঝাঁকায় ইরফান, “কাজের কথায় আসা যাক-অসপেক্সকে আমার দরকার। লজে ঢুকবো আমি। অসপেক্সকে ছাড়া লোকেশন জানা সম্ভব নয়।”

ঘরঘরে একটা শব্দ করে লোকটা, “অসপেক্সকে আমারও দরকার।”

“আমরা দু-জনেই ওকে ব্যবহার করতে পারি। সমঝোতায় আসতে রাজি আছেন? তথ্য উদ্ধারের জন্য দু-জনেই ব্যবহার করছি আমরা অসপেক্সকে। না-হলে কেউই পাচ্ছি না।”

“কেউই পাচ্ছি না?” কৌতুহল নিয়ে জানতে চায় ভ্যাম্পায়ার।

“চতুর ওরা কি হাল ছেড়ে দেবে বলে মনে হয়? গ্যারান্টি যে গুলি চালিয়েছে সে ঠিকই লাগিয়ে দিয়েছে এতক্ষণে। আশেপাশের ক্লিনিকগুলোতে খোঁজ পড়বেই। এখন থেকে একঘণ্টার মাঝে ওখান থেকে অসপেক্সকে সরাতে হবে।”

অস্থির হয়ে উঠলো লোকটা, “আরেকটা ক্লিনিকে সরালেই হবে না। গোপনীয়তা রক্ষা করতে পারবে এমন কোন ক্লিনিক দরকার আমাদের। এত অল্প সময়ে এত সব অ্যারেঞ্জমেন্ট কিভাবে করবো?”

চোখ টিপ দেয় ইরফান। “আপনি পারবেন না, আমি পারবো। এখন বলুন, অসপেক্ষকে দু-জনেই ব্যবহার করতে যাচ্ছি—এই প্রস্তাবে আপনি রাজি কি না। নতুবা থাকুক। যে খুশি নিয়ে যাক বুড়োকে! আর আমরা এদিকে নিজেরা ঝামেলা করতে থাকি।”

ভাবার তেমন কিছু নেই আসলে, কিছুক্ষণের মাঝেই গোয়ার্তুমি বাদ দিয়ে লাইনে চলে আসলো লোকটা, “অলরাইট—তবে আপনার কাজ শেষ হয়ে গেলে বুড়োকে আমিই নিকেশ করবো। আপনি নন।”

অসপেক্ষকে খুন করতে চায় এই লোক? কেন?

প্রশ্নটাকে প্রশ্ন দেয় না ইরফান, মাথা দোলাল, “অলরাইট। এখন মালিবাগে চলুন তো। একটু দ্রুত করুন। সময় হাতে আছে খুব বেশি হলে পঞ্চাশ মিনিট। আরও কম থাকতে পারে, হয়তো চক্রকে আন্ডারএস্টিমেট করছি আমরা।”

“অসপেক্ষকে ক্লিনিক থেকে বের করে আনাই একমাত্র কাজ না কিন্তু, ব্যাটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সবদিক সামলাতে পারবেন তো?” জানতে চায় মানুষটা।

“শুধু মালিবাগে পৌঁছে নেই। তারপর আমার ডিরেকশন অনুযায়ী গাড়ি চালাবেন। বাকিটা আমার দায়িত্ব। অসপেক্ষকে সরাতে আমাদের আর ওই ক্লিনিকে ফিরে যাওয়া লাগবে না। বিশ্বাস রাখুন।”

চুপচাপ কিছুক্ষণ ড্রাইভ করলো অদ্ভুত লোকটা। তার দিকে কয়েকবার তাকালো ইরফান।

“পরিচয় দেওয়া হয়নি, আমি ইরফান।”

একটু হাসে মানুষটা, “ছদ্মনাম? তবে কাজ চলবে। আমাকে সৈকত বলে ডাকতে পারেন।”

“আমার মনে হচ্ছে আমাদের একসাথে কাজ করা লাগবে, মি. সৈকত। কাজেই নিজেদের জানা তথ্যগুলো শেয়ার করাটা কাজে দিতে পারে।” প্রস্তাব রাখে ইরফান।

গায়ে মাখল না সৈকত, “আপনার আমার পথ সম্পূর্ণ আলাদা, মি. ইরফান। বোঝা যায় আপনি একটা উদ্দেশ্য সামনে রেখে ফাইট করছেন ওদের বিরুদ্ধে। আমার কোন উদ্দেশ্য নেই। আপনি জেতার জন্য লড়াইছেন—আমি আগেই হেরে গেছি।”

মেনে নিতে পারে না ইরফান, “তবুও...আপনি বলেছিলেন ওরা আমাদের কমন এনিমি।”

মাথা নাড়লো সৈকত, “কমন এনিমি তারা, এতটুকু ঠিক আছে। সেজন্য আমাদের বন্ধু হতে হবে—এমন তো নয়। আপনার কে আছে ওদের কাছে, মি. ইরফান? গার্লফ্রেন্ড?”

আচমকা প্রশ্নটা ছুটে আসতে দেখে চমকে যায় ইরফান। প্রস্তুত ছিলো না ওটার জন্য ও।

মাথা নাড়ে ও হালকা করে, “না, বোন। ডানদিকে ঢুকে পড়ুন।”

ওর পথনির্দেশনা অনুযায়ী এগিয়ে যায় সৈকত। তারপর মাথা দোলায়, “ঈশিতার ভাই আপনি?”

সরু চোখে ওর দিকে তাকালো ইরফান, “ঈশিতাকে আপনি আগে থেকে চেনেন?”

নেতিবাচক মাথা দোলায় সৈকত, “না। নামটা জানি। ওদের কাছে মহামানবী হয়ে উঠেছে মেয়েটা।”

“তিনগলি পর আবার ডানে যাবেন।” জানায় ইরফান।

অন্ধকার পথঘাট এদিকে। রাস্তার লাইটগুলো কতদিন ধরে যে মেইনটেনেন্সের দিকে মুখ চেয়ে আছে কে জানে! তবে যত্ন তারা পায় নি। আজও কানা হয়ে আছে তাই।

অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সৈকত, “শুভকামনা থাকলো আপনার জন্য।”

মনে হতে প্রশ্নটা করে ফেললো ইরফান, “আপনার কে আছে ওদের হাতে?”

চোয়াল শক্ত হয়ে যায় সৈকতের, শ্বদন্ত বের হয়ে এসেছে ঠোঁটের দু-পাশ থেকে, “ছিলো।”

আর কিছু জানতে চায় না ইরফান। সময় হলে হয়তো নিজে থেকেই বলবে। “ওই গলিতে ঢুকে পড়েন, ভাই।”

সৈকত কথামত ঠিক জায়গাতে গাড়িটা থামিয়ে দু-বার হর্ন দিতে ছোট টিনশেড বাসাটার দরজা খুলে যায়। ইরফান নেমে এসেছে আগেই, এইমাত্র বের হয়ে আসা লোকটার সামনে দাঁড়ালো।

“ইরফান ভাই! গরীবের বাড়িতে হাতির পাড়া দেহন যায়!” সবগুলো দাঁত বের করে দিয়ে বলে আন্ডারওয়ার্ডের ট্রাস সাদ্দাম।

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে ইরফান, “তোমার সাহায্য আমার দরকার, সাদ্দাম।”

“অসপেক্ষকে নিয়ে আর ভাবার কোন কারণ নেই,” সৈকতের দিকে তাকিয়ে বলে ইরফান।

চিন্তার ছাপটা সরে না তবুও ওর মুখ থেকে। আগামাথা বুঝতে পারেনি।

ইরফান আর সাদ্দাম ফিস ফিস করেছে কিছুক্ষণ, ইরফানকে গদ গদ হয়ে ভক্তি করছিলো। মনে হচ্ছিলো পারলে জান কোরবান করে দেবে। ফিসুর-ফাসুর শেষ হতেই সোজা গাড়িতে ফিরে এসেছে ইরফান। তারপর আবারও পথে নেমে এসেছে ওরা।

ক্লিনিকের ধারে কাছেও যাচ্ছে না গাড়ি, কিছুক্ষণ পর এতটুকু বুঝতে পারলো সৈকত। মিরপুরের পথে ওরা এখন। কোথায় যাচ্ছে তা জানতে চায়নি সে, আস্তে করে একবার কাঁধের কাছে থাকা পাতলা ছুরিটা স্পর্শ করে নিজের সিটে বসে আছে। পানি কোথায় গড়াচ্ছে দেখতে চাইছে আগে।

“আমি আন্ডারওয়ার্ল্ডে ছিলাম এক সময়। বয়সে নেহায়েত কাঁচা ছিলাম। তবে ওপরের দিকে উঠে আসার পেছনে কিছু ঘটনাপ্রবাহ সাহায্য করেছিলো,” সৈকতকে আশ্বস্ত করার সুরে বলল ইরফান, “সাদ্দামকে যে দেখছেন—এই লোক এখন কালো জগতের তুরান ভাইয়ের ডানহাত। একে যখন দায়িত্ব দিয়েছি আর কোন চিন্তা নেই।”

“কাজটা ওরা কিভাবে করবে?” প্রশ্ন করে সৈকত।

“হে-হট্টগোল করে অসপেক্ষকে নামিয়ে আনবে ওরা, সোজা রওনা দেবে অ্যাম্বুলেন্সের দিকে। তারপর একটা অ্যাম্বুলেন্সকে জোর করে বের করাবে। ক্লিনিকেরই সিল মারা থাকবে ওতে। এতটুকু করা কোন ব্যাপারই না ওদের জন্য। ক্লিনিক তোলপাড় করে ওই অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে যেদিকে মন চায় চলে যাবে তারা। কিন্তু অসপেক্ষ ওটাতে থাকছে না।” হাসে ইরফান।

হাসলে লোকটাকে একেবারে শিশুদের মতো লাগে, সৈকত অবাক হলো দেখে।

“অসপেক্ষকে তুলে নিয়ে বের হয়ে যাবে ওরা। তবে অ্যাম্বুলেন্সে করে না। প্রাইভেট করে করে চলে যাবে মাত্র একরকম দূরে অপেক্ষাতে থাকা আরেকটা অ্যাম্বুলেন্সে। ওই অ্যাম্বুলেন্সটা ইম্পেরিয়াল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সিলযুক্ত। তবে সেখানেও যাবে না ওটা। সাদ্দামের পরিচিত আরেকটি ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হবে অসপেক্ষকে। সিলভার ব্লাড ক্লিনিক। ছোট তবে নিরাপদ। অসপেক্ষ মুখ খোলার আগ পর্যন্ত ওখানেই থাকবে।”

“বুড়ো ভেগে গেলে?”

“ভাগতে পারবে না। সাদ্দামের লোকজন ওকে পাহারা দেবে।”

কিছুক্ষণ চুপ থাকে সৈকত সব শুনলো। লোকটা কাঁচা কাজ করে না—এতটুকু

বুঝতে পারছে। বেশিক্ষণ মুখ বন্ধ রাখতে পারলো না অবশ্য, ফস্ করে প্রশ্নটা করেই ফেলে, “ওদের নতুন ঝামেলা তাহলে আপনিই? শুনেছি একজন কিডন্যাপার উঠেপড়ে লেগেছে তাদের পিছে।”

নির্বিকার মুখে বলে ইরফান, “হয়তো।”

প্রতিবাদ করে সৈকত, “কিডন্যাপার? আন্ডারওয়ার্ল্ডের মাঝে প্রফেশনাল কিডন্যাপারের ছানটা কোথায়?”

হাসে ইরফান, “আপনার কৌতুহলের দেখছি সীমা নেই। কিডন্যাপারটি নিজের গুল্লর গলায় বটি ঢুকিয়ে দিয়ে বের হয়ে গেছিলো একদিন। তারপর থেকে নিজের জন্য আশাদা ব্যবসা বেছে নিয়েছিলো সে-নিজের সবগুলো ফ্লিল যেখানে ফিট করেছিলো সেই পেশাটা যদি কিডন্যাপিং হয়, ক্ষতি কি?”

“নিরপরাধ শিশুদের ক্ষতি-এই যা।” ঘৃণাভরে ইরফানের দিকে তাকায় সৈকত।

মুচকি হাসে ইরফান, “কোন শিশুর ক্ষতি সে করেছে বলে শোনা যায়নি কখনও।”

সৈকতের কিছু একটা মনে করতে করতেও আসছে না-বাইরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে ও। ইরফানের অলক্ষ্যে নিজের দিকের সাইড ভিউ মিররটা ধরে আস্তে করে বন্ধ করে দিল। হঠাৎ মনে পড়ে যায় ওর, কোথাও এ ব্যাপারে শুনেছিলো। ইরফান বলে নিজের পরিচয় দিয়েছে এই লোক! পেশায় কিডন্যাপার এমন কেউ ঝামেলা করেছে প্রতিপক্ষের।

এই সেই লোক-অপরাধ জগতে যাকে ফ্যান্টম ইরফান বলে একনামে চেনে সবাই! আড়চোখে তাকিয়ে একবার দেখলো সৈকত। শিশুর মতো নিষ্পাপ চেহারা, কাজের ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় সতর্ক, যার বিরুদ্ধে লাগে তার শেষ না দেখে ছাড়ে না!

নিজের গুস্তাদকে মেরে ফেলে বের হয়ে এসেছিলো আন্ডারওয়ার্ল্ড থেকে। পেশা হিসেবে কিডন্যাপকে বেছে নিয়েই ক্ষান্ত দেয়নি, ‘ইরফান’ শব্দটাকে ছড়িয়ে দিয়েছিলো যতটা সম্ভব। বড় বড় ক্লায়েন্টরা খুঁজে বেড়ায় এই ছেলেকে। সুযোগ বুঝে ছোটখাটো কিডন্যাপাররাও ‘ইরফান’ নামটা ব্যবহার করে গেছে। তবে ধরা পড়েছে যখন, দেখা গেছে তাদের কেউ প্রকৃত ইরফান নয়। একে কোনদিনও ধরতে পারেনি পুলিশ। কিডন্যাপ করা শিশু থেকে বয়স্ক মানুষগুলোর কোন ক্ষতি করেছে বলে শোনা যায়নি। তাদের মানুষ নয়, ইনভেস্টমেন্ট বিবেচনা করতো লোকটা। বন্দির ক্ষতি করেনি দেখে নিশ্চিত থাকার উপায় অপহৃতের স্বজনদের থাকেনি, ইরফান তাদের ফেরত না দিলে পুলিশ মাস ধরে খুঁজেও নিখোঁজ ব্যক্তিকে বের করতে পারেনি।

দুর্ভেদ্য যেকোন বাসাতেই ঢুকে পড়ার ক্ষমতা আছে ইরফানের-যত কঠিন সিকিউরিটি রাখা হোক, তার ভেতরে খুঁত বের করতে পারে সে। এ বিষয়ে ভয়ঙ্কর দক্ষতাই বাকিদের জন্য ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই দক্ষতা তাকে অর্জন করিয়েছে ফ্যান্টম উপাধি। একই কারণে ইরফানকে অনেকে একটি মিথ মনে করেন। শুধুই গালগল্প যেন সে, একজন কিংবদন্তি।

মানুষটা সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছিলো ঢাকার সবচেয়ে বড় অপরাধ সংগঠনটিকে ধ্বংস করে দিয়ে। তখন আবছাভাবে তার ব্যাপারে জানতে পেরেছিলো সাংবাদিকরা। সৈকত তাদের রিপোর্ট বিশ্বাস করেনি, গুজব বলেই উড়িয়ে দিয়েছিলো সব। এখন পাশে জলজ্যান্ত বসে থাকা লোকটার উপস্থিতি অস্বীকার করার কোন উপায় নেই!

“একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে পারি?” আস্তে করেই জানতে চেয়েছিলো ইরফান, চমকে ওঠে সৈকত।

“নিশ্চয়। প্রশ্ন তো করতেই পারেন। তবে উত্তর পাচ্ছেন কি-না আমি জানি না।”

সামনের গাড়িটাকে ওভারটেক করে আড়চোখে তার দিকে তাকায় ইরফান, “ভ্যাম্পায়ার থিং-মানে, যেটা সবাই বলে বেড়াচ্ছে এখন...মানুষের রক্ত খান আপনি। কিন্তু বাস্তবতা আপনার অস্তিত্ব অস্বীকার করে। আমি ভ্যাম্পায়ার তত্ত্বে বিশ্বাসি নই।”

আর কিছু বলল না ইরফান। সৈকত বুঝতে পারলো, তার কাছে একটা ব্যাখ্যা চাওয়া হলো।

কাঁধ ঝাঁকালো সৈকত, “মানুষের রক্ত খেতে আমার খারাপ লাগে না। ওভাবে তাকাবেন না, প্রিজ, আপনার ঘাড়ের ল্যাফিয়ে পড়তে আমার কী ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে সেটা আমার জায়গাতে না আসলে বুঝবেন না!”

ধ্বক ধ্বক করে জ্বলছে সৈকতের চোখ, বের হয়ে এসেছে শব্দন্ত, সেটা দেখে আবার সামনে রাস্তার দিকে মনযোগ ফেরালো ইরফান।

সৈকতও হেলান দিল সিটে, “আমি জানি, সবার থেকে কিছুটা আলাদা আমি...”

“কিছুটা!” শোনা যায় না এভাবে বলল ইরফান।

“...আমার দাঁত অতিমাত্রায় চোঁখা। আমার রক্ত পানের অভ্যাস আছে...”

“...আয়নায় বিশ্ব না পড়ার ব্যাপারটা কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?” চট করে বলে বসলো ইরফান, “সাইড ভিউ মিরর সরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা আমার চোখে পড়েছে। আয়না ভয় পান আপনি, তাই না?”

চুপ করে থাকলো সৈকত, এই লোকের নজর থেকে কিছুই এড়ায় না!

“দিনের আলোয় বের হতে পারেন?” স্বাভাবিকভাবেই জানতে চায় ইরফান।

“না,” স্বীকার করে সৈকত।

“কেন?”

“শরীরের চামড়া পুড়ে যায়। ফোঁকা পড়ে যায় সবখানে। বের হলে আমাকে একটা ভারি পোশাক পরে বের হতে হয়, চামড়ার দস্তানায় ঢাকা থাকে হাত।”

“একেবারে ভ্যাম্পায়ারের চরিত্র দখল করে বসে আছেন দেখা যাচ্ছে!” ইরফানের গলাতে স্পষ্ট অবিশ্বাসের ছাপ।

“নিজেকে ভ্যাম্পায়ার বা ও জাতীয় কিছু ভাবি না আমি। আমি সাধারণভাবেই জন্মেছি। বড় হয়েছি।” সাফ সাফ জানিয়ে দেয় সৈকত।

লোকটার একটা কথাও বিশ্বাস করার কোন উপায় নেই। একেবারেই উড়ে এসে

জুড়ে বসেছে। আচমকা আজকে ইরফান যেখানে ছিলো সেখানেই কেন বা তাকে পাওয়া গেলো? এই মুহূর্তে সৈকতের শুধু কথা না, আস্ত মানুষটাকেই বিশ্বাস করতে পারে না ইরফান।

চক্রের পক্ষ থেকে ইরফানের ওপর নজর রাখতে একে পাঠানো হয়নি তো? অসম্ভব না। প্রথমে অস্ত্রপেক্ষের আস্তানাতে কাকতালিয়ভাবে প্রাণে বাঁচানোর কাজে লেগে গেলো এই লোক-তারপরই অসপেক্ষকে সাথে রাখার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আসলে সৈকত লোকটা কি উদ্দেশ্যে ওর সাথে লেগে আছে জানার উপায় নেই। ইরফানের আস্থা অর্জন করতে চাইছে? বিজয়ের লোকেশন জানার জন্য?

অসম্ভব নয়! চক্রের ষড়যন্ত্র এর চেয়েও গভীর হয়ে থাকে।

অন্ধগলিটা চোখে পড়তেই আচমকা ওতে গাড়িটার নাক ঢুকিয়ে ফেললো ইরফান, তারপর হার্ডব্রেক কষল।

গাড়ির গতি জড়তার জন্য সামনে ছিটকে গেছিলো সৈকত, কোনমতে নিজেকে সোজা করতে সামনের উইন্ডশিল্ড ভেদ করে একটা দেওয়াল দেখতে পায় ও। ডেড-এন্ড। অবাক হয়ে ইরফানের দিকে তাকাতেই চকচকে পিস্তলটা দেখতে পেল এবার।

“এখানেই আমাকে পরিষ্কার করে আপনার কাহিনী বলছেন, মি. সৈকত। তারপর আমার সেটা ভাল লাগলে আমরা একসাথে সামনে যাবো। নাহলে অস্ত্র আপনি নড়ছেন না কোথাও।” বাইরের দিকে ইঙ্গিত করলো ইরফান।

তাকিয়ে দেখে সৈকত। বালু স্তুপ করে রাখা হয়েছে ওখানে। কঙ্গট্রাকশনের কাজ চলছে। মোটামুটি শান্ত একটা জায়গা। এখানে ওকে গুলি করে ফেলে দিয়ে গাড়ি নিয়ে বের হয়ে গেলে আশেপাশের মানুষজন টের পাওয়ার আগেই উদ্ধাও হয়ে যাবে ইরফান। ছেলেটার চোখে মুখে সিরিয়াসনেস ফুটে উঠেছে। অবিশ্বাস করলো না সৈকত, এই লোক আসলেই এখানে গুলি করতে পারে। সামান্যতম সন্দেহের কারণ দেখলেও টেনে দিতে পারে ট্রিগার।

“বলুন, কি জানতে চান?” হালকা ঘাম জমেছে সৈকতের মুখে।

“চক্রের পেছনে কিভাবে লেগেছেন? বানিয়ে বলার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। একটা বুলেটের তেমন দাম নেই আমার কাছে। তবুও আপনার চেয়ে এটির দাম বেশি।”

শুকিয়ে যাওয়া গলা নিয়ে একটু কাশল ও, “ইটস অল অ্যাবাউট মাই সিস্টার, মি. ইরফান। জাস্ট লাইক ইউ।”

কিছু না বলে পিস্তল ধরা হাতের আঙুলগুলোতে আয়ত চাপ দেয় ইরফান। থমথমে মুখে তাকিয়ে আছে সৈকতের দিকে।

দ্রুত মুখ খোলার তাগিদ অনুভব করলো সৈকত। সব জানিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। সামনে অস্ত্র ধরে থাকা মানুষটার খুন-খারাবির রেকর্ড খারাপ না। নিজের শত্রুর শেষ এ রাখে না। এই মুহূর্তে সৈকতকে শত্রু মনে হলে একটা বুলেট আসলেই খরচ করবে ও। এটা তার চেহারাতেই লেখা আছে।

“ইভা-আমার একমাত্র বোন। ওদের সংঘে যোগ দিয়েছিলো বোকা মেয়েটা। ওদের উদ্দেশ্য তো বাইরে থেকে খুবই মহৎ-ইভার আর বয়স কত-বোঝে নাকি এতকিছু!” নিচের ঠাট কামড়ে ধরে সৈকত, “বান্ধবির পাল্লায় পড়ে ছুটল ওদের পেছনে-ক্ষমতা, জ্ঞান! অন্ধ হয়ে গেলো মেয়েটা। আমি শুরুতে কিছুই বুঝি নি। মাঝে মাঝে ধর্ম নিয়ে তর্ক জুড়ে দিত-তখন কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলাম। তারপর চেপে ধরে জানলাম নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছে সে। ওটার তাৎপর্য তখনও বুঝিনি।”

ঐ কুঁচকে গেছে ইরফানের, “উৎসর্গ? শি ওয়জ অ্যা ডায়মন্ড?”

মাথা নাড়ে সৈকত, “হুম।”

“তাহলে ইভা কোথায় এখন? একজন ডায়মন্ড সরে আসতে পারে না আর-”

“যদি না তার মৃত্যু না হয়!” ড্যাশবোর্ডে ঘুমি মারে সৈকত পিস্তলের প্রতি তোয়াক্কা না রেখে, “আর ওই মৃত্যুদন্ড তাকে দেওয়া হয়েছিলো। আমার ছোট বোনটা...পৃথিবীর কিছুই দেখেনি ও, তাকে ওরা এভাবে মৃত্যুদন্ড দিয়ে দিল, ক্যান ইউ বিলিভ ইট, মি. ইরফান!”

সৈকতের চোখ ছলছল করছে, নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করে ও। ইরফান পরের প্রশ্নটা করার সময় নিজের গলাতে আগের মতো কাঠিন্য টের পেল না, “ডায়মন্ডকে হাতছাড়া করলো কেন তারা?”

“শি ওয়জ রেইপড।” অন্যদিকে তাকিয়ে বলে সৈকত, “কেমিস্ট্রি টিচারের বাসাতে যেত ইভা। প্রাইভেট পড়তে। মানুষরূপী পশু ছিলো ওই লোক। সেদিন বৃষ্টিতে ইভা একাকী পৌঁছেছিলো হারামজাদার বাসায়, সুযোগ পেয়ে ছেড়ে দেয়নি বাস্টার্ডটা! ইভা কিছু বলেনি আমাকে। ডায়েরিতে টুকে রেখেছিলো ওই অভিজ্ঞতা। পৃষ্ঠাগুলো আমি দেখেছি-ভিজে গিয়ে শুকোলে যেমনটা হয় তেমন। মেয়েটি কেন কেঁদেছিলো জানেন? নিজের জন্য না। লুসিফারের জন্য।”

“ওকে আর উৎসর্গ করা হবে না, সেজন্য?”

“এক্স্যাক্টলি। নিশ্চয় চক্রে ব্যাপারটা জানিয়েছে তারা। আর আপনি নিয়মটা জানেন।”

“অ্যা ডায়মন্ড ইজ অনলি ফর হিম,” বিড় বিড় করে বলে ইরফান, “এই ‘হিম’টার এইচ থাকে ক্যাপিটাল লেটারে-জানা আছে তার। কুমারি মেয়ে চাই প্রভু শয়তানের। কাউকে নির্বাচন করার পর কুমারিত্ব হারালে তাকে হত্যা করা হয়। যেন নির্বাচিত মেয়েটি আর কোন পুরুষের সঙ্গে থাকতে না পারে। চক্রের আইন-কানুন খুবই কড়া, যে ছেলেটি কুমারিত্ব ধ্বংসের জন্য দায়ি, তাকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

“কাজেই প্রতিশোধ নিতে পথে নেমেছি আমি। এটাই আমার গল্প।”

“আমি দুঃখিত।” মন থেকে বলল ইরফান, “কেমিস্ট্রি টিচারের কি হলো? চক্র এসব ক্ষেত্রে খুবই স্ট্রিকট।”

“ছাদ থেকে পা পিছলে পড়ে গেছে বেচারি,” ঠাণ্ডা গলায় বলে সৈকত।

“আর যে বান্ধবির পাল্লায় পড়ে চক্রে যোগ দিয়েছিলো ও-”



“বান্ধবিটির গলা কে জানি কামড়ে আলাদা করে ফেলেছে। বাকি আছে লজের হেড-যার কলমের খোঁচায় মৃত্যুদন্ডের আদেশটুকু বের হয়েছিলো। আর অসপেক্ষ-যার প্রফেসি সফল করার জন্য মরতে হলো ইভাকে, মারা যাবে ঈশিতাও। এই বুড়ো হারামজাদা ওসব ঘোষণা না করলে ক্রো-মেসন শাখা চালু করার দরকারই পড়তো না!”

“অসপেক্ষকে এজন্যই খুঁজে বের করেছিলেন?”

মাথা দোলায় সৈকত।

“ফাইন, আপনি খুঁজছেন লজের হেডকে, আমি খুঁজছি লজটা। পথ একই বলতে হবে।” পিস্তলটা সরিয়ে ফেলে ইরফান, “নতুন ডায়মন্ড নিয়ে ওরা এত সতর্ক কেন এখন বুঝলাম। ইভার পরিণতি নতুন ডায়মন্ডের হোক-সেটা চায় না। লগ্ন পেরিয়ে যাবে যে! তবে সেরাতে ঈশিতাকে লজে নিয়ে আসতেই হবে ওদের।”

“ঈশিতা ওদের নিউ ডায়মন্ড,” মন্তব্য করার ধাঁচে বলল সৈকত।

মাথা নাড়লো ইরফান, স্টার্ট দিয়েছে ইঞ্জিন। সৈকতের বলার ভঙ্গিটা বিশ্বাসযোগ্য। তবে মেসনদের হয়ে সে কাজ করছে কি না বোঝার একটাই উপায়। সাথে করে বিজয়ের কাছে নিয়ে যেতে হবে তাকে। সতর্ক থাকতে হবে আজ রাতে।

“রিচুয়ালের রাতে লজে গিয়ে কি করতে চাইছেন? ভাল একটা প্ল্যান আপনার লাগবে। সে-রাতে অনেক কড়াকড়ি থাকবে। লজের হেডরা থাকবে সেখানে। থাকবে ওদের গ্র্যান্ড।”

“ফাক দেম। আমি যে কাজে দক্ষ, তাই করতে যাচ্ছি সে-রাতে।”

অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে গাড়ি ছোটাল ইরফান। লজ থেকে নিজের বোনকে কিডন্যাপ করার প্ল্যানটা সৈকতকে খুলে বলতে চায় না।

মিরপুরের তিনতলা বাড়িটার সামনে থেমে গেলো ওদের গাড়ি। সন্দের চোখে বাড়িটির দিকে তাকিয়ে থাকে সৈকত। বিনাধিধায় নেমে এসেছে ইরফান। সৈকতের নড়াচড়ার লক্ষণ না দেখে তাগাদা দেয়, “নামুন।”

ধীরে ধীরে দরজা খুলে নামলো সৈকত। সাবধানেই লাগালো দরজা। “এখানে আপনি রেখেছেন ছেলেটাকে?”

“হঁ। দ্য সিলেক্টেডের জন্য খুবই সামান্য হয়ে গেলো, তাই না?” শয়তানি হাসিতে ভরে যায় ইরফানের মুখ।

“ব্যাটাকে নাগালে পেলেন কিভাবে? তার পরিচয় কেউ জানতো না।”

অসপেক্ষের ভবিষ্যৎবাণী মনে পড়ে গেলো ওর। এমন একজন আসবেন, পুরো ভারতবর্ষকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন তিনি। আসবেন এক কিশোরের রূপ নিয়ে, মহাপ্রভুকে ভেতরে ধারণ করে আসবেন তিনি। তার হাতেই সঁপে দেওয়া হবে নিম্নভূমির দায়িত্ব। নিম্নভূমি বলতে দক্ষিণ এশিয়াকে বোঝানো হয়েছিলো।

“ঈশিতাকে চক্রে জুটিয়েছিলো হারামজাদা,” ব্যাখ্যা দিল ইরফান, “পিকনিক স্পটে প্রথম দেখা, ছেলেটার প্রেমে পড়ে যায় আমার বোন। ডায়েরি থেকে গুরু করে ফেসবুক নোটে তাকে নিয়েই কবিতা লিখেছে সে। বেশি প্রচ্ছন্ন হয়ে গেছে কবিতাগুলো, ভাবার্থ বের করতে আমার খুব বেগ পেতে হয়নি। হারামজাদার সাথে মেশার কিছুদিনের মধ্যেই চক্রের একজন পুরোদস্তুর সদস্যা হয়ে গেছিলো সে। খুব সহজে বিজয়কে খুঁজে বের করেছি এভাবে। কিন্তু জানতাম না তার প্রকৃত গুরুত্ব।”

“ও ব্যাটাই সিলেক্টেড ওয়ান, সেটা জানলেন কখন?”

“ওকে কিডন্যাপ করার পর থেকে যখন আমার নামে হুন্ডিয়া জারি করলো ওরা। তারপর যখন বুলেটগুলো আমার মাথা বা বুকের ধারে কাছেও আসছিলো না, তখন। সামান্য একজন ফ্রি মেনসনের জন্য এত দরদ থাকার তো কথা ছিলো না, তাই না? জেনে অবাক হবেন, ওদের লজ-সেক্টরের চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে আজ সকালে নির্দিধায় মেরে ফেলেছে নিজেরাই। বিজয়ের তুলনায় তার জীবনের গুরুত্ব পর্যাপ্ত দেয়নি ওরা। বুঝলাম, ছোকরার আলাদা গুরুত্ব আছে।”

“বয়সের বিচারে তার ফ্রি মেনসন হওয়ারই কথা না। আত্মরক্ষার কম সে।” সিঁড়ি ঘরে পৌঁছে বলে সৈকত, মাথা তুলে পেঁচিয়ে ওঠা সিঁড়িটা দেখলো।

“এটা একটা খটকা লাগার মতো বিষয়। ওরা এইজ ফ্যাক্টরকে অগ্রাহ্য করছে।” বিড় বিড় করে বলে ইরফান, “সিলেক্টেডের কথা আলাদা। কিন্তু আপনার বোন বা তার ক্লাসমেটের জন্য বিষয়টা কেমন যেন হয়ে গেলো না? ইভা অথবা ক্রিশ্চিনা—তারা কিন্তু আন্ডার এইটিন ছিলো।”

“ওরা তো ঠিক ফ্রি মেসনারির মধ্যে পড়ে না। ক্রো-মেসন ছিলো দু-জনই। তাছাড়া ডায়মন্ড হওয়ার জন্য সাবালিকা হওয়াই যথেষ্ট।”

পকেট থেকে চাবি বের করে ফেলেছে ইরফান। হুড়কোতে তালা দিয়ে রাখা হয়েছে এখানে। বিজয়কে কয়েক ঘণ্টা আগে শেষ দেখে গেছিলো। এই ছেলে যতক্ষণ হাতে আছে ততক্ষণ ট্রাম্প কার্ড ওদের হাতে।

এক ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে ভেতরে পা রাখলো ওরা। গট গট করে হেটে চললো ইরফান, লক্ষ্য বেডরুম। একেবারে শেষ প্রান্তের ঘর ওটা। বিজয়কে করার মতো বেশ কিছু প্রশ্ন আছে ওর। পাশাপাশি বিজয়ের সঙ্গে সৈকতের প্রতিক্রিয়া দেখে তাদের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে। লোকটাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে হলেও শতভাগ নিশ্চিত হওয়া বলে একটা কথা থাকে।

অসপেক্ষকে হাতে পেয়ে যাওয়াতে সুবিধে হয়েছে। গ্র্যান্ড লজের লোকেশন এই বুড়ো থেকে জোর করে হোক আর স্বাভাবিকভাবে-বের করে আনতে পারবে বলে ইরফান আশা করছে। ঈশিতাকে খুঁজের বের করতে হলে একমাত্র উপায় এই গ্র্যান্ড লজের লোকেশন জানা।

শয়তানের কাছে উৎসর্গ করা হবে মেয়েটাকে। আর সেজন্য নিজেই নিজেকে বিলিয়ে দিতে চাইছে ও-এদের বলা হয় ডায়মন্ড। আর একজন ডায়মন্ডকে অবশ্যই হতে হবে কুমারি। প্রথম ডায়মন্ডের কুমারিত্ব ভেঙে যাওয়াতে চক্রের লোকেরা অতিমাত্রায় সাবধান হয়ে গেছে। দ্বিতীয় ডায়মন্ডকে হারাতে চায় না।

নিজেদের প্রটেকশনে তুলে রেখেছে ঈশিতাকে। প্রতিদিনই তার লোকেশন পাণ্টানো হচ্ছে। সরাসরি রিচুয়ালের দিন লজে হামলে পড়তে না পারলে চিরতরে হারাতে হবে তাকে।

বেডরুমের দরজার সামনে এসে ফিরে তাকালো ইরফান, “এদিকে চলে আসুন। এই ঘরেই আছে ও।”

পিছিয়ে পড়েছে সৈকত। ঘুরে ফিরে বাসার অন্য রুমগুলোতে সাবধানে চোখ বোলাচ্ছে সে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে দরজা খুলে ফেলে থমকে গেলো ইরফান। বিছানাটা খালি। কেউ নেই ওখানে। শূন্যে দুলছে হ্যান্ডকাফ দুটো!

“বিজয়!” হুঙ্কার ছেড়ে ডাকে ইরফান, পিস্তলটা বের হয়ে এসেছে তাকে। এই বাসা থেকে দরজা ছাড়া বের হওয়ার কোন উপায় নেই। অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরেই আছে ছেলেটা। “মি. সৈকত, সাবধান।”

হিস হিস জাতীয় একধরনের শব্দের সাথে যন্ত্রণাকাতর চিৎকারটা গুনে চট করে ঘুরল ও। পেছনের ঘর থেকে আসছে শব্দটা। ছিটকে মাফিয়ার বেড থেকে বের হতেই মেইনগেটটা লেগে যেতে দেখলো, এইমাত্র বাইরে থেকে এসেছে গেলো কিশোর দুটো পা। মাঝের ঘর থেকে আসছে অমানবিক চিৎকার।

সৈকতের গলা!

দু-দিকে একবার করে তাকিয়ে দ্বিধাবিহীন হয়ে যায় ইরফান। তারপরই সম্বিত

ফিরে পেয়ে ছুটল দরজার দিকে। একবার ছেলেটাকে হারালে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না কখনই। দরজার কাছেও পৌঁছতে পারেনি—বাইরে থেকে হড়কো তুলে দেওয়ার শব্দ শুনতে পেল পরিস্কার!

বিকট শব্দে যখন সদর দরজাতে আছড়ে পড়ল, বুঝতে পারে বাইরে থেকে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে ওটা। ঘরের ভেতরে আটকে রেখে বের হয়ে গেছে বিজয়!

মাঝের ঘরে দ্রুত ফিরে এলো ইরফান—অন্ধকার! দেওয়াল হাতড়ে সুইচবোর্ড খুঁজে নিল। সুইচ চাপতে বীভৎস দৃশ্যটি দেখতে পেল পরিস্কার! ঘরে ঠিক মাঝখানে শুয়ে আছে সৈকত। থেকে থেকে মুচড়ে উঠছে ওর শরীর। মাংস পোড়া গন্ধে ভরে আছে ঘর।

গলা আর বুকের কিছু অংশ পুড়ে গলে গেছে—ওখান থেকে ধীরে ধীরে থকথকে রক্ত বের হয়ে আসছে। আর জন্মের মত গলা ফাটিয়ে চোঁচাচ্ছে ছেলেটা। শব্দন্ত বের হয়ে এসেছে মুখ থেকে, চিকণ জিহ্বাটা দেখতে পাচ্ছে ইরফান। একপাশে পড়ে থাকা গরম ইঞ্জিটা দেখে মাথা নাড়ে হতাশায়।

বিজয় নিজেকে কিভাবে মুক্ত করেছে ও জানে না—তবে পুরোটা সময় ঠাণ্ডা মাথাতে কাজ করেছে ছেলেটা। জানতো ফিরে আসবে ইরফান—তারপর ওকে খুঁজে বের করবে। তাই আগে নিজের পালানোর পরিকল্পনাটা করে রেখেছে। এই ঘরে ঢুকে ইঞ্জিটা দেখেই নিশ্চয় প্ল্যানটা করে ফেলেছিলো। ওটাকে গরম করতে দিয়ে অপেক্ষা করেছে। সাথে সৈকত ছিলো বলে বেঁচে গেছে সে। নতুবা খোঁজার এক পর্যায়ে ইরফানই ঢুকতো এখানে, ছাঁকাটাও তার মুখে এসে পড়তো!

“ওহ্ গড! আমি মরে যাচ্ছি! আমাকে বাঁচান! প্লিজ! মি. ইরফান!” চোঁচাতে থাকা লোকটার দাঁতে দাঁত পিষে বলা এ কথা কয়টার মানেই শুধু বের করতে পারলো।

হঠাৎই বাস্তবে ফিরে এল ও। সৈকতের দিকে একবারও না তাকিয়ে বের হয়ে আসলো ঘরটা থেকে। ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে মাথায়। বিজয় বের হয়ে বেশি দেরি করবে না। চক্রের সাথে যোগাযোগ করবে সে, এটা শুধু সময়ের ব্যাপার এখন। তারপর তাদের হাফ ডজন খুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে এই বাসার ওপর। এর মাঝেই বের হয়ে আসতে হবে ওকে। দরজার কথা ভেবে লাভ নেই—অসম্ভব শব্দ ফাটের দরজা, ভাঙার কোন উপায় নেই।

বারান্দায় রাখা এক্সেপ রুটটার দিকে এগিয়ে যায় ও।

ইরফান যে পেশায় আছে, তাতে যে কোন সময় তার অবস্থান ফাঁস হয়ে যেতে পারে, যেকোন মুহূর্তে পালানোর প্রয়োজন হতে পারে। প্রতিটি হাইড-আউটে, এমনকি তার ভিক্টিমকে রাখার জন্য যে ফ্ল্যাটগুলো ও ভাড়া করে, বাসা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে একটা নিখুঁত এক্সেপ রুট থাকাটা বাধ্যতামূলক।

এ বাসাটিতেও সেটা আছে। বারান্দাগুলোর ঘিলের মাঝে ছোট্ট একটা জানালা। নিজ হাতে তালি দিয়ে রেখেছে সেখানে। একটা দড়ি বেঁধে অনায়াসে নেমে যাওয়া

সম্ভব। সে মাপের দড়িও আগে থেকেই বেডরুমে রাখা আছে। ওটা বের করে দ্রুত বারান্দার গ্রীলের সাথে লাগিয়ে ফেললো। তারপর দড়িটা নিচের দিকে ছেড়ে দিল।

পকেট থেকে চাবি বের করে ঘিলের জানালাতে লাগানো ছোট তালাটা যখন খুলছে, খেয়াল করলো সামান্য কাঁপছে হাত। বিজয় ওদের জানিয়ে দেওয়ার পর কতক্ষণ পাওয়া যাবে? পনের মিনিট? আধঘণ্টা? না একঘণ্টা?

জানে না ও।

চক্র গোটা বাংলাদেশে ছড়িয়ে আছে। এতদিন একাকি ওদের সাথে লড়েছে ইরফান, টিকে গেছে তারপরও। এলিমেন্ট অব সারপ্রাইজ ছিলো। নিজের নামকরণ সার্থক রেখেছিলো এতদিন। ভুতের মতোই অতর্কিতে আক্রমণ করে অর্জন করেছিলো সফলতা। ওর অবস্থান কেউ জানতো না। আজ পরিস্থিতি পাল্টে গেছে।

পেছন থেকে মরণ চিৎকার শোনা যাচ্ছে—চৌচিৎ বাড়ি মাথায় তুলে ফেলছে সৈকত। যে ক্ষত দেখে এসেছে ইরফান, মেডিকেল অ্যাটেনশন সময়মত না পেলে মৃত্যুও হতে পারে লোকটার। তাকে এই ছোট জানালা দিয়ে বের করার কোন উপায় নেই। চিৎকারে কান না দিয়ে দড়ি ধরে সর সর করে নেমে আসে নিচে।

বাড়ির পেছনদিক এটা। ছয়ফিট চওড়া একটা রাস্তা আছে। তারপর পরের বাড়িটার পেছন দিকের দেওয়াল। মাঝের এই জায়গাটুকু সুয়ারেজ সিস্টেমের জন্য রাখা হয়েছে। ধপ করে জুতোজোড়া ওখানে ঠেকাতে যা দেরি, উর্ধ্বশ্বাসে ছোট্ট ইরফান।

শিক দিয়ে ড্রেনের অংশটা আড়াল করে রাখা হয়েছে—ওটা টপকে এপাশে চলে আসে ও। তারপর বিল্ডিংটা ঘুরে সামনের দিকে ফিরে আসল আবার। একটু আগে এখানে গাড়ি পার্ক করে ভেতরে ঢুকেছিলো ওরা।

এই মুহূর্তে গাড়িটা উধাও। কোথাও দেখা যাচ্ছে না ওটাকে। কাজটা কার তা বোঝার জন্য জোতিষ্য হওয়া লাগে না। মাত্র পনের বছরের একটা ছেলে হট-ওয়্যার করে একটা আস্ত গাড়ি নিয়ে কেটে পড়েছে! বিশ্বাস হতে চায় না ওর। ধরে নেওয়া যায়, হাতে বিশ মিনিটেরও কম সময় পাবে। তারপরই চক্রের প্রতিটি 'সৈন্য' ঝাঁপিয়ে পড়বে ওদের ওপর।

সিঁড়িঘরের ধাপগুলো ঝড়ের বেগে পার হলো ইরফান। বাইরে থেকে হড়কো তুলে দেওয়া দরজার সামনে এসে একমুহূর্তও সময় নষ্ট না করে খুলে ফেললো ওটা। ভেতরে সৈকতের গলা মিইয়ে এসেছে। জ্ঞান হারাচ্ছে সম্ভবত। দু-হাত ধরে তাকে টেনে তোলে ও, একহাত নিজের কাঁধে জড়িয়ে ধরে হাটানোর চেষ্টা করছে।

“প্লিজ, পা ফেলার চেষ্টা করুন। জেগে থাকার চেষ্টা করতে থাকুন,” তাগাদা দেয় ইরফান ওকে।

চোখ বুজে ফেলেছে সৈকত প্রায়, টেনে হিঁচড়ে ওকে বের করে আনে ইরফান। টানাটানির এক ফাঁকে পাতলা একটা ছুরি মেঝেতে পড়ে গেছে সেটা ওদের কেউই খেয়াল করলো না।

দোতলায় এসে ঘন ঘন কলিং বেল দেয় ও, এখন আর লুকোছাপার সময় নেই। এত রাতে বের হয়ে কোন ক্লিনিকে নিতে গেলে বাঁচবে না সৈকত। চক্রের বন্ধুরা আগেই নিকেশ করে দেবে ওদের। গাড়িটা থাকলে চেষ্টা করতে পারতো ও। সেটাও নেই।

ঘুম ঘুম চোখে দরজা খুলে দিল বাড়িওয়ালা, তারপরই চোখ কপালে উঠে যায় সাধাসিধে মানুষটার, “ভাইজান, এইটা কে?”

“আমার গেস্ট। ইন্ডিতে অ্যাকসিডেন্ট করেছেন। হাসপাতালে নেওয়া দরকার। ইমিডিয়েটলি। আপনি গাড়ি বের করুন।”

লুঙ্গি পরেই ভেতরের দিকে ছোটেন ভদ্রলোক। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রচুর টাকা পয়সার মালিক। পোষা ড্রাইভার থাকে গ্যারেজের পাশে ছোট একটা রুমে। নেহায়েত সরল সোজা একজন মানুষ দেখেই এই বাসাটা ভাড়া করেছিলো ইরফান। অনেক দিন হয়ে গেলো। টেম্পোরারি হাইড-আউটটাই প্রাইমারি হয়ে গেছিলো একরকম।

নিচে সৈকতকে নিয়ে এসে গাড়ির পাশে বসিয়ে দিল ও। বাড়িওয়ালার গাড়িটা খুব সুবিধের জিনিস না। তবে কাজ চলবে। এটা নিয়েই কেটে পড়তে পারতো, কিন্তু গ্যারাজে এখন তালা মারা। ওটা খোলার সময় পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না ওর।

বাইরে থেকে একাধিক ইঞ্জিনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। চকিতে ওদিকে ফিরে তাকায় ইরফান। তারপর আশ্ত করে শুইয়ে দেয় সৈকতকে। মানুষটা জ্ঞান হারিয়েছে। বাইরে কারা এসেছে সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন ও। গ্যারেজের ছোট দরজাটা টপকে বের হয়ে এলো ইরফান।

বাড়িওয়ালা নেমে এসে ড্রাইভারকে হাঁকডাক করে তুলে খেয়াল করলেন মরণদশার ‘গেস্ট’কে ফেলে রেখে কোথায় জানি চলে গেছে ভাড়াটে।

ছয়টা মোটরসাইকেল গুণতে পারলো ইরফান।

ভাড়া করা বাসাটা যে বিল্ডিংয়ের অংশ, সেটা রাস্তার একেবারে কোণে। সামনে আর বাম পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। ইচ্ছে করেই এমন বাসা বাছাই করেছিলো ইরফান—যাতে পালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কয়েকটা পথ খোলা থাকে।

দু-পাশে বিল্ডিং থাকলে বদ্ধ ইঁদুরের মতো অবস্থা হতে পারে—এই ব্যাপারে নিজের বর্তমান পেশাতে নামার আগে থেকেই জানে ও। বিল্ডিংয়ের পাশের বাসাটা একটা টিনশেড। বের হয়ে এটার ওপর হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে এসেছে ইরফান। এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওদের। দুটো মোটরসাইকেল এসেছে গলির অন্যপাশ থেকে। বিল্ডিংয়ের বামপাশ দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তাটাতে এসে মিলেছে এই গলি। তবে তিনটি পথের মিলন মেলার তিনপাশ থেকেই দুটো করে মোটরসাইকেলে করে এসেছে আততায়ীরা। নজর বিল্ডিংয়ের দিকে। তারা জানে, ভেতরে হড়কো আটকে বন্দি হয়ে আছে দু-জন। পাশের টিনশেডের চাল থেকে কেউ দেখছে এটা টের পায়নি এখনও।

ওদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। ইরফানকে হত্যা করতে চায় তারা, সেই সাথে সৈকতকেও। বিজয় ছেলেটা নিঃসন্দেহে দু-জনের ব্যাপারেই জানিয়ে দিয়েছে তাদের। ওদের মেরে ফেলার জন্য ‘চক্র’-এর ব্যস্ত হয়ে পড়া স্বাভাবিক। গত একশ’ বছরের মাঝে এই প্রথম কেউ তাদের বিরুদ্ধে নেমেছে এবং সত্যিকারের ক্ষতি করতে পেরেছে। ওদের ঠেকাতে না পারলে এ দেশে কার্যক্রম এগিয়ে নিতে পারবে না।

ইরফান চায় তারা এগিয়ে নিতে না পারুক। কিন্তু এই মুহূর্তে নিজেকে নিয়ে ভাবছে না শুধু সৈকত বাসার গ্যারাজেই আছে। অদ্ভুত ছেলেটা ভ্যাম্পায়ারদের মতো কেন বা কিভাবে—সেটা একটা বড় প্রশ্ন। তবে সাধারণ মানুষের মতোই তার ক্ষতি করা যায়, এই তথ্যটা ওর জানা হয়ে গেছে। চক্রের ওরাও এতক্ষণে জেনে গেছে। বিল্ডিং থেকে বের হয়ে এসেছে ইরফান, রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দেওয়া তার জন্য কোন ব্যাপার হওয়ার কথা না। কিন্তু তাতে করে সৈকতের বাঁচার সামান্যতম সম্ভাবনা থাকবে না।

ষষ্ঠ মোটরসাইকেলটাও থেমে গেলো বাসাটার সামনে। বাড়ির পেছনের দিকে অস্তিত্ব তিনজন ছুটে গেলো। ইরফান একাধিক এক্সপ্লোজিভিভ রাখতে পারে, এরা আগেই অনুমান করে ফেলেছে। সামনে দিয়ে ঢোকান আগে পেছনে তিনজনকে পাঠিয়ে দিয়েছে এজন্য।

অন্য তিনজনের দু-জনকে গলির দুই মুখে পজিশন নিতে দেখে ও। একজন এখানেই থেকে গেলো। অন্যজন বাইক ছোটালো গলির অন্যপ্রান্তে। বিল্ডিংয়ের সামনে থাকা একমাত্র মোটরসাইকেল আরোহি কলারের কাছ থেকে ছোট একটা মাউথপিস বের করে কথা বলছে।

নিঃসন্দেহে ঢুকতে চাইছে ভেতরে। আর সেজন্য সাথে আরেকজন সঙ্গিকে চাচ্ছে—একে অন্যের ব্যাকআপ দিতে পারবে তারা।

টিনশেডের ওপর থেকে ভুতের মতো নেমে আসল ইরফান। ছোকড়ার পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করতে দেওয়া যাবে না।

হেলমেট পরে থাকা মাথাটারও অরক্ষিত এলাকা আছে। পেছনে হেলমেট যেখানে শেষ—সেখানে ঘাড়ের মাঝে পিস্তলের বাট দিয়ে মাপমত একবার আঘাত করলো ইরফান। টু শব্দ না করে জ্ঞান হারিয়েছে ছেলেটা, ঢলে পড়ে যাচ্ছে ইরফানের শরীরে। ডানহাতে পড়ন্ত শরীরটা চেপে ধরে বামহাত বাড়িয়ে অজ্ঞান মানুষটার কোমরের কাছে গুঁজে রাখা পিস্তলটা টান দিয়ে বের করে আনলো ইরফান। স্পর্শ করেই বুঝতে পারে ও, এটা একটা কেল-টেক পিএফ-০৯। শেষ মাথায় লেগে থাকা সাইলেন্সারটা দেখে মনটা খুশি হয়ে যায় ওর। ঘাড় মটকাতে এবং হাত সাফাই করতে সব মিলিয়ে ওর লেগেছে এক সেকেন্ডের পাঁচ ভাগের একভাগ!

ইরফানের হাত সাফাই দেখেও জায়গাতে দাঁড়িয়ে নেই গলির এ মাথার চক্র-সদস্য। দ্রুত বেগে নিজের অস্ত্রটা কোমর থেকে বের করছে মানুষটা, একই সাথে নেমে এসেছে মোটরসাইকেল থেকে, তবে খোলা জায়গাতে এভাবে ইরফানকে দেখার আশা করেনি সে। কিছুটা পিছিয়ে গেলো প্রতিক্রিয়া দেখাতে গিয়ে। তার দিকে একটা মাত্র গুলি খরচ করে ইরফান। বুলেটটা তাকে লাগলো না, ঠং-জাতীয় একটা শব্দ করলো মোটরসাইকেলে লেগে। ঝাঁপিয়ে কোণের বাড়ির দেয়ালের আড়ালে চলে যায় লোকটা। ঝড়ের বেগে বাইকে উঠে পড়ে ইরফান এই ফাঁকে—গলির অন্যপ্রান্তে ছুটিয়েছে মোটরসাইকেল। পেছনে এই মাত্র গা বাঁচাতে লুকিয়ে পড়া মানুষটা চাপা গলাতে দুনিয়ার নোংরাতম গালিগুলো বর্ষণ করে যাচ্ছে—কর্ণপাত না করে ছুটতে থাকে ও। জানে, নিজেদের মাঝে কমিউনিকেশন রাখার ফলে এতক্ষণে রাস্তার অন্য প্রান্তে গুঁত পেতে থাকা মানুষটা ওর জন্যই অপেক্ষা করছে।

চমৎকার একটা ইউক্যালিপটাস দেখা যাচ্ছে এখান থেকেই। কেন জানি এর ওপর পরিবেশ সচেতনদের হামলা পড়েনি। ঢাকাতে গলির ভেতর ইউক্যালিপটাস গাছ থাকাও ভাগ্যের ব্যাপার। এই গলিবাসিরা সেই ভাগ্য পেয়েছে।

এই মুহূর্তে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা বাইকারের ভাগ্যটা ততটা প্রশস্ত হলো না—গলি থেকে মাঝারি রাস্তায় ওঠার আগমুহূর্তে তাকে ঝড়ের বেগে পাশ কাটিয়েছে ইরফান, বাম উরুতে হ্যাঁচকা টান অনুভব করেছে। একইসাথে চারবার গুলি ছুঁড়েছে প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করে। মানুষটাকে বাইক থেকে ছিটকে পেছনে পড়ে যেতে দেখে অন্তরের অন্তস্থলে কোথাও গভির শান্তি অনুভব করে ও। হাত থেকে ফেলে দিল কেল-টেক। দুই হাতে আঁকড়ে ধরেছে হ্যান্ডেল।

পাশের গলি থেকে হুস্কার ছেড়ে বাইক তিনটা উঠে আসতে যাচ্ছে—এরা বাড়ির পেছনের দিকে টহল দিতে গেছিলো। মিররে একবার তাদের দেখে বাইক ছোট্টোতে মন দেয় ও। উরুর কাছে জ্বলুনি হচ্ছে। বুলেটটা সম্ভবত মাংস ছুঁয়ে বেরিয়ে



গেছে—আশা করে ও। এর চেয়ে বেশি কিছু হলে রক্তক্ষণেই দুর্বল হয়ে পড়বে। আধঘণ্টা টিকলে চলবে না ওর। সময়টা পিছনে লেগে থাকা 'ভক্তবৃন্দ'কে হতাশ করার জন্য যথেষ্ট না।

বেশ পেছনে লাফিয়ে বের হয়ে আসে অবশিষ্ট বাইকার—এইমাত্র ওই গলি থেকে বের হয়েছে ইরফান। পেছনে চারজনকেই দেখতে পেয়ে সম্ভ্রমের হাসি ফোটে ওর মুখে। আপাতত সৈকতের দিকে কারও মনোযোগ নেই। বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক বের হয়ে যেতে পারবেন নির্বিঘ্নে—আশা করলো ও।

ফুলস্পিডে বাইক ছুটিয়েও সুবিধে করা গেলো না, একই ক্যাটাগরির প্রতিটি বাইক। পেছনের ওরা সমান তালে লেগে রয়েছে। একের পর এক গলিতে ঢুকে অন্যপাশ দিয়ে বের হয়ে আসে ইরফান। ধাওয়ারত শত্রুকে গুলি করার মতো যথেষ্ট রিঅ্যাকশন টাইম দিতে নারাজ। সে চেষ্টাও করলো না ওরা। শুধু আঁঠার মতো লেগে আছে। জানে, শত্রুকে একটা সময় কোনঠাসা করে ফেলতে পারবে, অথবা পাবে গুলি করে ফেলে দেওয়ার মতো একটা উইন্ডো।

অবশেষে সামনে নতুন কোন গলি পড়ল না আর। বুলেটের মতো ছিটকে বড় রাস্তাতে বের হয়ে আসলো। ডিভাইডার পার হয়ে কোনরকম দ্বিধা ছাড়াই ডান দিকে মোড় নিলো। ওদের গুলি রেঞ্জে আসতে দেওয়ার আগেই সামনের গোলচত্বরটা পেরিয়ে যেতে হবে। সনি সিনেমা হলের সামনের মোড়টা ঘুরে জনতা হাউজিংয়ের ভেতরে সঁধিয়ে যায় নির্দিধায়। পেছনে বার দুই ভোঁতা শব্দ শুনেছে বলে মনে হলো, তবে পান্ডা দেয় না।

বাইকের গর্জনের বিরাম নেই, পরের মোড়ে ঢুকে যাওয়ার সময় এই গলিতেও ঢুকে পড়তে দেখে। হেডলাইটের সংখ্যা এখনও চার! বাধ্য হয়েই এবার তুলনামূলক লম্বা পথ বেছে নিল ইরফান। ছুটে আসা আলোগুলোর ফোকাস একসাথে ওর ওপর পড়েছে—ভোঁতা শব্দগুলো আবার টের পাওয়া যাচ্ছে—সাইলেন্সড গানের শব্দ। তার একটু আগেই সাপের মতো গতি বেছে নিয়েছে ইরফান—আশ পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায় বুলেটগুলো। আর পঞ্চাশ ফুট দূরে আরেকটা বাঁক, ঝুঁকি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো ও, মরিয়া হয়ে উঠেছে। একহাতে হ্যান্ডেল ধরে রেখে শরীরের ওপরের অর্ধেকটা বাইকের ওপরই ঘুরিয়ে ফেলেছে। হাতে বের হয়ে এসেছে বিশুদ্ধ গ্রু-২৩, কোনমতে লক্ষ্যস্থির করেই গুলি করলো ও। রাতের নিস্তব্ধতার মাঝে কামানের গোলাবর্ষার মত শব্দ হলো। এলাকা কেঁপে গেছে।

ছুটন্ত গতি নিয়েই একজন বাইকাউকে রাস্তার পাশে ঝুঁকি খেয়ে গুয়ে পড়তে দেখে ও, পরের গুলিটা আবারও কাঁপিয়ে দিয়েছে এলাকা, আতঙ্কিত পেছনের বাইকার বুলেট এড়ানোর ভয়ে রাস্তার আরও ধারে ঘেঁষে যাচ্ছিলো—পড়ে থাকা সঙ্গির বাইকে বাইক বাঁধিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেলো। দ্রুত সোজা হলো ইরফান, নিজের বাইকের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করলো, পেছনের ভোঁতা শব্দটা আরও একবার শোনা গেছে তখন।

কোমরে তখনও পিস্তলটা ঢুকিয়ে রাখতে পারেনি—হাত থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়ে যায় ওটা। ডান কাঁধে প্রচণ্ড ধাক্কা লেগেছে একটা, সেটার ফলাফল। আরেকটু হলে বাইকসহ মোড়েই বিদ্ধ হতে যাচ্ছিলো। শেষ মুহূর্তে শুধু বাম হাতের সহায়তায় মোড় কোনমতে বের হয়ে গেলো। আরেকবার পরীক্ষা করে দেখলো—ডান হাত সাড়া দিচ্ছে না। পিঠ বেয়ে নেমে আসছে আঠালো গরম তরল—গুলি লেগেছে ওখানে!

তীব্র একটা ভয়ের অনুভূতি খামচে ধরে ওকে চারপাশ থেকে। অত্যাধিক রক্তক্ষরণের ভয়! সেই সাথে একমাত্র অস্ত্রটা হাতছাড়া হয়ে যাওয়াতে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হয়ে পড়েছে ও!

পরক্ষণেই নিজেকে কষে ধমক দিল কয়েকবার। মানসিক পরাজয় হলে শারীরিক পরাজয় হতে দশ মিনিটও লাগবে না। সাহস দেওয়ার চেষ্টা করলো নিজেকে—মণিপুর এলাকাতে চুকে গেছে ও, অসংখ্য ছোট ছোট গলি আছে এখানে আর আছে অসংখ্য গোলকধাঁধা। তিন বছর আগে রাফায়েত নামে ভার্শিটি পড়ুয়া ছেলেটিকে ক্লায়েন্টের অর্ডারে এখান থেকেই কিডন্যাপ করতে হয়েছিলো। কাজটা কঠিন ছিলো। সেজন্যই ভালোমত রেকি করতে হয়েছিলো জায়গাটা। হাতের উল্টোপিঠের মতোই চেনে ও এখন রাস্তাগুলো।

মোড়ের পর মোড় ঘুরে যায় ঠিকই—পেছনের অবশিষ্ট দুটো হেডলাইট ওকে একা হতে দেয় না। ছায়ার মতোই লেগে আছে তারা। দূরে কোথাও পুলিশের গাড়ির সাইরেন শোনা যাচ্ছে। পেছনে ফেলে আসা এলাকার গোলাগুলির শব্দ ওদের কানে গেছে সন্দেহাতীতভাবে। দ্রুত কেটে পড়তে পারলে ওরা টিকিটিও ছুঁতে পারবে না—বাংলাদেশ পুলিশকে নিয়ে ইরফানের অভিজ্ঞতা সেটাই বলে। তবে আসল সমস্যা হতে চলেছে পেছনের দু-জন।

কাজীপাড়া ভেদ করে বেগম রোকেয়া সরণীতে যখন বেরিয়ে এসেছে—বেশ পেছনে পড়ে গেছে অন্ধভক্ত দু-জন। তবে স্বস্তির কিছু দেখে না ও এতে—কিছুক্ষণের মাঝেই আবারও দৃষ্টিসীমার মধ্যে ফিরে আসবে তারা। এখন একটা বড় রাস্তায় আছে ইরফান, বড় একটা মটরসাইকেল নিয়ে। সেই সাথে রাত বেশ গভির—এসময় ফাঁকা রাস্তাতে ওকে খুঁজে পেতে মোটেও অসুবিধে হবে না তাদের।

সারভাইভাল ইন্সটিংক্টের কথা শুনলো এবার ও। রাস্তা ক্রস করে অন্যপাশে নেমে যায়, কাজীপাড়া রোড ধরে যেদিকে চলেছে ওদিকেই ইব্রাহীমপুর। বড় রাস্তা থেকে যখন নেমে পড়ছে—পাশের ল্যাম্পপোস্টে ছুটন্ত কিছু আঘাত হেনে ঠং জাতীয় শব্দ তোলে। মিররে হেডলাইট দুটোকে বের হয়ে আসতে দেখে ও একই সাথে। এখনও গুলির ওপর আছে দেখা যায়!

ঝড়ের বেগে সামনে এগিয়ে প্রথম মোড়টাতে এসেই থামে নিলো ইরফান। তারপর দ্রুত কমিয়েছে গতি। আঁপটে করে থেমে গেলো মোটরসাইকেলটা। এক পা দিয়ে ঘুরিয়ে নিলো ওটাকে, যেদিক থেকে এসেছে সেদিকেই বাইকের মুখ এখন। জানে শত্রুপক্ষ ওর টেইল লাইট দেখে ধরে নেবে বামে মোড় নিয়েছে ও। ওরা যেটা জানে না, একেবারে মোড়টার কাছেই সেঁটে আছে ইরফান!

তীব্রবেগে ছুটে আসা প্রথম বাইকটা ওকে পাশ কাটিয়ে ষাট ফিট পেছনে চলে যায়। এর পরে বাইকার প্রথমবারের মতো উপলব্ধি করলো, বাইকসহ কাউকে মোড়েই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে সে!

ততক্ষণে দ্বিতীয় বাইকও চলে এসেছে—প্রথমজনের মতোই অন্ধের মতো বাঁক ঘোরে এই মানুষটাও—ধরেই নিয়েছে ইরফান তার আগের গতিবেগেই ছুটে চলেছে! তীব্রবেগে বাঁক নিতে থাকা বাইকারের শরীরটা বাইকসহ এতটাই বাঁকিয়ে গেছে—খুব কাছে চলে আসা মাথাটায় প্রাণের সুখে লাথিটা মারার লোভ ইরফান সামলাতে পারে না।

প্রচণ্ড লাথিটা হজম করে তাল হারিয়েছে দ্বিতীয় বাইকার, রাস্তার যাবতীয় ধূলোবালি উড়িয়ে আছড়ে পড়ল মানুষটা। আহত উরুতে শত শত কাঁচ ঢুকে যাওয়ার অনুভূতি উপেক্ষা করে বাইকারদের ফেলে আসা পথে আবারও বাইক ছোটায় ইরফান। একটু আগে যেখানে ইরফানের মাথাটা ছিলো তার পেছনের দেওয়ালের সুড়কি খসে চলে যায় প্রথম বাইকারের বুলেট।

দমকা হাওয়ার মতো ছুটে গেলো ইরফান, দ্বিগুণ আত্মবিশ্বাসের সাথে। পেছনে একজন মাত্র ধাওয়াকারি—যে অন্তত একশ ফুট পিছিয়ে গেছে—তাকে হারিয়ে দেওয়াটা মোটেও কঠিন হবে না।

কাফরুল! কাফরুল পৌছাতে হবে ওকে!

সামনের রাস্তাটা যেন বিপরীত দিকে ছুটছে—তীব্র গতির কারণে এমনটা মনে হচ্ছে ওর। একমাত্র শত্রু রক্তক্ষরণ। ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি ঘোলা হয়ে আসে ইরফানের। আলোগুলো দূরে সরে যাচ্ছে কেন?

কে জানি ডাকছে অনেক দূর থেকে—রবিন...রবিন...

BanglaBook.org

অ্যাসাইনমেন্টটা অতি জঘন্য। পঞ্চমবারের মতো চেষ্টা করেও মেলাতে পারে না ফারিহা। ল্যাপটপটাকে আছড়ে ফেলতে ইচ্ছে করতে শুরু করেছে ওর। গ্রুপমেটগুলোর দোষ এখানে। তিনজন আছে গ্রুপে—তিনজনই অকর্মার ঢেঁকি। রাত বারোটা বাজার আগেই অফলাইনে সবগুলো।

টেবিলে থাবা দেয় মেয়েটা অস্থির হাতে। একজনও ঘুমাচ্ছে না। ফোন দিয়ে দেখেছে—প্রত্যেকেই ‘বিজি।’ ঠাণ্ডা এই রাতে অস্থির প্রেম করেছে নিশ্চয়? এক ফারিহাকেই কেন ভার্টিসিটি আর ল্যাব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে? অসহ্য!

ষষ্ঠবারের মতো ড্রইংটা শুরু করলো ও। হিসেবে কোথাও ভুল হচ্ছে নিশ্চয়। নাহলে ত্রিমাত্রিক ডিজাইনে একটা সারফেসের সাথে আরেকটা মিলিয়ে যেত না।

পর পর তিনবার কলিং বেল পড়ল এই সময়। ঝট করে দরজার দিকে ঘুরে তাকায় ও। এই বাসাতে ফারিহা ছাড়া কেউ থাকে না।

বাবার মৃত্যুর পর পরিবেশ শান্ত হতে অপেক্ষা করেছিলো ও। তারপর এখানে উঠেছে। ঠিকানা জানার কথা নয় কারও। ভার্টিসিটির বন্ধু-বান্ধবদের সাথেও শেয়ার করেনি ও এর ঠিকানা। করতে পারেনি। ওর জন্য নিরাপদ হতো না কাজটা।

বাড়িওয়ালার আসার সম্ভাবনা নেই, এত রাতে আসবে না কেউই। হাটুর নিচে থাকা কম্পিউটার টেবিলের ছোট ড্রয়ারটা খুলে মাদারবোর্ডের বাক্সটা হাতে নিলো ও। ভেতরে শান্তভাবে শুয়ে আছে লেডি-হকটা। পিস্তলটা মেয়েদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি। অথচ কী ভারি!

আরও কয়েকবার কলিং বেলের শব্দ শোনা যায়। অধৈর্য হাতে বেল বাজাচ্ছে কেউ। অতীতের কেউ কি উঠে এসেছে ওর শান্ত জীবনকে নষ্ট করতে? কাঁপা হাতে পিস্তলটা তুলে ধরে পা টিপে টিপে ও এগিয়ে যায় দরজার দিকে। অনেকদিন পর অস্ত্রের স্পর্শ পেয়েছে তুক, শিহরিত হচ্ছে থেকে থেকে। দরজার পাশের দেওয়ালে তিন সেকেন্ড অপেক্ষা করলো। তারপর সাবধানে হাত বাড়িয়ে খুলে দিল দরজা। একমুহূর্ত পরেই আঁতকে উঠলো ফারিহা।

ঠিক বাইরে বিধ্বস্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ইরফান। খোলা দরজা দিয়ে অবসন্নের মত হেটে যায় কয়েক পা—তারপর হুড়মুড় করে পড়ে গেলো। হঠাৎ ভেসে যাচ্ছে ওর জামাকাপড়।

দৌড়ে এসে ওকে ধরে সোজা করে ফারিহা। একালে তুলে নেয় মাথাটা। লেডি-হক একপাশে রেখে দিয়েছে।

“গুলি খেয়েছো তুমি! হাসপাতালে—”

“ধরা পড়ে যাবো। আপাতত, তোমাকেই ডাক্তার হতে হবে, মিস্ ফারিহা।” বড়

করে শ্বাস নেয় ইরফান, দুর্বলতার শেষ সীমায় এখন, “প্রথমে আমাকে ফার্স্ট এইড কিটটা হাতে দিয়ে যাও। সিঁড়ি ঘরে রক্তের ফোঁটা আছে—প্রতিফোঁটা মুছে আসো।”

অক্ষরে অক্ষরে পালন করলো ফারিহা ইরফানের আদেশ। ইরফানের পরামর্শেই বড় আকারের একটা ফার্স্ট এইড কিট বক্স রেখেছে বাসায়। জরুরি মুহূর্তের জন্য রাখা হয়েছে। ওটা তাকে এনে দিল ফারিহা, প্রচণ্ডভাবে কাঁপছে বুক। টিস্যু নিয়ে সিঁড়িঘরে বের হয়ে প্রতি ফোঁটা রক্তের ট্রেস সরিয়ে ফেলতে শুরু করলো।

ইরফানের কথার যুক্তি বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না ওর। এলাকায় নিশ্চয় কাউকে না বুঝতে দিয়েই চুকেছে সে। রক্ত দেখে কারও মনে হালকা সন্দেহ জন্মালে এককান দুইকান করে শত্রু পক্ষের কানে পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া, পুলিশ আরেক বামেলা।

রক্তের চিহ্ন মুছে ঘরে ফিরে এসে ইরফানকে ড্রইং রুমের মেঝেতে বসে থাকতে দেখা গেলো। ছুরি দিয়ে প্যান্টের বাম পা উরু পর্যন্ত কেটে ফেলেছে। ক্ষতটা দরজা থেকেই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ফারিহা। চমকে উঠলো ও, বেশ গভীরভাবেই কেটেছে। কালচে দেখাচ্ছে ক্ষতটা, আগে থেকে বের হওয়া রক্তের জমাট বাঁধা অংশ রক্তের এমন পরিবর্তন করেছে। নতুন রক্তগুলো লাল রঙের। আরেকটু কাছে এসে বুঝতে পারলো কেটেছে নয়, বুলেট ঘেঁষে গেছে ওখানে। মাংস ছিঁড়ে নিয়ে বের হয়ে গেছে ওটা।

“দরজা লাগিয়ে দাও, হানি। ঘাবড়িও না, গো থ্রু ওউন্ড। বড় কোন শিরা কাটেনি এটা।”

ব্যস্তহাতে দরজাটি লাগিয়ে দেয় ফারিহা, কাছে এগিয়ে আসছে, হাত বাড়ালো ইরফান, “অ্যান্টিসেপ্টিক।”

নিজের হাতেই ঢেলে দেয় ফারিহা, ক্ষততে স্পর্শ করতে চোয়াল শক্ত হয়ে যায় ইরফানের, দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করার চেষ্টা করছে। তারপর ফার্স্ট এইড কিটের বাক্স থেকে বের করে নেয় সুই সুতো। নেহায়েত ঠেকায় না পড়লে এর ব্যবহার করা হয় না। এখন করতে হবে।

“লোকাল অ্যানেসথেসিয়া আছে?” জানতে চায় ইরফান।

অসহায়ভাবে মাথা নাড়ে ফারিহা, এই রাতে অ্যানেসথেসিয়া পাওয়ার কোন উপায় নেই এখানে। তার মাঝেই বিস্থিত হয়ে তাকিয়ে থাকে ও। যন্ত্রণাকাতর ইরফানের মুখের শিরাগুলো ফুলে উঠেছে, কি রূপবানই না লাগছে তাকে!

“ফাইন!” বুক ভরে বাতাস টানে ইরফান, “ফাইন। ফাইন!”

তারপর মাংসে ঢুকিয়ে দেয় সুইটা ঢুকিয়ে দিল। সাবধানে সেলাই করছে ক্ষতমুখ। শিউরে উঠে মুখ ঢাকতে যাচ্ছিলো ফারিহা, দাঁতে দাঁত চেপে মানা করে ইরফান।

“পিঠে আরেকটা ক্ষত আছে। ওখানে সেলাই করবে তুমি। সাবধানে। মনে করো এটা তোমর...টি-উ-টো-রি-য়া-ল!”

একটা একটা করে সেলাই বাঁধে ও-মুখে যন্ত্রণার কোন শব্দ নেই। তবে অ্যানেসথেসিয়া ছাড়া সেলাই করতে প্রতিবার সুচ ফোঁটানোর সময় শতভাগ ব্যথা টের পাচ্ছে।

সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে আছে ওর-মনে হচ্ছে অনন্তকাল ধরে চলবে নিজেকে যন্ত্রণা দেওয়ার এই প্রক্রিয়া। থেমে যাওয়ার উপায় নেই, কাজটা না করলে প্রতি সেকেন্ডে শরীর থেকে মূল্যবান রক্ত বিন্দুগুলো বের হয়ে যাবে ধীরে ধীরে। অবশেষে যখন শেষ হয় ওটা-তখন সারা শরীর থেকে ঘাম বের হয়ে এসেছে ইরফানের। যন্ত্রণার এখনও কিছুই শুরু হয়নি-জানে ও। কাঁধের ক্ষতটা গো খু না। বুলেট ঢুকেছে ঠিকই কিন্তু বের হতে পারেনি। সামনে দ্বিতীয় কোন ক্ষত হয়নি।

সেক্ষেত্রে বুলেটটা বের করতে হবে। আর সেটা করতে হবে আনাড়ি ফারিহাকেই। ক্ষতের ভেতর বুলেটটার অবস্থান বের করতেই কতটা খোঁচাখুঁচি সে করবে-তা ভেবে রীতিমত শঙ্কিত হয়ে ওঠে ইরফান। ঠোঁট কামড়ে ফারিহা দিকে তাকায় ইরফান, করুণ মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। মুখে পরিস্ফুটভাবে ফুটে আছে ইরফানকে সাহায্য করার ইচ্ছে আর নিজের দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন। ওর চেষ্টাতে শার্টটা খুলে ফেলতে পারলো ইরফান। ডানহাত অসাড় হয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

পিঠের ক্ষতটা আরও ভয়ানক। বুলেট ঢোকানোর সময় বাইরের মাংসগুলোকে কিছুটা ভেতরের দিকে বাঁকিয়ে ঢুকিয়ে ফেলে। তবে পুরো ক্ষতটা এখন টাটকা। শার্টের আবরণ সরিয়ে ফেলতেই স্পষ্ট দেখতে পায় ফারিহা। বেশি ঢোকেনি, এখান থেকেই বুলেটের পেছন দিকটা দেখা যাচ্ছে। তবে ভেতরে ঢোকা বুলেটটার চারপাশ থেকে রক্ত বয়ে এসে বার বার লাল করে দিচ্ছে ক্ষতমুখ, এরপর পিঠ বেয়ে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে নিচে। কাঁপা গলাতে সেটা জানালো ফারিহা।

পেছনে রক্ত ঝাড়ার কারণ কী হতে পারে? ভাবলো ইরফান। নিশ্চয় নড়াচড়াতে ক্ষতমুখ খুলে গেছে। ছোট্টাছুটির মাঝে ওটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

নির্দেশনা দিল, “এখন বুলেটটা তোমাকে আটকে ধরতে হবে। তারপর টানতে হবে বাইরের দিকে। ফরসেপটা ধর। শক্ত করে।”

আগে থেকেই ইরফান জানে, একটি বুলেট ইনফেকশনের কারণ হলে এমনটা ভাবার কোন কারণ নেই। বুলেটের গায়ে জীবাণু কিছু থেকে থাকলেও তা ট্রিগার চাপার পর তাপমাত্রা বৃদ্ধির পর মারা যায়। একটি ফায়ার করা বুলেট সব সময় জীবাণুহীন হয়ে থাকে। অতিরিক্ত দ্রুতগতি আরেকটা কারণ। বুলেট থেকে ইনফেকশন হয় না, অন্তত তাৎক্ষণিকভাবে ইনফেকশনের কোন ভয় নেই। বুলেটটা বের করে রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে পারলেই ও নিশ্চিত হতে পারে। সেই সাথে কিছু ফ্র্যাগমেন্ট থাকবে। বুলেটের ক্ষুদ্র ভাঙা অংশগুলো বের করা জরুরি। সেগুলোর কতটুকু ফারিহা বের করতে পারবে তা ও নিশ্চিত না।

তবে ক্ষতটা রক্ষা করাই প্রধান কাজ। গুটুকুর ব্যাপারে মেয়েটার ওপর ভরসা রাখছে ইরফান।

পেছনে দাঁড়িয়ে ফরসেপ হাতে নিয়ে ইতস্তত করছে মেয়েটা। আশ্তে করে তাগাদা দেয় ইরফান, “ফারিহা?”

আচমকা ধাক্কা দেওয়া পিঠের ব্যথাটা জগতের সবকিছুকে হার মানালো। অ্যানেসথেসিয়া ছাড়াই খুঁচিয়ে চলেছে ফারিহা। ওর আনাড়ি হাতে বুলেটটা বার বার ফরসেপ থেকে পিছলে যাচ্ছে। ইরফানের মনে হয় বার বার কেউ গরম শাবল ঢুকিয়ে দিচ্ছে ওর পিঠে। শাবল ঢোকানোর ব্যাস অন্তত তিন ইঞ্চি হবে, ওর ধারণা। অথচ ক্ষতটার ব্যাস এক ইঞ্চিও না।

না দেখা ক্ষতের আকার মানসিকভাবে বড় করে দেখে শরীর-কথাটার সত্যতা হাড়ে হাড়ে টের পায় ইরফান। সেই সাথে খেয়ে আসছে নরক যন্ত্রণা!

অবশেষে ফরসেপে বুলেটটা বাঁধিয়ে নিতে পারলো ফারিহা। অর্ধেকটুকু বের করার পর আবার ছুটেও গেলো। বার বার পিছলে যাওয়া আনাড়ি হাত, ইরফানের সমগ্রসত্তা শক্ত হয়ে ওঠে। যখন মনে হচ্ছিলো আর সহ্য করতে পারবে না, ধাক্কা দিয়ে ফারিহাকে পেছন থেকে সরিয়ে দেবে-ঠিক তখনই হ্যাচকা টানে বুলেটটা বের করে ফেলে মেয়েটা। বড় করে দম নিচ্ছে ইরফান। ট্রে-তে খটাং করে সদ্য বের করা বুলেটটা রাখলো ফারিহা। পরমুহূর্তেই ওর সামনে চলে এসেছে মেয়েটা, হাতে কোন ফরসেপ নেই এখন। আঙুলে রক্তের ছাপ, ইরফানের রক্ত। দুই হাতে ইরফানের গাল ধরে ওর মুখটা তুলে ধরলো, তারপর পাগলের মতো চুমু খেলো ওর ঠোঁটে, মুখে। প্রায় তিনমাস পর প্রথমবার মেয়েটার এত কাছে এসেছে ইরফান, সাড়া দেয় ও নিজেও। ফারিহার নরম ঠোঁটদুটো যত্নের সাথে তুলে নেয় নিজের মুখে।

আধমিনিট পর একটু দূরে সরে এলো ও। ফারিহা ওর গলা আকড়ে ধরেছে, “আ’ম সরি, বেবি। আ’ম সো সরি-ডিডন’ট মিন টু হার্ট ইউ...”

আশ্তে করে ওকে আরেকবার চুমু খেয়ে আশ্বস্ত করলো ইরফান। মাথা নাড়ে একটু, কপালে ভাঁজ খেয়ে গেছে। “ফারিহা, ফ্র্যাগমেন্ট?”

চোখ মুছে উঠে দাঁড়ায় মেয়েটা। আবার ফরসেপ তুলে নিয়েছে। বুলেটের ছোট ছোট অংশ থেকে গেছে পিঠের মাঝে। ওগুলো বের করতে হবে এখন। হালকা করে পিঠ নড়াতে পারছে ইরফান। ব্যথার মাঝেই সাড়া দিল পেশি। বুঝতে পারলো পেশি আর ত্বকের মাঝে ছিলো বুলেট। ডাক্তারি ভাষাতে কী জানি বলে একে পড়েছিলো ও, তবে এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

আধঘণ্টা পরে একটা ব্যান্ডেজ পিঠে নিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল ইরফান। পৃথিবীতে তখন চক্র নেই, শয়তান নেই, দ্য সিলেক্টেড নেই, দ্য ডায়মন্ড হিসেবে বাছাই করা তার বোন ঈশিতাও নেই।

অসীম ক্লান্তি আর চোখ ভাঙা ঘুম সেখানে। কথা অস্বাভাবিক করে ঘুমিয়ে পড়ল ইরফান।

সকালের ঝলমলে আলো মুখে পড়তে চোখ কুঁচকে ওঠে ইরফানের। তারপর ধীরে ধীরে তাকায়। উপুড় হয়েই একপাশে কাত করে রেখেছিলো মাথাটা। এদিকে একটা জানালা আছে দেখা যাচ্ছে। কাল রাতে তো খেয়াল করেনি!

এখন জানালাটা খুলে দেওয়া হয়েছে। উজ্জ্বল আলো আসছে ওদিক দিয়ে।

আলোর উৎস থেমে যায়। জানালাটা কেউ বন্ধ করে দিয়েছে। সাদা টি-শার্ট আর কালো জিন্সে ফারিহাকে দেবির মতো লাগছে। চুলগুলো দেখে মনে হয় গোসল করেছে বেশিক্ষণ হয়নি—তবে চুলের পানি চুলেই শুকিয়েছে।

“মর্নিং, ফারিহা।” একটু হেসে বলে ইরফান। সোজা হয়ে গিয়ে ব্যথায় কুচকে যায় ওর মুখ।

“মর্নিং।” হাসি ফোটে না মেয়েটির মুখে, শান্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে দেখছে ওকে, “ব্যথা কেমন আছে?”

“যতটা থাকার কথা। কয়েকদিন আর চিত হয়ে শুতে পারবো না মনে হচ্ছে।” হাসিমুখে উঠে বসলো ইরফান। সামান্য ঘুমাতে পেরেছে, শরীরের খুব দরকার ছিলো ঘুমটা। গতকাল সারাদিন, এমনকি সারারাত খাটুনি গেছে।

“তুমি হাসছো? কী ভয়টা পেয়েছিলাম তোমার রক্ত দেখে, জানো তুমি?” আন্তে করে ওর পাশে বসে ফারিহা, “চিত হয়ে শোয়া লাগবে না, যেভাবে পারো শোও তো। একটু বিশ্রাম নাও।”

দ্বির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে ইরফান, “সারারাত ঘুমাওনি, তাই না?”

“তোমাকে এভাবে রেখে ঘুমাবো? পাগল হয়েছে?” আন্তে করে ইরফানের কাঁধে মুখ রাখে ফারিহা, “আজ সারাদিন তোমার বিশ্রাম।”

“উহু, বের হতে হবে। কাজ এগিয়ে এনেছি অনেকটাই। বাকিটুকু ঠিকমত শেষ করতে পারলে হয়।”

পিঠে আর পায়ে ব্যথা থাকলেও ইরফানের মন ভাল হয়ে আছে। হাইড্রোআউট থেকে বের হয়ে আসার পর অনেকটাই হতাশ হয়ে পড়েছিলো ও। অস্বস্তির করতে পারবে না, বিজয়ের অন্তর্ধান কিছুটা পিছিয়ে ফেলেছে ওকে। ছোট্টা সিলেক্টেড ওয়ান, ঈশিতাকে শয়তানের কাছে উৎসর্গের নামে খুন করাটা ছিলো সিলেক্টেড ওয়ানের কাজ। অসপেক্ষের প্রফেসি তাই বলে। তাকে স্মরণে রাখতে পারলে ঈশিতার মুক্তি—সেটা ইরফান বিশ্বাস করে না। লোকগুলো মানসিক বিকারগ্রস্ত। দরকার হলে ওরা আরেকজন সিলেক্টেড ওয়ান জোঁগাড় করে নেবে। কিন্তু পনের তারিখ শয়তানের কাছে কুমারি-বলি তারা দেবেই। দক্ষিণ এশিয়া নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যোগ্য একজন নেতা দরকার তাদের। নেতার প্রস্তুতিপর্বে ওরা কোন প্রতিবন্ধকতা সহ্য করবে না।



এখন ঘুমানোর পর ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে পারছে ইরফান। সেজন্যই মন ভাল হয়ে গেছে ওর। আসলে বিজয় পালিয়ে যাওয়াতে সবমিলিয়ে লাভ হয়েছে ওরই। এতে শত্রুপক্ষের পরিকল্পনাতে কোন পরিবর্তন আসছে না। কাজেই দিনক্ষণ পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনাও থাকছে না। একটা অ্যামবুশের প্ল্যান ইরফান করতে পারছে।

হাতে আছে আটদিন। আর হাতে আছে অল্পপেত্র!

ইরফানের বিশ্বাস, এই বুড়োকে কঠিন চাপ দিলে সে গড় গড় করে মেসনিক লজের অবস্থান বলে দেবে। চাপটা শারীরিকভাবে না দিয়ে মানসিকভাবে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। যেহেতু সাদামের হাতে রেখে এসেছে বুড়োকে, ওখানে মেসনিক উন্মাদগুলো হাত দিতে পারবে না। বাংলাদেশে মাত্র একটি মেসনিক লজ থাকার কথা। সেটা এমনি খুঁজে পাওয়া যাবে না। খড়ের গাদায় সুঁচ খুঁজে পাওয়া গেলেও যেতে পারে, লজ খুঁজে পাওয়া কঠিন হতে পারে। সুঁচ তো আর নিজেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে না! ফ্রি মেসনরা করবে।

সর্বপ্রথম এখানে যে মেসনিক লজটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো সেটা ছিলো পুরানো পল্টনে। ১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত লজটি সম্ভবত ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত সক্রিয় ছিলো। লজে তখন কত হাজার মানুষ যোগ দিয়েছিলো তা জানার উপায় নেই। এরা ভারত-পাকিস্তানের জন্মের পর দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। নিজেদের মধ্যে নয়। কাজের ক্ষেত্র হিসেবে অনেকে ভারতকে বেছে নেওয়াতেই দেশটাতে আজ ফ্রি মেসনিক চর্চা এত জোরদারভাবে চলছে। পুরনো পল্টনের লজের কাজও ১৯৪৮ এই বন্ধ হয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানে যারা থেকে গেছিলো তারা আবার ১৯৭১ সালে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। দুই পাকিস্তানের মাঝে লেগে যাওয়া যুদ্ধটি ফ্রি মেসনারির পরিকল্পিত ছিলো না। ফ্রি মেসন সমাজটি পৃথিবীর প্রতিটি পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করছে ১৭৭০ এর এদিক ওদিক থেকেই। আমেরিকার জন্ম হয়েছিলো ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই, বৃহস্পতিবার। বারটির সাথে বিশেষ খাতির আছে ফ্রি মেসনদের। অনেক উৎসবই তারা বৃহস্পতিবার ফেলে থাকে। এমনকি সিলেক্টেড ওয়ানের রিচুয়ালের ডেট এই মে মাসের পনের তারিখও বৃহস্পতিবার।

আমেরিকার জন্মের পর থেকে একটু গুছিয়ে নিতে ওদের সময় লেগেছিলো। একশ বছর পার হওয়ার আগেই পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ শুরু করেছিলো তারা। প্রথমেই কয়েকটি বড় ধাক্কা দিয়ে কাজ শুরু করায় পৃথিবী নিয়ন্ত্রণে তাদের বিশেষ সুবিধে হয়েছে। আমেরিকার জন্ম দেওয়ার কয়েক বছরের মাঝেই ফরাসি বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটায় তারা। একই সাথে লিজ আর ব্রাবান্ত বিপ্লবও হয় সুসজ্জ। নেপোলিয়ন-যিনি ফ্রি মেসনদের পক্ষে সব সময়ই ছিলেন-ফ্রান্সে চড়ে বসলেন এই সময়টাতেই। মেসনিক লজের গ্র্যান্ড মাস্টার হওয়ার প্রস্তাবও তিনি পেয়েছিলেন। ব্যস্ততার অজুহাতে তিনি সেটা গ্রহণ করেননি। তবে ক্ষতিপূরণ করেছেন, তার ভাই জোসেফ বোনাপার্টে, তৎকালীন স্পেনের অধিকর্তাকে সেই প্রস্তাব দেওয়ার রিকমেন্ডেশন দিয়ে 'গ্র্যান্ড ওরিয়েন্ট দ্য ফ্রান্স' লজের গ্র্যান্ড মাস্টারের অভাব পূরণ করেছিলেন।

সারা পৃথিবীতে ফ্রি মেসনরা সূতো টানাটানি করতে শুরু করলেও কিছু জায়গাতে তাদের হিসেব হয়েছিলো ভুল। জার্মানির হিটলার ছিলেন ফ্রি মেসনারির বিরুদ্ধে একজন শক্ত প্রতিপক্ষ, ইরাকের সাদ্দাম হুসাইন তো রীতিমত লড়াই করে মেসনিক লজ তুলে দিয়েছেন। আজ ইতিহাসের দুই পরাজিত নাম হিটলার এবং সাদ্দাম হোসেন। পরাস্ত করা হয়েছে তাদের। আমেরিকা ইরাকে পা রেখেই চল্লিশের ওপর লজ খুলে বসে। এখন একশর কাছে মেসনিক লজ নির্মিত হয়েছে সেখানে, বাদ পড়েনি জার্মানি-সেখানে মেসনিক লজের সংখ্যা পঞ্চাশের কাছাকাছি। কাজেই বাংলাদেশে মেসনিক লজ নেই-এধরনের চিন্তা একেবারেই অমূলক।

পুরানো পল্টনের যে বিল্ডিংটি মেসনিক লজ ছিলো, ওটার কার্যকারিতা অনেক আগেই শেষ। তারপর ভাসা ভাসা ভাবে জানা যায় ১৯৬০ এর দিকে একটি ‘পার্মানেন্ট মেসনিক লজ’ তৈরি করা হয়েছে এদেশে। সেটা এখনও বহাল আছে। ওটা যদি গ্র্যান্ড লজ হয়ে থাকে আরও কিছু ছোটখাটো লজ থাকাও বিচিত্র নয়।

গ্র্যান্ড লজটিকে খুঁজে বের করতেই হবে ইরফানকে। সেখানেই হতে যাচ্ছে ঈশিতার হত্যাযজ্ঞ, মানসিক ভারসাম্যহীন আজকের ফ্রি মেসনদের কাছে যেটা একটি সামান্য রিচুয়াল। আর কিছু না।

অসপেক্ষকে হাতে পাওয়াতে লজ খুঁজে বের করাটা সময়ের ব্যাপার এখন। ইরফানের মন এজন্যই কিছুটা প্রসন্ন।

“তুমি যদি বিরক্ত না হও, কিছুদিনের জন্য হাইড-আউট হিসেবে তোমার বাসাটা বেছে নিতে চাই। এখানেই নিয়ে আসব আমি ঈশিতাকে।” একহাতে ফারিহাকে জড়িয়ে ধরলো ও।

“এখানে যতদিন ইচ্ছে থাকতে পারো। কিন্তু, বের হবে না তুমি কয়েকদিন। প্রিজ?”

ফারিহার অনুনয়-মাথা চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে ইরফান, “বের হতে হবে। নতুবা ঈশিতাকে শেষ করে ফেলবে ওরা।”

ফারিহা জানে এসব। ঈশিতার অন্তর্ধানের পরেই ফোনে ওকে কিছুটা জানিয়েছিলো ইরফান। তবুও ওকে শক্ত করে ধরে থাকলো মেয়েটা।

ফিস ফিস করে বলল, “টিভিতে ওরা তোমার ছবি ছেড়েছে।”

থমকে গেলো ইরফান, এটা ওর জানা ছিলো না। জানার কথাও না। সারাদিন-রাত দৌড়ের ওপর ছিলো। তারপর লম্বা সময় ধরে ঘুমিয়েছে ও। জেগেছে একটু আগে। ফারিহা টিভিতে খবরটা দেখেছে দেড় ঘণ্টা মতো হবে।

“আমার ছবি?”

“হুম। বের হবে না প্রিজ। গোটা বাংলাদেশ তোমাকে দেখলেই চিনে ফেলবে। ডক্টর তানভীর জালালকে খুন করতে গেলে কেন তুমি?”

এবার ইরফান একেবারে চুপ হয়ে যায়।

এটা ওর কাছে একেবারেই নতুন খবর। ডক্টর জালাল মারা গেছেন? একই রাতে? কিভাবে সম্ভব।

সেরাতে ওখানে ইরফানও ছিলো, দ্বিতীয় কাউকে দেখেনি সেখানে। আততায়ি এলো কোথা থেকে? ও চলে যাওয়ার পর ঢুকেছিলো লোকটা? নাকি বাড়ির ভেতরের কারও ষড়যন্ত্র? সাত বছর ধরে তাদের সাথে একসাথে বাস করছেন ডক্টর, ওদের কাউকে অবিশ্বাসের কারণ দেখতে পেল না ইরফান।

ফারিহার দিকে তাকালো ও, “তিনি খুন হয়েছেন, এটাই জানতাম না। পুরো কাহিনী খুলে বলো তো আমাদের। যতদূর জেনেছ।”

গড় গড় করে বলতে থাকে ফারিহা। আজকের সকালের পত্রিকার আর টিভি-নিউজ ঘেঁটে যতদূর সে জানতে পেরেছে, সব। তারপর জানায় বিজয়ের অপহরণের খবর। ইরফানের ছবি প্রচারের ঘটনা। ও বুঝতে পারলো, ছেলেটা ফিরে এসেছে এটা এখনও প্রেস জানতে পারেনি। ইরফানের হাত থেকে প্রথমবারের মতো পালিয়ে গেছে কোন ভিক্টিম!

সব শুনে কিছুক্ষণ চিন্তা করলো ও, তারপর মাথা নাড়লো, “বের হতেই হবে। হাতে একেবারেই সময় নেই। কিন্তু তোমার আরেকটু হেল্প লাগবে। একটু বাইরে যেতে হবে তোমাকে। কিছু জিনিস কিনে আনতে হবে। পারবে না?”

বড় বড় দুই চোখ মেলে যখন ফারিহা তাকায় ইরফানের দিকে, ওকে ঠিক রাজকন্যার মতো লাগে। গোলাপি গাল আঁতে করে ঘষলো মেয়েটা।

“পারবো।”

BanglaBook.org

পিঠে গিটার নিয়ে হেটে যাচ্ছে লম্বা তরুণ। চুল আর দাঁড়িতে একাকার মুখ।

এই ধরনের ছেলেপুলেকে ঢাকার রাস্তায় আজকাল কম দেখা যায় না। জর্জ হ্যারিসনকে এরা ছাড়িয়ে যাবে এমনটা অনেকেই মনে করেন। কিন্তু দিন রাত এক করা প্রচেষ্টার পরও বেচারারা স্টুডিওর মুখ পর্যন্ত দেখে না। শখের গিটারিস্ট থেকে সত্যিকারের কত প্রতিভা যে এভাবে হারিয়ে যায় রোজ-কে তার খবর রাখে?

ক্লিনিকে ঢোকান মুখে চিকন এক ছেলে দাঁড়িয়ে আছে এখন। হালকা পাতলা ছেলেটা এই গিটারিস্টের দিকে বাঁকা চোখে তাকালো। আগাগোড়া সন্দেহজনক মানুষকে দেখলে এভাবেই তাকায় যে কেউ। তাকে মোটেও পাত্তা না দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেলো তরুণ। ডেস্কের ওপাড়ে বসে থাকা মেয়েটা দেখতে চমৎকার। কিন্তু এই মুহূর্তে সুন্দর মুখটাতে একটা ভ্যাবাচেকা ভাব। তরুণের ঘন দাঁড়ি যে এর পেছনে ভাল একটা ভূমিকা রেখেছে তা বলে দিতে হলো না।

সুন্দরির বিমূঢ় ভাবটাকে আমলেই নিলো না গিটারিস্ট। গট গট করে হেটে গেলো চার নম্বর রুমের দিকে। করিডোরে স্থানে স্থানে চমৎকার সব গাছের সমাহার। এগুলো রোগির বেঁচে থাকার প্রেরণা যোগায় না ধূলো বাড়ায়-তা একটা প্রশ্ন হতে পারে। ঘরটার বাইরে আরও দু-জন তরুণের দাঁড়িয়ে থাকা দেখেই বোঝা যায় এখানে তারা খোশগল্প করছে না। ভেতরের কাউকে পাহারা দিচ্ছে। তরুণকে সরাসরি এগিয়ে আসতে দেখে চোখের পলকে নড়ে উঠলো দু-জনেই।

এক মুহূর্ত পরেই তরুণের বুকে আর মাথায় একটা করে ছোট পিস্তলের উপস্থিতি জানিয়ে দেয় এই ঘরটাতে গট গট করে হেটে ঢুকতে চাইলেই সেই ইচ্ছে পূরণ করতে দেওয়া হবে না। গিটারিস্ট এবার আলতো হাসি দিল দুই অস্ত্রধারির দিকে তাকিয়ে। তাতে তাদের গলানো গেলো বলে মনে হয় না অবশ্য।

“পাসকোড!” হিস হিস করে বলল বামদিকের চ্যাপ্টা নাক। পোশাকে কাকতালু যাকে হার মানাবে। সাদামের ওপর হালকা বিরক্ত হলো ইরফান। আরেকটু শুদ্ধ সভ্য কাউকে দাঁড় করানো গেলেও তো হতো। তবে সন্দেহের অবকাশ নেই-এরাই সাদামের সবচেয়ে দক্ষ লোক।

“ডাক সুপ।” মুচকি হেসে শব্দটা উচ্চারণ করে ইরফান। কোডটা ঠিক করার সময় পাসকোড শব্দটাকেই উচ্চারণে একটু ঘুরিয়ে নিয়েছে ও।

দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ালো পাহারাদার সমগ্র। ঢেকুর সময় খোঁচাটা দেওয়ার লোভ সামলাতে পারলো না ইরফান, “ফিরোজ, তোমাকে স্রেফ কাকতালুয়ার মতো লাগছে।”

হা হয়ে যায় এইমাত্র পিস্তল লুকিয়ে ফেলা ছেলেটা, “ইরফান ভাই! এই চেহারা কেন?”

কিছু না বলে চোখ টিপ দেয় ও, “নজর রেখো। তোমাদের কাজ দেখে সন্তুষ্ট না হয়ে উপায় নেই।”

ভেতরে ঢুকে দরজাটা লাগিয়ে দিল ইরফান। গোটা বাংলাদেশে এখন ওর মুখটা পরিচিত। কাজেই ছদ্মবেশ ছাড়া উপায় ছিলো না। ফারিহাকে দিয়ে নকল দাঁড়ি-গোঁফের পাশাপাশি লম্বা চুলের ব্যবস্থাও করাতে হয়েছে। প্লাস্টিকের নকল নাক লাগিয়ে নেওয়ার পর এখন ঈশিতা পর্যন্ত ভাইকে দেখলে চিনতে পারবে কী না সন্দেহ!

ছদ্মবেশ জোগাড় হতে আবারও মাঠে নেমে পড়েছে ও। অসপেক্ষ একদিনের পূর্ণ বিশ্রাম পেয়েছে। রক্তক্ষরণে দুর্বল ছিলো সে, কতটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে তা জানার উপায় নেই। তবে আজ সকালে লোকটার জ্ঞান ফিরেছে। খোঁজ নিয়ে তারপর এখানে এসেছে ও। সাদ্দামকে এখানে আশা করেছিলো, কিন্তু উত্তরার দিকে কি একটা ঝামেলা সামলাতে গেছে সে।

বুড়ো অসপেক্ষ বিছানা থেকে পিটপিট করে তাকাচ্ছে। এইমাত্র ঘুম ভেঙেছে তার। ছোট ছোট চোখ আর কুঁচকে থাকা কপাল দেখে আশা করা যায় মাথাব্যথা পীড়া দিচ্ছে মানুষটাকে। পেছন থেকে আসা খোলা জানালার আলো টাকমাথায় ভালই প্রতিফলিত হচ্ছে। সবমিলিয়ে একনজর দেখে বুড়োকে বেশ পর্যুদস্ত লাগে ইরফানের।

“শুভ সকাল, ইরফান।” থেমে থেমে বলে বুড়ো।

এক সেকেন্ডের জন্য থমকে গেলো ইরফান। লোকটা ছদ্মবেশ ভেদ করে দেখে ফেলেছে ওকে, এটা ও বিশ্বাস করতে পারলো না। আরেকবার ওর বিশ্বাসের ভিত্তি নাড়া দিয়ে গেলো। বুড়ো গ্যারাজে কি বলেছিলো তা স্পষ্ট মনে আছে ওর। এভাবে থেমে থেমেই উচ্চারণ করেছিলো তখনও। “ফিরে যাওয়ার তাড়া তোমার থাকার কথা না, ইরফান। ফিরে গিয়ে তো আর তোমার বন্দিকে পাচ্ছ না তুমি!”

আর ফিরে গিয়ে বিজয়কে পায়নি ও।

এই লোকটা কিভাবে সব কিছু জানে? অসপেক্ষ আগে থেকেই জানতো সে আসছে। তিন আততায়ি সে-রাতে গ্যারেজে আসবে এটাও তার জানা ছিলো। ইরফানকে প্রস্তাব দেওয়ার জন্য সামান্য সময় নিয়েছিলো একাকি। পাগলের দলে যোগদানের সে প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ার পর হামলা আসতে একটুও দেরি হয়নি।

এইমুহূর্তে বুড়োর উচ্চারণ ভঙ্গি দেখে বুঝতে পারে, ইরফান যে এই সময়ে এখানে আসবে তা বৃদ্ধ জানতো। চমকে সে ওঠেনি, ছদ্মবেশের আড়ালে ঠিক ধরে ফেলেছে তাকে।

“অসপেক্ষ” নামে এই বুড়োকে এমনি ডাকা হয় না। শব্দটার অর্থ ‘ভবিষ্যত-বক্তা’। চক্রের জন্য বৃদ্ধ যথেষ্ট কাজের। তার কথা অর্ধশব্দে ধরে বিশ্বাস করা হয় সেখানে। সংগঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তার ক্ষমতা দেখে ইরফানের অবাকই লাগে।

ভেতরে লজিক্যাল কোন ব্যাখ্যা থাকতে বাধ্য-নিজেকে বোঝায় ও। এখানে ইরফান তাকে ধরে এনেছে সেটা অসপেক্ষ জানে। কাজেই এক সময় ইরফান জেরা করতে আসনে, সেটা অনুমান করেছে বুড়ো। ছদ্মবেশের সাথে ওর শারীরিক গঠন

মিলিয়ে হয়তো চিনে নিয়েছে। ইরফান নিজের অজান্তেই কাঁধ বাঁকালো ও। অতিপ্রাকৃত বিষয়ে সে বিশ্বাস করে না। করার কোন মানে নেই। যা করতে এসেছে তা করে এখান থেকে চলে যেতে হবে। যত দিন যাচ্ছে, চক্রের ক্ষমতা আর কিস্তি নিয়ে আগের ধারণাটা যথেষ্ট ছিলো না বলে মনে হচ্ছে।

টেবিলের ওপর ছোট প্যাকেটটা নামিয়ে রাখলো ও। তারপর বৃদ্ধের সামনে রাখা একমাত্র চেয়ারে বসে পড়ল।

“আমার তথ্যের দরকার, অসপেক্ষ। গ্যারাজেই বলেছিলাম তোমাকে,” থমথমে মুখে বলল ইরফান, “আর সেটা তোমার ইচ্ছেতে হোক আর ইচ্ছের বিরুদ্ধে—আমি বের করে নিতে এসেছি। এখন। এখানেই।”

ছাদের দিকে শান্ত ভাবে তাকালেন অসপেক্ষ। বিড় বিড় করে উঠলেন কিছু বলে। বোঝে না ও, ভাষাটা বাংলা নয়।

তারপর ইরফানের দিকে ফিরে শান্ত কণ্ঠে বললেন, “ইথানল, ফ্লোপোল্যামিন, কুইনিউক্লাইডিনাইল বেনজিলেট, মিডাজোলাম, ফ্লান্ডিট্রোজেপাম, সোডিয়াম পেন্টোথাল, অ্যামোবারবিটাল।”

বিস্মিত ইরফানের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন অসপেক্ষ।

“সাইকো-অ্যাকটিভ মেডিকেশন। তোমার তো বোঝার তো কথা। এইমাত্র টেবিলে নামিয়ে রেখেছ ওটা।” টাকমাথা হালকা নেড়ে ওদিকে মুখ ফিরিয়ে দেখেন বুড়ো, “ট্রুথ সিরাম।”

ঠাণ্ডা চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে ইরফান “আপনি যেহেতু সবকিছুই জানেন, আজ এখানে শুয়ে থাকতে হবে, বিষয়টাও জানা উচিত ছিলো। জানা ছিলো আপনাকে ট্রুথ সিরাম দিয়ে কথা আদায় করে নেব আমি। তাহলে গ্যারাজে সববলে দিলেই তো পারতেন। তাই না? এত নাটকের অর্থ কি ছিলো?”

“কারণ, ভবিষ্যত আমি জানি। আর এটাও জানি—আমার থেকে নজের লোকেশন তুমি পাবে না। শেষটায় হয়তো পাবে, কিন্তু আমার কাছ থেকে নয়। অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। আর—”

“আর?”

“ওই পর্যন্ত জীবিত যেতে পারবে কী না সেটা কিভাবে নিশ্চিত হচ্ছে?” মেরুদণ্ড শির শির করে উঠলো ইরফানের। অসপেক্ষ তার মস্তিষ্কের ভবিষ্যৎবাণী করেছেন মাত্র?

“কি মনে করেন? ঈশিতা বেঁচে থাকবে? নাকি গ্র্যান্ড মাস্টার মেসনের হাতের তলে বলী হয়ে যাবে?”

“বলি তো হবেই মেয়েটি। ওটা তার গন্তব্য, সাই ডিয়ার। লুসিফারকে বুড়ো আঙুল দেখাতে পারলেও যে সে বেঁচে যাবে এটা কিভাবে ভাবলে?”

চোখ পাকায় ইরফান, “দ্য ডায়মন্ড শুধুমাত্র লুসিফারের জন্য, তা আমি জানি। কিন্তু, লুসিফার না পেলেই তাকে মরতে হবে?”

“দেহটাই তো আর সব কিছু নয়। আত্মা সরাসরি চলে যাবে তার কাছে।”

আধ্যাত্মিক আলোচনায় বিরক্ত বোধ করে ইরফান। কিন্তু এই লোক এর মাঝে অনেকগুলো ভবিষ্যৎবাণী করেছে, সত্য হয়েছে প্রত্যেকটা। তাছাড়া অসপেক্ষের বাড়িতে হানা দেওয়ার সময় এই লোক গ্যারাজের দরজা খোলার সঠিক সময় কিভাবে জানতো? কিংবা সৈকতের আক্রমণের ব্যাপারে? অসপেক্ষের বিশ্বাস এটা শুধুই আধ্যাত্মিক ক্ষমতা। অথবা মানুষের মাঝে এই বিশ্বাসটা গাঁথিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে সে। সফল হয়েছে কাজটিতে, অস্বীকার করার উপায় নেই।

মাথা দোলাল ইরফান, “ট্রিক্স। আপনি খুব ভাল পর্যবেক্ষণ দৃষ্টি রাখেন। নাথিং এলস। আপনার ফ্যাক্টস কালেকশন আর তার ওপর ভিত্তি করে ক্যালকুলেশনের একটা ভাল দক্ষতা আছে। এজন্যই ভবিষ্যৎবাণীগুলো সঠিক হয় আপনার। আপনার বাড়িতে কেউ একজন আমাদের গাড়ির দিকে গুলি ছুঁড়েছিলো। নিশ্চয় গ্যারাজ গেটের কন্ট্রোল তার হাতেই ছিলো। ক্যামেরার সাহায্যে ভিজুয়ালও পেয়েছে। আর আপনাকে সে জানিয়েছে মাইক্রোফোনে।”

“আমি আগেই বলেছি,” ইরফানের দিকে তাকিয়ে হাসলেন অসপেক্ষ, “আপনাকে আমার ভবিষ্যৎবাণীতে বিশ্বাস করতে হবে এমনটা নয়।”

“বিশ্বাস তো করছিই না, আপনার ভবিষ্যৎবাণী ভুল প্রমাণ করতে যাচ্ছি এখনই।” প্রথমবারের মতো হাসলো ইরফান, ভয়ঙ্কর দেখায় তাকে এখন এই হাসিতে, “লজের লোকেশন দিচ্ছেন আপনিই, আমাকে। আর কেউ নয়। আর কোথাও নয়। এই ঘরে।”

বুড়ো লোকটা বাঁধা দিতে পারে না এবার। অ্যাম্পুল ভেঙে সিরিঞ্জে ট্রুথ সিরাম ভরে ফেললো ইরফান। চট করে অসপেক্ষের হাতে গাঁথিয়ে দিল। কাজের ফাঁকে খেয়ালই করেনি মুখের একটা দাঁত খুলে গিলে নিচ্ছে বৃদ্ধ মানুষটা।

গলা বেয়ে নেমে গেলো নকল দাঁতের ক্যাপসুল। অসপেক্ষের মুখের দিকে তাকালো ইরফান, বিজয়ের হাসি সেখানে!

“পটাশিয়াম সায়ানাইড, মি. ইরফান। ঠিক যা দিয়ে সুইসাইড করেছিলো বেজন্মা হিটলার—গতকালকের কথা সব।”

তাকিয়ে থাকে ইরফান শুধু। মুচড়ে উঠছে অসপেক্ষের শরীর। অস্ত্রিতার সাথে ছটফট করছেন তিনি। ছোট বিছানায় বার বার কেঁপে উঠছেন। কাঁপুনির পরিমাণের সাথে বাড়তে থাকে ইরফানের দুচোখের হতাশা।

“লেহিভ্রাও!” কোনমতে উচ্চারণ করেন তিনি।

তারপরই দুচোখের আলো নিভে যায় ওর হাতে থাকা চক্রের সাথে একমাত্র লিংক, অসপেক্ষের।

বাইকের গতির সাথে পালা দিয়ে বাড়ছে ইরফানের চুলের সরল ছন্দিত স্পন্দন। একদাগা ব্যথানিরোধক ঔষধ গিলে শরীর কর্মক্ষম করে রেখেছে। পোশাকের আড়ালে ঢাকা পড়েছে ব্যাণ্ডেজগুলো। ক্লিনিক থেকে বের হয়ে অসপেক্সের বাড়ির কাছাকাছি চলে গেছিলো ইরফান। গত রাতে পার্ক করা মোটরসাইকেলটা তুলে এনেছে।

মেসনিক লজ খুঁজে বের করাটার গুরুত্বটা সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বেড়েই চলেছে। আজ থেকে গুনলে আর মাত্র সাতদিন থাকে হাতে। সাত নম্বর রাতেই অসপেক্সের প্রফেসি অনুযায়ী সবচেয়ে কম বয়স্ক মাস্টার মেসন নির্বাচিত হতে চলেছে। এই মাস্টার মেসন হবে প্রফেসর তানভীর জালালের ছেলে বিজয়।

এই মুহূর্তে ইরফানের মনে হয় তার কাজটা কঠিন করে ফেলার জন্যই তানভীর জালালকে মেসনদের কেউ মেরে রেখে গেছে। এখন কি তাকে সাবধানে চলতে হচ্ছে না? রাস্তায় বের হতে হলে হাজারটা প্রস্তুতি নিয়ে পা বাড়াতে হচ্ছে না? একজন আন্তর্জাতিক মানের গুরুত্বপূর্ণ মানুষকে সরিয়ে দিতেও দ্বিধাবোধ করেনি মনে হয় তারা। প্রফেসর নিজেও ছিলেন একজন মেসন, তবে সেটা তাদের কাছে গুরুত্ব আর তাৎপর্য কতটা রাখে সেটা ভাবার বিষয়। হারভার্ডের সিলেবাস ধরে পড়াশোনা করেছে বিজয়, ছেলেটা ছিলো একজন প্রডিজি। মাত্র সাড়ে সাত বছরের মাঝেই বাংলাদেশের এইচএসসির সমমানের জ্ঞান সে অর্জন করেছিলো। নয় বছর বয়সে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করার পরও তার নাম গিনেজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে ওঠেনি। কারণ, তাদের এটা জানানোই হয়নি। এই ছেলে দক্ষিণ এশিয়ার হাল ধরবে একদিন। তাকে প্রস্তুত করা হচ্ছে এখন। তার তুলনায় তানভীর জালাল আর কি এমন গুরুত্ব রাখেন? বিজয়ের বয়স পঁচিশ হওয়ার আগেই বাবার সব সাফল্য ছাড়িয়ে যাবে সে।

বিজয়কে ধরে আনার পর প্রথম জেরা করেছিলো আশুলিয়ায়। ছেলেটা ভাল মানুষের মতো তথ্য দিয়েছিলো, বিষয়টা ইরফানের চোখে অস্বাভাবিক ছিলো না। অল্প বয়েস-সোনার চামচ মুখে নিয়ে বড় হওয়া একটা ছেলের কাছ থেকে এরকমটাই আশা করেছিলো ও। নতুন লজ স্থাপন করার পরিকল্পনা তাদের আছে, জানিয়েছিলো বিজয়। খালিদের কথা বলেছিলো তাকে। ইরফানের ধারণা ছিলো, ছেলেটি সত্য বলছে। তবে খালিদের সাথে দেখা করার পর ফাঁদের মাঝে বিজয়কে আবিষ্কার করে প্রথমবারের মতো বুঝতে পেরেছিলো বিজয় ছেলেটা সাধারণ কেউ নয়। খালিদের কথা থেকে বুঝতে পেরেছে, অজান্তেই তাদের সিলেক্টেড গুণানকে উঠিয়ে এনেছে সে। বিজয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হতে সরাসরি ওর পায়ে পিস্তল ঠেকিয়ে প্রফেসি-বজার ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলো ও। অসপেক্সের ঠিকানা পেতে সমস্যা হয়নি এরপর।

অসপেক্স সুইসাইড করতে পারে—এ ধারণাটা আগে একবারও ইরফানের মাথায়



আসেনি। দাঁতের মাঝে সায়ানায়িড ক্যাপসুল ভরে রাখার মেথডটা খুবই প্রাচীন এবং কার্যকর। এই কাজ সাধারণত করে থাকে গুপ্তচররা। অন্য দেশে ধরা পড়ে গেলে দ্রুত নিজের এবং দেশের জন্য লজ্জার কারণ হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করে এভাবে, নিজের সাথে নিয়ে যায় গোপন তথ্য। কিন্তু অসপেক্ষ কেন মুখের মাঝে সায়ানায়িড পিল নিয়ে ঘুরছিলো? অসপেক্ষ কি জানতেন তার বাড়িতে ইরফান হামলা করার পর তিনি ধৃত হবেন? সেজন্যেই কি আগে থেকে মুখে আত্মহত্যার ব্যবস্থা রেখেছিলেন?

এসব আধিভৌতিক চিন্তা করার জন্য নিজের ওপর বিরক্ত হলো ও। সব কিছুর একটা যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা থাকতে বাধ্য।

অসপেক্ষকে হারানোটা ঠিক হয়নি। একমাত্র লিংক হারিয়ে ফেলার মতো বোকামি করার জন্য নিজেকে কয়েকটা লাথি মারতে ইচ্ছে করে ইরফানের। তবে এই মুহূর্তে ওটা নিয়ে আক্ষেপ করে লাভ নেই। ঈশিতার হাতে মোটেও সময় নেই—যা করার আজকালের মাঝেই করে ফেলতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে নতুন ট্রেইল। সৈকত সাথে থাকলে ভাল হতো। ছেলেটার স্কিল কিছু ছিলো—খুব দ্রুত বের করে ফেলেছিলো অসপেক্ষের ঘাঁটি।

সৈকত!

নামটা মনে হতেই চমকে ওঠে ইরফান। এই ছেলেটা একদিনে খুঁজে পেয়েছে ওদের, এমনটা নয় নিশ্চয়! প্রচুর রিসার্চের প্রয়োজন তার নিশ্চয় হয়েছিলো। সেগুলো সে কোথায় রাখতে পারে? জাত ক্রিমিনাল সে ছিলো না—নিশ্চয় নিজের বাসাতে রাখবে ওসব। আর সেক্ষেত্রে...

চায়ের দোকানদার সুরুষ মিয়া দাঁত কেলিয়ে জানাল, “সাদিক ভাইরে তো আজ পাইতেন না।”

শান্ত ভঙ্গিতে চায়ের কাপে চুমুক দেয় ইরফান আরেকবার, “সাদিক কোথায়? বাসা পাঁটেছে নাকি?”

সুরুজ মিয়া হাসলো এবারও, “না, তয় আজ ভাইয়ে বাসাতে নাই। একটু আগে এখানেই চা খাইয়া গ্যাছে গা বাইরে।”

“কোনদিকে যায়?”

সুরুজ মিয়া উত্তর না দিয়ে একবার চোখ টিপ দেয় শুধু। ইরফানের বিরক্ত লাগে। সাদিককে দরকার। আর এখনই দরকার তাকে। একটা ইউনিফর্ম পেলেই কাজ অনেকটা সহজ হয়ে যাবে। এই মুহূর্তে তাকে এলাকাতে পাওয়া না গেলে সেটা বিরক্ত উদ্বেক করতেই পারে। চায়ের এই দোকানদার সাদিকের ব্যাপারে ভালই জানে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু জানাশোনাতে ওর কাজ উদ্ধার হচ্ছে না, সে চোখ টেপাতে ব্যস্ত। আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলে ইরফান।

নকল প্লাস্টিকের নাক আর ভিন্নধরণের আরেকটা পরচুলা চেহারার অনেকটাই পালটে দিয়েছে ওর। সেই সাথে বেশ বদখত করে দিয়েছে ওকে-ওটা নিয়ে অবশ্য মাইন্ড করার কিছু নেই এখন।

“শুক্রবারেও কি তার অফিস থাকে নাকি?” সুরুষ মিয়াকে প্রশ্ন করে ও।

“না, স্যার। কিন্তু এই দিন উনার ইয়ের সাথে তিনি ঘুরতে যান। কোন শুক্রবারই মিস নাই। আজ তো হেরে পাইতেন না।” চোখ টেপার রহস্য স্পষ্ট করে দেয় সুরুজ।

“তার বাসাটা তো চেনো?” বিরক্তির ভাবটা প্রকাশ না করে বলে ইরফান।

“তা চিনি। আপনি চেনেন না?” অবাক হয়ে যায় সুরুজ মিয়া।

“ওর বাসায় আসা হয়নি আগে। এদিকেই কোথাও বলেছিলো।”

“লাল রঙের একটাই বিল্ডিং দেখতে পাইবেন। ওইটাই। সাদিক ভাইয়ে দোতলায় থাকে। একা মানুষ, ভাইরে কত করে কইলাম বিয়াটা কইরা ফলাইতে-”

ইরফান আর কিছু না বলে সিগারেট আর চায়ের দাম মিটিয়ে উঠে পড়ে। সাদিকের সাথে পরিচয় কয়েক বছর আগে। পেশায় এই লোক ইলেকট্রিক্যাল রিপেয়ারার। বাসা, অফিসে অথবা রাস্তায় বৈদ্যুতিক-লাইনে যেকোন সমস্যা এই লোক হুড়মুড় করে সারিয়ে দিতে পারে। ডেসকোর এক অফিসারের সাথে ধানাই পানাই ছিলো ইরফানের দলের, আন্ডারওয়াল্ডে ছিলো তখন ও। অফিসারকে হাতে না মেরে ভাতে মারার সিদ্ধান্ত নেন রাহাত ভাই। কাজটা সহজ ছিলো না একেবারে, খেলাটা ছিলো কৌশলের। আর সেজন্য একটু ভেতরের সাহায্য দরকার ছিলো। সাদিককে

বেছে নিতেই খুশিমনে রাজি হয় সে। আগে একবার সহপাঠির গালে ছুরি মারার জন্য পুলিশের কাছে রেকর্ড ছিল—আইন ভাঙা এর কাছে নতুন কিছু নয়।

এই মুহূর্তে লাল বিল্ডিংটার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে ইরফানের মনে হয়, ওই একটা জিনিসই তাদের মাঝে কমন ছিলো হয়তো। দোতলার দরজাটাতে মাক্কাতা আমলের তালটা চোখে পড়তে সম্ভব হয় ও। তার বের করে কাজে লেগে পড়ে। সাদিকের জন্য অপেক্ষা করলে দেরি হয়ে যাবে। এখান থেকে একটা জিনিসই দরকার ওর, ওটা নিয়ে কেটে পড়লেই চলবে আপাতত। পরে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে সেটা।

বহুল ব্যবহারে তালটার ভেতরের দাঁতগুলোর দফারফা একেবারে। পিন বাঁকিয়েও নাগাল পাওয়া দুষ্কর। ইরফানের ধারণার থেকেও তিনমিনিট পেরিয়ে যেতে কিছুটা উদ্বেগ অনুভব করলো ও। ওপর থেকে কেউ নেমে এসে ওকে যদি এভাবে তালার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকতে দেখে, চেষ্টা করে বাড়ি মাথায় তুলবে। তার ভয়কে সত্যি করতেই কি—না কে জানে, প্রথমে একটা দরজা খোলার এবং লাগানোর, তারপর পায়ের শব্দ শোনা যায় সিঁড়িঘরে। হাত স্থির রেখে চেষ্টা চালিয়ে যায় ইরফান। ক্লিক শব্দটা হলো, ঠিক তখনই দোতলার সিঁড়িঘরে মাঝবয়সি মানুষটিকে চোখে পড়ে ওর। উদাস ভঙ্গিতে নেমে আসার ধরণটা দেখেই তাকে বাড়িওয়ালা বলে মনে হয়। ইরফানকে দেখে একটু থমকালেন।

“আসসালামু আলাইকুম।”

থতমত খেয়ে সালামের জবাব দেয় সে, “ওয়ালাইকুম আস সালাম।”

“ভাইজানরে তো আগে দেখলাম না।” পানের পিক ফেলে বলে লোকটা।

একটু হাসে ইরফান, “আমি সাদিকের গেস্ট। আজ খুব সকালে পৌছেছি। দেখা না হওয়াটাই স্বাভাবিক।”

“ও—দেশ কই আপনার?” কপালের কাছে চোখ তুলে জানতে চান ভদ্রলোক।

“চট্টগ্রাম। ঢাকায় কাজ ছিলো।” বাড়িওয়ালার চোখেমুখে বিতৃষ্ণা দেখা দিল। চট্টগ্রামে শুল্লুরবাড়ি নাকি তার? প্রশ্নটার উত্তর ইরফানের জানা নেই।

“চুকতেছিলেন মনে হয়—” খোলা দরজাটা দেখায় মানুষটা, “চুকেন তাইলে।”

মাথা নেড়ে চুকে পড়তে যাবে ইরফান, আবার ডাক দেয় লোকটা, “ভাইজান?”

“জি?”

“সাদিককে বইলেন, ভাড়া দুইমাসের বাকি যে ফালায় রাখছে—এই মাস শেষে না দিতে পারলে আমরা কিম্বক উঠায় দেওয়া লাগবে তারে।”

তাড়াতাড়ি বলে ইরফান, “আচ্ছা, বলে দেবো।”

বিতৃষ্ণার পেছনের কারণটা এখন স্পষ্ট। লোকটা চোখের আড়ালে যাওয়ার আগেই চুকে দরজা লাগিয়ে দেয় ও। নকল নাক আর ছোট একটা দাঁড়ি লাগিয়ে বাড়িওয়ালাকেও ধোঁকা দেওয়া গেছে। সেভাবে লক্ষ্য করেনি লোকটা তাকে, অথবা টিভিতে খবর এ লোক তেমন দেখে না।

সাদিকের ঘরটা ভালমতো খোঁজা দরকার। বেশি পরিশ্রম করতে হবে বলে মনে

হয় না, তবে এখানে একটা সেকেন্ডও নষ্ট করতে চায় না ইরফান। যতদ্রুত সম্ভব ইউনিফর্মটা নিয়ে বের হয়ে যেতে হবে। সৈকতের দিকে পুলিশের নজর কতটা পড়েছে জানার উপায় নেই। তবে তাদের বোকা ভাবতে ইরফান চায় না। আন্ডার এস্টিমেশন একটা বড় দুর্বলতা।

মিনিট দশেকের মাঝেই পোশাকটা খুঁজে পেল ও। এরকম একটা পড়েই কাজ করতে যায় সাদিক। পিঠের কাছে বড় করে ছাপানো আছে লোগোটা। ইলেক্ট্রিক্যাল যে কোন ঝামেলা দেখা দিলেই বড় বড় মই লাগিয়ে যারা উঠে পড়ে কারেন্টের পোলে-তাদের পিঠে এমন জিনিসই থাকে সাধারণত। ব্যাকপ্যাকে ওটা ভরে রওনা হলো মোটরসাইকেলের দিকে।

আপাতত ডক্টর তানভীর জালালকে কে মেরে ফেলেছে সেটা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই-এমনটাই মনে হচ্ছিলো ওর কাছে, কিন্তু এই মুহূর্তে আবার ভাবনাটা ফিরে আসল, কেউ কি ইচ্ছে করেই সব দায় ইরফানের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইছে? ঈশিতার জন্য ও ছুটে আসবে সেটা তাদের জানা ছিলো নিশ্চয়।

এমনও হতে পারে, মেসনদের অন্তর্দলীয় কোন্দলের ফলস্বরূপ তানভীর জালালকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনাটা কেউ করেছিলো। একজনকে ফাঁসানোর জন্য বেছে নিয়েছে তারা, ইরফান হয়তো নির্বাচিত হয়েছে। যাকে ফাঁসাতে হবে-সেই লোকের বোনকে ডায়মন্ড বানাতে পারলে এক টিলে একাধিক পাখি মারা সম্ভব হচ্ছে। এই সম্ভাবনাটাও উড়িয়ে দিতে পারলো না ও।

তারা শুধু একটা জিনিসই ভুল করেছিলো। বিজয়ের নিরাপত্তার ব্যবস্থা আগেই করা উচিত ছিলো। অবশ্য ওদিকে তাদের দোষ দেওয়া চলে না। বিজয়ের বা চক্রের নাম নিজের বোনও ওকে বলেনি। আর সব মেয়ের মতো ডায়েরি লেখার অভ্যাস তার ছিল, সেখানেও সরাসরি কিছু লিখেনি সে। তবে ওখান থেকেই সামান্য তথ্য পেয়েছে ইরফানকে। বয়সে একদম কাঁচা ঈশিতা, নাহলে ডায়েরিতেও কিছু লিখতো বলে মনে হয় না। অদ্ভুত ব্যাপার হলো-মেয়েটার ব্রেইনওয়াশ করে দেওয়া হয়েছে, তবুও ভাইয়ের প্রতি ভালবাসাটুকু টিকে গেছে কিভাবে জানি। সেটা কাজে লাগিয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে তাকে বের করে আনতে হবে, যত দ্রুত সম্ভব।

বাসাটার কাছে এসে একবার চক্কর মেরে সরে যায় ইরফান। একটু দূরে মোটরসাইকেল থামিয়ে দেয়। বাড়ির সামনে শব্দ তুলে থেমে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজন নেই। হেটে ফেরার সময় রাস্তার দু-পাশে চোখ ফেলার সাবধানে। মানুষ অনেক আছে। চায়ের দোকান নেই ঢাকায় এমন কোন জায়গা নেই বোধহয় এখন আর। সেই সাথে হাবিজাবির দোকানে অসংখ্য মানুষের ভিড়। এখানে কাজ করতে গেলে চোখে পড়বেই কারও না কারও।

একবার সৈকতের বাসাটাতে চোখ বুলিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে ও। নিচে কোন সিকিউরিটির ব্যাপার নেই-সহজেই সিঁড়িঘরের অ্যাকসেস পাওয়া গেলো। ওপরে উঠতে উঠতে মাকাতা আমলের আরেকটা তালা পাওয়ার আশা করতে থাকে

ইরফান-মনে মনে বার কয়েক প্রার্থনাও জানিয়ে ফেলে !

তালায় কারসাজি করে খুলে ফেলা সম্ভব হলে আর সাদিকের ইউনিফর্মের প্রয়োজন হওয়ার কথা না। অথচ চারতলায় উঠে রীতিমত হতাশ হতে হলো। আধুনিক নব বসানো হয়েছে। তিন খাঁজের লক থাকে এগুলোর ভেতরে। তিন খাঁজের লক খোলা সাধারণভাবে একটা তার দিয়ে সম্ভব নয়। ম্যাথমেটিকালিই এটা অসম্ভব।

চারতলার দরজাটার দিকে একবার তাকিয়েই ছাদের দিকে উঠতে শুরু করে ইরফান। সিঁড়িঘরটা ওপরের দিকে। নিচের তলাগুলোতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাওয়া একটা ভাব থাকলেও এখানে নেই। রেলিংগুলোও চক চক করছে। ধারণা করা যায়, বাড়িওয়ালা পরে ওপরের দুই তলা তুলেছেন। বেশিদিন আগের কাজ না হয়তো।

মনে মনে এই কাজের জন্য তাকে একটা গালি দেয় ইরফান। অথথা খাটুনি বলতে যা বোঝায় তাই হচ্ছে এখন ওর। ছাদের রোদ ঝলমলে গরমে বের হয়ে দ্রুত কাঁধের ব্যাকপ্যাক খুলে কাজে নেমে পড়ল। লম্বা আর মোটা নাইলনের দড়িটা বের করে চমৎকার ভাবে অ্যান্টেনার স্ট্যান্ডের সাথে বাঁধলো প্রথমেই। বাইরে একবার চক্কর দেওয়ার সময়ই বাড়ির জানালাগুলো কোথায় কোথায় আছে দেখা হয়ে গেছে ওর। সেই হিসেবে একটা জানালার ওপরই নেমে আসার কথা দড়িটার। সবকিছু নিশ্চিত হতে একটা রোপ-কাটার বের করে দড়িতে লাগিয়ে দেয় ও।

যন্ত্রগুলো আঙটির মতো। দড়ি লাগিয়ে এগুলোকে চাপিয়ে দিলেই প্রস্তুত হয়ে যায় গরম হওয়ার জন্য। নির্দিষ্ট টাইমারের রোপকাটার পাওয়া যায় এখন বাজারে। দড়ি বেয়ে এমন কোথাও অভিযাত্রি নামতে চাইতে পারেন—যেখানে দড়িটি তার আবার লাগবে। অতি দ্রুত নামার প্রয়োজন হলে গাঁড়ো দিতে সময় নষ্ট না করে রাফলি দড়ি বেঁধে একটা রোপকাটার পড়িয়ে দিলেই চলে। ওটা ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হতে থাকে, নির্দিষ্ট সময় পর নাইলন গলিয়ে গোড়া থেকে কেটে অভিযাত্রির হাতে অবশিষ্ট দড়ি পৌঁছে দেয়। এই মুহূর্তে যে রোপকাটার ইরফান লাগিয়েছে, এটার টাইমার একমিনিটের। এর মাঝেই চারতলায় নেমে পড়তে হবে ওকে। একমিনিট পর দড়িটা কেটে চলে যাবে ওর হাতে।

সাদিকের ইউনিফর্মটা পরে ফেলে ব্যাকপ্যাক কাঁধে নিয়ে ঝুলে পড়ল ও দড়িতে। সর সর করে চারতলায় এসে পা আটকে ফেলে জানালায়। তারপর সময় নষ্ট না করে খোলা জানালার শিকে মাত্রই ব্যাকপ্যাক থেকে বের করা হ্যাক স্টাফ পাশায়। কির কির শব্দ করে কাটতে থাকলো ছিল।

সৈকতের বাসাটা খুঁজের বের করা ইরফানের জন্য কতটা কিছু ছিলো না। তথ্য যেটুকু জানা ছিলো তার ওপর ভিত্তি করে কয়েকটা ফোন কল দিতেই বের হয়ে গেছে। এখান থেকে একটা লিড আশা করছে ইরফান মনেপ্রাণে। আপাতত চক্র নিয়ে তার হাতে আর কিছু নেই। সৈকতের স্টাডিরুম টাইপ কিছু পাবে এমনটা আশা করা ছাড়া আর উপায় দেখতে পায় না এখন।

আচমকা দড়িটা ঝুলে পড়ল ছাদ থেকে। রোপকাটার তার কাজ করে ফেলেছে।

দড়ির শেষ মাথাটা নিজের সাথে জড়িয়ে জানালার শিক কেটে আলাদা করে ইরফান। যত্ন করে কাটা শিকদুটোকে একে একে নিচে ফেলে দেয়। জানালার ঠিক নিচেই সামান্য মাটি আছে, সেখানে গঁথে গেলো শিকদুটো। সরাসরি ইরফানের দিকে তাকিয়ে আছে যেন। ওদিকে তাকায় না ও, তিনতলার জন্য বানানো সানশেডে দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ ধরেই। কেউ কেউ খেয়াল করেছে হয়ত-কিন্তু পিঠের ট্রেডমার্ক তাদের বিভ্রান্তির মাঝে রাখবে। ইউনিফর্ম দেখলেই এদেশের মানুষ ধরে নেয় বৈধ কিছু হচ্ছে।

ঢাকার মানুষ রাস্তায় হাটার সময় ওপরের দিকে খুব কমই তাকায়—এটা একটা স্বস্তি। দড়িটা এবার এই জানালায় বেঁধে ফেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল ইরফান। কাজটা সহজেই সারা গেছে। প্রথমে সবগুলো ঘরে একবার ঘুরে আসে ও। বাসাটা সম্পর্কে একটা ধারণা থাকা প্রয়োজন। ছোট বাসাটাতে মাত্র দুটো ঘর। আর ডাইনিং স্পেস।

ঘর দুটোর একটা ইভার আরেকটা সৈকতের। কোনটা কার, সেটা বুঝতে সময় লাগে না ইরফানের। ইভার নিষ্পাপ মুখটা ঝুলে আছে দেওয়ালের ওপর থেকে। একেবারেই ভাইয়ের মতো ছিলো না মেয়েটা। ভাইয়ের ভয়ঙ্কর বৈশিষ্ট্যের কোনটাই সে পায় নি।

সৈকতের কথা মনে হতে বিভ্রান্তিতে পড়ে গেলো সে, ছেলেটা আসলেই কি কোন রোগে আক্রান্ত? নাকি, নিজের ওপর অত্যাচার করে করে সে-রকম কিছু বানিয়ে নিয়েছে মানুষটা? নিজেকে ভ্যাম্পায়ার বলে বিশ্বাস করা এক জিনিস আর ভ্যাম্পায়ারের কল্পকাহিনীতে যেরকম বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তা একজন মানুষের শরীরে পাওয়া আরেক জিনিস। মাথা থেকে জোর করে প্রশ্নগুলো সরিয়ে ফেলে ইরফান। সৈকত একজন মানুষ ছিলো। না-হলে বিজয়ের কাছে এভাবে বিধ্বস্ত হতো না সে, তা-ও রাতের বেলায়।

আবার সৈকতের ঘরে ফিরে আসলো ইরফান। এ বাসায় কোন স্টাডি রুম নেই। একটা কম্পিউটার দেখা যাচ্ছে বটে—সেটাকে অন করে চারপাশে তাকালো ইরফান। একটা খাট, আলনা, আলমারি আর বুক শেলফ। আর কিছু নেই এখানে। কম্পিউটারের দিকে নজর দিল। পাসওয়ার্ড প্রটেক্টেড না। পার্সোনাল কম্পিউটার যখন বাসায় থাকে—অনেকেই পাসওয়ার্ড দেয় না।

হার্ডড্রাইভ মাত্র আশি গিগাবাইটের। যার বেশিরভাগ মুভিতে ভর্তি হয়ে আছে। ও ছাড়া ডকুমেন্টস ফোল্ডারে অনেকগুলো ইন্টারনেট ফাইল দেখা যাচ্ছে, সব মেসনদের ওপর। এগুলোর প্রায় সবই ইরফান আগেই পড়ে ফেলেছে। যেগুলো পড়েনি, সেগুলোতে একটু চোখ বোলালো। বাংলাদেশের কোন কথা সেখানেও নেই। নেই কোন ধরনের ক্লুও।

হতাশ ইরফান আধঘণ্টা পর স্ট্রিন থেকে মুখ তুলল। বিছানার ওপর ধপ করে বসলো প্রথমে—তারপর গুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে। আহত শরীরের ক্লান্তি চেপে ধরছে তাকে। এখানে একটা ভাল ক্লু পাবে ভেবেই এসেছিলো, কিন্তু ওর মতো সৈকতও

ফাঁকা। তবে তার কোন প্ল্যান নিশ্চয় ছিলো। ছেলেটার জ্ঞান ফিরেছে কি না, সেটা হাসপাতালে গিয়ে পরীক্ষা করা উচিত একবার। জ্ঞান ফিরলে কিছু তথ্য তো অন্তত দিতে পারবে সে?

ঘরটা সার্চ করতে হবে—ভাবনাটা তুলে ফেলে ওকে বিছানা থেকে। বুক শেলফের প্রতিটি বই পরীক্ষা করলো এবার। মলাট দেখেই ভোলার কিছু নেই। বইগুলোকে খুব সহজেই গোপন কম্পার্টমেন্ট বানানো সম্ভব। দুই মলাটের মধ্যে পৃষ্ঠাগুলো কাটলেই চমৎকার খোপে পরিণত হয় ওগুলো। তবে সৈকতের কালেকশনে থাকা অর্ধশত ফিকশন আর অর্ধশত দর্শনতত্ত্বের বইগুলো আসলেই বই। কোনটার মাঝেই কোনরকম কারসাজি টের পায় না। বিছানার চাদর তুলেই অবশ্য থমকে যেতে হলো।

কম্পিউটারের মতো এখানেও কোন প্রটেকশন নেই, তানাও মারেনি বাক্সে। সৈকত ধরেই নিয়েছিলো তার ব্যাপারে খুঁজে কেউ বাসা পর্যন্ত আসবে না। যা গবেষণা সে করেছে তা সরাসরি খাটের নিচে রেখে দিয়েছে। চোখের সামনে রাখিনি, এতটুকুই।

মেসনদের নিয়ে যতটা পারা যায় ততটাই তথ্য কালেক্ট করেছে মানুষটা। ওদিকে কিছুক্ষণ সময় দিয়ে মাঝামাঝি গুগল ম্যাপের একটা প্রিন্ট-আউট কপি দেখতে পায়। অবাক হয়ে হাতে তুলে নেয় ওটা ইরফান-জায়গাটা বাংলাদেশে। তবে, অবশ্যই মেসনিক লজ এটা নয়।

ছোট্ট করে লেখা আছে : O.T.O

ইরফানের দ্রু কুঁচকে যায়, এদের ব্যাপারে জানে সে। বাংলাদেশে লজ খুলে বসে আছে দেখা যাচ্ছে! বাইরে গাড়ির ইঞ্জিনের মৃদু শব্দটা কানে আসতেই ম্যাপটা বাক্সের তলে পাঠিয়ে দিল ও। চিন্তার সূতো কেটে গেছে। বারান্দায় সাবধানে উঁকি দিল। চকচকে গাড়িটা থেকে নেমে আসা দু-জন মানুষের চেহারাতে আইনের সাথে থাকার চিহ্ন স্পষ্টভাবে ফুটে আছে। এগিয়ে থাকা মানুষটাকে হাবভাবে নেতা মনে হচ্ছে। শিশুতোষ সারল্য তার চেহারায়।

দ্রুত সৈকতের রুমে ফিরে এসে বাক্সটাকে আবার খাটের নিচে পাঠিয়ে দিল ইরফান। একটানে খুলে ফেললো কম্পিউটারের দেওয়াল সকেটের সংযোগ। তারপর আবার লাগিয়ে দিল ওটাকে। ইউপিএস না থাকায় বন্ধ হয়ে গেছে কম্পিউটার। কোনদিকে না তাকিয়ে জানালার কাছে পৌঁছে গেলো আবারও। দাঁড়িতে রোপকাটার লাগানোর সময় নেই, পর্দাটা টেনে দিল শুধু। প্রথম দেখায় এটা নজরে আসবে না নিচের ওদের।

তারপর বড় একটা নিঃশ্বাস নিয়ে দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল ইরফান। ওপরে কোন এক দরজায় প্রচণ্ড আঘাতের শব্দ শোনা যায় সাথে সাথে। বিকট শব্দে নব ভেঙে খুলে গেছে দরজা। কেউ একজন ভারি গলায় হুঙ্কার দিয়েছে :

“পুলিশ!”

“চমৎকার!” এবার আর না বলে পারে না আসিফ, “তাহলে ওটা তুমিই ছিলে। সৈকতের ওখানে!”

এখনও ছোট ঘরটাতে বসে আছে ওরা। জানালা দিয়ে এখন আর দিনের আলো ঢুকছে না। খুনের সময় থেকে এখন পর্যন্ত কি ঘটেছে সংক্ষেপে জানাচ্ছিলো ইরফান, এতেই নেমে এসেছে সন্ধ্যা। ডিটেক্টিভ আসিফের মতো বোকা মানুষ সে জীবনে দ্বিতীয়টা দেখেনি। আর দেখবে বলেও মনে হয় না। গোয়েন্দার পেশায় এসেও এই মানুষটা তার মতো একজন ক্রিমিনালকে বিশ্বাস করে বসে আছে। শুধু তাই না, হাতকড়া খুলেও দিয়েছে। অথচ তার ধারণাও সম্ভবত নেই-ঈশিতাকে উদ্ধারের পথে এই লোক পড়ে গেলে তাকে হত্যা করতে ইরফানের একটা মুহূর্তও দ্বিধা হবে না।

“তুমি যাদের খুঁজছ, আমিও তাদের খুঁজছি, আসিফ। শুধু আমার একটা খটকা আছে। তানভীর জালালের কেসটা তুমি হ্যান্ডল করছিলে, নাকি সৈকতের?”

“একরকমভাবে, দুটোই।” এতটুকুই বলে আসিফ।

“তারপর ডিপার্টমেন্ট থেকে তোমাদের লাভ কষিয়ে বের করে দেওয়া হয়েছে?”

অপমানিত হলো আসিফ। “অফিসিয়ালি না হোক, আনঅফিসিয়ালি আমরা খোঁজ চালিয়ে যাবো। ওসব নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।”

“খোঁজাখুঁজি যেভাবেই চালাতে চাও-সেটার প্রক্রিয়া আরেকটু দ্রুত হলে মনে হয় ভাল হয়। ঈশিতার হাতে আর মাত্র সাতদিন আছে।” দীর্ঘশ্বাস চাপে ইরফান।

“ঈশিতা ওদের ভেতর জুটলো কি করে?”

“বিজয়ের প্রেমে পড়েছিলো মেয়েটা। আমার মনে হয় বিজয় আগে থেকেই টার্গেট করেছিলো ওকে। গত ঈদে বসুন্ধরা সিটিতে ওদের পরিচয় হয়। ধীরে ধীরে ঈশিতা এক নেশাতে আটকে গেছিলো, নেশটার নাম বিজয়। একটা সময় বিজয় ওকে মেসন হিসেবে শপথ নেওয়ায়। কোথায়-সেটা জানার উপায় নেই। কিছু কবিতা থেকে আর কত গেস করবো?”

“কবিতা?”

“এসব ওর ডায়েরি থেকে গেস করেছিলাম আমি। তোমার কি ধারণা সরাসরি এসব নিয়ে আলোচনা করবে সে?”

“হুম-বলে যাও।”

“বিজয়ের ব্যাপারে তার ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলো সরাসরি লিখেছিলো অবশ্য। সায়েন্টিস্টের ছেলে। অগাধ জ্ঞান রাখে সব বিষয়ে। ছেলেটার নাম বিজয়। এতটুকুই জানতাম আমি। আর এটাই আকৃষ্ট করেছিলো ঈশিতাকে। সে প্রেমের বিষয়টুকু ডায়েরিতে লিখেছিলো, নিজের গুপ্তসজ্জের ব্যাপারে কিছু লেখেনি। বিজয়ের তাৎপর্য



বুঝতে আমার সময় লেগেছিলো অনেক। ঈশিতা প্রথমে দীক্ষা নেয়। পরে নিজেকে ডায়মন্ড হিসেবে স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করে।”

“ডায়মন্ড তারা-যারা শয়তানের উদ্দেশ্যে সজ্জানে নিজেকে উৎসর্গ করে?” নিশ্চিত হতে প্রশ্ন করলো আসিফ।

“হু। আত্মা আর শরীর।”

“ইভাও একজন ডায়মন্ড ছিলো। সৈকতের বোন?”

“হুম। তবে শয়তানের উদ্দেশ্যে একজন কুমারি শুধু মুখের কথায় নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে না। আলাদা রিচুয়াল আছে। সেই রিচুয়ালের পর থেকে শয়তানের জন্য নির্ধারিত হয়ে যায় মেয়েটার শরীর। এরপর তার কুমারিত্ব নষ্ট হলে তাকে মারা যেতে হবে, এটাই বিধান। শয়তানের জন্য রাখা নৈবদ্য আর কেউ স্পর্শ করলে সেটা তার ক্রোধের কারণ হবে। ইভাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়নি এজন্যে।” ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকালো ইরফান।

ধীরে ধীরে আসিফের কাছে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যায়। “কলেজ টিচার আনোয়ার ইভাকে ধর্ষণ করেছিলো!”

প্রথমবারের মতো পৃথিবীকে অধিকার করে নেওয়ার জন্য ব্যস্ত একদল উন্মাদের প্রতি তীব্র ঘৃণা অনুভব করলো আসিফ। সৈকতের বোন ইভা ছিলো একজন ডায়মন্ড। ইভা তার উদ্দেশ্য লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারে নি। এক দুর্ঘটনায় কুমারিত্ব হারিয়েছে শিক্ষক আনোয়ারের কাছে। শয়তানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করায় তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে ওরা। তাকে চক্রের জন্য দীক্ষা নিতে প্ররোচিত করা ক্রিস্চিনাকেও দায়িদের কাতারে ফেলেছে সৈকত। প্রতিশোধের গল্পটা তাহলে এটাই!

ক্রিস্চিনা আর আনোয়ার দু-জনের ওপরই অপার ঘৃণা কাজ করেছে সৈকতের মনে। দু-জনকেই হত্যা করেছে সে। যদিও এতে করে তার ভ্যাম্পায়ার বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারটা স্পষ্ট হচ্ছে না। আর প্রথম ডায়মন্ডকে হারিয়ে মেসনরা আরেকটি ডায়মন্ড খুঁজে নিয়েছে। এবারের সিলেকশনটাও খারাপ না। ইরফানের বোন ঈশিতা। আরেকজন কুমারি।

যতদূর শোনা যায়-যেকোন কুমারিকে শয়তানের জন্য উৎসর্গ করে না গুজরা। সুন্দরি আর গুণবতি একটি মেয়েকে-এককথায় বলতে গেলে ওরকম কাজের জন্য সবদিক থেকে সর্বোৎকৃষ্ট একটি মেয়ে প্রয়োজন। ইভা ছিলো প্রাথমিক বেস্ট সিলেকশন। তার অন্তর্ধানের পর ঈশিতার দিকে মনোযোগ দেয় ওরা। সম্ভবত এরকম কিছু মেয়েকে এই পথে শুধু বলিদানের উদ্দেশ্যেই নিয়ে আসা হয়েছে।

“একটা ব্যাপার আমার কাছে এখনও স্পষ্ট নয়। মেসন হতে হলে একটা সময় প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া লাগত। ক্রিস্চিনা, ইভা অথবা ঈশিতারা এখানে কিভাবে আসছে? তাছাড়া বিজয়ের বয়স খুবই কম। এরা কিভাবে মেসনের সাথে জড়িত?”

একটু হাসে এবার ইরফান, হাসিটাতে মিশে আছে তিক্ততা। “শয়তানের জন্য সৌন্দর্যের বিচারে অনেক ওপরের দিকের কাউকেই বলি দিতে হবে। রূপের সাথে

প্রয়োজন আরও কিছু গুণ-ক্রাইটেরিয়া লিস্ট আছে একটা। এই দেশে পূর্ণবয়স্ক মেয়ে পাবে না ওরকম। মানে, কুমারি অবস্থায়। সেজন্য এদের মেসন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে তারা, তবে সরাসরি নয়। ক্রো-মেসন নামে একটা সাব-সেকশনে পড়ে এই মাইনর মেয়েগুলো। কাব-স্কাউট জাতীয় শাখা থাকে না, অনেকটা সেরকম। সংঘটর স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই নেই এখানে। বিজয়ের ব্যাপারটা আলাদা। তাকে অসপেক্ষ দূরদর্শিতার সাথে সিলেক্টেড ওয়ান ঘোষণা দিয়েছিলেন। এশিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় তারা, বিজয়ের মাধ্যমে। ধর, আর দশ বছর পর কি ঘটবে? ছেলেটা একজন প্রিডিজি। এই বয়সে একজন আর্কিটেকচারাল ইঞ্জিনিয়ার পাবে না তুমি পৃথিবীর কোথাও। তার অন্যান্য সামাজিক, অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক শিক্ষাও উন্নত মানের। একেবারে পরিকল্পনা মফিক এগিয়ে গেছে ওরা। বিজয়কে সম্ভবত বিশেষ বিবেচনাতে এই পর্যায়ে আনা হয়েছে। বলা চলে, জন্মগতভাবে এই অবস্থান পেয়েছে সে। ছোট থেকে একজন মানুষকে প্রস্তুত করে তোলা হলে তার মাঝে আর কোন রকম বিবেচনা বোধ থাকার কথা না। দশ বছর পর যদি বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণ করে এই ছেলে, ত্রিশ বছর পর গোটা ভারতবর্ষকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে সে। বয়স তখন হবে মাত্র পঁয়তাল্লিশ। বুঝতে পারছো, কেন বিজয়কে সিলেক্ট করেছে অসপেক্ষ? প্রফেসি-টফেসি বাজে কথা। ক্যালকুলেশনের ব্যাপার-স্যাপার সবই।”

“মানলাম, কিন্তু এর মাঝে অর্ডো টেম্পলি ওরিয়েন্টিসের ভূমিকা কি? কোন সন্দেহ নেই এখন সৈকতের বাসাতে হানা দেওয়ার পর আমরা যখন দৌড়েছি ওখানে, তুমিও সেদিকে গেছো। ওদের হার্ড ড্রাইভ চুরি হবার আর কোন ব্যাখ্যা থাকতে পারে না।” অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় আসিফ তার দিকে।

“আটটা হার্ডডিস্ক আছে আমার কাছে।” স্বীকার করে ইরফান অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে, “তবে ওগুলো পাবে না তুমি কখনই। টেকনোলজির দিকে একজন দক্ষ বন্ধু আমার আছে। ওগুলো চলে গেছে তার কাছে। পরে আমি দেখব অগ্রগতি কতটুকু হতে পারে ও থেকে।”

“ওটো থেকে ওগুলো নিয়ে তুমি তাহলে সেদিকেই গেছিলে। তারপর ফিরে এসেছিলে ফারিহার বাসায়। সার্ভিল্যান্সারকে দেখে ফেলে তাকে কাত করে প্লাস্টাতে চেয়েছিলে ফারিহাকে নিয়ে।”

আসিফের দিকে চোখ ফেরায় ইরফান, কণ্ঠে হতাশা। “হিসেব তোমার ঠিক আছে। তারপরই তোমার হাতে আটকে গেছি গর্দভ একজন একবিআই এজেন্টের কারণে।”

“সে না থাকলে ফাইটটাতে তুমি জিততে বুঝে মনে হচ্ছে?” মুচকি হাসে আসিফ।

“মনে হওয়ার প্রশ্নই আসে না। আমি জানি সেটা।”

দরজায় জিয়ার ছায়া পড়ে এই সময়। “ডক্টর রমিজ খানের ডিনারের ইনভাইটেশন আমরা অ্যাকসেস্ট করবো, স্যার?”

“অ্যাকসেন্ট তো করেই ফেলেছি। যেতে হবে আর কি। কয়টা বাজে?” মাথা না ঘুরিয়েই জানতে চায় আসিফ।

“সাতটা, স্যার।”

“গাড়ি বের করো। প্রফেসরকে জানিয়ে দাও—আরও একজন একজন গেস্ট আসছে। মেসনদের নিয়ে অজানা প্রশ্নের জবাব তিনি তার কাছ থেকে পেতে পারেন। উনার কোন সমস্যা এতে আছে কি না দেখ।”

আঙুল তোলে ইরফান। “দু-জন। তোমরা আমাকে কোথাও নিয়ে যেতে চাইলে আমি চাইব ফারিহাকেও আশেপাশে দেখতে। মেয়েটার নিরাপত্তা নিয়ে তোমাদের মাথাব্যথা নেই হয়ত আমার আছে।”

“মেয়েটা এখানে ভালই থাকবে, ইরফান। পানি ঘোলা করবে না আশা করি। আমার মনে হয়, ঈশিতাকে উদ্ধার করতে চাইলে ডক্টর খানের সাথে তুমি নিজেও কথা বলতে চাইবে।”

রাগে চোখ জ্বলে ইরফানের। “ফারিহা আমার উইকপয়েন্ট সেটা তোমাদের মতো মানুষ যদি বুঝে থাকে, বর্তমান মাস্টার মেসনও বুঝবে। ব্যাপারটা হয়তো তোমরা বুঝতে পারছ না—”

“বুঝতে পারছি। আর সেজন্যই এখানে ফারিহাকে রেখে যেতে চাইছি। এই বাড়ির কথা ডিপার্টমেন্টের কেউ জানে না। এর চেয়ে নিরাপদ কোন জায়গা তোমার জানা থাকলে বলো। নিশ্চয় চাও না মেয়েটা একটা চকচকে কয়েনের মতো রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশে গড়াগড়ি থাক? এটা হাইডআউট হিসেবে খুব একটা খারাপ জায়গা না, ইরফান। ফারিহা এখানেই নিরাপদ থাকবে।”

কিছুক্ষণ চুপ থেকে মেনে নিলো ইরফান। বাইরের জগতে ফারিহাকে একা ছাড়াটা ঠিক হবে না। আর বোঝা যাচ্ছে যে ডক্টরের কাছে ওরা যাচ্ছে তার কাছে ফারিহাকে নেওয়ার ব্যাপারে আসিফের স্পষ্ট আপত্তি আছে। হাতকড়া এখন নেই বটে, তবে এদের হাতে এখনও বন্দি ইরফান। এব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। মাও সে তুং যেমনটা বলে গেছিলেন আরকি! বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস।

আসিফ ওর মনের কথা বুঝতে পারে যেন। “ডক্টর খানের ওখানে তুমি মেসন আর চক্র সম্পর্কে আলোকপাত করবে। এই সময়টা তোমাকে খোলাখোলা হাটে দেবো, তবে পালানোর চেষ্টা করবে না আশা করি। মেসনদের কমন প্রশ্নই ধরে নিয়ে যদি তোমার আর সৈকতের একসাথে কাজ করার পরিস্থিতি আসে, আমাদেরও কাজ করতে সমস্যা হবে না মনে হয়। ওদের তোমার মতই উৎসাহ দিয়ে ধরতে চাই আমি, ইরফান। সেইম সাইড করে ফেলার ইচ্ছে মাথায় থেকে থাকলে দূর করে দাও সেটা।”

মাথা নাড়ে ইরফান, “আমার বোনটাকে অক্ষত ফিরে পেতে চাই আমি। সেমসাইডের ইচ্ছে আমার নেই, ডিটেক্টিভ।”

মুখে এটা বললেও মাথায় ঘুরছে অন্য চিন্তা। প্রথম সুযোগেই এদের হাত থেকে কেটে পড়তে হবে!

ডক্টর খানের অ্যাপার্টমেন্টটি বিশাল কিছু নয়। মোহাম্মদপুরে একটা ফ্ল্যাট কিনে বাস করছেন। পিছুটান রাখতে চান না তিনি। জীবনের ধ্যান-ধারণা সবই কেমিস্ট্রির ওপর। জমানো টাকা দিয়ে নিজের জন্য ছোটখাটো একটা ল্যাব বানিয়েছেন। কিন্তু বসতবাড়ির দিকে মনোযোগ দেননি। কিছু মানুষের ডেডিকেশন দেখলে আপনা থেকেই শ্রদ্ধা চলে আসে, ইনি এরকমই একজন মানুষ।

দরজা খুলে যখন কম বয়সি ছেলেটা ওদের অভ্যর্থনা জানালো, আজ পাল্টা হাসি ছুঁড়ে দেয় আসিফ। এর সাথে আগে একবার দেখা হয়েছিলো তার। তখন আগুনঝরা দৃষ্টি দিয়ে একে কয়েকবার কুচকে দিয়েছিলো। আজকে আসিফকে হাসতে দেখেও ছেলেটা সহজ হতে পারলো না। ডক্টর খানের বিশ্বস্ত সহকারি ফরহাদ।

মাঝারি আকারের ড্রইংরুমে ডক্টর রমিজ খানকে বসে থাকতে দেখা গেলো। ওদের দেখে চমৎকার একটা হাসি দিয়ে উঠে আসলেন। হাত বোলাচ্ছেন দাঁড়িতে।

“ডিটেক্টিভ আসিফ অ্যান্ড ডিটেক্টিভ রেজা! ইট’স অ্যা প্লেজার! উনি?” ইরফানের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন ডক্টর।

“উনি মি. সালেহীন। গত কয়েক মাস ধরে মেসনদের পেছনে লেগে আছেন তিনি।”

একথায় ডক্টর খানের মুখের হাসি আরও কয়েক ডিগ্রি উজ্জ্বল হয়ে যায়। ইরফানের হাত শক্ত করে পাকড়ে ধরলেন। “গ্রেট টু মিট ইউ, ইয়াংম্যান। আমি রমিজ খান। আশা করি এরই মাঝে ডিটেক্টিভ আসিফ আপনাকে আমার ব্যাপারে টাউস কোন ফাইল পড়ে শুনিয়েছেন। উনার কাছে আবার সবার নামেই একটা ফাইল থাকে। গোয়েন্দা মানুষ তো!” নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলেন ডক্টর। চমৎকার আলোচনা সভা বসাবেন এই আশায় তিনি উৎফুল্ল। “চলুন, বসা যাক। ফরহাদ, দেখো তো ওভেনে সবকিছু একটু গরম করতে দাও। আমরা আলোচনা করি এই ফাঁকে।”

দরজা দিয়ে ফরহাদ উধাও হয়ে যেতে সোফাগুলো দখল করে ওঠে। দু-হাত একটা আরেকটার ওপর রাখেন ডক্টর খান, তারপর আসিফের দিকে যখন তাকালেন, মুখ থেকে হাসি উধাও হয়ে গেছে।

“শুনলাম প্রফেসরের মার্ডার কেসটা সমাধান হয়ে গেছে। ফিরে এসেছে বিজয়ও। আপনাকে অভিনন্দন।”

মাথা নাড়ে আসিফ। “কেসটা আমার হাতে নেই। ওটা অন্য একজন ডিটেক্টিভ দেখছিলেন।”

ডানার লাশ যে ওরাই উদ্ধার করেছে, সে-ব্যাপারে জানালো না আসিফ। কেসটা

তার জন্য অমর্যাদার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। জিয়া বোঝে সেটা, একেবারে চুপ হয়ে আছে সেজনে।

“মেসনদের প্রভাবে আপনাকে সরিয়ে দেওয়া হয়নি তো?” সামনে ঝুঁকে বসলেন ডক্টর, “আপনাকে যে ডিটেক্টিভ রিপ্রেস করেছে তার ব্যাপারে খোঁজ নেবেন ভালমত।”

“আমাকে সরিয়েছে এফবিআই-প্র্যাক্টিক্যালি। মেসনদের সাথে সম্পর্কটা বুঝতেই পারছেন।” চোখ টেপে আসিফ, “যাকগে, প্রথমে আপনাকে একবার ধন্যবাদ জানাতে চাই। আপনার ক্লু একেবারে পানিতে পড়েনি। খুনগুলোর পেছনে মেসনদের হাত আছে।”

ত্র কুচকে যায় ডক্টরের, “খুনগুলো?”

“আরেকটি কেস ছিলো আমার হাতে। ভ্যাম্পায়ারদের মতো অ্যাটাক করে কেউ মেরে ফেলেছিলো দু-জন মানুষকে। তাদের সাথে মেসনদের লিংক আছে।”

“ওহ্।” মাথা দোলালেন ডক্টর খান স্বাভাবিকভাবে, “তবে আচমকা আমার সাথে দেখা করতে চাওয়ার পেছনে নিশ্চয় এই ধন্যবাদ জানাতে চাওয়াটাই উদ্দেশ্য নয়?”

মাথা নাড়ে আসিফ, “আসলে গতবার আপনার কাছে মেসনদের ব্যাপারে শোনার সময় একেবারেই অন্ধকারে ছিলাম। তবে এখন কিছুটা আলোকপাত করতে পেরেছি। সে-ব্যাপারে জানাতে চাই আপনাকে। তাছাড়া, মি. সালেহীন থাকতে আমার মনে হয় ব্যাপারটা আরও বেশি হেল্লফুল হবে।”

আনমনে ইরফানের দিকে তাকান ডক্টর, “তা বটে। আপনি এখন কোথায় আছেন, মি. সালেহীন?”

একটু কাশে ইরফান, “ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাবডাকশন অ্যান্ড হস্টেজ সিচুয়েশন-এ। নাম শুনবেন না হয়তো। নতুন ডিপার্টমেন্ট।”

অনেক কষ্টে হাসি চাপে জিয়া। ইরফান যা বলেছে তা মোটেও মিথ্যা নয়। তার কাজটা অ্যাবডাকশন আর হস্টেজ সিচুয়েশন নিয়েই। ডক্টর খান এজন্যই হয়তো নীরবে মেনে নিলেন, “তা, আপনার সঙ্গে মেসনদের টক্কর লাগলো কিভাবে? কতটা জেনেছেন তাদের ব্যাপারে?”

আসিফের দিকে ইঙ্গিত করে ইরফান, “উনার ভ্যাম্পায়ার কেসটা নিয়েই ক্রস কানেকশন হয় আমাদের। খুনগুলো করছিলো একজন প্রতিশোধপরায়ণ যুবক। তার বোনকে উঠিয়ে নিয়ে মেরে ফেলে কেউ। মৃত্যুর ব্যাপারটা জানার আগেই আমাদের ডিপার্টমেন্ট কাজে লেগে পড়েছিলো। আমাদের চোখে ওটা ছিলো শুধুই এক কিডন্যাপ কেস। তবে পরে কেসটা হত্যায় ঘুরে গেলে পুলিশের হাত ছেড়ে দেওয়া হয়। ভাইটি প্রতিশোধ নিতে এসে মেয়েটির ক্লাসমেট আর প্রাইভেট টিউটরকে মেরে ফেলে। ডিটেক্টিভ আসিফ ওই জোড়া খুন সামলাচ্ছিলেন। এভাবেওই উনার সঙ্গে আমার পরিচয়।”

একটু কাশলো জিয়া। হাসবে না কাঁদবে ঠিক করতে পারছে না।

“এদের সাথে মেসনদের কি সম্পর্ক?” জানতে চান ডক্টর।

“সোজাসাপ্টা। ক্লাসমেটটি তাকে মেসনদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো। ক্রো-মেসনে যোগ দিয়েছিলো কিশোরি মেয়েটি। তারপর দুর্ঘটনাক্রমে তার শিক্ষক ধর্ষণ করেছিলো তাকে। এর পরই মেয়েটিকে মৃত পাওয়া যায়।”

“ধর্ষণ এবং মৃত!” উত্তেজনা দাঁড়িয়ে পড়লেন ডক্টর খান, “তাহলে ডায়মন্ডের ব্যাপারটি শুধুই মিথ নয়!”

কিছু না বলে তার দিকে তাকিয়ে থাকলো ইরফান। পাশ থেকে প্রশ্ন করে আসিফ, “ডায়মন্ড? জানতেন আপনি বিষয়টা?”

“জানতাম, তবে বিশ্বাস করিনি। মেসনরা যুক্তিবাদি প্রকৃতির। অযথা নিরীহ মেয়েদের খুনোখুনি তাদের কাজ নয়।” আবার বসে পড়েন ডক্টর খান, “প্রথম থেকে শুরু করা যাক, কি বলেন? মেসনদের ব্যাপারে কি কি জানেন, মি. সালেহীন?”

কাঁধ ঝাঁকায় ইরফান, “কম নয়।”

তবুও স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন ডক্টর খান, “সেটাই শুনতে চাচ্ছি।”

বড় করে নিঃশ্বাস নেয় ইরফান, “ভুল হলে শুধরে দেবেন। ইতিহাস মনে রাখাটা ঠিক আমার ক্ষেত্র নয়।”

অভয় দেন ডক্টর খান, “ভাববেন না। শুরু করেন। মেসনদের সম্পর্কে ক্রিয়ার পিকচার এখনও কেউ পায়নি। ভাসা ভাসা জানা যায়, তা নিয়েই আমাদের আলোচনা করতে হয়। আমাকে কিছুটা আলোতে আনতে পারলে সত্যই কৃতজ্ঞ থাকবো।”

“আমি জানি না, মি. আসিফকে আপনি আগের মিটিংয়ে কতটা কি বলেছেন। তবে তার কথা শুনে আমার মনে হয়েছে ইহুদিদের সাথে মেসনদের সম্পর্ক নিয়ে তিনি স্পষ্ট ধারণা পাননি। ও ব্যাপারে কিছু বলেননি উনি আমাকে। তবে আজ আমি বলব। মেসনরা ইহুদিদের ব্রৈন থেকে বের হয়েছে, স্যার। অনেকেই এই ফ্যাক্টের দিকে নজর দিতে চান না আজকের যুগে। অনেকের ধারণা মেসনিক হাই ডিগ্রিগুলোতে ইহুদিদের অবাধ বিচরণের কারণে তাদের আলাদা মর্যাদা দেওয়া হয়। অথচ, ব্যাপারটা কাকতালিয় নয় মোটেও। ইহুদিরাই জন্ম দিয়েছে মেসনদের।”

থমথমে মুখে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে তিনজোড়া আগ্রহি চোখ।

“ঘটনার শুরু সলোমন বা, আমরা যাকে সুলাইমান (আঃ) বলি তার সময় থেকে,” বলতে থাকে ইরফান, “তখনকার ইহুদিদের ঈশ্বর হলেন ইয়াওয়া। আর সলোমন তাদের চোখে একজন জাদুকর ছাড়া আর কিছুই নন। আধ্যাত্মিক শক্তি তার অনেক বেশি—এই ছিলো তাদের বিশ্বাস। সলোমনের টেম্পল নির্মাণ নিয়ে অনেকেরই খুঁতখুঁতানি ছিলো। ইয়াওয়ার সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনকারি প্রতিনিধি হিসেবে সলোমনকে মেনে নেওয়া হয়েছিলো।”

“সলোমনের টেম্পলের সাথে ইয়াওয়ার সম্পর্কটা আসছে কোথায়? নবী হিসেবে তারা মেনেছে বলে তো মনে হয় না। যত আগ্রহ টেম্পল জুড়ে!” অবাক জিয়া প্রশ্নটা করেই ফেলে।

“এর কারণটা সহজ, জিয়া। দুর্দান্ত একটা ডিজাইন ছিলো টেম্পল অব সলোমনের। আজকের যুগের আর্কিটেক্টরাও হাবুডুবু খাবে ওরকম একটা স্ট্রাকচার বানাতে—এমনটাই মনে করা হয় এখন পর্যন্ত। কোন মানুষের পক্ষে ওটা নির্মাণ করা সম্ভব ছিলো না। ইসলাম বলে সুলায়মান (আঃ) একাজে নিয়োগ দিয়েছিলেন জ্বিন জাতিকে। দেখো, এখানেও বলা হয়নি মানুষের পক্ষে এরকম একটা স্ট্রাকচার বানানো সম্ভব হয়েছিলো। ইহুদিদের বিশ্বাস অবশ্য আলাদা।”

“যেমন?” আসিফের প্রশ্ন শুনে বোঝা যায়, সেও হঠাৎই আগ্রহি হয়ে উঠেছে।

“তারা মনে করে, সলোমন ইয়াওয়ে বা ঈশ্বরের কাছ থেকে সরাসরি নকশাটি পেয়েছিলেন বটে কিন্তু তারপরই তিনি হুটহাট সেটা তৈরি করে ফেলতে পারেননি। তাদের বিশ্বাস ইসলামের সাথে একাত্ম নয়। ইসলামের বিশ্বাস সুলাইমান(আঃ)-কে আল্লাহ ক্ষমতা দিয়েছিলেন পৃথিবীর সমগ্র প্রাণিজগতের ভাষা বুঝতে এবং তাদের ওপর কর্তৃত্ব করতে। এমনকি জ্বিন জাতির ওপরও কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা তাকে আল্লাহ দিয়েছিলেন। তবে ইহুদিরা মনে করে সলোমন সাধারণ একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নন। আর কোন মানুষ থেকে একমাত্র পার্থক্য, জাদুবিদ্যার ওপর অগাধ জ্ঞান ছিলো তার। সে-কারণেই, কোন জ্বিনের দলকে টেম্পল অব সলোমনের নির্মাতা বলে তারা মনে করে না। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী, নকশা পাওয়ার পর সলোমনের কিসের অভাব পড়েছিলো বলে মনে করেন?” চোখ নাচায় ইরফান আসিফের দিকে তাকিয়ে।

“একজন ইঞ্জিনিয়ারের?” ধারণা করে আসিফ।

“ইয়েস! একজন ক্র্যাফটসম্যান বা কারিগর তার প্রয়োজন ছিলো। সে সময় টায়ার নগরীর কারিগরদের সুনাম কম নয়। কাজেই সলোমন টায়ারের খানের কাছে একজন কারিগর চাইলেন। আজকের যুগে এদের আর্কিটেক্ট বলা হবে নিঃসন্দেহে। সলোমনের দাবিটা ইহুদিদের মতে ছিলো এরকম—‘দক্ষ একজন কারিগর পাঠান আমাকে, খান। যিনি কাজ করতে জানেন সোনা নিয়ে, রূপা নিয়ে, একই দক্ষতায় যিনি পারেন তামার কাজ, লোহাকে সামলে ফেলা যার জন্য কঠিন কাজ নয়, কঠিন নয় রক্তিম পাথরের ওপর কাজ, কঠিন নয় অরুণরাস্তা পাথরের ওপর দক্ষতার আধিপত্য দেখানো, নীল রঙের পাথরেও যে পারবে সমান দক্ষ কাজ করতে।’”

“এলাহি কারবার!” বিড় বিড় করে বলে জিয়া।

তাকাল না ওদিকে ইরফান, বলে চলেছে, “টায়ারের খান সলোমনকে অভয় দিয়েছিলেন, এমন একজন আর্কিটেক্ট তার কাছে আছে। এই আর্কিটেক্টকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সলোমনের দরবারে। তৎকালীন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আর্কিটেক্ট এভাবেই পা রেখেছিলেন সলোমনের দরবারে। আর এভাবেই সূচনা হল অসংখ্য গুপ্তসংঘের। তখনও কেউ জানেন না, শুরুটা হয়ে গেছে। মানুষটি যদি কোনদিন সলোমনের দরবারে পা না রাখতেন, আজকের জগতটা হয়তো গোপনীয়তা রক্ষায় একটু কম তৎপর থাকত। এই মানুষটির নাম হিরাম আবিফ।”

ডক্টর খান সামনে ঝুঁকে পড়েন সাথে সাথে। “অ্যাডোনিরাম! দ্যাটস হোয়াট দে কলড হিম!”

“যাই ডাকা হোক তাকে, পরবর্তিতে হিরাম আবিফ নামেই বেশি পরিচিত হয়েছেন তিনি। হিরাম আবিফকে সসম্মানে প্রাসাদে স্থান দিয়ে তার হাতে টেম্পল অব সলোমনের ডিজাইন তুলে দিলেন সলোমন। ‘মেসন’ শব্দটা তখন কোন তাৎপর্য বহন করে না। এর অর্থ ডিকশনারি ঘাঁটলে যা পাবেন তাই : রাজমিস্ত্রি। রাজমিস্ত্রিদের প্রধান হলেন হিরাম আবিফ। সেজন্য তাকে বলা হত ‘মাস্টার মেসন।’ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ডিজাইন হাতে পেয়ে হিরাম ঘাবড়ালেন না—তিনি গুছিয়ে কাজ শুরু করে দিলেন।”

হাত তোলে জিয়া হতভম্ব মুখে। “এক সেকেন্ড, আজকের ফ্রি মেসনদের হেডকে মাস্টার মেসন বলা হয় কি ওখান থেকে?”

মাথা নাড়ে ইরফান, “অবশ্যই। মেসনদের প্রধান মাস্টার মেসন, দ্বিতীয় স্তরে যারা থাকেন তারা ফেলোক্র্যাফট। সর্বশেষ স্তরে অ্যাপ্রেন্টিসগশ। নামগুলো সেই টেম্পল অব সলোমনের কারিগরদের থেকে নেওয়া। আমি আমার কথাতে ফিরে যাই আবার, যদি আপনারা প্রস্তুত থাকেন।”

সায় দিল জিয়া।

“মাস্টার মেসন হিরাম আবিফের অধীনস্থ মেসন ছিলো অনেকেই। কিন্তু ওই যে বলেছি, ইহুদি বিশ্বাসের কথা, তারা সলোমনকে একজন জাদুকর বৈ আর কিছু ভাবতে পারেনি। আর যেহেতু ইয়াওয়ায়ে থেকে নকশা পেয়েছেন তিনি—টেম্পল অব সলোমনের ডিজাইনকে তারা ধরে নিলো জ্ঞানের এক বিশাল আধার হিসেবে। শুধু তাই নয়, যেহেতু মাস্টার মেসন হিরাম আবিফ তাদের নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তারা নিশ্চিত হলো সলোমন তাকে কৌশল এবং ঈশ্বরের কাছে পাওয়া অসীম জ্ঞান—সবই শেয়ার করেছেন। আর এরকম জ্ঞানের লোভ হয় না কার বলুন?”

আঙুলের সাহায্যে সোফার হাতলে টোকা দেয় আসিফ, “কেউ কেউ লোভি হয়ে উঠলো।”

“লোভি হয়ে উঠলো তো বটেই। তবে লোভটা কিসের ছিলো তা নিয়ে কেউ আজ নিশ্চিত হয়ে বলতে পারে না। অনেকের ধারণা, ঐশ্বরিক জ্ঞান নিয়ে মহা ক্ষমতা অর্জনের ইচ্ছে তাদের ছিলো। আবার কারও ধারণা, একটু বেশি জেনে নিতে এরকম স্ট্রাকচার নির্মাণ তাদের জন্য হবে ছেলেখেলা—এরকম কোন ধারণার ওপর ভিত্তি করে লোভি হয়ে ওঠে তারা। ওদিকে হিরাম কিন্তু তার অধীনদের পুরো নকশা দেখাতেন না। নির্দেশনা দিতেন ধাপে ধাপে। মোটকথা একটু একটু করে সুতো ছাড়ছিলেন তিনি।”

“সেটা সহ্য করলো না সাধারণ মেসনরা?” একটা সিদ্ধান্তে পৌছতে চায় জিয়া।

অর্ধেক ছেলেটার দিকে বিরক্ত হয়ে তাকায় ইরফান। “হিরাম আবিফ তাদের অসন্তোষ বুঝেছিলেন। আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন সম্পূর্ণ কাজ শেষ হলে প্রতিটি মেসনই এই বিদ্যা জানবেন। সম্ভবত তিনি চাননি প্রয়োজনের বেশি জানিয়ে মেসনদের বিভ্রান্ত করে দিতে। তাদের হয়তো পুরো স্ট্রাকচারটাকে বোঝার মতো ইনটেলেকচুয়াল ক্ষমতাই ছিলো না। হয়তো বা টেম্পল অব সলোমনের নির্মাতারা



সেই পর্যায়ের আর্কিটেক্ট ছিলেন না। যে কারণে ধীরে ধীরে সূতো ছাড়া থেকে ভাল কোন উপায় হিরামের ছিলো না।”

সোফায় হেলান দেয় ইরফান ক্লান্ত ভঙ্গিতে। “তিনজন মেসন-মানে রাজমিস্ত্রি এখানে ধৈর্য হারায়। তারা স্বর্গীয় জ্ঞান জানতে চায়, কাজ শেষ হওয়ার পর নয়-তখনই, সেই মুহূর্তেই। এক রাতে অর্ধনির্মিত টেম্পল অব সলোমনে হিরাম আবিষ্কে কোণঠাসা করে ফেলে তারা। দৃঢ় গলায় দাবি করে পুরো প্রক্ৰিয়াটার জ্ঞান তাদের জানিয়ে দিতে হবে। হিরাম অবশ্যই নরম ধাতুতে গড়া ছিলেন না, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তিটা তিনি তৈরি করতে চলেছেন। স্বভাবতই অস্বীকার করলেন তিনি। টেম্পল অব সলোমনের ডিজাইন হাতে হাতে ঘুরে বেড়ানোর জিনিস নয়। ফলাফল : হিরামকে আক্রমণ করলো তারা তিনজন। শারীরিক নির্যাতন সহ্য করেও টু শব্দটা করেননি হিরাম।”

“ওরা তাকে আক্রমণ করেছিলো হাতুড়ি দিয়ে-কিছু ইতিহাসবিদের মতে,” আচমকা মুখ খোলেন ডক্টর খান, “প্রথম দু-জন হাতুড়ির আঘাতে রক্তাক্ত করে দেয় হিরামের শরীর। তারপর তৃতীয় কারিগর মাথা ছাতু করে ফেলে। ওখানেই মারা যায় হিরাম। মি. সালেহীন, বলে যান। বাধা দেওয়ার জন্য দুঃখিত।”

হালকা নড করে ইরফান, “আমি যেভাবে জেনেছি, তাতে হাতুড়ির বদলে ছেনির ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। তবে এটা ঠিক, আক্রমণ করেছিলো রাজমিস্ত্রিরা আর করেছিলো তাদের নির্মাণ যন্ত্র দিয়েই। আর এভাবেই মৃত্যু হয় মাস্টার মেসন হিরাম আবিষ্কের। যাকে স্মরণ করেই আজকের দুনিয়ার ফ্রি মেসনরা খুলেছে তাদের গুপ্ত সংঘ। তাদের কাছে থাকা গুপ্তজ্ঞান রক্ষা করার জন্য হিরামের মতোই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তারা। গোপনীয়তা রক্ষার জন্য হিরাম যেভাবে নিজের প্রাণ বিলিয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হননি, তারাও সেভাবে রক্ষা করে তাদের গোপনীয়তা। হিরাম তৈরি করতে চেয়েছিলেন টেম্পল অব সলোমন। আর তারা পুণর্নির্মাণ করতে চায় পুরো পৃথিবীকে। মেসনরা পৃথিবী নিয়ে যে পরিকল্পনা করেছে তা অবশ্যই তাদের একধরনের আর্কিটেক্টে পরিণত করেছে, পেশায় তারা যাই হোক না কেন। এরা নির্মাণ করবে নতুন এক পৃথিবী। আজও একজন মেসনকে দীক্ষা নিতে চাইলে হিরাম আবিষ্কের হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটা অনুভব করতে হয়। অভিনয় করে দেখাতে হয় সেই দৃশ্য। এভাবেই তারা হতে পারে একজন ফ্রি মেসন। হিরাম যেমন ছিলেন একজন মুক্ত রাজমিস্ত্রি, সেখান থেকেই ‘ফ্রি মেসন’ নামটুকু এসেছে। মাস্টার মেসনে উন্নীত হওয়ার আগে তারা কোন ধরনের রিচুয়ালে অংশ নিতে পারে না। আগাগোড়াই মেসনরা জন্ম নিয়েছে ওখান থেকে। আর তখন যারা হিরাম আবিষ্কের লাশের কাছে দাঁড়িয়ে ফ্রি মেসনারি চালু করছিলো, তারা প্রত্যেকেই ছিলো ইহুদি।”

বসার ঘরে পিনপতন নীরবতা নেমে এসেছে। বেশ পরিস্কার করেই ফ্রি মেসনদের পণ্ডন ইতিহাস তুলে ধরেছে ইরফান। সবার মনে এখন কিছু প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। নীরবতার কারণ ওটাই। গুপ্ত সংঘটিকে নিয়ে তাদের জানা তথ্যের অভাব আছে। আসিফ এ নিয়ে দুই সিটিং জুড়ে মেসনদের ব্যাপারে শুনে গেলেও তাদের উদ্দেশ্য তারা কিভাবে বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে তার কিছুই বোঝেনি। ডক্টর খানও অনেকদিন ধরেই লেগে আছেন। তবুও খুব একটা অগ্রগতি যে হয়েছে, তা নয়। কোন সংঘ যখন পৃথিবী জয়ের নেশায় নিজেদেও তথ্য গোপন রাখে তা দূর্শ্চিন্তার কারণ হতেই পারে।

তারচেয়েও বড় ব্যাপার, এসব ঘটনা বিদেশের মাটিতে ঘটছে না, যেখানে মেসনরা আজকের দিনে নতুন কোন বিস্ময় নয়। এসব ঘটছে বাংলাদেশের মাটিতে।

“নিউটনের আগ্রহ ছিলো টেম্পল অব সলোমন নিয়ে। স্থাপত্যটির ডিজাইন কেমন হতে পারে তার ওপর উনার গবেষণা চলছিলো। এর সাথে মেসনদের কোন লিংক আছে বলে মনে করো, সালেহীন?” ইরফানের দিকে তাকায় আসিফ।

এবার মুখ খোলেন ডক্টর খানই, “মেসনদেরই শুধু আগ্রহ দেখা যায় না টেম্পল অব সলোমনের দিকে। আরও অনেকে আছে। অ্যালকেমি নিয়ে যথেষ্ট বলেছিলাম আপনাকে, ডিটেক্টিভ। মনে পড়ে কি?”

সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে আসিফ।

“সলোমনের সময় অ্যালকেমির চর্চা যারা করত তাদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছিলেন তিনি। সে সময় বেশিরভাগ অ্যালকেমিস্টই অলৌকিক শক্তির উৎস হিসেবে বেছে নিয়েছিলো শয়তানকে। তাদের কাছ থেকে লিখিত যে কোন বিদ্যা পেলেই সলোমনবাহিনী কেড়ে নিত। আর সেগুলো স্বয়ং শয়তানের আইডিয়া বলে বিশ্বাস ছিলো সলোমনের। কোন মানুষের হাতে যাতে ওসব কাগজ না পড়ে—সেজন্য নিজের সিংহাসনের নিচে পুঁতে রাখেন সব। ইসলাম ধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী, সলোমনের মৃত্যুর পর শয়তান মানুষের রূপ ধরে এসে সিংহাসনের নীচে থেকে ওসব কাগজ খুঁড়ে বের করে সাধারণ মানুষকে দেখিয়েছিলো। সলোমনকে ধ্রুপদী করে সে বলেছিলো সলোমন নিজেই জাদুবিদ্যা চর্চা করতেন। শয়তানের পূজোও করতেন তিনি। সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে ওঠে এসব শুনে। তবে আজকের আরেকদল ইতিহাসবিদ আবার মনে করেন ওই কাগজগুলো উদ্ধার করেছিলো একদল মানুষ। পরবর্তিতে এরাই নাইট টেম্পলার হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেয়। আরেকটি গুপ্ত সংঘ এরাও। ফ্রি মেসনদের থেকেও নিজেদের গোপন রাখার প্রবণতা এদের বেশি।”

“তবে নিউটন কিংবা নাইট টেম্পলাররা আমাদের এই মুহূর্তের ঝামেলা না, ডক্টর।” তাড়াতাড়ি বিজ্ঞ মানুষটাকে থামায় ইরফান, না-হলে আবার নাইট

টেম্পলারদের নিয়ে লেকচার দিতে দিতে রাত কাবার করে ফেলবেন। “এখানে ঝামেলাটা ভিন্নরকম। মেসনরা তাদের মাস্টার মেসন নির্বাচন করতে চলেছে। আর সেজন্য একটি কুমারি বলি দেওয়ার সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছে। আমাদের আগ্রহ এখন ওখানেই। বুঝতেই পারছেন, প্রফেসরের মার্ডারার নিজেই সুইসাইড করেছে, বিজয় ফিরে এসেছে। কিন্তু উন্মাদগুলোকে আর ছয় দিনের মাঝে ঠেকানো সম্ভব না-হলে একটি নিরীহ মেয়ে নিঃসন্দেহে মারা যাচ্ছে।”

চোখ পিটপিট করেন ডক্টর, “আশির দশকে এরকম ঘটনা একবার ঘটেছিলো। মাস্টার মেসন হতে নয়, গ্র্যান্ড মাস্টার মেসন হওয়ার আগে যোগ্য মেসন সদস্যকে একটি কুমারি বলি দেওয়ার প্রথা ছিলো। এটা এখনও ধরে রেখেছে তারা?”

“ব্যাপারটা নিছক কুমারির বলি দেওয়া নয়, স্যার। শয়তানের পূজোর একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে উঠতে হয় তাদের। ইপসিসিমাস। দশম স্তরে উঠতে হলে কুমারির বলি আবশ্যিক।”

“বাদুড় বা ছাগলের বলি দিলেও তো হয়। এই শতাব্দির জ্ঞানী মানুষগুলো কুমারি বলি কেন দেবে?” আসিফকে ক্রু কুঁচকাতে দেখে আবার বললেন, “মেসনরা জ্ঞান বিজ্ঞানে অনেক অ্যাডভান্সড-এটা আমাদের স্বীকার করতে হবে, মি. আসিফ।”

“পাগলের কারবার। মানুষ বলি দিলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।” দীর্ঘশ্বাস ফেলে আসিফ, “ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারছেন তো? মি. সালেহীনের বিশেষ দরকার এখন একটা লোকেশন। মেয়েটাকে তারা বলি দিতে কোথায় নিয়ে যাবে তা তো বুঝতেই পারছেন?”

অবাক হয়ে তাকান ডক্টর, “আরও একটি মেয়েকে এরই মাঝে ধরে ফেলেছে ওরা? একজন ডায়মন্ডের মৃত্যুতে তাদের সময়ক্ষেপন হয়নি মনে হচ্ছে?”

প্রশ্নটার জবাব দিল না আসিফ, “তাকে কোথায় নিয়ে যাবে তারা বলির জন্য সেটা আপনাকে বের করতে হবে, স্যার। এজন্যই আপনার সাথে দেখা করার জন্য একটু বেশিই ব্যস্ততা দেখিয়ে ফেলেছি আমরা।”

“মেসনিক লজেই এমন এক রিচুয়াল করার কথা। মেয়েটিকে ওখানে হত্যা করা হবে, ডিটেক্টিভ। কিন্তু বাংলাদেশে কোন মেসনিক লজ নেই।” মাথা নাড়েন ডক্টর, “একটা ছিল-১৯৪৮ এই বন্ধ হয়ে গেছে। আগেই আপনাকে জানিয়েছি ডিটেক্টিভ।”

“ওটা আবার রি-ওপেন হয়নি তো?” আইডিয়া দেয় জিয়া, “আমরা একবার ওখান থেকে ঘুরে আসতে পারি।”

মাথা নাড়লো ইরফান, “আমি ঘুরে এসেছি কয়েকদিন আগেই। পুরানা পল্টনের রাস্তার পাশে একটা বিল্ডিং। এখন ভূমি অধিদপ্তর পকেটে পুড়েছে ওটাকে। জিপিকে ডানপাশে রেখে ফুটপাথ ধরে হেটে গেলেই পাওয়া যায়। এখন আর ওটা মেসনিক লজ হিসেবে ব্যবহার হয় না।”

“আমার মনে হয়,” আসিফ চিন্তিত স্বরে মুখ খোলে, “ওরা আরেকটু ঘাঁটি বানিয়ে নিয়েছে।”

বিরক্ত হয় ইরফান। “সে তো আমরা জানিই। যেসব মেসন সৈনিকেরা আমার ওপর হামলা চাণিয়েছিলো তারা কোন ডাউনলোড ম্যানেজারে ডাউনলোডেড হয়নি। কোন মেসনিক লজে অবশ্যই দীক্ষা নিয়েছে তারা। দীক্ষা নিতে হয়েছে ইভাকে, ত্রিশিনাকে, ঈশিতাকে, প্রফেসর জালালকে—মোট কথা লজ একটা আছে সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত।”

ওর দিকে তাকায় আসিফ, “আমি বলতে চাইছি, ওরা আরেকটা লজ বানিয়েছে আটচল্লিশ সালের কয়েক বছরের মাঝেই। দেশের পরিবেশ অশান্ত ছিলো সে সময়, ব্রিটিশদের থেকে স্বাধীনতা অর্জন, দেশবিভাগ, ইন্ডিয়া-পাকিস্তানের যুদ্ধ, ’৬৫-এর মাইগ্রেশন...কিন্তু তাই বলে খুব একটা দেরি তারা করেনি।”

চোখ জ্বলে ওঠে এবার ইরফানের, “বলতে চাইছেন, ’৪৮ থেকে ’৬৫-এর মধ্যে নির্মাণকৃত বিল্ডিংগুলোর ব্যাপারে খোঁজ নিতে হবে আমাদের। ইউ আর অ্যা জিনিয়াস, মি. আসিফ! এভাবে ভাবিনি আগে।”

“তারা পরে আবারও লজ পরিবর্তন করতে পারে।” ইরফানের উৎসাহে পানি ঢেলে দেন ডক্টর খান।

মাথা নাড়ে ইরফান। “এই ঘরের সবাই জানে মেসনদের ব্যাপারে। আপনাদের আরও কিছু জানা উচিত। তারা বার বার লজ তৈরির ঝামেলাতে যাবে না। পার্মানেন্ট কিছু থাকা উচিত ওদের। শুধু মেসনরা আমাদের সমস্যা নয়, স্যার। কিছু কথা বলবো এখন, আগে কোথাও শোনেনি আপনি, গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি। সব শুনে ক্রস রেফারেন্সে মেলানোর দায়িত্ব আপনাদের ওপর ছেড়ে দেব আমি।”

মনে পড়ে আসিফের, “বলেছিলে, মেসনরা একা নয়। আরও গুপ্ত সজ্জ আছে এদেশে।”

“আরেকটা, মিথরাস। মিথরাস নামে আরেকটি সজ্জ আছে এদেশের বুকেই। যারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে মেসনদের সাথে। আসলে, তাদের মেসন থেকে আলাদা করাটা কতটা যৌক্তিক তা আমি জানি না।” ইরফান হঠাৎ করেই চুপ হয়ে যায়। ঘরে দ্বিতীয়বারের মতো পিন পতন নীরবতা নেমে এসেছে। এই ব্যাপারে এমনকি ডক্টর খানেরও ধারণা নেই বলে মনে হচ্ছে এখন।

“মিথরাসদের সম্পর্কে কিছুই জানি না আমি।” অকপটে স্বীকার করে নেন ডক্টর খান নিজ মুখেই এবার।

“জানবেন না। এরা নিজেদের ক্লিন রেখেছে শুরু থেকেই। আমার মনে হয় পেছন থেকে এরাই এতদিন মেসনদের নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে। যখন মেসনরা আলোতে চলে আসতে শুরু করেছে তখনও এরা আছে সন্দেহের উর্ধ্বে। আজকের পৃথিবীতে অনেকেই আলোচনা করছে ফ্রি মেসন আর ইলুমিনাতিদের নিয়ে। কিন্তু মিথরাস সম্পর্কে জানে কয়জন?”

সবার আঁহ তার দিকে নিবদ্ধ দেখতে পেয়ে একবার সবার দিকে তাকায় ও, তারপর আবার বলতে শুরু করলো, “মিথরাসের ব্যাপারটা সারা দুনিয়া জুড়ে

আছে—মিথোলজিগুলোতে। সত্যের ছায়া যে থাকতে পারে তা ভেবেও দেখেনি কেউ আগে। আমার কথা বুঝতে হলে প্যাগানিজম সম্পর্কে জ্ঞান থাকা লাগবে। প্রাচীনতম ধর্মবিশ্বাস ওটা। রোমে প্যাগানদের ছড়াছড়ি ছিলো। জ্ঞানেন তো?”

মাথা দোলায় আসিফ, “আগের এক রাতে ডক্টর খান আমাকে আর জিয়াকে ফিল আপ করেছেন প্যাগানদের ব্যাপারে। তারা তাদের সাহায্যে আসা যে কোন বস্তুকেই পূজো করতো। ঈশ্বরের আসনে বসাতো। তাই না? ওদের থেকে তো খ্রিস্টান ধর্মও অনেকাংশে প্রভাবিত? এমনটাই বলেছেন আমাকে ডক্টর খান সে-রাতে।”

মুচকি হাসে ইরফান, “এখানটাতেই ভুল হয় সবার। সবারই। খ্রিস্টান ধর্ম শুধু প্যাগানদের দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। হয়েছে মিথরাস দ্বারা। প্যাগানিজম কোন একক ধর্মবিশ্বাস নয়। অনেকগুলো সমধর্মি বিশ্বাসকে একত্রে আজ প্যাগানিজম বলে। এই বিশ্বাসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালি বিশ্বাস হলো মিথরাইক বিলিফ। ওদের জন্যই আজকের দিনে প্যাগান আর খ্রিস্টানদের মাঝে এত সাদৃশ্য। অথচ মিলটা মূলত মিথরাসের সাথে। দুই ধর্মেরই।”

দরজা দিয়ে মাথা গলিয়ে দেয় ফরহাদ এই সময়, “আপনারা কি খেতে আসবেন? সব কিছু প্রস্তুত।”

একে অন্যের দিকে তাকায় ওরা। এই সময় সরে আসতে চায় না আলোচনা থেকে। তবে নিস্তর্রতা ভাঙেন ডক্টর খানই, “খেতে খেতে আলোচনা শেষ করা যাবে। কি বলেন?”

চিন্তিত ভঙ্গিতে সায় দেয় আসিফ। উঠে দাঁড়িয়েছে সবাই, তাদের অনুসরণ করলো। মাথা ভারি হয়ে আছে বিভিন্ন চিন্তায়। ডক্টর তানভীর জালালের হত্যা রহস্যের সমাধান কি তারা আসলেই পেয়েছে? মেসনদের বাংলাদেশকে নিয়ে পরিকল্পনা কি? কেনই বা এই একবিংশ শতাব্দিতে এসে মানুষ বলি দিয়ে শয়তানের উপাসনায় বিশ্বাস রাখে মেধাতে অনন্য একদল মানুষ?

এই প্রশ্নগুলো বয়ে বেড়াতে বেড়াতে কি খাওয়া দাওয়া করার মানসিকতা আনা সম্ভব? জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকায় আসিফ, কালো রাত বাসা বেঁধেছে ওখানে। একাধিক হত্যা রহস্য, একাধিক কিডন্যাপ কেস, ফ্রি মেসনারি জাদুঘর আর মিথরাস মিলে সৃষ্টি করেছে অন্যরকম এক মিথড্রিয়া।

অশুভ এক মিথড্রিয়া।

একটু আগে যদিও ভাবছিলো অজানা প্রশ্নগুলোর উত্তর জানার আগে গলা দিয়ে খাবার নামবে না-চমৎকার সব ডিশ সামনে সাজানো দেখার পর ওই অনুভূতিটা কোথায় যেন হারিয়ে যায়। খুব বেশি কিছু নয় খাবারের আয়োজন, আবার একেবারে কমও না। চমৎকার করে কাটা গরুর গোশত, আস্ত মাছের ভুনা, বড় বড় পিসের মুরগির ফ্রাই, হরেক পদের সবজি আর পাঁচমিশেলি সালাদ থেকে ভুর ভুরে গন্ধ আসছে। দু-জন হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের গোয়েন্দা, একজন কুখ্যাত অপহরণকারি এবং দু-জন রসায়নের প্রেমে পড়া মানুষ এখন অনুভূতির এক কাতারে চলে এসেছেন নিমেষে। খাদকানুভূতি!

সারাদিন যথেষ্ট ব্যস্ত গেছে। সকাল থেকে ডানার মৃতদেহ উদ্ধারের পর ওটো লজে ঘুরে আসাটাই যথেষ্ট ছিলো একদিনের জন্য। বিকেলে ইরফানের সাথে দেখা হয়ে যাওয়ার ঘটনা ওদের আরও ক্লান্ত করে তুলেছে। অতদ্রুত ঘটনা এগিয়ে যাচ্ছে, আসিফের ভ্রম হয় এগুলো কি একদিনেই ঘটেছে, না তিনদিনে?

ইরফানের জন্যও দিনটি ক্লান্তিকর। ছদ্মবেশে ঘুরতে হচ্ছে আজ সকাল থেকেই। এখনও নকল নাক আর চুল পরে আছে সে। অসপেক্ষকে জেরা করার আগেই বুড়োর মৃত্যু রীতিমত হতাশ করে তুলেছিলো ওকে। তারপর আবারও সৈকতের বাসায় একটা ন্যারো এক্সপের পর নিজের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ওটো লজের ডাটাবেজ ফাঁকা করতে হয়েছিলো। এরপর একজন ডিটেক্টিভের কাছে ধরা পড়ে যাওয়াটা তার কাছে হতাশাজনক, তবে এখানে আরও বৃহত্তর স্বার্থের জন্য কাজ করতে থাকা গোয়েন্দাকে ফাঁকি দেওয়ার কয়েকটা দিক দেখতে পাচ্ছে ও। সারাদিন এত খাটুনির পরও পালিয়ে যাওয়ার জন্য একটা ফাঁক তাকে খুঁজে বের করতে হবে-চিন্তাটা পুরোপুরি সজাগ রেখেছে তাকে।

আসিফের দিকে কোল্ড ড্রিস্কসের বোতলটা এগিয়ে দিতে দিতে মুখ খুলল ইরফান। খাওয়া শুরু করার পর পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেছে, “তাহলে আমরা আমাদের আলোচনায় ফিরে যেতে পারি?”

খাবার থেকে এতক্ষণে মনোযোগ সরে আসিফেরও, “শিওর সালেহীন। বলছিলে খ্রিস্টান আর প্যাগান ধর্ম প্রভাবিত হয়েছে মিথরাস থেকে? তাই না? মিথরাস নিয়ে তেমন কিছু বলার সময় পাওনি এখনও।”

মাথা দোলায় ইরফান, আসিফের সাথে এমনটাই ডিল করতে সে বাধ্য হয়েছে। তাকে মুক্তি দেওয়ার বদলে জানাবে বর্তমানে আসলে ঠিক কি চলছে। তবে ইরফানের বিশ্বাস, আসিফও তার সাথে মাইন্ড গেইম খেলছে। সব শোনার পর চট করে আবার

হ্যান্ডকাফটা পরিয়ে দিতে বাঁধা কোথায়? পিস্তল তো আসিফের হোলস্টারে। ওকে ঠেকাতে পারবে না ইরফান। তবে এই মুহূর্তে কিছু তথ্য দেওয়া ছাড়া উপায়ও নেই। ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে আসিফও তার দিকে তাকিয়ে আছে।

“প্যাগানদের সাথে খ্রিস্টান ধর্মের মূল পার্থক্য হলো, প্যাগানরা পরকাল নিয়ে খ্রিস্টানদের মতো ধারণা রাখে না। স্বর্গ নরকের অস্তিত্বে তারা বিশ্বাস করে না। প্যাগান বিশ্বাস ছিলো পুণর্জন্মের ওপর। একজন মানুষ মারা যাবে এবং আবারও তাকে পাওয়া যাবে পৃথিবীর আর কোথাও, নতুন কারও পরিচয়ে জন্ম নেবে তার আত্মা; এটাই ছিলো তাদের বিশ্বাস। পৃথিবীর কথা যদি তুলিই, প্যাগানদের মূল বিশ্বাস—পৃথিবীর মৌলিক উপাদান চারটি—আগুন, মাটি বাতাস, পানি।”

মুরগির হাঁড় ভাঙার বিদ্যুটে শব্দ করতে করতে আলোচনাতে যোগ দেন বিজ্ঞ ডক্টরও, “ইলুমিনাতিরাও এটা বিশ্বাস করতো, মি. সালেহীন। এজন্যই ইলুমিনাতিদের ধরা হয় প্যাগানদের থেকে আসা একটা বিবর্তিত সঙ্ঘ হিসেবে।”

“তা ঠিক আছে।” সায় দেয় ইরফান, “তবে যেটা বলতে চাইছি, প্যাগানদের খ্রিস্টান ধর্মে ম্যাসিভলি ঢুকে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছিলো সেই রোমে খ্রিস্টান বিজয়ের সময়। সম্রাটরা যদি ধর্মান্তরিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন জনতার ভাল খ্রিস্টান ধর্মেই—তখন সেটা মেনে নেওয়া ছাড়া জনতার উপায় থাকে না। প্রতিবাদীদের ঝোঁটিয়ে বিদেয় করা হলো। খ্রিস্ট ধর্মের ক্রসের ওপর অগাধ বিশ্বাসের প্রচলন তখন থেকেই, প্যাগানদেরও ক্রসকে পবিত্র ভাবার ঐতিহ্য ছিলো। কিভাবে সরে যাবে তারা? জিশুকে হত্যা করা হয়েছে ক্রসে বিদ্ধ করে। বিষয়টা ঘৃণিত হলো না খ্রিস্টানদের কাছে। কয়েক ফোঁটা রক্তকে তারা সম্মানের কারণ হিসেবে দেখালো।”

“আপনাকে যদি আমি প্রচণ্ড ভক্তি করি,” বলল জিয়া, “তাহলে আপনার মৃত্যুর প্রণালীকে আমি ঘৃণা করবো। সেটাকে শ্রদ্ধা করাটা অস্বাভাবিক হওয়ার কথা।”

মাথা দোলাল ইরফান, “প্যাগানরা ক্রসকে শ্রদ্ধা করে। খ্রিস্টানরা সবাই ধর্মান্তরিত নতুন প্রাণ। প্যাগান অভ্যাস তাদের ভেতর থেকে যায়নি। তারাও ক্রসকে শ্রদ্ধা করার সিদ্ধান্ত নিলো। হলি ক্রসের জন্ম তখন। ফায়ার ফেস্টিভাল ছিলো প্যাগানদের উৎসব। জার্মান প্যাগানদের জন্য এটা ঢুকলো খ্রিস্টান ধর্মে। জিশুর জন্ম যেখানে শীতকালে হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই—ওটা হয়েছিলো গ্রীষ্মের দিকে। সেখানে ২৫শে ডিসেম্বরকে জিশুর জন্মদিন বলে পালন করে আজ খ্রিস্টানরা। কারণ, প্যাগানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসবের দিন ছিলো ওই ২৫শে ডিসেম্বর। তবে এটা এখন এমনভাবে খ্রিস্টীয় কাস্টমের সাথে মিশে গেছে—আলাদা করবে কে?”

সবার দিকে চোখ বোলাচ্ছে ইরফান, এক পাশ থেকে জিয়া প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়, “মিথরাসের ভূমিকা তাহলে কি এখানে?”

একটু হাসে ইরফান, এই প্রশ্নের অপেক্ষায়ই ছিলো সে বোঝা যায়, “ম্যানিকিয়েজম। অ্যানি আইডিয়া অ্যাবাউট দ্যাট টপিক?”

ক্র চুলকালেন ডক্টর খান বামহাতে, “প্রাচীন আরেকটা বিশ্বাস। এরা মনে হয় ভাল আর খারাপের মাঝে পার্থক্য দেখতো সব ক্ষেত্রেই। খ্রিস্টান ধর্মের প্রধান প্রতিযোগি এরাই ছিলো সেই আমলে। ম্যানিকান চার্চ আর খ্রিস্টানে ভরে গেছিলো প্রায় পুরো পৃথিবী, এমন একটা পর্যায়ে খ্রিস্টানরা আবারও এগিয়ে যায়। ধীরে ধীরে নেমে আসে ম্যানিকিয়েজম। আর যতদূর মনে পড়ে ফোর্টিনথ সেক্সুরির দিকে একেবারেই থেমে যায় ওরা। আপনি, মি. সালেহীন, মনে হয় আরও বেশি কিছু জানাতে পারবেন। ওদের দিকে স্পেসিফিকভাবে তাকানো হয়নি আসলে...তাই আর কিছু জানাতে পারছি না।”

গরুর বাটির দিকে হাত বাড়ায় ইরফান, “চমৎকার রান্না, ডক্টর।”

ডক্টর খান মুচকি হাসলেন, “আমাদের কৃতিত্ব ভাবলে ভুল করবেন। রান্নার ওপাশে নতুন খুলেছে খাবারের হোটেলটা। রাঁধে দারুণ। ওদের থেকেই আসে এখানে সাপ্লাই।”

হাসিটা ফেরত দেয় ইরফান তাকে, “তো, এই ম্যানিকিয়াজম। এদের কিস্তারটা কেমন ছিলো জানেন সেটা?”

“চীন থেকে প্রাচীন রোম পর্যন্ত,” বলেই তাৎপর্যটা বোঝেন ডক্টর।

“হুঁ। প্রাচীন রোম পর্যন্ত। আর এই ম্যানিকিয়াজমের সাথে টক্কর লাগানোটাই খ্রিস্টান ধর্মের সবচেয়ে বড় ভুল ছিলো। আসলে তারা ছিলো পার্সিয়ান রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত। আলোর সাথে সত্যের তুলনা করতো। আর অন্ধকারের সাথে মিথ্যার। ধর্মবিশ্বাসগুলোর মাঝে এটা কমন ছিলো অবশ্য। তবে ম্যানিকিয়াজমের প্রতিষ্ঠাতা ইরানি সন্যাসি ম্যানির বিশ্বাসটুকু ছিলো কিছুটা এগিয়ে যাওয়া বিশ্বাস। তার মতে, জিশু, বুদ্ধ আর জরথুষ্ট্র যা শিক্ষা দিয়েছেন তা একেবারে ভুল নয়। তবে অসম্পূর্ণ। জরথুষ্ট্র নিয়ে বলতে গেলে এটা খেয়াল রাখা জরুরি ইনিও কিন্তু একজন ধর্মপ্রচারক-যার ক্ষেত্রও ছিলো পারস্য। পারস্যের রিজিওন সবসময়ই পৃথিবী বিস্তৃত ধর্মগুলোর ক্ষেত্রে ভাল ভূমিকা রাখে। যাকগে সে সব, বলছিলাম ম্যানির কথা। ম্যানিকিয়াজমের প্রতিষ্ঠা বলা চলে তার বয়েস যখন চব্বিশ বছর; তখন। তবে যতই সময় যেতে থাকে, ম্যানির অসম্ভব বেড়ে যায়। তার নিজের বাসস্থান এলসাইট সেক্টর মাঝে। এলসাইট কি বোঝেন তো?”

মাথা দোলালেন ডক্টর খান তবে আসিফ মাথা নাড়ে দু-পাশে।

“খ্রিস্ট-ইহুদিদের সম্মিলিত সমাজ বলতে পারেন ওটাকে। ম্যানি তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। কাজেই নেমে পড়লেন তিনি কাজে। জিশুকে তিনি ভণ্ড বলেননি কখনই-জিশুর জীবনকে তিনি ভাগ করেছিলেন তিনটি অংশে। প্রথমত যেখানে জিশু হলেন আলো বিতরণকারি, দ্বিতীয়ত যেখানে জিশু পেলেন নবুয়্যত এবং তৃতীয়ত কষ্ট সহ্য কারি জিশু-ক্রশের ব্যাপারটাও ওখানে ধরা হয়। নিজেকে তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন জিশুর দূত হিসেবে। তার এই ধর্মপ্রচারকে ম্যানিকিয়াজম বলা হয়, খ্রিস্টিয়ানিটি ওটা না। তিনি চেয়েছিলেন জিশুর কাজ সমাপ্ত করতে। অথচ,

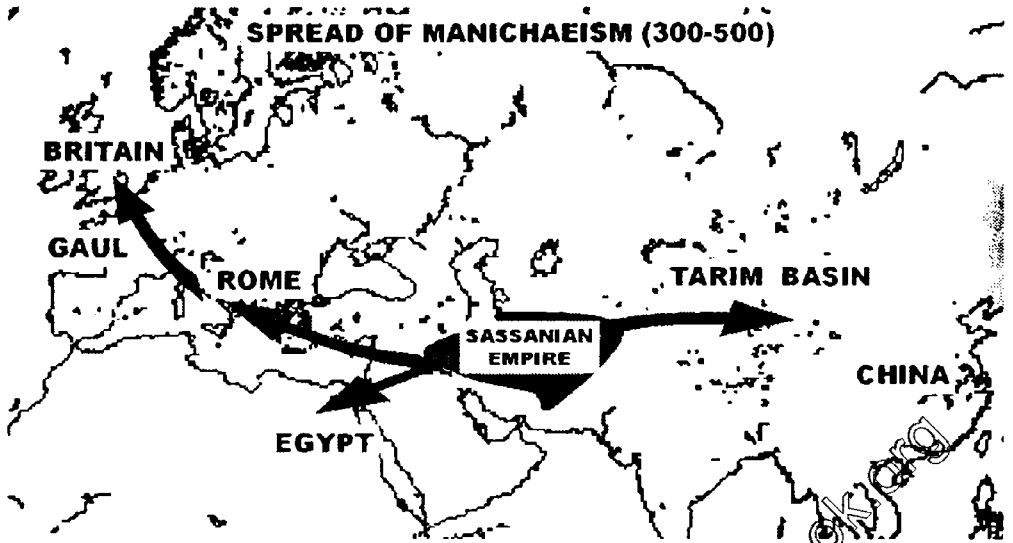


খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী জিশুর কাজ তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। তাছাড়া ম্যানির মাঝে ডুয়ালিজমের বিশ্বাস ছিলো। শয়তানকে তিনি মনে করতেন ঈশ্বরের সমান শক্তির অধিকারি। চার্চের অনেকেই এই রকম ধ্যান ধারণাতে সরে যাচ্ছিলেন তখন-ম্যানিকিয়াজমে। কিন্তু, জিশুর শিক্ষা বলে, শয়তানকে সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর। তারা সমান হতে পারে, এই বিশ্বাস খ্রিস্টানরা রাখে না। ম্যানিকিয়াজমের বিস্তার আপনাদের দেখাতে পারি-ইফ ইউ এক্সকিউজ মি ফর অ্যা মোমেন্ট।”

ইরফান মোবাইল বের করেছে বাম হাত দিয়ে। অনেকক্ষণ পর আবার খাবারের দিকে মনোযোগ দেয় ওরা। টিস্যু পেপার দিয়ে ঠোঁটের কোণ হালকা মুছে জিয়া জানতে চায় এই ফাঁকে, “শয়তানকে তাহলে এরা সুপ্রিম বিইং বলে মনে করতো?”

মোবাইল থেকে চোখ সরে না ইরফানের, তার মাঝেই জানায়, “ক্ষেত্র বিশেষে। আবার অনেকে মনে করতো ইন্টারমিডিয়েরি বিইং-ডেমিয়ার্জ। ঈশ্বরের আদেশ শয়তান পালন করে, এমন। অনেক কৌতুক প্রচলিত আছে, যেখানে গড স্যাটানকে বলছেন জাহান্নামের অবস্থা দেখে আসতে। জাহান্নামের অবস্থা দেখে স্যাটান গডকে রিপোর্ট করছে... ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানেও ডেমিয়ার্জ কনসেন্ট কাজ করে। আজকের যুগে অনেকে এখনও বিশ্বাস করে এসবে। পেয়েছি-”

ইরফান ওদের দিকে মোবাইলটা বাড়িয়ে দিলে সবাই ম্যাপটা দেখতে পায়।



“এই হলো আমাদের ম্যানিকিয়াজমের বিস্তার। ইতিহাসবিদদের মতে এরকমটাই ছিলো তাদের অবস্থান। আপনাদের বলছি-কারণ, স্থানের বিষয়টা ক্রিয়ার করা দরকার আগে। দেখছেন তো-কিভাবে রোমে এসে পরে রোম ছাড়িয়ে চলে গেছিলো এই বিশ্বাস ইংল্যান্ডের দিকে?”

“স্থানের ব্যাপারটা বুঝলাম। সময়?” জানতে চায় আসিফ।

ক্র নাচায় ইরফান, “২৫০ খ্রিস্টাব্দ।”

মাথা দোলান ডক্টর খান, “রোমের জন্য সময়টা অস্থির। খ্রিস্টানদের মেনে নিতে

পারেনি তারা তখন। প্যাগানদের ঝামেলাও ছিলো তখনই। সম্রাট নিরোর সময় থেকে শুরু হয় এই অত্যাচার। নিজেই রোম পুড়িয়ে দোষ খ্রিস্টানদের কাঁধে ভালই চাপিয়েছিলেন তিনি। এগুলো অবশ্য ৬৪ সালের দিকের কথা। তবে ২৫০ খ্রিস্টাব্দ হলে দাঁড়াচ্ছে-ডাইক্লেশিয়ানের সময়। এই সম্রাট এক গুলিতে কয়েক পাখি মেরেছেন বটে। খ্রিস্টানদের সাথে ম্যানিকিয়াজমের অনেক বিশ্বাসিকে দিয়েছেন মৃত্যুদণ্ড।”

কোন্সটান্টিনাস খালি করে ফেলে ইরফান, “তবে এসব বিশৃঙ্খলার শেষ হয়েছিলো কন্সট্যান্টাইনের সময় এসে। ৩২৪ খ্রিস্টাব্দেই খুব সম্ভব-মাফ করবেন আমাকে সালের ব্যাপারটা ভুল হলে, তিনি এসেছিলেন খ্রিস্টানদের সহায়ক হয়ে। আর তখন থেকে রোমের মাঝে খ্রিস্টানদের পদচারণার শুরু। তবে সেই সাথে প্যাগানদের মিশেল চলে আসলো একই সাথে। টেন কম্যান্ডমেন্টসের কথা জানেন তো? খ্রিস্টানদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র এই দশটি নির্দেশ বাক্য। প্রথম কম্যান্ডমেন্টটা কি? এখানে কারও জানা আছে?”

ইরফানের প্রশ্নটা অগ্রাহ্য করে সালাদের পায়ে হামলা চালায় আসিফ, “আমরা খ্রিস্টান নই, সালেহীন। তুমি বলে দিয়ে আমাদের জ্ঞানচক্ষু বিকশিত করতে পারো।”

ডক্টর খান অবশ্য এখানে মুখ খোলেন, “খ্রিস্টানদের প্রথম কম্যান্ডমেন্ট হলো, *“You shall have no other gods before Me i”*

ইরফানের গলাটা কেমন জানি শীতল হয়ে যায়, “প্যাগানদেরও টেন কম্যান্ডমেন্টস আছে, স্যার। প্রথমটা হলো, *‘There is more than one God and Goddess. Do not honor one above another, and respect each individual's right to honor the God or Goddesses of their choice i’*”

“মুখস্ত করে এসেছ নাকি?” অবাক হয় আসিফ, “অবশ্য অপোজিট একেবারেই। প্যাগানরা বহু ঈশ্বরের বিশ্বাস নিয়ে পড়ে ছিলো।”

“জানতে হয়েছে আমাকে, ডিটেক্টিভ। নিরীহ মেয়েটাকে উদ্ধার করার দায়িত্ব আমার, আপনার নয়। হলে এতক্ষণে আপনার মুখ থেকেও প্যাগান কম্যান্ডমেন্ট একে একে বের হয়ে আসতো।” ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকালো ইরফান আসিফের দিকে একবার, তারপর আবার ডক্টরের দিকে মুখ ফেরায়, “সেকেন্ড কম্যান্ডমেন্টটা?”

*“You shall not make idols।* মূর্তিপূজার বিরোধি আদেশ খ্রিস্টান ধর্মে,” জানালেন ডক্টর খান।

“প্যাগানদের সেকেন্ড কম্যান্ডমেন্ট হলো-*All things are created equal, and each thing is created in an image of the All i”*

“জাস্ট দ্য অপোজিট,” নিরাস ভঙ্গিতে বলে জিয়াও।

“থার্ড কম্যান্ডমেন্ট, ডক্টর?” থামে না ইরফান।

*“You shall not take the name of the Lord your God in vain,”* দ্বিতীয় দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন ডক্টর।

“Do no speak ill of the Gods, for each thing that happens happens for a purpose or reason that we may not yet be privy to। প্যাগানদের থার্ড কম্যান্ডমেন্ট।”

মাথা দোলায় আসিফ, “একই সমান্তরালে এগুচ্ছে। এবার অবশ্য একমত হয়েছে দুটো বিশ্বাসের কম্যান্ডমেন্ট। চতুর্থটা কি?”

পানির গ্লাসে একবার চুমুক দেন ডক্টর, “সংক্ষেপে যদি বলি—*Remember the Sabbath day, to keep it holy।*”

“আমিও সংক্ষেপে বলছি,” একটু হাসে ইরফান, “প্যাগানদের চতুর্থ কম্যান্ডমেন্ট—*Keep your holy days sacred।*”

“ওহ মাই—” জিয়া সোজা হয়ে গেছে এবার, “মিলছে কিভাবে?”

“খ্রিস্টানদের পঞ্চম কম্যান্ডমেন্ট, সংক্ষেপে—*Honor your father and your mother,*” বলে চলেছে ইরফান, “প্যাগানদের ক্ষেত্রে তা হলো—*Honor our elders for they hold much knowledge. Follow the instructions of your parents and bring honor to their household।* সিরিয়ালটা খেয়াল করুন, অবিকৃত, তারপরে ষষ্ঠ কম্যান্ডমেন্ট, খ্রিস্টানরা জানে সেটা হলো, *You shall not murder।* প্যাগানরা জানে, *Honor Nature and the spirit of the Earth; do not destroy— any of the God or Goddesses creations without just cause,* সপ্তম কম্যান্ডমেন্ট, খ্রিস্টানদের বিশ্বাস, সেটা হলো *You shall not commit adultery।* প্যাগানদের জানা আছে, তাদের সপ্তম কম্যান্ডমেন্ট—*Regard sexuality as sacred and do not defile it with abusive acts, or use it as an excuse to degrade others।*”

চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে আসিফের, “অষ্টম?”

“খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রে, *You shall not steal* প্যাগানদের জন্য—*Do not set yourself up higher than anyone else, nor take tangible items from another, nor steal their thoughts and present them as your own।* নবমটা হলো, আজকের খ্রিস্টধর্ম অনুযায়ী, *You shall not bear false witness against your neighbor,* যেখানে প্যাগান বিশ্বাসে সেটাই, *Do not speak falsely of others; neither gossip nor lie।* খ্রিস্টানদের শেষ কম্যান্ডমেন্ট *You shall not covet* প্যাগানদের জন্য, *Do not covet what others have; rather, treat your belongings with respect and care।* কি বুঝলেন?”

ডক্টর খান প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকালেন এবার, “প্রথমত বুঝলাম, ভালই পড়াশোনা করেছেন আপনি এদের ওপর মি. সালেহীন। কিন্তু, এখনও কোন সংশয়

নেই, প্যাগানরা যে সংকর ধর্মের জন্য দিয়েছিলো তাই আজকের দিনে খ্রিস্টধর্ম বলে চলে আসছে। তবে আমার যেটা বুঝতে সমস্যা হচ্ছে, মিথরাসদের এখানে আনছেন কিভাবে? এরাও তো একটি সিক্রেট সোসাইটি, তাই না? তবে ফ্রি মেসনরা নিজেদের প্যাগান বলে পরিচয় দেবে না। অথচ মিথরাসদের পরিচয় এখনও যদি মিথরাস থেকে থাকে, প্রাচীনকাল থেকে চলে আসতে থাকা একটা বিশ্বাসকে আমি অন্য চোখে দেখব।”

অনুচ্চস্বরে জানতে চায় জিয়া, “কিভাবে?”

“দেন, দে আর মোর ডেঞ্জারাস,” এক বাক্যে জানিয়ে দিলেন ডক্টর, “এখন, মি. সালেহীন, মিথরাসদের দিকটা আমাদের পরিষ্কার করে বলবেন কি? আপনার মতে প্যাগানদের জন্য এরাই দিয়েছে। পাল্টেছে খ্রিস্টানদের।”

“এখানে আরও একখাপ মজার কাহিনী আছে, ডক্টর। মিথরাসদের বিশ্বাস হলো জেসাস ক্রাইস্ট বলে কেউ ছিলেন না কখনও। কোন জিশুর অস্তিত্বই নেই। ওটা শুধুই একটি কিংবদন্তি।” সবাইকে একেবারে চুপ হয়ে যেতে দেখে মুচকি হাসে ইরফান, চমকে দিতে পেরে সন্তুষ্ট, “প্রাচীন মিশরিয় বিশ্বাস এটা, স্যার। সম্ভবত আমরা বলছি সেই যুগের কথা যখন মানুষ লোহার ব্যবহার শেখেনি, সোনা চিনতে শেখেনি। তবে অন্ধকার গ্রাস করেছিলো তাদের চারপাশ থেকে। বিশ্বাস ছিলো বিভিন্ন মাত্রার। এবং সেই সময়ের বিশ্বাস এতটাই ভারিভাবে চলে এসেছে আজ পর্যন্ত, জিশু নয় শুধু, মোজেস অর্থাৎ মুসা (আঃ)-এর অস্তিত্বকেও তারা অস্বীকার করে। তার জন্মের পর পানিতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলো মুসা (আঃ)-এর মা। স্থানীয় সম্রাট ফেরাউনের লোকজন জানতো এই সময়ে জন্ম নেওয়া শিশুই হত্যা করবে তাকে। কাজেই প্রতিটি শিশুকে হত্যা করছিলো সে তখন। ওদিকে পানিতে ভেসে ফেরাউনের স্ত্রীর হাতে গিয়ে পড়েন মুসা(আঃ)-ইসলামের বিশ্বাস। ইহুদি বিশ্বাস, তিনি পড়েন রাজকুমারির হাতে, এবং এভাবেই রাজকুমার হয়ে বেড়ে ওঠেন ফেরাউনের প্রাসাদেই। ঘটনা তো সবাই জানেন। আর বিশ্বাস করা হয়, মোজেসের জন্য ১৩৯৩ খ্রিস্টপূর্বে।”

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় ইরফান সবার দিকে।

“তো?” জানতে চায় আসিফ।

“তো, টরাস যুগের আরেকটা ঘটনা আমি শোনাচ্ছি এবার, সার্গন নামক শিশুটিকে এভাবেই বাস্তব ভরে পানিতে ছেড়ে দেয় তার মা। ইনফ্যান্টিসাইড থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য। অথচ যে সম্রাট তাকে মারতে চেয়েছিলো সেই সম্রাটের স্ত্রীই কুড়িয়ে নেয় তাকে, আককি ছিলো এই মহিলার নাম। ২২৫০ খ্রিস্টপূর্বের কথা এটা।”

“মোজেসের জন্মের একহাজার বছর আগে!” বিড় বিড় করেন চমকিত ডক্টর।

“এবার মোজেসের সাথে ঈশ্বরের মোলাকাতের কথা যদি বলি-সিনাই পর্বতে দেখা করেছিলেন তিনি খোদার সাথে। সেখানে তাকে দেওয়া হয়েছিলো টেন

কম্যান্ডমেন্টস। যা শুনলেন একটু আগে খ্রিস্টানদের মাঝে টেন কম্যান্ডমেন্টসে তার সাথে বিশেষ পার্থক্য নেই এখানে। তবে প্রাচীন মিশরের ইজিপশিয়ান বুক অব দ্য ডেড থেকে নেওয়া দশটি আজ্ঞা পাওয়া গেছিলো একটি পিরামিডে। ফিফথ ডাইনেস্ট্রির পিরামিড ইউনাস ওটা। অবস্থান সাক্কারা নামক এক স্থানে।

“২৩৭৫ খ্রিস্টপূর্বের এই পিরামিডে ছিলো বেশ কিছু কফিন। যাদের সাথে কিছু আজ্ঞা দেওয়া হয়েছিলো প্যাপিরাসে মুড়িয়ে। এটাকেই ধরে নেওয়া হয় বুক অব দ্য ডেড। উদাহরণ দেই—*Thou shalt not kill, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness against thy neighbor!*”

“ডিয়ার মি!” বিড় বিড় করে এবার জিয়া।

“মিথরাসদের বিশ্বাস এগুলো তাদের নিজস্ব বিশ্বাস। যা পরবর্তিতে চুরি করেছে ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা। বানিয়েছে নিজেদের ধর্ম। আপনাদের আমি এখন জানাচ্ছি, তবে ইজরায়েলিরা জেনেছে আরও আগেই। ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত ছয় লক্ষ ইজরায়েলি চিরুণী অভিযান চালায় সিনাই মরুভূমি জুড়ে। প্রমাণ খুঁজেছে তারা, মোজেসের অবস্থানের প্রমাণ। নিজেদের ভেতর এসেছিলো সংশয়।”

“পেয়েছে কিছু?” শান্তভাবেই জানতে চায় আসিফ।

“ঘোড়ার ডিম। কোন প্রমাণ তারা পায়নি। অথচ মিশরের সেই ইউনাস পিরামিডের লেখাগুলো আর তাদের কার্বন টেস্টিং থেকে পাওয়া বয়স অসঙ্গত। নিখাদ প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে মিথরাসদের বিশ্বাস প্রাচীন। অনেক বেশি পরিমাণে প্রাচীন। তাদেরকে চুরির অভিযোগ দেবে এমন ক্ষমতা ইহুদি বার খ্রিস্টানদের নেই। কিন্তু আছে অত্যাচারের সাথে তাদের নিঃশেষ করে দেওয়ার ক্ষমতা। গত কয়েক হাজার বছর ধরে মার খেয়েছে প্যাগান। মার খেয়েছে মিথরাস। এর পরে তারা শুধু মনোযোগ দেয় জ্ঞান অর্জনের দিকে। গোপনীয়তার শুরু সেই ইহুদিদের প্রতাপের সময় থেকেই সম্ভবত। জিশুর জন্মেরও অনেক, অনেক বছর আগ থেকেই।”

“মিথরাসদের জ্ঞানের দিকে ঢুকে যাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু না। অনেক মার খাওয়া জাতিই এই কাজ করেছে এবং শেষে বেছে নিয়েছে নিখাদ গোপনীয়তা।” মন্তব্য করেন ডক্টর খান।

“এটুকু স্বাভাবিক। তবে ফ্রি মেসন অথবা ইলুমিনাতিদের ব্যাপারটাও এরকমই ছিলো কিন্তু।” সরু চোখে তাকিয়ে বলে ইরফান, “মিথরাসদের জ্ঞানের দিকে ঝুঁকে যাওয়ার ব্যাপারেও ইলুমিনাতিদের মতই যুক্তি পাওয়া যায়। জানতে হবে। নিজেদের জানতে হবে। যতটা সম্ভব। জ্ঞান হলো আলো আর জ্ঞানের মাধ্যমেই তারা বেছে নেয় ধর্মের পথ।”

“মানে, জ্ঞান অর্জনের এক পর্যায়ে তারা বুঝতে পারবে কার উপাসনা করা

উচিত?” আসিফের ভ্রু অনেকাংশেই কুঁচকে গেছে। আরএসএসের সাথে তার কথোপকথন মনে পড়ছে।

“ঠিক সেরকম না। তবে অনেকটা ওরকমই হয়ে যায় তাদের কাজের অর্থ। নস্টিসিজম প্রথম থেকেই ছিলো, নাকি পরে এদের মাঝে ঢুকে গেছে—তা অবশ্য আমরা আজ আর বলতে পারবো না।”

“ওটোর আরএসএস এরকম কিছুই বলেছিলেন আমাদের। তাদের সাধনার ধরণ নস্টিসিজমের মতো, কিন্তু কিছুটা আলাদা।” অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে বসের দিকে তাকায় জিয়া।

আসিফ মাত্র শান্ত ভঙ্গিতে কোন্ড ড্রিংকসে চুমুক দিতে গেছিলো, পরবর্তি কথাটা ওর হাত থেকে ছলকে ফেলে পানীয়। শান্ত কর্তেই বোমাটা ফাটিয়েছে ইরফান।

“মিথরাস লজকে বলা হয় অর্ডো টেম্পলি ওরিয়েন্টিস। সংক্ষেপে ওটো!”

“খাপ খাচ্ছে না ঠিক,” মন্তব্য করলো আসিফ দশ সেকেন্ড পর।

“কোনটুকু? মিথরাসদের সাথে মেসনদের মিল থাকতে পারে, এটা? বিশ্বাস করতে পারছেন না? কেন?”

“কেনেখ গ্র্যান্ট-মানে, মিথরাস লজের প্রধান জানিয়েছিলো তাদের সাথে মেসনদের ঝামেলা আছে। মেসনরা শয়তানের দিকে ঝুঁকে গেছে এমনটা বলে স্বীকারও করেছেন তিনি। ধরলাম, তিনি মিথ্যা বলেছেন। তবে যদি মেসনদের পথেই তারা থাকে, তাহলে খোলামেলা লজ বসানোর মানে কি?”

মুচকি হাসে ইরফান, “খোলামেলা লজ কেন তারা খুলেছে তার ব্যাখ্যা আছে। তবে শয়তান থেকে মিথরাস লজ অনেক দূরে এমনটা ভাবার কোন কারণ নেই। ‘মিথরাস’ শব্দটা থেকে শুরু করি তাহলে। ধীরে ধীরে বুঝতে পারবেন কেন এবং কিভাবে তারা মেসনদের সাথে কানেক্টেড। আর শয়তানের সাথে তো তাদের সরাসরি সম্পর্ক!”

“নামটা থেকে গ্রিক-গ্রিক একটা গন্ধ আসছে।” মন্তব্য করে জিয়া।

“শব্দটা ল্যাটিন। তবে এসেছে গ্রিক থেকেই,” জানায় ইরফান, “প্রাচীন পারসিয়ান দেবতা। এতটাই জনপ্রিয় ছিলো এই দেবতা-পার্সিয়ান ধর্মবিশ্বাস থেকে যখন সব দেবতাদের সরিয়ে দেওয়া হলো, মিথরাস ছিলো তার অধিষ্ঠিত স্থানেই। রোমে মিথরাস ঢুকেছিলো পরে। পূর্ব দিক থেকে আসা দেবতা হিসেবে তাকে তারা দেখে। ষাঁড় বধ করাটা হয়ে গেছিলো মিথরাসের ট্রেডমার্ক। রোমে তাকে শক্তির প্রতীক মনে করা হতো। মেয়েদেরকে মিথরাসের পূজোতে অংশ নিতে দেওয়া হতো না। তবে মিথরাসের পার্সিয়ান দিকটাই বেশি আগ্রহের। এরা মিথরাসকে দেখে এসেছে জ্ঞানের এক আধার হিসেবে। মিথরাস তাদের কাছে সূর্যদেবতা। সূর্যদেবতা হিসেবে মিথরাসকে বেছে নেওয়াটা ওখানেই সীমাবদ্ধ, সেটা বলা যাবে না। এই দেবতাকে প্রধানত ধরে নেওয়া হয় ইন্দো-ইরানিয়ান সূর্যদেবতা হিসেবেই।”

খাওয়া-দাওয়ার পর্ব শেষ প্রায়, ফরহাদ উঠে গেলো ডেজার্টের ব্যবস্থা করতে। ইরফান আবার আগের কথাতে ফিরে আসলো।

“সূর্যকে পূজো করতে থাকা এই মানুষগুলো মূর্খ ছিলো না মোটেও। মিথরাজ্যের ভেতরের অনেকেই প্রসিদ্ধ জ্ঞানী ছিলেন। অ্যাস্ট্রোলজি নিয়ে ভাল ধারণাও ছিলো এদের। এরা জানতেন ২৫ শে ডিসেম্বর সূর্য পৃথিবীর থেকে সবচেয়ে দূরে চলে যায়। খ্রিস্টপূর্ব কয়েক হাজার বছর আগে এই জ্ঞান তাদের ছিলো, বেশ বিস্ময়কর একটা ব্যাপার! নিরক্ষরেখা থেকে সূর্য সবচেয়ে দূরে যাওয়ার পরই শুরু হয় দক্ষিণায়ন। সূর্য দক্ষিণ দিকে হেলে পড়তে পড়তে আবার উত্তরে ফিরে আসে। আর এটাকে মিথরাজ্যে বিশ্বাসিরা ধরে নিলেন সূর্যের পূর্ণর্জনা হিসেবে। আগেই বলেছি প্যাগানরা

পরকালে বিশ্বাস করে না, ওদের কাছে পুনর্জন্ম বেশি গ্রহণযোগ্য হলো। আর ওটা এসেছিলো এই মিথরাস থেকে। প্যাগানিজমের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ধর্ম ছিলো এই মিথরাস। স্বাভাবিকভাবেই এদের বিশ্বাসে পুনর্জন্ম ছিলো। ২৫শে ডিসেম্বরটাকে তাই তারা সূর্যের তথা মিথরাস দেবতার জন্মদিন বলে ধরে নেয়। পুনর্জন্মদিন বলা চলে একে।”

“ওদিকে জিশুর সময়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণকারি অনেকেই জিশুর মৃত্যুর পর বৈকে বসলেন। বললেন, এই মানুষকে অনুসরণ করার কিছু নেই। যিনি নিজেই অসহ্য কষ্ট ভোগ করে মারা গেলেন, শিষ্যদের অসংখ্য সমস্যার মাঝে ফেলে রেখে চলে গেলেন; তাকে অনুসরণ করতে চায়নি তারা। অনেকেই খ্রিস্ট ধর্ম ছেড়ে দিল। ওদিকে ইহুদিরা রোমের রাজত্বে বাস করছেন তখন। তারা রোমান ধর্মের কোন রীতি মানেন না। বরং অন্য কোন ধর্মে পালন করা হয় এমন রীতিকে পরোক্ষভাবেও গ্রহণে এই ধর্মে বাঁধা আছে। খ্রিস্টানরা এই ইহুদিদের কোনভাবেই প্রভাবিত করতে পারলো না। পল নামক এক ইহুদি তো সরাসরি পুরো খ্রিস্টান জাতিকে নাস্তিক বলে ঘোষণা দিয়ে দিলেন। রোমান সম্রাটদের প্রতি ইহুদিদের অসন্তোষ কাজ করছিলো তখন। ওই সময় প্যাগানিজমের মাঝে ডুবে আছে সবাই, হাজারো দেবতা হয়ে গেছে স্বাভাবিক জীবনের প্রতিচ্ছবি। এক ইহুদিরাই একেশ্বরবাদি ছিলো। এক খোদায় তাদের বিশ্বাস অটুট। কাজেই তাদের প্রতি সাধারণ রোমানরা তো বটেই, সম্রাটগণও ছিলেন বিরক্ত। তাছাড়া, রোমের প্রতি ইহুদিদের বীতশ্রদ্ধতা আসে কিছু সম্রাটের বাড়িবাড়িতে। এরা নিজেদের দেবতা ভাবা শুরু করেছিলেন। সম্রাট ক্যালিগুলা প্রথম অকাজটা করলেন। চেয়েছিলেন প্রজারা তাকে দেবতাদের মতোই আরাধনা করুক। উপাসনালয়গুলোতে নিজের মূর্তি তিনি ঢুকিয়েছিলেন। জেরুজালেমে তার মূর্তি প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে ইহুদিরা অস্বীকৃতি জানায়। খোদা একজন, কোন সম্রাটকে তারা খোদা বলে মানার আগে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। ইহুদিরা সংখ্যায় কম ছিলেন না, তাদের সাথে যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতিও নিয়েছিলেন সম্রাট ক্যালিগুলা। তবে তার আগেই আততায়ীদের হাতে তিনি নিহত হন। তবে, ইহুদিদের বিধাতার ক্ষেত্রে একক অনুভূতি আর সে অনুভূতি রক্ষার জন্য তাদের বেপরোয়া ভঙ্গির কারণে তারা দিন দিন রোমানদের কাছে জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে। যেই পল নিজেই কটর ইহুদি ছিলেন, তিনিও খ্রিস্টধর্মে সরে আসলেন। ধর্মপ্রচার চালিয়ে যেতে থাকলেন ঠিকই, তবে এবার ইহুদি নয়, খ্রিস্টধর্ম। বনে গেলেন সেইন্ট পল। তবে খ্রিস্টানদের তেমন বিশ্বাস তাকেও হয়তো হতো না, যদি না রোমে আগুন লাগতো।”

“এটা কি সম্রাট নিরোর সময়?” প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় আদিস।

“হুম। আগুন লাগার পর অনেকে মনে করেন নিরো নিজেই এটা করেছিলেন। চতুর নিরো অবশ্য দোষ চাপিয়ে দেন খ্রিস্টানদের ওপর। অসংখ্য খ্রিস্টানকে হত্যা করা হয় তখন। পল তখন সেইন্ট পল। শুধু মাত্র ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে তাকে এবং সেইন্ট পিটারকে এতটা নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিলো, অন্য ধর্মালম্বিরাও তাদের



জন্য সমবেদনায় চোখের জল ফেলেছিলো। সম্রাটের কাছে তারা এদের মুক্তির জন্য প্রার্থনাও জানালেও যথারীতি তা নাকচ করা হয়েছিলো। তবে এটা খ্রিস্টধর্মের জন্য ছিলো খুবই পজেকটিভ। জনগণের সহানুভূতি অর্জনের পর বাকি কাজটা খুবই সহজ হয়েছিলো। এখান থেকেই খ্রিস্টধর্ম ব্যাপক প্রসার লাভ করে। জিশুর মৃত্যু(!)র তিনদিন পর গুজব উঠেছিলো জিশুকে আবারও দেখা গেছে, আর এখান থেকেই জনতার মাঝে নতুন একটা কৌতুহল জেগে উঠলো। খ্রিস্টধর্ম ছড়িয়ে চলল খুব দ্রুত। ওই সময় পুরো দেশে ২৫শে ডিসেম্বরকে উৎসবের দিন মনে করা হয়—মিথরাস ধর্মটির প্রভাব তখনও অটুট। খ্রিস্টানরা জনপ্রিয়তা পেলেও তাদের প্রধান ধর্মীয় প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে থাকলো এই মিথরাস। তবে, সূর্যের নবীনত্ব পাওয়ার ব্যাপারে উৎফুল্ল মিথরাস অবলম্বিদের খুশিটুকু তাদের কিভাবে যেন ছুঁয়ে যায়। শীতকাল শেষে মিথরাস আবারও তরুণ হয়ে ফিরে আসবেন, প্রথমে শিশু মিথরাস বসন্ত এবং পরে তরুণ মিথরাস প্রখর গ্রীষ্ম হয়ে—উৎসবের জন্য মিথরাজমের বিশ্বাসে এটাই ছিলো মূল কারণ। খ্রিস্টানরা তখনও জানে না জিশু আসলে ঠিক কবে জন্ম নিয়েছেন। তারা মিথরাস দেবতার জন্মদিনের সাথে জিশুর জন্মদিন মিলিয়ে নিলেন। মিথরাস প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে খ্রিস্টধর্মের এটুকুই শেষ না।”

“ক্রশ?” ডক্টর খান অনেকক্ষণ পর মুখ খুললেন।

“হুম। প্যাগান ক্রশ আসলে মিথরাসদের অবদান। পবিত্র ফিগার তাদের কাছে ওটা। হ্যান্ডশেক করাটা খ্রিস্টানরা তাদের প্রথা মনে করে থাকে। তবে মিথরাস ধারণা—হাতে হাত মেলানোর মাধ্যমে আত্মিক বন্ধন বৃদ্ধি পায়। দেখা হলে হ্যান্ডশেক করতো মানব ইতিহাসের প্রথম কোন জাতির বিশ্বাসি হিসেবে এই মিথরাসদেরই দেখা যায়। এটা তাদের মধ্যে খুবই প্রচলিত ছিলো। তারপরে আছে স্যালুট দিয়ে সম্মান দেখানোর প্রথা।”

অবাক হয় জিয়া, “এটাও মিথরাস বিশ্বাস নাকি?”

“সূর্যকে স্যালুট দিয়ে সম্মান জানাতো মিথরাস বিশ্বাসিরা।” তার দিকে তাকিয়ে বলল ইরফান, “সেজদা জাতীয় কিছু তারা করতো না, কারণ, ওটা মাথার ওপরের সূর্যের ক্ষেত্রে খুব একটা খাটে না। কাজেই তারা দিতো স্যালুট। মানব ইতিহাসে প্রথম কোথাও স্যালুটের প্রচলন যদি থেকে থাকে—ওটা মিথরাস বিশ্বাসিদের ক্ষেত্রেই, জিয়া। এগুলো সবই এখন খ্রিস্টান সমাজের সাধারণ প্রথা।”

আগের কথার খেই ধরলো ইরফান, “যাই হোক, যেটা বলা ছিলো—খ্রিস্টানরা তো রীতিমত এগিয়ে গেলো এরপরে। সম্রাট কনস্টেন্টাইন প্রথমে ধর্মটির প্রচার বৈধ বলে ঘোষণা দিলেন, পরে চল্লিশের কোঠায় এসে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের স্বীকৃতিও দিলেন। কাঁটা ঘুরে গেলো, প্যাগান আর মিথরাসরা পড়ে গেলো প্রথমবারের মতো অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে। মিথরাসরা ধীরে ধীরে সবার চোখের আড়ালে চলে গেলো।”

“মিথরাসদের দাবি, খ্রিস্টান ধর্মটা তাদের থেকে এসেছে।” জিয়ার মনে পড়ে কেনেথ গ্রান্টের কথা।

“তা ভাবার পেছনে তাদের যুক্তিও আছে।” গভির মুখে জানায় ইরফান, “জিশুর অস্তিত্ব অবিশ্বাস করে তারা। মনে করে থাকে, সে সময় মিথরাসের প্রভাব আর বিস্তার সহ্য করতে না পেরে আইডিয়াতে সামান্য পরিবর্তন এনে এই ষড়যন্ত্রটা করা হয়েছে। তাদের টেন কম্যান্ডমেন্টস নিয়ে দিব্যি চালিয়ে দিয়েছে খ্রিস্টানরা। শুধু ব্যবহার করেছে একত্ববাদ। মোজেসের ব্যাপারেও তাদের একই মতো। মোজেসের সময়ের আগ থেকেই তারা আছে—কাজেই তারা মনে করে মোজেসের কাহিনীগুলো সবই কপি-পেস্ট। রাণী নেফ্রিতিতিও সূর্যদেবের পূজো করতেন, এটা সর্বজনস্বীকৃত। মিথরাস বিশ্বাসির ধারণা, সার্গন থেকে রানী নেফ্রিতিতির সময়ের মাঝে কোন মোজেসের চিহ্ন পাওয়া যায়নি কখনও। ঘটনা সবই বানোয়াট।”

“কিন্তু, এরা শয়তানের দিকে ঝুঁকলো কখন?” আগের প্রশ্নটা আবার করে আসিফ। হজম করার চেষ্টা করছে প্রাচীন এক বিশ্বাসিদের অলীক সব বিশ্বাসের কথাগুলো।

“প্রথম থেকেই কানেকশন আছে বিষয়গুলোর মধ্যে। মিথরাস শব্দের ব্যবহার অনেক জায়গাতেই হয়, তবে পরিবর্তিত অর্থে। ইন্দো-ইরানিয়ান শব্দ বলেই এটাকে এখন বিশ্বাস করা হয়। ধারণা করা হয় শব্দটা এসেছে ‘মিত্রা’ থেকে। যার অর্থ অ্যাগ্রিমেন্ট, বন্ধু অথবা মিত্র। স্থানভেদে উচ্চারণ পাল্টেছে অবশ্যই। ‘মিইত্রা’ শব্দের ব্যবহার জিশুর জন্মের ১৪০০ বছর আগেও পাওয়া গেছে, হিটটি আর মিতান্নি সাম্রাজ্যের ঝামেলা তখন মিটেছিলো। ইরানিয়ান উচ্চারণে এটা মিথরা। সংস্কৃততে মিত্রা। ভারতসহ অন্যান্য স্থানের হিন্দুদের মাঝে অবশ্য মিত্রা শব্দটাই বেশি গ্রহণযোগ্য। ‘মিত্রা’ একটি দেবতার নাম।”

“সূর্য দেবতা এখানেও?” শান্ত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করেন ডক্টর খান।

“বরুণ, মিত্র, অর্যমা, ভগ, দক্ষ, অংশ, মার্তণ্ড, সূর্য, সবিতা ও ইন্দ্র।” ‘মিত্র’ শব্দটার ওপর একটু জোর দিয়ে বলে ইরফান, “এগুলো হিন্দুধর্ম বিশ্বাসিদের দশটি দেবতার নাম, স্যার। ঋকবেদে এদের একত্রে আদিত্য বলা হয়েছে। বাংলা অভিধান ঘাঁটলে দেখবেন, প্রতিটি শব্দই সূর্যের প্রতিশব্দ। এসব দেবতার মাঝে অর্যমা, ভগ, দক্ষ, অংশ আর মার্তণ্ডকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি কোথাও। মিত্র আর বরুণকে দেওয়া হয়েছে সর্বোচ্চ সম্মান। এরা কখনও ভাই হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন ঋকবেদে, কখনও বা সমকামি দুই পুরুষ হিসেবে। ভাগবত পুরাণমতে, এই মিত্র ও বরুণ অযোনিজ কামে লিপ্ত হয়ে বাল্মিকী ও অগ্যস্ত নামে দুই পুত্রের জন্ম দেন।”

হা হয়ে গেছে জিয়া। আসিফের অবস্থাও সুবিধের নয়। কামের প্রকারভেদ শুনে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে তাদের। ডক্টর খানই শুধু নিষ্কপার।

“এই মিত্রই তাহলে আমাদের মিথরাস?” চিত্তিত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলেন তিনি। ফরহাদ ঢুকেছে আবারও। ট্রে-তে করে সাজিয়ে এনেছে চমৎকার মিক্সড আইসক্রিম আর ফালুদার গ্লাসগুলো।

“একদম তাই, আর এখানেই পাচ্ছেন আপনাদের প্রশ্নের জবাব। হিন্দুধর্মে মিত্র

আর বরুণকে একত্র করে বলা হয় অসুর। অর্থাৎ, শয়তান।” ঘাড় একটু কাত করে ইরফান।

“হিন্দুধর্ম বিশ্বাস যথেষ্ট প্রাচীন এবং তারা এজন্যই একে সনাতন ধর্ম বলে মানে।” টিস্যু দিয়ে মুখ মোছে আসিফ, “কাজেই, যদি তাদের বিশ্বাসে মিত্রকে দেখা যায় সূর্যদেবতারূপে এবং একই সাথে মিত্রকে পাওয়া যায় অন্যান্য প্রাচীন বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত অবস্থাতে, তার ওপর যদি তাকে দেখা যায় শয়তানের সাথে কানেকটেড অবস্থাতে—অবিশ্বাসের কিছু নেই। এটাই আমাদের মিথরাস।”

উঠে দাঁড়ালো ও, “এক্সপ্লেন্ট ওয়ার্ক, সালেহীন। যথেষ্ট জানতে হয়েছে তোমাকে। এক্সকিউজ মি ফর আ মোমেন্ট। হাতটা ধুয়ে নেই। তারপর গুনতে চাইবো বাংলাদেশের সাথে এদের সম্পর্ক কিভাবে সে-ব্যাপারে।”

আসিফের সাথে হাত ধোয়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেলো জিয়াও। সিংকের দিকে এগুতে এগুতে এক পাশে ইরফানকে দেখতে পায় ও। গলা নামিয়ে ছেলেটা বলল, “আমাদের ডিল রাখছো আশা করি। আমাকে হেটে যেতে দেবে তুমি, বিনিময়ে জানতে পারবে সবকিছুর ব্যাখ্যা।”

মাথা দোলায় আসিফ, “তা যেতে পারবে। বাংলাদেশে ঠিক কি ঘটছে সে-ব্যাপারে জানিয়ে আগে আমাকে সন্তুষ্ট করতে হবে তোমার।”

“যতটুকু জানি জানাব, আগেই বলেছি। তাদের উদ্দেশ্য হয়তো বুঝতে পারবে, কিন্তু কিছুই করতে পারবে না। লজের ঠিকানা আমি আজও পাইনি, আসিফ।”

“মানুষকে ঘরবাড়ি উঠিয়ে আনা তোমার পেশা হতে পারে, আমার পেশা ওটা নয়। তথ্য থেকে মানুষ খুঁজে বের করাটা আমার কাজ। আমার কাছে তথ্যগুলো ভিন্ন কোন অর্থ বহন করতে পারে।” এতটুকুই বলে আসিফ। সিংক থেকে সরে এসে ইরফানকে হাত ধোয়ার সুবিধে করে দেয়।

অরক্ষিত লোকটাকে একবার ঠাণ্ডা চোখে দেখলো ইরফান। এখানে নকআউট করে দিতে পারবে ও আসিফ আর জিয়াকে, বিশ সেকেন্ডেরও কম লাগবে সময়। তারপর বড় রাস্তাতে পৌছতে দেড় মিনিট, একটা গাড়ি হাইজ্যাক করে সরে পড়তে সর্বমোট মিনিট পাঁচেক। অনায়াসে হাওয়া হয়ে যেতে পারবে ও। তবে সব কিছু শোনার পর একজন ডক্টর আর একজন গোয়েন্দা কি মন্তব্য করতে যাচ্ছে—তা জানার আগ্রহ কাজ করেছে ওর ভেতরে। ফ্রি উইশডম। এই মুহূর্তে পালিয়ে যাওয়াটা খুব একটা বিচক্ষণ কাজ হবে না।

এখনও সময় হয়নি—মনে মনে ভাবল ইরফান।

ড্রইংরুমে আবারও ফিরে এসেছে ওরা। অন্য কোন দিন হলে সারাদিনের ব্যস্ততা শেষে এরকম চমৎকার খাবার হজম করার পর ঘুমানোর প্রস্তুতি নিতো আসিফ। তবে আজ চোখে ঘুমের লেশমাত্র নেই। মাথার পেছনে আর কপালের বাম দিকে হালকা ব্যথা করছে শুধু। মস্তিষ্ক বিশ্রাম চাইছে ওর কাছে।

বেচারার আবেদন নাকচ করে দিল ও। আত্মহের সাথে তাকালো ইরফানের দিকে। “মিথরাসকে দেখা যাচ্ছে সব ধর্মের মাঝেই কম বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। অথচ এখনকার মানুষ জানে না একেবারেই। ব্যাপারটা অদ্ভুত।”

“রোমে যে মার তারা খেয়েছে, তারপর এক হাজার বছর পরও গোপনীয়তার ছায়া থেকে বের হতে তারা পারেনি। তারপর খুবই সাবধানে নাক জাগিয়েছিলো বলে অনেকে মনে করে। নিজেদের ট্র্যাক যথেষ্ট পরিমাণে ঢেকে রেখেছিলো ওরা। যখন ম্যানিকিয়াজম ধ্বংস হয়ে গেলো—তখনই অদ্ভুতভাবে নাক জাগিয়েছিলো একটি গুপ্ত সঙ্ঘ। আমরা জানি না বিষয়টি কাকতালীয় ছিলো কি না।” ডক্টর খানের দিকে এবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো ইরফান।

“ফিফটিভ সেক্সুরি! ম্যানিকিয়াজমের শেষ, ফ্রি মেসনারির প্রকাশ্য বিচরণ শুরু!” উত্তেজনা খেলা করে ভদ্রলোকের চেহারা, “বলে যান, মি. সালেহীন।”

“খ্রিস্ট ধর্মের এবং খ্রিস্টধর্মের কাছাকাছি অপভ্রংশ ম্যানিকিয়াজম—এই দুটো শক্তির সামনে সম্ভবত তারা জেগে উঠতে চায়নি। কাজেই ম্যানিকিয়াজমের পতনের জন্য তারা অপেক্ষা করেছিলো। আত্মপ্রকাশ করেছে ম্যানিকিয়াজম ধ্বংসস্তুপে পরিণত হওয়ার পর পরই। অনেক মানুষই খ্রিস্টান নামের আড়ালে কটুর মিথরাসপন্থি ছিলেন। এমন মানুষ ছিলেন ইহুদিদের ভেতরও।”

“অথচ, ইহুদিরা মিথরাসদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলো প্রথম থেকেই।” অবাক হয় আসিফ।

“সেটা ঠিক। ফ্রি মেসন আর মিথরাসে ইহুদি গিজ গিজ করেছে, এটা স্বাভাবিক প্রশ্ন। উত্তরটাও সহজ, আগের মতো নেই এখন সবকিছু। এখন তারা যেভাবে কাজ করে, তাতে তাদেরকে আমার নাস্তিক ভ্রম হয়। ধর্মটা খুব একটা বড় ব্যাপার নয় এদের কাছে, শৃঙ্খলাটাই আসল। যার মাধ্যমে পৃথিবীর ওপর কর্তৃত্ব তারা করতে পারবে।”

“শৃঙ্খলা ধরে রাখার জন্য গোপন ধর্মের ফ্রন্টের চেয়ে শক্ত আর কিছুই হতে পারে না,” মন্তব্য করলেন ডক্টর খান।

“ঠিক তাই। যাই হোক—ফ্রি মেসনারি আর মিথরাসের সাথে কানেকশন বোঝানোর আগে আপনাদের আরেকবারের জন্য অতীতের কথা বলি। প্যাগানদের

বিশ্বাস বলে মনে করা হয় এখন একটা ব্যাপারকে, তবে অনেকেই হয়তো জানেন না বিশ্বাসটা ছিলো স্পেসিফিকভাবে মিথরাসদের। তারা পৃথিবীর মৌলিক উপাদান ভাবত চারটি জিনিসকে। আগুন, বাতাস, মাটি এবং পানি।”

আন্তে করে মন্তব্য করে জিয়া, “ইলুমিনিতাস!”

“১৭৭৬ এ বাভারিয়ায় ইলুমিনাতাসদের উৎপত্তি। আমেরিকার জন্মের ঠিক দু-মাস আগে। মাত্র দু-মাস আগে।” গুরুত্ব দেয় ইরফান এই কথাটাকে।

ডক্টর রমিজ খান হেলান দিলেন সোফাতে ক্লান্ত ভঙ্গিতে, “ফ্রি মেসনদের প্রকাশ্য যাত্রা শুরু ১৪২৫-এরও আগে। ইতিহাসবিদেরা ওই সময়ের পর্যন্ত ডকুমেন্টারি পেয়েছেন ফ্রি মেসনারির বিষয়ে। তখন থেকে তারা ওপেন সিক্রেট। তাদের উৎপত্তি টেম্পল অব সলোমন হোক আর প্রাচীন মিশরিয় সভ্যতাই হোক, পুরোটা সময় লুকিয়ে থেকে ঠিক ওই সময় নাক জাগিয়েছিলো কেন তারা? কারণ, তখন তারা অ্যাকশনে নামতে শুরু করেছে কেবল। টাইম গ্যাপটা খেয়াল করুন, যখন আমেরিকার জন্ম নিয়ে তারা প্রায় নিঃসন্দেহ-ইলুমিনাতিরা বাভারিয়াতে প্রথমবারের মতো মোটামুটি গা ছাড়া দিয়ে এক সিক্রেট সোসাইটি খুলে বসলো। আমি বলবো, তারা যেটা খুলেছিলো, তা একটা ওপেন সিক্রেট সোসাইটি।”

টুকরোগুলো জোড়া লাগানোর চেষ্টা করে আসিফও, “তাহলে, মিথরাসদের পরিবর্তিত রূপ ফ্রি মেসন নাম নিয়ে এগিয়ে এসে নিজেদের শক্ত একটা স্থানে দাঁড় করিয়েছিল? তারপর নিজেদের অবস্থান নিশ্চিত হতে ট্রায়াল ভার্সন ইলুমিনাতাসকে আরেকটু খোলামেলাভাবে ছেড়েছে। হিট খেলে যাতে ইলুমিনাতাস খায়, ফ্রি মেসন থাকে অক্ষত। আর গোড়া অর্থাৎ, মিথরাসদের ব্যাপারে যাতে সবাই থাকে অন্ধকারে!”

হালকা নড করে ইরফান, “এমনটা ভাবলেই শুধু মিলে যায় সব। ইলুমিনাতাস একেবারে সিক্রেট ছিলো না, আবার এরা নিজেদের সব কথা হড়বড় করে বলেও বেড়াত না। তবে ফ্রি মেসনদের চেয়ে ইলুমিনাতিরাই আগে চোখে পড়ে গেছে। সম্ভবত এটা তাদের প্ল্যানের অংশই ছিলো। তারপর ফ্রি মেসনারির দিকে আসুন। মিথরাসদের সাথে গঠনগত এত মিল এদের আছে সন্দেহ না করে আসলেই পারা যায় না। মেসনদের তিনটি গ্রেড-অ্যাপ্রেন্টিস, ফেলোক্র্যাফটস আর মাস্টার মেসন। মিথরাসদের গ্রেড সাতটা। ফ্রি মেসনদের উৎপত্তি টেম্পল অব সলোমনের মাস্টার মেসনের মৃত্যুর পর। খ্রিস্টপূর্ব সাড়ে নয়শ’র দিকের ঘটনা। মিথরাসরা প্রাচীনতম। এধরণের পার্থক্য দেখবে পৃথিবী। তবে গোপনীয়তা রক্ষা, জ্ঞানচর্চা আর পৃথিবীর ওপর আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে এদের মিল, একেক সময়ে একেকটি সোসাইটির বিপ্লবের সময়কাল আর ব্যাপ্তি, প্যাগানদের রীতি-নীতির সাথে বেশ কিছু ভয়ঙ্কর মিল, ধর্মগুলোকে রূপকথার গল্প বলে প্রচারের ক্ষেত্রে তাদের যুক্তিগত মিল দেখে আমার মনে হয় না এরা খুব একটা আলাদা কিছু।”

একমত হলেন ডক্টর খানও, “ইলুমিনাতিরা যখন পৃথিবী জয়ের অভিলাষ নিয়ে আচমকা জেগে উঠেছে—ততদিনে ফ্রি মেসনদের আমেরিকা গঠনের স্বপ্ন পূরণ হয়ে গেছে। ১৭৭৬ এ আমেরিকার জন্য, একই সময় ইলুমিনাতিরও পত্তন। ঠিক বলেছেন আপনি, মি. সালেহীন। সম্ভবত এটা ছিলো তাদের পরীক্ষামূলক সম্প্রচার। তারা দেখতে চেয়েছে সাধারণের কাছে তাদের বিশ্বাসের গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু। ইলুমিনাতি নামে সংগঠনকে লক্ষ্য করেছিলো ওরা। তারপর দেখা গেলো, জনতা থেকে শাসকশ্রেণির রোষানলে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেলো ইলুমিনাতি। কাজেই, ওরা ফ্রি মেসনারিকে আড়ালেই রাখলো। বুঝে গেলো, এখনও লোক তাদের প্রকাশ্যে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠেনি। ইউ আর ড্যাম রাইট!” উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন প্রৌঢ়, “তবে মিথরাস নামে এরা কবে এবং কেন আত্মপ্রকাশ করেছে—সেটা আমার বোধগম্য হলো না।”

তার দিকে ফিরে ইরফান, “অর্ডো টেম্পলি ওরিয়েন্টিস নামে সজ্জাটি অ্যানালিস্টার ক্রাউলি সাহেব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ১৯১০-এর দিকে। এসব মানুষের দূরদর্শিতার প্রশংসা করতেই হয়। হাজার বছরের প্ল্যান নিয়ে কাজ করতে তারা অভ্যস্ত। পৃথিবীটা এরা পঞ্চাশ বা একশ বছরে অধিকার করার প্ল্যান নিয়ে মাঠে নামেনি। তাদের প্ল্যান হয় হাজার বছরের।”

“ফ্রি মেসন আজকের দিনে বেশ পরিচিত নাম,” মন্তব্য করে আসিফ।

“হিরাম কী বইটি প্রকাশের পর থেকে ফোকাসে আসে তারা। ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত বইটি লেখেছিলেন দু-জন ফ্রি মেসন। তুলে ধরেছিলেন তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারগুলো। এরপরে আর গোপন সোসাইটি হিসেবে থাকতে পারেনি মেসনরা। এটাও হয়ে গেছে ওপেন সিক্রেট।”

“অ্যানালিস্টার ক্রাউলি—ইনি কি আগেই ধারণা করেছিলেন এমন কিছু একটা আসতে যাচ্ছে?” ডক্টর আনমনে বলেন।

“খুব সম্ভব। নতুবা আমি অন্তত আর কোন যুক্তি দেখছি না। মিথরাসকে টিকিয়ে রাখতে ব্যাক-আপ সোসাইটি তিনি খুলে রেখেছিলেন, নিশ্চয় ফ্রি মেসনের পতন ঠেকানোর জন্যই। আজ ভেবে দেখুন—ড্যান ব্রাউনের মতো লিভিং লিজেন্ড পর্যন্ত ইলুমিনাতি আর ফ্রি মেসন নিয়ে আলোচনা করেছেন অনেক জায়গাতেই। কিন্তু তিনিও মিথরাসদের তেমন গুরুত্ব দেননি। দেওয়ার কথাও নয়। মিথরাস এভাবেই আরও কয়েকশ বছর লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে যেতে পারবে বলেই আমার মনে হয়, আলোতে আসার সম্ভাবনা দেখলে ওরা আরেকটা সোসাইটি খুলে ফেলবে। এটাই ওদের ট্রিকস। এজন্যই আমরা শত শত সিক্রেট সোসাইটি দেখে বিভ্রান্ত হই, অথচ সবই একই সূতোতে গাঁথা। যতদিনে তারা পুরো পৃথিবী অধিকার করতে না পারছে, ততদিন এরকমটাই চালাবে তারা।”

“তাহলে, আজকে বাংলাদেশের বুকে ফ্রি মেসন আর মিথরাসরা এক

হয়েছে—এটাই হলো সামারি? নিজেদের ওরা চক্র বলে ডাকে এখন?” উপসংহারে পৌছতে চাচ্ছে আসিফ।

“ফ্রি মেসনরা অনেক আগে থেকেই এদেশে আছে। একেবারে সুপ্ত অবস্থাতে।” জবাব দিল ইরফান, “তারা চাইছে এখন সবকিছু নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আসতে। ওদের আসলে বলা উচিত প্রাচীন মিশরীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসি। আমি নিজেও এখন আর নিশ্চিত না, তারা কতটা বিশ্বাস করে ওসব ব্যাপারে। তবে সজ্জবদ্ধতার দিক থেকে দুর্ভাগ্য কোন ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির চেয়ে বেটার তারা। ফ্রি মেসন আর মিথরাসদের আলাদা কিছু হওয়ার প্রশ্নই আসে না। তাদের লোগো কি এখনও দেখেননি আপনারা?”

“অর্ডো টেম্পলি ওরিয়েন্টেসের?” কৌতূহলি হয়ে ওঠে জিয়া, “না, দেখিনি। লজ থেকে ঘুরে এসেছি আমরা। কিন্তু কোন চিহ্ন চোখে পড়েনি।”

মাথা নাড়লো আসিফ, “ছিলো, তবে সম্পূর্ণটা দেখতে পাইনি। ঢাকা ছিলো ওটা। একটা পেইন্টিংয়ের নীচে। বাজপাখি টাইপ কিছু একটা থাকে সম্ভবত?”

শিম্বের দিকে একবার তাকায় আসিফ। জিয়ার উচিত হয়নি সিনে গিয়ে একটা রু পুরোপুরি মিস্ করা।

“এক সেকেন্ড।” মোবাইল বের করে আবার ইরফান, “এবার দেখুন।”

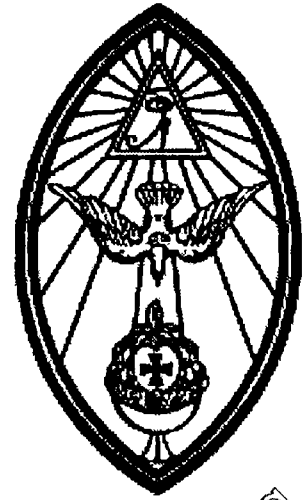
ধাক্কাটা অপ্রত্যাশিত ছিলো না, তবে চমকে ওঠে আসিফ আর জিয়া।

“পিরামিড এবং তার ওপরের চোখের ব্যাপারটা এতটা মিলে যাচ্ছে কেন সবার ক্ষেত্রে?” বিড় বিড় করে জিয়া।

“শুধু তাই নয়। দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে আলোকছটা বের হচ্ছে সেই চোখটাকে কেন্দ্র করে। হালকা পরিবর্তিত হলেও ফ্রি মেসনিক

লোগোতে এরকম একটা থিমই ব্যবহার করা হয়েছে। ইলুমিনাতিদের থিম মেলে ধারণাটির সাথে। তাছাড়া, আমাদের মিথরাস লজ ফাউন্ডার ক্রাউনিংগের দুর্নাম আছে শয়তানের পূজারি হিসেবে। নেটে হালকা সার্চ দিলেই জানতে পারবেন। একই সাথে ইনি একজন প্রসিদ্ধ ফ্রি মেসন, একই সাথে গর্বের সাথে নিজেকে শয়তানের পূজারি বলে ঘোষণা দিতেন। কি মনে হচ্ছে? এখনও কাকতালিয়?” ক্র নাচায় ইরফান।

একটু ইতস্তত করে ওরা। এসব সিক্রেট সোসাইটিগুলোর মাঝে কোনরকম সংযোগ নেই সেটা বলার মতো সামান্য কোন ফাঁকও রাখেনি ইরফান। স্পষ্টভাবেই তুলে ধরেছে সব কিছু।



“এতকিছুর পর আর সন্দেহ চলে না। বাংলাদেশ নিয়ে তাদের প্ল্যান কি?” চিন্তিত মুখে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় আসিফ।

“রোডেশিয়া বলা হতো জিম্বাবুয়েকে, সেটা জানেন তো?” পালটা প্রশ্ন ছোঁড়ে ইরফান।

প্রসঙ্গ পরিবর্তনে অবাক হয় জিয়া, “হুম। তাতে কি?”

“সেসিল জন রোডস ছিলেন এই জিম্বাবুয়ের ফাউন্ডার। রোডেশিয়া নামটা এসেছিলো তার নাম থেকেই। ব্রিটিশ ব্যবসায়ি। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভাল একটা সময় কাটিয়েছেন তিনি। আফ্রিকার সে এলাকার নাম রোডেশিয়া দেওয়া হয়েছিলো ১৮৯৫ সালে। সেসিল রোডসের জীবনটা কিছুটা দুর্ভোগের ছিলো। ষোল বছর বয়সে বাড়ি ছাড়তে হয়েছিলো তাকে। লোকাল এক দুরারোগ্য ব্যাধির ঝুঁকিতে ছিলেন তিনি। সেই থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার কিম্বার্লিতে চলে আসলেন, পরবর্তি ১৭ বছরের জন্য। এবং ওখান থেকে ইংল্যান্ডে ফিরে এসেছিলেন ১৮৭৩এ। ওরিয়েল কলেজে একটা টার্ম ক্লাস করার জন্য।”

“মাত্র?” দু-হাত একত্র করে জানতে চায় আসিফ।

“মাত্র একটা টার্ম শেষ করার পাশাপাশি আরেকটা ছোট্ট কাজ তিনি করেছিলেন। অ্যাপোলো ইউনিভার্সিটি মেসনিক লজে ফ্রি মেসন হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। তারপর আবারও ফিরে গেছেন দক্ষিণ আফ্রিকায়।”

“চমৎকার। আরেকজন ফ্রি মেসন। ইনার পড়াশোনা তাহলে শেষ করলেন কোথায়? সাউথ আফ্রিকা থেকে ইংল্যান্ডের দূরত্ব তো ব্যাপক। ইন্টারনেটে অনলাইন ক্লাস করার উপায়ও তখন ছিলো না।”

“এজন্য তার কোর্স শেষ করতে পাক্কা আট বছরও লেগে যায়। তবে এই মানুষটার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে আমাদের আলোচনা করাটা এখন জরুরি না। যে কারণে আপনাদের দৃষ্টি এই রোডসের দিকে তুলে ধরতে হয়েছে, ফ্রি মেসন হিসেবে তাকে সন্দেহ করা হলে তিনি উত্তর দিতেন না প্রথম দিকে। গোপনীয়তার ব্যাপারটা ছিলো। তবে পরবর্তিতে হালকা ধারণা থেকে শক্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই সাথে এটাও জানা যায়, সমগ্র পৃথিবীকে ইংল্যান্ডের পদতলে আনার জন্য তিনি নিজেও একটি সিক্রেট সোসাইটি নিয়ে কাজ করছেন। ১৯০২ সালে মারা যান তিনি।”

ডক্টর খান সরু চোখে তাকালেন, “১৯১০ এর দিকে অ্যান্টিস্টার ক্রাউলি মিথরাস খুলে বসলেন। পেছনে কি আমাদের এই রোডস সাহেবের ভূমিকা ছিলো? ইংল্যান্ডের পদতলে আনতে চেয়েছিলেন তিনি বিশ্বকে, না সেই সোসাইটির পদতলে?”

মাথা নাড়ে ইরফান, “প্রশ্নগুলোর উত্তর আমরা কোনদিনও জানতে পারবো না। অনেক কিছুই সন্দেহ করা যায়। তবে আমাদের ধারণা যে সঠিক পথেই যাবে, তা নয়। তবে, ধরে নিতে পারি, মিথরাসের সাথেই তার যোগাযোগ ছিলো। ফ্যাক্টস সেদিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। আমাদের এই রোডস সাহেবই প্রথম আন্তর্জাতিক বৃত্তি ব্যবস্থা



‘রোডস স্কলারশিপ’ চালু করেছিলেন। এখন পর্যন্ত এই স্কলারশিপকে মনে করা হয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সবচেয়ে সম্মানজনক স্কলারশিপ। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রদের পড়ার সুযোগ করে দিতে এই স্কলারশিপ দেওয়া হয়। টিউশন ফি সম্পূর্ণ ফ্রি হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি ছাত্র বা ছাত্রটির থাকার এবং পকেট খরচ বহন করে থাকে রোডস ট্রাস্ট। রোডস হাউজে তাদের মুক্ত বিচরণ করার অধিকার দেওয়া হয় সেই সাথে। আর গত একশ বছর ধরে রোডস স্কলাররা অক্সফোর্ড ছেড়েছেন কাজ হাতে নিয়ে, বেকার বের হননি একজনও। সময়ের সাথে রোডস স্কলারদের দেখা গেছে পৃথিবীর অনেক দেশে ছড়িয়ে যেতে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অধিষ্ঠিত হতে। তাদের দেখা যায় শিক্ষকতা, কলমপেশা, মেডিসিন এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাথে যুক্ত থাকতে, রোডস স্কলাররা আইন, মিলিটারি এবং পাবলিক সার্ভিসে ফ্রিকুয়েন্টলি ঢুকে পড়েছে এবং পড়ছে। একারণেই স্কলারশিপটার এতটা মূল্য দেওয়া হয়ে থাকে আজও।”

“সফল সফল সব স্টুডেন্ট বের হচ্ছে আমাদের সেসিল জন রোডসের রেখে যাওয়া স্কলারশিপ এবং ট্রাস্টের মাধ্যমে।” সোফার হাতলে টাটু বাজালেন ডক্টর খান, “যেই রোডস ছিলো একজন ফ্রি মেসন এবং ইংল্যান্ডের হাতে সারা পৃথিবীর ক্ষমতা তুলে দেওয়ার মাস্টারপ্ল্যানার। বীজ বুনে দিয়ে যায় এরকম মানুষেরা। নিজের কাজটা অন্য কেউ শেষ করে যাবে সেই লক্ষ্যে বোনা হয় বীজ।”

চমকে উঠলো আসিফ, “আপনি বলতে চাইছেন, রোডস চেয়েছে তার রোডস স্কলাররা হাতে দায়িত্ব তুলে নেক? প্রশাসনিক শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু, অক্সফোর্ডের এই স্টুডেন্টগুলো আসলে ঠিক কোন ধরনের মানসিক শিক্ষা নিয়ে অক্সফোর্ড থেকে বের হত-তা জানার উপায় কি আজ রয়েছে?”

ডক্টর কিছু বলার আগেই মাথা দোলায় ইরফান, “ধারণা করা হয় শুধু মাত্র মেসনদেরকে দেওয়া হয়ে আসছে এই স্কলারশিপ। আপনি মেসন না হলে যতই ব্রিলিয়ান্ট হন, রোডস স্কলারশিপ আপনাকে দেবে না ওরা। কারণ, রোডস হাউজ একটি মেসনিক লজ। অক্সফোর্ড লজ নম্বর ৩৫৩। ফিফথ মেসনিক ডিস্ট্রিক্ট।”

ঘরের মাঝে আবারও পিনপতন নীরবতা নেমে এলো। মেসনদের বিস্তৃতির ব্যাপারটা তারা আগে থেকেই জানে, তবে যতই স্পষ্ট হয়ে আসছে ছবিগুলো, ততই যেন একটা প্রকট কোন অশুভ শক্তি হিসেবে দেখা দিচ্ছে সেটা মনস্তান করে। বার বার। চারপাশ থেকে চেপে ধরছে যেন অশুভ সে শক্তির জাল।

“বেশ।” অবশেষে আসিফই নীরবতা ভাঙে, “সেসিল রোডস একজন ফ্রি মেসন। তিনি একেবারে আনুষ্ঠানিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে মেসনদের পৃথিবীর বুকে প্রেজেন্ট করছেন। আক্ষরিক অর্থেই ব্রাইনের লড়াইয়ে নামানো হয়েছে-ইভেনচুয়ালি আসছে পাওয়ার। তাতে বাংলাদেশের কি আসছে যাচ্ছে? রোডসের গল্প আমরা শুনি কেন?”

আঙুল মটকাল ইরফান, বিচ্ছিরি শব্দটা মিলিয়ে যাওয়ার পর আশ্তে করে জানায়,  
“বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর তাওহীদ খান, বাংলাদেশ আর্মি চিফ জাহিদ  
ফরমান, পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেলিম রিজভী-প্রত্যেকেই ছিলেন রোডস স্কলার।”

ইরফানের মুখের দিকে চুম্বকের মতো আটকে আছে এখন ঘরের প্রতিটি মানুষের  
দৃষ্টি।

“রোডস স্কলারশিপের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন আরেকজন মানুষ। যিনি সেই  
স্কলারশিপ প্রত্যাখ্যান করে পরবর্তিতে হারভার্ডে ঢুকে পড়েন। একেও আপনারা  
চিনবেন হয়তো। ডক্টর তানভীর জালাল!”

BanglaBook.org

চমৎকারভাবে নিজের ধারণাটা সবার সামনে তুলে ধরে নেমে এলো মানুষটা। বসে থাকা প্রত্যেকে হাততালি দিয়ে তাকে স্বাগত জানায়। তাদের দিকে তাকিয়ে হালকা হাসি দিলেন তুলনামূলক তরুণ গবেষক। তারপর বিশাল হলরুমের পেছন দিকে চমৎকারভাবে সাজানো ড্রিংকসের টেবিলের দিকে এগিয়ে যান তিনি। ঠাণ্ডা বরফের মাঝে ডুবে থাকা একগাদা কাঁচের বোতল থেকে একটা মাউন্টেইন ডিউ তুলে নিতেই অন্য মানুষটাকে দেখা যায়। ভদ্রতার একটা হাসি দিয়ে একহাতে ধরে থাকা ড্রিংকসের গ্লাসটা তুলে ‘চিয়াস’ জানাচ্ছেন এই মুহূর্তে। তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে আসলেন সামনে।

“আপনি নিশ্চয় রিয়াজুল করিম। দ্য লিভিং লিজেন্ড। ডক্টর তানভীর জালালের সাথে সরাসরি কাজ করার অভিজ্ঞতা আপনার ছিলো।” হাত বাড়িয়ে দেন তিনি, “আমি মোর্শেদ আলম। ইটস আ প্রেজার টু মিট উইথ ইউ।”

মুচকি হেসে হাতটা ঝাঁকায় রিয়াজ, “নোপ। দ্য প্রেজার ইজ মাইন। আমাকে রিয়াজ বলেই ডাকতে পারেন। আপনি সম্ভবত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আছেন?”

কাঁধ ঝাঁকলেন মোর্শেদ, “শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়ার সুবিধে আছে কিছু। কাজ করার অনেক সুযোগ আর সময় থাকে। থাক সে কথা, আপনার জন্য তো নতুনও নয় ঠিক।” হাসলেন তিনি, “আজ আপনার কথাগুলো আমাকে ইমপ্রেস করেছে, মি. রিয়াজ। বায়োকেমিস্ট্রির দিকেও আপনার আগ্রহ আছে, সেটা আমার জানা ছিলো না। সত্যি কি আপনি বিশ্বাস করেন গ্রাফাইট-বেস ন্যানো কম্পোসাইট থেকেও বেটার ফটো ক্যাটালিস্ট কাজে লাগানো সম্ভব?”

মাথা দোলাল রিয়াজ, “অফকোর্স। তবে সেটা হোমোজিনিয়াস হবে না। হেটেরোজিনিয়াস ফটো-ক্যাটালিস্ট। অ্যামরফাস ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড দিয়েই বেটার ফটোক্যাটালিস্ট প্রস্তুত করা সম্ভব।”

দীর্ঘ একটা ছায়া পড়ল এসময় ওদের টেবিলে। কেউ একজন আলোটা ঢেকে দাঁড়িয়েছে। মাথা একটু ঘুরিয়ে লোকটাকে দেখে রিয়াজের চেহারাতে হালকা বিরক্তি ফোটে। মানুষটাকে দেখতে পারতেন না ডক্টর তানভীর জালাল কাজেই দেখতে পারে না রিয়াজও। তাকে সহ্য করা লাগছে, কারণ সেমিনারে জড়িয়ে রয়েছেন ইনিও।

“আমি কি আপনাদের আলাপের মাঝপথে বাধা দিলাম? এক্সট্রিমলি সরি, জেন্টলমেন।” মুখে দুঃখপ্রকাশের সামান্যতম চিহ্নটুকুও রেখে বললেন ডক্টর রমিজ খান, “আসলে, আপনার সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য দুই ভদ্রলোক আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এই মাত্র। দেখা যাচ্ছে, আপনি এখানে যথেষ্ট পপুলার, মি. রিয়াজ!”

মুখটা বিরক্তিতে আরেকটু কুচকে যাচ্ছিলো রিয়াজের, আসিফকে কালো কোটে

দেখতে পেয়ে রাতারাতি সরে গেলো সেই অভিব্যক্তি। আঙুঠে করে ফিরে তাকায় ও প্রফেসর মোর্শেদের দিকে, “কিছু মনে করবেন কী...যদি আলোচনাটা আমরা পরে শেষ করি?”

“ইটস ফাইন, স্যার।” গ্লাসটা তুলে ধরে বলেন মোর্শেদ।

আসিফের দিকে এগিয়ে আসে রিয়াজ, দুই চোখে ফুটে উঠেছে ভীতি।

“থ্যাংকস গড! আপনি এখানে!” তীব্র আতঙ্ক ঢেকে রাখতে গিয়েও পারে না রিয়াজ।

অবাক হলো আসিফ, “ভেবেছিলাম আপনি আমাকে দেখে বিরক্ত হবেন। কেমিস্ট্রি ঠিক আমার ঘরবাড়ি না।”

রিয়াজ আসিফের মতো এত শান্ত থাকতে পারে না, “আপনি ডিটেক্টিভ আসিফ আহমেদ, অ্যাম আই রাইট? মানুষের চেহারা সহজে ভুলি না আমি। আই নিড ইয়োর হেল্প, মি. আসিফ।”

তাকে ইস্তিতে এককোণে থাকা কিছু খালি চেয়ার দেখায় আসিফ, “চলুন কথা বলা যাক।”

দ্বিতীয়বার বলতে হয় না তাকে। চেয়ারগুলোর দিকে এগিয়ে গেলো রিয়াজ। তারপর ওগুলোর একটাতে বিধ্বস্ত একজন মানুষের মতো বসে পড়ল। একটু আগে ফুটে থাকা আত্মবিশ্বাস চেহারা থেকে একেবারে চলে গেছে। একনজর দেখেই বুঝতে পারলো আসিফ, সেমিনারে থাকা পুরো সময়টা নিরুদ্বেগ থাকার অভিনয় করেছে সে।

“কাকে ভয় পাচ্ছেন?” সরাসরি কাজের কথাতে চলে যায় আসিফ।

“জানি না। বাইরের কেউ। গতকাল আমার বাসা পর্যন্ত এসেছিলো ওরা।” একটা রুমাল বের করে কপালের ঘাম মোছে রিয়াজ।

“কি চেয়েছে তারা?” সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে আসিফ।

“তার আগে আমার প্রশ্ন, অনেস্টলি উত্তর দেবেন আশা করি। ডানার মৃত্যুটা কি সুইসাইড ছিলো?” সরাসরি আসিফের চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে রিয়াজ।

“রিপোর্টে আর কিছু পাওয়া যায়নি। ঘরে আর কারও উপস্থিতির চিহ্নও ছিলো না। রক্তপাতের পরিমাণ দেখেও মনে হয়েছে সবকিছু ঠিকই আছে। ওটা সুইসাইড ছাড়া আর কিছু না—এমনটাই বলছে ফ্যাক্টস। হাতের লেখাও ডানার সাথেই মেলে। আপনার কি কোন কারণে সন্দেহ হচ্ছে?”

“ডানা সুইসাইড করার মতো মেয়ে ছিলো না। তাছাড়া প্রফেসরকে ওখানে যেভাবে সে প্রেজেন্ট করেছে, তিনি মোটেও সেরকম কোন ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। নারী-আসক্তি প্রফেসরের কোনকালেই ছিলো না। কাজেই একটু খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম। মির্জাপুরের ওসি গৌরবকে তো চেনেন? তাকে একটা ফোন দিয়েছিলাম এব্যাপারে আরেকটু খতিয়ে দেখার জন্য অনুরোধ জানিয়ে।”

“তারপর?” ভ্রু কুঁচকে গেছে আসিফের।

“রাতের বেলায় বিছানার পাশে অদ্ভুত লোকগুলোকে দেখা লাগলো।”

“বিদেশি?” প্রশ্ন করে জিয়া। চোখে সন্দেহের ছায়া তার।

“দু-জনেই। ডানার ব্যাপারে খোঁড়াখুঁড়ি করতে নিষেধ করে গেছে তারা। হাতে পিস্তল নিয়ে এরকম একটা নিষেধাজ্ঞার মানে আপনারা হয়তো ভালই জানেন।”

“আপনাকে ডানার ব্যাপারে ডিগ করতে দেখাটা তাদের পছন্দ হয়নি মনে হচ্ছে,” মন্তব্য করে আসিফ।

জিয়া এখনও দাঁড়িয়েই আছে, “ডানার ব্যাপারে আপনি আমাদের ঠিক তথ্য দেননি, মি. রিয়াজ। আপনি বলেছিলেন ডানার কাছে টাকা আসার ব্যাপারে কিছু জানেন না। অথচ মেয়েটা আমাদের বলেছিলো, আগে থেকেই জানতেন প্রফেসর টাকাটা উনাকে দিয়েছিলেন।”

“প্রফেসর চাননি তার দানের ব্যাপারে কেউ জানুক। আমি উনার ইচ্ছে পালন করবো না? আফটার অল, তখন উনি কেবল সদ্যপ্রয়াত। একারণেই আপনাদের জানাইনি। তেমন বিগ ডিল মনে হয়নি আমার তখন। কারণ, টাকাটা প্রফেসর দিয়েছেন ডানাকে। আর সেটার পরিমাণ ঠিকই আছে। ডানা প্রফেসরকে হত্যা করবে এমন কোন সন্দেহ করাটা আমার কাছে স্রেফ বোকামি ঠেকেছিলো।”

“কিন্তু, আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, খুনটা ডানাই করেছিলো।” মন্তব্য করে আসিফ।

“তাহলে ইনসুলিন পুশ করার পর সিরিঞ্জটা গেলো কোথায়?”

“ডানা সরিয়ে নিয়েছে কোথাও। প্রফেসর ল্যাভে ঢোকার ঠিক আগ মুহূর্তে ইনসুলিন-অ্যাসল্টের শিকার হন। ডানার কথা ঠিক থাকলে, ওই সময় প্রফেসর তার সাথে বিছানাতে ছিলেন। ডানা তাকে অজ্ঞান করে ইনসুলিন পুশ করেছিলো। সেখান থেকে ল্যাভে নিয়ে আসে অচেতন দেহটিকে। ওখানেই মৃত্যু হয় প্রফেসরের।”

“ডানার সাথে বিছানায় থাকার মতো সম্পর্ক প্রফেসরের ছিলো না,” সম্ভাবনাটা নাকচ করে দিল রিয়াজ, তারপর আরও একবার অভিব্যক্তি পাল্টে গেলো তার, “ওহ মাই গড!”

লাফিয়ে উঠেছে সে, আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হলরুমের প্রবেশপথের দিকে। একবার তাকিয়েই মাথা নামিয়ে ফেললো আসিফ। কালো কোট পরিহিত দু-জন মানুষ এইমাত্র ঢুকেছে ভেতরে, পুরনো বন্ধু। কারও মাঝেই কোন ব্যস্ততা নেই। গেটের কাছে একজনকে ধরে কি জানি প্রশ্ন করছে। জবাবে মানুষটা ওদের দিকে দেখিয়ে দেয়।

উঠে দাঁড়ায় আসিফও, “পেছনের দরজার দিকে চান। সবাই। ডক্টর খান, আপনিও।”

“সবার সামনে অ্যাটাক করবে না নিশ্চয় ওরা?” হাটতে হাটতে জানতে চায় জিয়া।

“তা করবে না। তবে ক্লিয়ারেন্স লেভেল দেখিয়ে আমাদের হাত থেকে রিয়াজকে নিয়ে যাবে ওরা। এরপর আর তাকে ফিরে পাবো কি না তার নিশ্চয়তা নেই।”

“আমাদেরও ফাটকে পুড়তে পারে। আমরা এখন হিয়ারিংয়ের দিকে তাকিয়ে আছি।” মনে পড়ে যায় জিয়ার, “ইরফানকে পালাতে সাহায্য করার অভিযোগ এনেছে আমাদের ওপর।”

কথাটার সত্যতা প্রমাণের জন্যই মনে হয় এফবিআই-র এজেন্ট দু-জন ওদের দেখে ফেললো। প্রায় দৌড়ে আসছে ওরা এখন। সেদিকে একবার তাকিয়ে কেঁপে যায় রিয়াজের কণ্ঠস্বর, “ওরা আমার কাছে কি চায়?”

“ভালো প্রশ্ন। আমিও আপনাকে করতে যাচ্ছিলাম। শুধু ডানার ব্যাপারে খোঁড়ার জন্যই ওরা আপনাকে খুঁজছে, এমনটা না। আপনার কাছে প্রফেসরের কোন জিনিস কি তারা চেয়েছিলো?”

“আমি জানি না,” বিড় বিড় করে রিয়াজ।

“লুকোবেন না।” প্রায় ছুটছে ওরা এখন, “কিছু জেনে থাকলে বলে ফেলুন।”

“যদি কিছু চেয়েও থাকে, আমাকে তারা বলেনি এখনও। লুকানোর অবস্থা কি আমার আছে বলে মনে হয়, ডিটেক্টিভ?” হাঁফাতে হাঁফাতে বলে রিয়াজ।

“প্রফেসরের আঙটি মিসিং। তার মৃত্যুর পর থেকেই ওটা উধাও। এ ব্যাপারে আপনার কোন আইডিয়া?” দরজার দিকে আরও দ্রুত এগুচ্ছে ওরা এখন।

“একটা বর্ণও বলেনি ওরা এ ব্যাপারে! প্রফেসরও আমাকে তার আঙটি নিয়ে কিছু বলেননি।” ককিয়ে উঠলো রিয়াজ।

দরজাটাকে জোরে ধাক্কা দিয়ে বের হয়ে আসে ওরা ওখান থেকে। পেছনে কয়েক ধাপ সিঁড়ির পর ছোট একটা গলিতে পড়েছে পথটা। সেটা ধরে পঞ্চাশ গজ এগিয়ে গেলেই পাওয়া যাবে বড় রাস্তা। প্রাণপনে ওদিকে ছোটে ওরা। বিশ গজ আগানোর আগেই দড়াম করে খুলে গেলো দরজাটা আবারও। কালো দুটো ছায়া বের হয়ে আসছে ওখান থেকে।

“এই বুড়ো বয়সে এমন দৌড়পাল্লাতে লাগার কারণে আমাকে আগামি একমাস শয্যা নিতে হবে মনে হয়।”

ডক্টর খানের কথা কানে না তুলে রিয়াজকে প্রশ্ন করে আসিফ, “আপনার গাড়িটা কোথায়?”

“সামনে-ওহ্ গড!”

রিয়াজের চিৎকারটা স্বাভাবিক। এই মাত্র পেছন থেকে প্রথমবারের মতো গুলির শব্দ হয়েছে। চমকে ওঠে আসিফও, ওদের জানা থাকার কথা রিয়াজের সাথে দু-জন হোমসাইড ডিটেক্টিভ আছে। একটু আগে ওদের চেহারা ওরা দেখেছে। তারপরও নিঃসংকোচে গুলি চালাচ্ছে? মনে পড়ে ওর, ইরফানের সাথে এনকাউন্টারের সময়ও এভাবেই গুলি চালিয়েছিলো ওরা। সেমসাইড নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথাই নেই!

আসিফের মেজাজ গরম হতে থাকে, “শালারা আমাদের দেশে এসে আমাদের দিকেই গুলি ছোঁড়ে!”

দ্বিধা ছাড়াই কোমর থেকে পিস্তলটা বের করে পেছনের দিকে দু-বার গুলি

করলো আসিফ। যেমন কুকুর, তার তেমন মুগুর! ছায়াদুটো ডিগবাজি খেয়ে কাভর নেয় সাথে সাথে।

মোবাইল বের করে দ্রুত একটা নাম্বারে ডায়াল করেছে জিয়া, “কাম অন!”

রাস্তায় পৌঁছে গেছে মাত্র, দূর থেকে একবার মাত্র গুলির শব্দ শোনা যায়। মাথা নামিয়ে ফেলে আসিফ, পিছিয়ে আসতে চাচ্ছে যেন, “স্লাইপার! আড়ালে চলুন।”

ঠিক পেছনে ভোঁতা একটা শব্দ হলো। একজন মানুষের পতনের শব্দটা শুকে যেন হ্যাচকা টানে ঘুরিয়ে দিল শব্দের উৎসের দিকে। এইমাত্র মাটিতে ছিটকে পড়েছে রিয়াজ। কল কল করে রক্ত বের হয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে শুকনো রাস্তা। দুই চোখ মেলে আসিফের দিকে তাকিয়ে থেকে কিছু একটা বলার চেষ্টা করে মানুষটা। ঘেম উঠেছে খুব। শব্দ রাস্তার ওপর রক্তভেজা হাত আছড়ে ফেললো দু-বার। তারপর নিখর হয়ে গেলো। গুলির ভেতর থেকে বার দুই গুলির শব্দ হলো আবার, এখনও পেছন ছাড়েনি এফবিআইর ওরা। ওদের সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ছুটে গিয়ে রিয়াজের পালস চেক করলো আসিফ। দুর্বল। হার্ট বরাবর ক্ষত, কোন সুযোগই নেই তরুণ গবেষকের।

বড় রাস্তা ধরে ছুটে আসছে কালো একটা গাড়ি। সেদিকে তাকিয়ে ভারি গলায় আদেশ দেয় ও। “সবাই গাড়িতে উঠে পড়ুন।”

“কিন্তু রিয়াজ—”

“গাড়িতে উঠো, জিয়া!” ধমকের সুরে বলে আসিফ, “তার জন্য কিছুই করার নেই এখন আর। ডক্টর খান, সামনে বসুন।”

পরের গুলির শব্দটা যেন আসিফের বুকের ঠিক মাঝখানে। জিয়ার কাঁধের কাছে ধুলো উড়েছে এইমাত্র। সহকারির শরীরে গুলি লেগেছে! টলে উঠে গাড়িতে ছিটকে পড়ে জিয়া। মাথার মধ্যে রাগের বিস্ফোরণ অনুভব করলো আসিফ। ঘুরে গুলির ভেতরে ম্যাগাজিন খালি করে দিল সে। তারপর জিয়াকে ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজেও কাঁপিয়ে পড়ল পেছনের সিটে। বন বন করে স্টিয়ারিং হুইল ঘোরায় ইরফান।

“এই মাত্র ঠিক কি হলো?” স্বাভাবিক কণ্ঠে প্রশ্নটা করে ইরফান।

“রিয়াজকে সরিয়ে দিয়েছে এফবিআই। সিলভার ব্রাডে চলো, কুইক!” হাঁফাতে হাঁফাতে জানায় আসিফ, “জিয়া, তোমার কি অবস্থা?”

কাঁধের ক্ষতটা শব্দ করে চেপে রেখেছে ছেলেটা, মাথা নাড়ে, “তেমন কিছু না। হলোপয়েন্ট ছিলো না বুলেট। গো থ্রু, ব্রিডিং শুধু।”

একনজর দেখে আসিফ বুঝতে পারলো এতো হালকাও নয় ব্যাপারটা। নিজেকে শব্দ করে রেখেছে জিয়া। ক্ষতটা চেপে রাখায় রক্তপাত কমেছে, তবে বন্ধ হয়নি। দ্রুত মেডিকেল অ্যাটেনশন দরকার তার। স্লাইপার বুলেট ছেলেখেলা নয়।

“স্লাইপ শটের শব্দ শুকলাম মনে হলো,” মন্তব্য করে ইরফান।

“সেটাই শুকলাম না। আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে ছিলো ওরা। পেছনে স্লাইপার বসিয়ে সামনে দিয়ে ঢুকেছে। জানতো আমরা আসতে পারি? না-হলে এমনটা করার তো কারণ দেখি না।”

“জানাবে কে? আমাদের আসার কথা আমরা কয়জন আর ডক্টর খান ছাড়া কেউ জানতেন না।” যন্ত্রণাটুকু গিলে ফেলে বলল জিয়া।

ডক্টর খান কিছুই বলছেন না। চোখের সামনে রিয়াজের মৃত্যু দেখে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছেন তিনি। বিড় বিড় করছেন কি সব বলে, হালকা শোনা যায় পেছনের সিট থেকে।

“কিছু বলছেন, ডক্টর?” জানতে চাইল আসিফ।

“আপনাদের এখানে আনাটা আমার ঠিক হয়নি, সেমিনারে আপনাদের ঢোকানোই উচিত হয়নি আমার। ওহ...এতটা কাছ থেকে কারও মৃত্যু দেখিনি কখনও।” দু-হাতে মুখ ঢাকেন তিনি।

নিজেকে রিয়াজের মৃত্যুর জন্য দায়ি করছেন তিনি—বুঝলো ওরা। পেছন থেকে ডক্টরের কাঁধে হাত রাখে আসিফ। “নিজেকে দুঃখবেন না। শ্লাইপার ছিলো একজন এখানে। ইচ্ছে করলে আমাদের সবাইকে ফেলে দিতে পারতো একে একে। তা করেনি। ওদের টার্গেট ছিলো রিয়াজ। শুধুই রিয়াজ। আমরা না এলেও তাকে সরিয়ে দিত ওরা। আমার আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিলো।”

নিজের ধারণাতে স্থির হয় আসিফ। মেসনদের বিরুদ্ধে কাজে লাগবে এমন কোন তথ্য অবশ্যই ছিলো রিয়াজুল করিমের কাছে। গত এক দশকের চেয়েও বেশি সময় ডক্টর তানভীর জালালের খুব কাছে থেকেছে সে। মেসনদের একজন হওয়াটাও তার পক্ষে বিচিত্র নয়। তবে রিয়াজের যে ভূমিকাই থাকুক—তাকে নিজেদের জন্য হুমকি মনে করেছে তারা। একারণে পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছে তাকে। মোবাইলের ভাইব্রেশন অনুভব করে পকেট থেকে বের করলো আসিফ। জিয়া গুটিয়ে আছে নিজের সিটে। দ্রুত ফার্ট এইডের ব্যবস্থা করা দরকার ওর। ইরফান নিজেও বুঝতে পারছে গুরুত্বটুকু।

আননোন নাম্বারটা দেখে আসিফের ভ্রু কুচকে যায়। হ্যান্ডসেট আর সিম—দুটোই নতুন। ওরা আর তৃণা ছাড়া কেউ জানে না এর নম্বর। আশ্তে করে রিসিভ করে ওটা, “হ্যালো?”

“আমি বলছি, স্যার।” তৃণার কণ্ঠটা শোনা যায় ওপাশ থেকে।

“বলো, কোন আপডেট?”

“আপনাদের মাথার ওপর হলিয়া জারি করা হচ্ছে, স্যার। আপনার আর জিয়ার ওপর। অলরেডি রোগ ডিটেক্টিভস খেতাব দেওয়া হয়েছে আপনাদের। শুধু অফিশিয়ালি অর্ডার দেওয়াটা বাকি, টেরিস্টদের মতো ট্রিট করা হবে আপনাদের। স্টট টু কিল অর্ডার যাওয়ার কথা, তবে হিটলার চেষ্টা করছে এটা এড়ানোর। পারবেন বলে মনে হয় না। কানাঘুষা শুনছি জাহিদ ফরমান পর্যন্ত আপনাদের নিয়ে মন্তব্য করেছেন। সাবধানে থাকবেন।”

এমন কিছু হবে, জানাই ছিলো। তবুও প্রশ্ন করলো আসিফ, “হঠাৎ আমার এই ডাবল-প্রমোশন?”



“এইমাত্র জানা গেছে, আপনি এবং জিয়া জিম্মি করে সরিয়ে নিচ্ছিলেন তানভীর জালালের সহকারিকে। এফবিআই সঠিক সময়ে পৌঁছে গেলে ব্যস্ত হয়ে গুলি ছোঁড়েন আপনারা। ট্রান্সফার করে নিহত হয়েছেন মি. রিয়াজ।” একটু ইতস্তত করে তৃণা, “আমি আপনাকে বিশ্বাস করি, স্যার।”

কাঁধ ঝাঁকায় আসিফ, “একটা ছোট্ট কাজ করো তাহলে, ডিটেক্টিভ আসাদকে পাও কি-না দেখ। তাকে শুধু জানাবে একটা ফ্যাক্স আসতে পারে তার কাছে। সেটাতে মনোযোগ যেন সে দেয়। বিষয়টা গোপন রাখা চাই। ওকে?”

“ওকে,” ভীতকণ্ঠে বলে তৃণা।

“এখন তাহলে লেডিস রুম থেকে বের হয়ে কাজে ফিরে যাও। সন্দেহ না করে কেউ আবার! সাবধান থেক।”

“কেসটার অগ্রগতি কেমন হলো?”

“খারাপ না। কিছু সূতাকে জোড়া দিতে হবে কেবল। থ্যাংকস তৃণা-ফর ট্রাস্টিং মি।”

ফোন রেখে দিয়েছে আসিফ। পাশ থেকে জিয়া দুর্বল গলায় জানতে চায়, “আমাদের মেসনিক লজ খুঁজে বের করতে হবে, স্যার। যত দ্রুত সম্ভব। হাইড্রার মতো এরা। ডাটা সোর্সদের খুন করতে এদের হাত সামান্যও কাঁপছে না।”

আন্তে করে গাড়ি থামায় ইরফান। বাইরে তাকিয়ে দেখতে পায় একটা ছোটখাটো ক্লিনিকের পাশে চলে এসেছে গাড়িটা। ‘সিলভার ব্রাড ক্লিনিক’-লেখা সাইনবোর্ডটার সামনে গাড়ি থেকে নেমে আসে ওরা। জিয়াকে এক হাত বাড়িয়ে দেন ডক্টর খান।

“আমাকে বিশ্বাস করে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল, তার পেছনে একটা কারণ তো থাকার কথা।” ইরফান চাবি ঘুরিয়ে নেমে আসতে আসতে হালকা চালে মন্তব্য করলো।

“আমাকে আর ডক্টর খানকে বাদ দিয়ে মেসনিক লজ খুঁজে বের করবে তুমি? সাফল্য কতটুকু হতে পারে তা হালকা মাথা খাটালেই হয়তো বুঝবে। আশা করেছিলাম অতটুকু মাথা খাটানোর মতো ঘিলু তোমার আছে।” ইরফানের হাত থেকে চাবিটা কেড়ে নিতে নিতে বলল আসিফ, “যদি সত্যিই তোমার বোনকে উদ্ধার করাটা তোমার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে-আপাতত আমাকে চিত করে দিলে তোমার কোন উপকার হচ্ছে না।”

“লজটা কোথায় তুমি জানো?” উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করে ইরফান।

“হয়তো হ্যা...হয়তো না! তবে এটুকু বিশ্বাস রাখতে পারো-লজ খুঁজে বের করার জন্য আমার সাহায্য তোমার প্রয়োজন হবে।”

অক্ষম ক্রোধে আসিফের দিকে একবার তাকালো ইরফান।

“ক্লিনিকটা সেফ তো?” সন্দিহান কণ্ঠে প্রশ্ন করলো জিয়া। আসিফ মাত্র ওদেরকে জানিয়েছে তাদের ‘আউট-ল’ ঘোষিত হওয়ার খবর।

উত্তরটা দিল ইরফান, “সাদ্দাম নামে এক শিষ্য আছে আমার। তার তত্ত্বাবধায়নে এই ক্লিনিক এখানে দাঁড়িয়েছে। এখানে যথেষ্ট সিকিউরিটি দিতে পারবে সাদ্দাম। কেউ খুঁজে পাবে না আমাদের।”

“ফাইন।” একহাতে ড্রেসিং নিয়ে আধশোয়া জিয়া এটুকুই বলল শুধু। একটু আগে ওর কাঁধ ওয়াশ করে ব্যান্ডেজ করা হয়েছে। আসলেই গো-থু ক্ষত ছিলো ওটা। বুলেট বের হয়ে গেছিলো অন্যপাশ দিয়ে। তবে রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে পড়েছে বেচারী। রক্ত জোগাড় করে দেওয়া হচ্ছে তাকে। এসব ঝামেলা শেষ হওয়ার পরই নিজেদের বর্তমান অবস্থা খুলে বলেছে আসিফ। ইরফান একচোট হেসেছে শুনে। তার মতে ‘আউটল-আউটল’ ভাই-ভাই থিওরি কাজে লাগানো উচিত এখন। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে আসিফ।

“আপাতত এখানে থাকছি আমরা। নেক্সট স্টেপ ঠিক না করে বের হওয়াটা উচিত হবে না।” হালকা সুরে বলল ও। একবার দেখে নিলো সবার চেহারা।

ডক্টর খান নড়ে উঠলেন, “আমার কি এখানে থাকাটা দরকার? আমার কিছু কাজ ছিলো যে, বাসায় যেতে পারি না?”

মাথা নাড়ে ইরফান, “আজ আপনাকে আমাদের সাথে দেখে ফেলেছে ওরা। বাসাতে আপনি নিরাপদ নন। রিয়াজের পরিণতি নিশ্চয় বরণ করতে চান না?”

“কিন্তু, মি. সালেহীন! আপনাদের বিরুদ্ধে ওদের কি অভিযোগ? প্রত্যেকেই আইনের পক্ষে আপনারা তবুও কেন আইনের কাছেই লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে আপনাদের?”

ডক্টর খানের প্রশ্নটার উত্তর ওরা সরাসরি দেয় না। তাকে জানানো হয়নি ইরফানের ব্যাপারে। ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাবডাকশন অ্যান্ড হোস্টেজ সিকিউরেশনের একজন সদস্য হিসেবেই তাকে চেনেন ডক্টর। ছদ্মবেশে থাকায় সরাসরি চেহারায় তাকে চেনার কথাও না। আসিফ তার প্রশ্নের জবাব দিল।

“এখানেই এফবিআই কাজ করছে। নিশ্চয় তাদের জন্য অভিযোগ খুঁজে বের করাটা কঠিন কিছু হবে না? মেসনদের কাজ কেমন হয় তা ভুলে গেলে আমাদের চলবে না, ডক্টর। তাদের ব্যাপারে প্রথমে আপনিই জ্ঞানিয়েছিলেন আমাকে।”

দুই চোখে শূন্যতা নিয়ে মাথা দোলালেন ডক্টর খান।

“সালেহীন আমার সাথে বাইরে আসো। কথা আছে,” আসিফ উঠে দাঁড়ায়। কেবিনে জিয়া আর ডক্টরকে রেখে বাইরে বের হয়ে আসে হালকা পায়ে।

“বলো।”

একমুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থাকে আসিফ। ইরফান এখন পর্যন্ত আসিফকে ‘আপনি’ করে সম্বোধন করেনি। অথচ বেশিরভাগ অপরাধি ডিটেক্টিভ পরিচয় পেলে ‘আপনি’ থেকেও উর্ধ্বতন কোন সম্বোধন খোঁজে। ইরফানের মাঝে ক্রিমিনাল সাইডের চেয়েও বড় হয়ে দেখা দিয়েছে আত্মসম্মানবোধ। প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত নিজেকে আসিফের চেয়ে কোন অংশে ছোট ভাবেনি সে। ধরা পড়ার পর থেকে এখনও একবারও অভিব্যক্তিতে বিচলিত হওয়ার কোন ছাপ দেখায়নি। অথচ আসিফের বিশ্বাস, ছেলেটা একটা সুযোগ খুঁজছে। সময় আর সুযোগ যখন এক হবে, সাথে সাথে উধাও হয়ে যাবে সে। চিরতরে।

“বলেছিলে, ঈশিতা নিজে থেকে যোগ দিয়েছিলো মেসনিক লজ্জে। তাকে পথ দেখিয়েছিলো বিজয় নিজেই। পরবর্তিতে নিজেকে নিজেই শয়তানের জন্য উৎসর্গ করতে চেয়েছে মেয়েটা?”

“হুম। আর এই আত্মত্যাগি মেয়েগুলোকেই ওরা বলে ডায়মন্ড। শয়তানের জন্য থাকে এরা।”

“ডায়েরি থেকে তুমি কবিতা পেয়েছো, বিজয়ের বর্ণনা পেয়েছো। পাশাপাশি এমন কোন কিছু দেখেছ যেটা থেকে ভৌগলিক অবস্থান বোঝানো হয়?”

মাথা নাড়ে ইরফান। নেতিবাচক উত্তর।

“শয়তানের উদ্দেশ্যে এই রিচুয়ালটা হবে কবে?”

“আর পাঁচদিন পর। পনের তারিখ।”

“যদি এর মাঝে ওদের লজ্জের পতন ঘটে? আটক হয় বিজয়?” অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় আসিফ।

“তাহলে ঈশিতার জীবনের কোন নিরাপত্তা থাকছে না আর। কারণ, শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, মেয়েটাকে একেকদিন একেক সেফ হাউজে রাখার ইচ্ছে মেসনদের। ইভার কেসটার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সেজন্যে এবার ওরা অতিমাত্রায় সতর্ক।”

“তার মানে, তোমার হাতে পাঁচদিন আছে। লজ লোকেশন বের করার জন্য।” মন্তব্য করে আসিফ।

“তুমি যদি লজ্জের অবস্থান জেনে থাক,” সরাসরি কাজের কথাতে চলে এলো ইরফান, “তাহলে তোমাকে অনুরোধ করবো, নির্দিষ্ট দিনের আগে লজ্জে ঢোকার চিন্তা করবে না।”

“লজ্জে শেষ দিন ঢোকার পক্ষে আমি নেই। কারণ, বাংলাদেশের একমাত্র মেসনিক লজ্জ কোনটা হতে পারে সেটা আমি অনুমান করতে পারি। কিন্তু একেবারে নিশ্চিত হতে হলে ঢুকে দেখতে হবে আমাকে। শেষ দিন যদি আমরা ট্রাই করে দেখি আমার অনুমান ভুল ছিলো—যে বিল্ডিংটিকে আমি মেসনিক লজ্জ বলে ধরেছি সেটি আসলে লজ্জ নয়? জবাই হয়ে যাবে ঈশিতা প্রকৃত লজ্জের ভেতর।”

চুপ হয়ে যায় ইরফান। আসিফের কথায় যুক্তি আছে। সে বলে যায়, “ডক্টর

খানকে আমি বিশ্বাস করি না। আমরা যে রিয়াজের কাছে যাবো, সে-ব্যাপারে আগে থেকেই জানতো ওরা। নিজেকে ফ্রি মেনসনবিরোধি বলেন ঠিকই—তবে ডক্টর খানের মধ্যে ঘাপলার গন্ধ পাচ্ছি আমি। এটা হয়তো শুধুই একটা ধারণা, তবে অবিশ্বাস নিয়ে একসাথে কাজ করা সম্ভব নয়। আমি কোন ঝুঁকি নিতে চাই না।”

মাথা দোলায় ইরফান, “ডক্টরকে আমারও ঠিক এই লাইনের মানুষ মনে হয় না। কেমিস্ট্রি নিয়ে সারাজীবন কাটালেন যিনি, তিনি যেন প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে একটু বেশিই জানেন, তাই না?”

“জিয়াকে টেক্সট করে এসেছি। ডক্টর জানেন তিনি জিয়াকে দেখে রাখছেন। তবে আসলে, জিয়া একটা চোখ রাখতে পারবে ডক্টরের ওপর।”

“আর আমরা?”

“আমরা যাবো একটা ফ্যাক্স করতে। আজ রাতেই গাজীপুরের মিথরাস লজে রেইড হবে। তোমার হার্ডডিস্ক অ্যানালাইসিসের কাজ কতদূর?”

“খোঁজ নেইনি। আগেই তো আটকে ফেলেছ। আমার ফোনটা কোথায়?”

“এখানে নেই। নতুনটা দিয়েই কাজ সারো। হার্ডডিস্কগুলো সেফ আছে তো?”

মাথা দোলায় ইরফান, “তা আছে। তারপর? ফ্যাক্স করার জন্য তোমার সজ্জি লাগে কবে থেকে?”

“আসলে, তার ঠিক পরেই আমরা যাবো এক মেয়ের সাথে দেখা করতে।”

অবাক হয় ইরফান, “অদ্ভুতমহিলা?”

মুচকি হাসলো আসিফ, “প্রস্টিটিউট।”

\* \* \*

ডিটেক্টিভ আসাদ খুব বেশিদিন ধরে হোমিসাইন্ডের সাথে নেই। নতুন জয়েন করার কারণে এখনও ছয়দিক বিবেচনা করে তাকে চলতে হয়। কমিশনার শাহেদ জামানের হুকুমারে সারাদিন ছোট্টাছুটি করতে হয়েছে ওকে। সিনিয়র অফিসার আসিফ আর তার সহকারি জিয়ার ব্যাপারে বেশ কিছু জায়গাতে অ্যালার্ট করা হয়েছে।

যে লোকটাকে দেখামাত্র গ্রেফতার আর প্রয়োজনে গুলি করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, তাকে আসাদ চেনে। হোমিসাইন্ডে যোগ দেওয়ার পর তার সাথে প্রথম যে সিনিয়রিটি-জুনিয়রিটি না ভেবে কথা বলেছে, সে হলো এই আসিফস্যার। মানুষটা খাঁটি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন আর নিজের কাজে অত্যন্ত দক্ষ। এতটুকুই জানা ছিলো তার পরিচয়ের আগ থেকেই। পরে আরও কিছু জানতে পারে, আসিফের সাথে কয়েকটি কেসে কাজ করার মাধ্যমে। প্রায় শতভাগ সফল্য এই ডিটেক্টিভের, অথচ কোনরকম অহংকার তার মধ্যে দেখেনি আসাদ।

তার পেছনে পুরো ডিপার্টমেন্ট লেগে গেছে, সেটা আসাদের কাছে এখনও দুঃস্বপ্নের মতো লাগে। স্যার নাকি প্রফেসর তানভীর জালালের ছেলের কিডন্যাপারের

সাথে হাত মিলিয়েছেন, হত্যা করেছেন প্রফেসর জালালের ডানহাত রিয়াজুল করিমকে!

এই মুহূর্তে ফ্যাক্সের মাধ্যমে আসা কাগজগুলোর দিকে তাকিয়ে ডিটেক্টিভ আসাদের অবাক হওয়ার ভাবটা আরও বেড়ে গেছে। একে একে সাজিয়ে রাখা তথ্যগুলো যে ইঙ্গিত দিচ্ছে তা উপলব্ধি করতে শিরদাঁড়া দিয়ে একটা অদ্ভুত রকম ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যায় ওর।

উন্মাদ একটা সিক্রেট সোসাইটির কথা সেখানে বলা হয়েছে। তাদের বিস্তার বাংলাদেশের কোন কোন পর্যায়ে আছে তা-ও এখানে স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছে। অর্থনীতির দিকটা এরাই দেখছে এখন। একই সাথে বহির্বিশ্বের সাথে সবধরনের কূটনৈতিক সম্পর্ক সামলাচ্ছেন যিনি, সেই পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেলিম রিজভী পর্যন্ত তাদের সদস্য। সামরিক শক্তির দিক বিচার করলেও বাংলাদেশের হাত-পা এখন তাদের হাতেই বাঁধা।

এবার তারা চূড়ান্ত বিজয়ের প্রস্তুতি নিয়েছে। একটা মুভমেন্টকে সামনে রেখে কাজ করছে তারা। পনের তারিখের পর প্রত্যেকে নেমে পড়বে কাজে। বাংলাদেশের সংবিধান থেকে সংসদ ব্যবস্থাতে আসবে আমূল পরিবর্তন। প্রধানমন্ত্রির অবস্থান পালটে যাবে, সার্বিক ক্ষমতা থাকবে তখন একজন জেনারেলের হাতে। দেশের ভবিষ্যৎ এই মানুষটার হাতে আজ থাকলে হয়তো সার্বিক উন্নয়নে ভাল একটা মোড় নেবে বাংলাদেশের ইতিহাস। ফ্যাক্টস অনুযায়ী, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আর সামরিক শক্তিতে বাংলাদেশ হয়ে উঠবে বেশ শক্ত একটা দেশ। তবে দেশের ধর্মীয় অনুভূতিগুলো হয়ে যাবে হুমকির সম্মুখীন। সংবিধানের পরিবর্তনের মাধ্যমে সব রকম ধর্মীয় অনুশাসনকে ন্যূনতম গুরুত্ব দেওয়া হবে না, লঙ্ঘিত হবে অসংখ্য ব্যক্তি অধিকার। ফ্যাক্সের ডাটাগুলোর পরে আসাদকে লেখা ছোট্ট চিঠিটাতে একটা প্রশ্ন তুলেছে ডিটেক্টিভ আসিফ, এই পরিবর্তন বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছর পরের প্রেক্ষাপটকে কিভাবে পরিবর্তন করতে যাচ্ছে?

অশুভ আদর্শে গড়ে ওঠা একদল মানুষের হাতে একটা দেশের ভবিষ্যৎ ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছে ডিটেক্টিভ আসাদেরও নেই। দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিছুক্ষণ অশ্রুসিক্ত ঘরে বসে থাকে ও। আসিফের তথ্য ঠিক থাকলে, অচিরেই বেশ কিছু পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে বাংলাদেশের বুকে। আর পরিবর্তনটা অনেকটা প্যানডোরার বাক্সের মতো। ভাল কিছু আশা নিয়ে যা খোলা হবে এবং পরে যা দেশটাকে বাহ্যিক উন্নয়নের পাশাপাশি মনস্তাত্ত্বিকভাবে সার্বিক ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে সক্ষম রাখবে।

ডিটেক্টিভ আসিফের কথার অর্ধেকও যদি সত্য হয় থাকে, এখান থেকে অফিশিয়ালি কোন মুভ নিতে গেলেই সেটা জেনারেল জাহিদ ফরমানের চোখে পড়বে। এবং সেটা তিনি নিঃসন্দেহে আটকে দেবেন। আসিফের আবেদন, হোমিসাইড নয়, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়নের সহায়তা নিয়ে আজ রাতেই একটা রেইড দেওয়া মিথরাস লজে। আটক করা আরএসএস কেনেথ গ্র্যান্টকে।

র‍্যাপিড অ‍্যাকশন ব্য‍্যাটেলিয়নের দিকেও জ‍্যাহিদ ফ‍্যরমানের চোখ আছে। র‍্যাবের একজন অ‍ফিসারের নাম রিকমেড করেছে আসিফ। পুরনো আমলের বন্ধু সে, জেনারেলকে কাঁচকলা দেখিয়ে একটা রেইড দেওয়ার মতো এই একজনই আছে বলে সে মনে করে।

নিজের অবস্থান সম্পর্কে ভাল ধারণা আছে ডিটেক্টিভ আসাদের। আসিফ তাকে যে কেস নিয়ে কাজ করতে বলেছে, তাতে নাক গলানোর সুযোগ তার নেই। কাজটা করেছে ডিটেক্টিভ রেজা। অদ্ভুত এই গোয়েন্দাকে দু-দিন ধরে অফিসের ভেতরে দেখেছে বলেও মনে পড়ে না ওর। তবে, অফিশিয়ালি কেসটা হ্যান্ডেল করেছে রেজা। তার কেসে নাক গলানোটা কেউই ভাল চোখে দেখবে না।

তানভীর জালালের হত্যার পেছনে সিক্রেট এই সোসাইটিকেই দায়ি করেছে আসিফ, এখানেও আছে ঝামেলা। কাগজে কলমে কেসটা ক্রোজড হয়ে গেছে। ডানা মেয়েটার স্বীকারোক্তিতে কোন খুঁত ওরা পায়নি। সেজন্য তাকেই মার্ডারার ধরে নিয়ে কেসটা ক্রোজ করতে হয়েছে। বহাল তব্বিতে ফিরে এসেছে বিজয় ছেলেটাও। পূর্ণ সমাপ্তি ঘোষণা করতে শুধু কিডন্যাপারকে ধরে ফেলা দরকার। সেটা হয়তো আর একসপ্তাহের মাঝেই সম্ভব হবে বলে ডিপার্টমেন্ট মনে করে।

যদি আসিফের গাঁজাখুরি গুলে সে বিশ্বাস করতে চায়, খুবই ঝামেলাপূর্ণ একটা অবস্থানে থেকে ওকে পদক্ষেপ নিতে হবে। র‍্যাবের যে অফিসারকে আসিফ রিকমেড করেছে সম্ভবত সে আসিফের পুরনো বন্ধু। এক্ষেত্রেও আসাদের সবকিছুই সন্দেহজনক লাগে। তাকে ফ্যাক্স করলেই চলত। মাঝে আবার ওকে টানা কেন? সম্ভবত র‍্যাপিড অ‍্যাকশন ব্য‍্যাটেলিয়নের ভেতরেও সোসাইটির লোক আছে। আশঙ্কাটি ঝেড়ে ফেলতে পারেননি আসিফ, সেজন্যই মাধ্যম হিসেবে ডিটেক্টিভ আসাদের ওপর ভরসা রেখেছেন!

দোটানায় ভুগতে ভুগতেই আশ্তে করে রিসিভারটা ক্রেডল থেকে তুলে নেয় আসাদ।

“প্রস্টিটিউট?” অবাক হয়ে প্রশ্নটা আবারও করে ইরফান।

সামনের গাড়ীটাকে ওভারটেক করতে করতে ওর দিকে ফিরে তাকালো আসিফ,  
“অবাক হওয়ার কিছু নেই। এদের কাছে ভাল তথ্য থাকে।”

“এই ভদ্রমহিলার নাম জানতে পারি?” ক্র কঁচকে জানতে চায় বিপথগামি তরুণ।

“সামান্না। অথবা রোজিনা। ওদের কোন নির্দিষ্ট নাম থাকে না। আমাকে সামান্না নামেই পরিচয় সে দিয়েছিলো দুই বছর আগে। একটা ছোট্ট সাহায্য চেয়েছিলো, যেটা আমি করতে পারিনি।”

“তাহলে এর কাছে আজ আবার সাহায্যের জন্য যাচ্ছ কোন মুখে?” হাতের তালু গালে ঘষল ইরফান।

ইরফানকে দেখে অদ্ভুতভাবে হাসলো আসিফ। কিছু না বলে আবার সামনের রাস্তাতে চোখ ফেরায়। ইরফান বিষয়টা লক্ষ্য করেছে, “কি হলো?”

“লিভিং ক্রাইম-লিজেন্ড ইরফানের হাতে একটা লেডি হক! দৃশ্যটা কল্পনা করে হাসি উঠে গেলে দোষ দিতে পারো না।”

নাক চুলকায় ইরফান অযথাই, “বলেছি একবার, নিজের অস্ত্রটা খুঁইয়ে এসেছি মণিপুরের কোন গলিতে। অলরেডি পুলিশের পকেটে চলে গেছে ওটা। ভাল কথা, তোমাকে বলেছি, সৈকত এখন আহত। ভাল করেই জানো, মানুষটা তোমার কেসের একমাত্র সাসপেক্ট। কেন তাকে গ্রেফতার করার জন্য পা বাড়াচ্ছ না? আমাকে একটা বার প্রশ্নও করোনি, কোন ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাকে।”

“কারণটা আমি না বললেও বোঝার কথা তোমার—” হতাশ ভঙ্গিতে বলে আসিফ,  
“সম্ভবত তুমি খেয়াল করো নি, কিন্তু আমার চাকরিটা না, চলে গেছে। তোমার সাথে আমার কোন পার্থক্য নেই এখন। দু-জনই ফেরারি।”

ঠোট বঁকে যায় ইরফানের, বিদ্রূপ, “এই ফেরারি দশাতেও আজ রাতে মিথরাস লজে রেইড দেওয়ার ব্যবস্থা যে করতে পারে, সে একজন ফিউজিটিভকে অ্যারেস্ট করতে পারে না?”

সরাসরি তার দিকে তাকালো আসিফ, “আমি সৈকতকে অ্যারেস্ট করতে পারি। কিন্তু জীবনের নিরাপত্তা দিতে পারি না। তাকে অ্যারেস্ট করার পরের মুহূর্তে মেসনদের ফোকাসে চলে আসবে ছেলেটা। এবার তারা হিট করতে ভুল করবে না হয়তো। সৈকতকে জীবিত দরকার আমার। একদল জঙ্গি হাতে তার প্রাণ যাক তা আমি চাই না।”

“মেসনদের বিরুদ্ধে প্রমাণ দরকার হলে তোমাকে তেমন কষ্ট করতে হবে না। মেসনিক লজটা খুঁজে বের করে ডকুমেন্টস সরিয়ে ফেলতে পারলেই বাংলাদেশে এই মুহূর্তে অনেক হর্তাকর্তাদের চেহারা খুঁজে পাবে। শুধু ওপেন মিডিয়াতে সেগুলো

প্রকাশ করে দিতে হবে। হয়তো জানো না, আজকের যুগে সবকিছুই কম্পিউটারাইজড অবস্থায় রাখে ওরা।”

“যার কাছে আমরা যাচ্ছি এখন, মেয়েটার কাছের বান্ধবি খুন হয়েছিলো দু-বছর আগে।” আচমকার প্রসঙ্গ পাল্টে ফেললো আসিফ, “মেয়েটার শরীর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। ছোট্ট একটা এয়ার রিং খুঁজে পেয়েছিলো শুধু সামান্য। জিয়া উদ্যানের ভেতরে।”

“লাকি হার। ঝড়ের গাদায় সুচ খুঁজে বের করেছে মেয়েটা। এতেই বান্ধবি খুন হয়েছে ভালো সে! এমন কান থেকে পড়ে যায়নি—তা কিভাবে জানলো?” সন্দিহান প্রশ্নটা করেই ফেলে ইরফান।

“শুকনো রক্তের ছাপ সে দেখেছে ওতে। আমাকেও পাঠিয়েছিলো জিনিসটা। রক্তের ছাপটা জেনুইন। ব্লাড স্যাম্পল মেলানোর উপায় ছিলো না, হারিয়ে যাওয়া মেয়েটির ব্লাড স্যাম্পল আমাদের কাছে নেই। নাহলে ম্যাচ করে দেখা যেত আসলেই ওটা তার বান্ধবি এলেনার কি না। তবে ব্লাড ফ্রপ মেলানো গেছিলো।”

“অথচ একটু আগে বলেছ, মেয়েটাকে সাহায্য করতে পারোনি তুমি।” মন্তব্য করে ইরফান।

আরেকটা গাড়িকে ওভারটেক করলো আসিফ, ঝড়ের বেগে ছুটছে এখন, “মেয়েটা খুন হয়েছে কি না, অথবা আদৌ মারা গেছে কি না তা একটা এয়াররিং থেকে প্রমাণ করা যায় না। নো বডি—নো ক্রাইম; এমনটাই বলে থাকে ওরা। ঠিক তাই ঘটেছিলো ওখানে।”

“বান্ধবির নিখোঁজ রহস্যে সাহায্য করতে পারনি, আবার আশা করছ এখন মেয়েটা তোমাকে সাহায্য করবে?” মুচকি হাসে ইরফান, “স্বার্থ ছাড়া তারা এক পা-ও নড়ে না বলে শুনেছি।”

“স্বার্থ তারও থাকছে। বান্ধবির মার্ডার কেসটা সলভ করে দেবো আমি আজ রাতে।”

উচ্চাভিলাষি লোকটাকে আরেকবার দেখলো ইরফান, কিছু বলল না আর। আসিফ গায়ে মাখলো না সে দৃষ্টি, “মিথরাস লজে রেইড পড়বে যখন, ঠিক তখনই আমরা হানা দেবো মেসনিক লজে।”

“মিথরাস লজে রেইড দিয়ে কিছু পাওয়া যাবে না।” আগেও বলেছে, আবারও বলল ইরফান, “ওরা এত কাঁচা কাজ করবে না।”

“আমিও জানি সেটা। চক্র মেসন আর মিথরাস মিলিত্রে পতিত। আমি চাই ওরা হতভম্ব হয়ে পড়ুক। আমাদের দিকে মনোযোগ দিতে সাপারক। মিথরাস লজের রেইডটা তো শুধুই ডিস্ট্রাকশন। এই সুযোগে মেসনিক লজে ঢুকে পড়বো আমরা। ঝড়ের বেগে ঢুকে বের করে আনবো তোমার বোনকে। সেই সাথে হার্ডড্রাইভ যেখানে যা পাওয়া যায় সরিয়ে দেবো। কাজটা কঠিন হবে, কিন্তু অসম্ভব না। আমাদের হাতে একটা পজিটিভ দিক আছে। সারপ্রাইজিং এলিমেন্ট।”



সাথে সাথে মাথা নাড়ে ইরফান, “ঈশিতাকে ওরা একেদিন একে জায়গাতে রাখছে। মেসনিক লজে তাকে পাবে না। মাঝ থেকে হয়তো মারা যাবে আমার বোনটা।”

অসম্মতি জানায় আসিফ, “মেসনদের যদি একশো ভাগের এক ভাগও চিনে থাকি-তারা এটাই ছড়িয়েছে বাইরে। কিডন্যাপে অদ্বিতীয় ইরফান খুঁজে বেড়াবে কোথায় রাখা হয়েছে ঈশিতাকে! অথচ সবচেয়ে গোপন ঘাঁটি, তাদের মেসনিক লজে একজন ডায়মন্ডের স্থান হবে না-তা কি হয়? লজে ঈশিতাকে রাখা তাদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ। তুমি আসছো কি না বলো? নইলে এখানে তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আমি একাই ঢুকে যাবো ভেতরে।”

“মেসনিক লজটা কোথায়?” রাগে লাল হয়ে গেছে ইরফানের চেহারাটা।

“তা বলবো কেন? কো-অপারেশন করছ বলে তো মনে হচ্ছে না। সবচেয়ে বড় কথা, আমিও শতভাগ নিশ্চিত নই। না ঢুকে বোঝা যাবে না। তুমি নিশ্চয় বলির দিনে ঢুকে দেখতে চাও না? সেদিন ভুল কোথাও হানা দিলে সব শেষ হয়ে যাবে।”

জানালা দিয়ে বাইরের রাস্তাটাকে খুব দ্রুত পেছনের দিকে ছুটে যেতে দেখলো ইরফান। কিছুক্ষণ বাইরেই তাকিয়ে থাকলো সে। মনস্থির করার চেষ্টা করছে। আসিফ খারাপ কিছু বলে নি। আসলেই এখন যদি আগে থেকে টেস্ট না করে রাখা হয়, তাহলে মেসনিক লজ হিসেবে ভুল বিল্ডিংকে নির্বাচন করা হয়ে যেতে পারে। ঈশিতাকে বলি দেওয়ার দিনে, চূড়ান্ত মুহূর্তে এমন একটা ভুল করলে মেয়েটাকে আর বাঁচানো যাবে না। বড় একটা শ্বাস ফেলে আবার আসিফের দিকে তাকালো ইরফান।

“আমরা ঢুকব, তবে স্টেলথ মেথডে। সাইলেন্সড গান থাকলে আমি রাজি আছি। স্টেলথ মেথডেই বের হয়ে আসবো। এতে রাজি থাকলে আমি তোমার সাথে ঢুকছি। নতুবা আমার সাথে একদফা লড়তে হবে তোমাকে। এবার এফবিআই-র কোন এজেন্ট থাকছে না মাঝে বেরসিকের মতো নাক গলানোর জন্য। ঈশিতার ব্যাপারে কোন ঝুঁকি নিতে পারবো না আমি।”

মাথা হালকা দোলায় আসিফ, “তোমার সাথে আমিও একমত। স্টেলথ মেথডেই ঢোকার প্ল্যান আমারও। লড়াইয়ের মনোভাব মেসনদের জন্য তুলে রাখো। আজ অনেক লাগবে ও জিনিস।”

“লজটা কোথায়?” জানতে চাইল ইরফান।

“লজ লোকেশন বলে দিলেই হয়তো হাওয়া হয়ে যাবে তুমি। তবে কাজটা শেষ করার জন্য আমার একজন পার্টনার দরকার, ইরফান। জিয়া সুস্থ থাকলে এত টানা-পোড়নের মাঝ দিয়ে আমাকে যেতে হতো না। পার্টনার হিসেবে তুমি আমার প্রথম পছন্দ নও। আশা করি সেটা বুঝে গেছ এরমধ্যে।”

মুচকি হাসে ইরফান, “এটুকু অন্তত জানি, অপরাধীদের ঘৃণা করে ডিটেক্টিভ আসিফ আহমেদ। তবে আজ রাতে যদি তুমি মেসনিক লজে ঢুকতে চাও এবং তার পরে জীবিতও ফিরতে চাও, আমাদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস থাকাটা জরুরি বলে মনে করি আমি।”

গাড়ি থামিয়ে দেয় আসিফ সাথে সাথে। দ্বির দৃষ্টিতে তাকালো ইরফানের দিকে।

“ইরফান, হোয়াটেভার ইউ আর, আমি কাজটা করতে যাচ্ছি তোমার বোনের জন্য। একজন সিভিলিয়ান শয়তানের পূজার নামে মার্ডার হয়ে যাবে, সেটা ঠেকানো আমার ডিপার্টমেন্টে পড়ে। মানুষটা তোমার বোন বলে অবস্থার কিছুই পাল্টাচ্ছে না। আশা করি এটুকুর ওপর আস্থা রাখতে পারো।”

আসিফের ঝকঝকে চোখ দুটো দেখলো ইরফান। শঠতার কোন চিহ্ন সেখানে নেই। ঠাণ্ডা দৃষ্টিটুকুতে মিশে আছে একাধারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ছাপ আর নিষ্ঠুরতা। এই মুহূর্তে ওটা কার জন্য রাখা আছে তা কিছুটা বোঝে ইরফান। মেসনিক লজে আজ রাতে আসিফ ঢুকলে ঝড় বয়ে যাবে।

“আস্থা আছে। তবে এটা দ্বিপাক্ষিক হোক, সেটাই চাওয়া। আমাকে বিশ্বাস করতে হবে তোমার,” আন্তে করে বলে ইরফান।

“তোমাকে বিশ্বাস করাটা আমার দৈনন্দিন অভ্যাসের মাঝে পড়ে না। তবে আজ রাতের জন্য ব্যতিক্রমি কিছু করা যেতেই পারে। নিজের এবং নিজের বোনের জন্যই বিশ্বাসের মর্যাদাটা রাখবে আশা করি।”

“তাহলে বলে ফেলো, বাংলাদেশের একমাত্র মেসনিক লজটা কোথায়?”

উদাস ভঙ্গিতে একটা সিগারেট ধরায় আসিফ, সাধারণত স্মোকিং করে না ও, তবে অনেকক্ষণ ধরেই ধোঁয়ার জন্য ফুসফুসটা আকুলি-বিকুলি করছিলো। আজকে সারাদিন অনেক বেশি মাথা খাটাতে হয়েছে তাকে, এখন চলে এসেছে একটা উপসংহারের কাছাকাছি। সিগারেটটা অপরিহার্য বলে মনে হচ্ছিলো হঠাৎই।

“ফ্রি মেসনদের নিয়ে ভাবার জন্য পুরো একটা দিন পেয়েছিলাম, ইরফান। গতকাল রাতে আমরা ডক্টর খানের বাসায় ছিলাম—তারপর আজ সারাটাদিন ওটা নিয়েই ভেবেছি।”

“আপনার চ্যালাকে আমার পিছে লাগিয়ে।” সারাদিন জিয়া তাকে চোখে চোখে রেখেছে, এক হাত পিস্তলের বাটে রেখে—মনে পড়ে যেতে তিক্ত কণ্ঠে বলে ইরফান।

“সে তোমার সৌভাগ্য। সিচুয়েশন এরকম না হলে চৌদ্দ শিকের মাঝে থাকতে তুমি।” বিরক্ত হয় আসিফ, “যাই হোক, মেসনরা বাংলাদেশে আজ আসেনি। মেসনিক লজের পত্তন ঘটেছিলো সেই ১৯১০ এই। কাজ থেমে গেলো ১৯৪৮-এ। দেশভাগের সাথে মেসনদের অনেকে ইন্ডিয়া চলে গেছিলো। তারপর কি অবশিষ্ট মেসনরা নতুন কোন লজ এখানে স্থাপন করেনি? করেছে। মেসনদের কাজের খরচকম ধারা দেখেছি, সেভাবে চিন্তা করার চেষ্টা করেছি আমি। ওরা ইংল্যান্ডের গ্র্যান্ড লজ স্থাপন করেছে সবার সামনে। চোখে পড়ার মতো একটা বিল্ডিং ওটা। সিউজিল্যান্ড, জাপান, ইন্ডিয়া, অস্ট্রেলিয়া, চীন, এমনকি মুসলিম দেশ লেবানন আর মরক্কোতেও গ্র্যান্ড লজগুলোর আকার আকৃতি বিশাল হয়ে থাকে। কাজের পরিধিও অনেক বেশি। অস্বাভাবিক না এসব। কিন্তু বাংলাদেশে চোখে পড়ার মতো একটা বিল্ডিংকে মেসনরা কিভাবে নিজেদের লজ বানাবে? ১৯১০-এ তাদের পরিত্যক্ত ছোট লজটা ছিলো একেবারেই

অপর্যাপ্ত, একটা বড় আয়তনের লজের পত্তন না ঘটালে পরবর্তিতে ঝামেলা তাদেরই হবে।”

“কাজেই নতুন একটা লজ তারা বানিয়েছে। এবং সেটা বিশাল আকারের, আমার ধারণা। কিন্তু এতে করে নির্দিষ্ট কোন বিল্ডিং আমরা পাচ্ছি না, তাই না?”

ইরফানের প্রশ্ন শুনে আসিফের গম্ভীর মুখটা আরও গম্ভীর হয়ে যায়। “অবান্তর প্রশ্ন না করে, কাজের একটা প্রশ্নের উত্তর দাও, যদি আমাদের নতুন কোন লজ খুঁজে বের করতে হয়, আমাদের চোখ রাখতে হবে কোথায়?”

দ্বিধায়ুক্ত কণ্ঠে উত্তর দেয় ও, “পুরনো বিল্ডিং খুঁজতে হবে। মানে, যেগুলো ১৯৪৮-এর পর নির্মাণ করা হয়েছে।”

“আর?”

“কার তত্ত্বাবধায়নে সে-সব বিল্ডিং বানানো হয়েছে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।”

“অথবা,” একটু হাসে আসিফ, “কার ডিজাইনে সেটা বানানো হয়েছে। মেসনিক লজের ডিজাইন বাসা-বাড়ির মতো কিছু নয়, ইরফান।”

ধীরে ধীরে পয়েন্টটা স্পষ্ট হয়ে যায় ইরফানের কাছে। মেসনিক লজ হিসেবে একটা বিল্ডিং খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু যদি জানা যায় কে কোন বিল্ডিংয়ের ডিজাইন করেছে অথবা, কাদের তত্ত্বাবধায়নে কোন বিল্ডিং নির্মিত হয়েছিলো তাহলে হয়তো কিছু পাওয়া যেতেও পারে। তরুণ ডিটেক্টিভ সেই পথই বেছে নিয়েছে!

“আমেরিকান একজন আর্কিটেক্ট ছিলেন, আর্কিটেক্ট-যাদের হিরাম আবিফের সময় শুধুই মেসন বলা হতো; নিজেকে মুক্ত একজন স্থপতি বলে মনে করতেন। এই আর্কিটেক্টের চিন্তাধারার মাঝেই ফ্রি মেসনিক ব্যাসিক এভাবে দেখতে পেলাম যখন, সন্দেশটা এসেছিলো। মোটামুটি নিশ্চিত হয়েছি আরও পরে।”

ইরফান ছিন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আসিফের মুখের দিকে। সুদর্শন এই তরুণের মাথায় এখন এমন কিছু চলছে যা তার বোঝার জন্য যথেষ্ট হচ্ছে না।

“আমাদের এই আর্কিটেক্ট কিন্তু জন্মসূত্রে আমেরিকান ছিলেন না। ইনি জন্মেছিলেন রাশিয়াতে। রুশ-জাপানিজ যুদ্ধের একজন যুদ্ধবন্দি হিসেবে তার স্বাক্ষর আটক করার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন সপরিবারে আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ায় মাইগ্রেট করে পরিবারটি। ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভেনিয়ার একজন ছাত্র ছিলেন এই আর্কিটেক্ট, ওখান থেকেই পেয়েছিলেন তার ব্যাচেলর অব আর্কিটেকচার ডিগ্রি। তারপর নিজের যোগ্যতার জোরেই হয়ে উঠেছিলেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আর্কিটেক্ট। অফার পেয়েছেন অনেক বড় বড় জায়গায় কাজ করার জন্য, অথচ ফিলাডেলফিয়া তিনি ছাড়েননি। তার যুক্তিটি ছিলো হাস্যকর, ‘একজন ফিলাডেলফিয়ান কিভাবে ফিলাডেলফিয়ার বাইরে থাকতে পারে?’-তিনি বলেছিলেন। অথচ জন্মসূত্রে তিনি রাশিয়ান একজন ব্যক্তিত্ব। ফিলাডেলফিয়ান তো নন-ই। ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মানুষটি ছিলেন ইহুদি। তাছাড়া, তার ডিজাইনে নির্মিত আমেরিকার ফোর ফ্রিডম’স

পার্কটির গঠন রীতিমত সন্দেহজনক। পানির মাঝে তৈরি ওটা, ওপর থেকে দেখলে স্ট্রাকচারটাকে ঠিক মেসনিক সিম্বলের মতোই মনে হয়। পিরামিড আকার। দুটুকরো। ওপরের অংশটা ছোট। রেশিওটা ঠিক যে চিহ্ন দেখেছি আমরা আগে, তার সমানই। সময় পেলে গুগলে সার্চ দিয়ে স্ট্রাকচারটা দেখে নিও।”

দরজা খুলে নেমে আসে আসিফ গাড়ি থেকে। অন্যপাশ থেকে বের হয় ইরফান। পেছনের ট্রাংক থেকে একটা ব্যাগ বের করে কাঁধে ঝোলানোর সময়টাতেও আর কোন কথা বলে না ও। চারপাশে তাকিয়ে ইরফান বুঝতে পারলো, জিয়া উদ্যানের পাশে চলে এসেছে ওরা। জিয়া উদ্যান এলাকাটি রাতের বেলায় বেশ্যাবৃত্তির জন্য বিখ্যাত। এখানেই থাকার কথা আসিফের কন্ট্যাক্ট সামান্ধার। নীরবে বেশিক্ষণ অনুসরণ করা সম্ভব হয় না ওর পক্ষে। জোর পায়ে হেটে আসিফের পাশে চলে এলো।

“তোমার ধারণা, ফিলাডেলফিয়া গ্র্যান্ড লজের একজন মাস্টার মেসন ছিলেন তিনি আর সেজন্যই ছাড়েননি জায়গাটি?”

“একেবারে পেনসিলভেনিয়াতেই একটা লজ আছে, ইরফান। গ্র্যান্ড লজ। মানে, এর আন্ডারে আরও কয়েকটি লজ আছে আশেপাশে।”

“তাহলে, আমাদের এই ইন্ডি ভদ্রলোক, যিনি ছিলেন একজন আর্কিটেক্ট—” নিজেকে শুধরে নেয় ইরফান, “স্বাধীনচেতা আর্কিটেক্ট, ফিলাডেলফিয়ান এবং সম্ভবত একজন মাস্টার মেসন—তার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কটা ঠিক কোথায়, আমি এখনও বুঝতে পারিনি।”

“বাংলাদেশের একমাত্র মিথরাস লজটি ফিলাডেলফিয়ার অধীনে কাজ করছে। আমাকে নিজেই জানিয়েছে তাদের আরএসএস। সম্ভবত ভাবেননি তথ্যটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে আমার জন্য। আর এই আর্কিটেক্ট ভদ্রলোক বাংলাদেশে একটা স্থাপত্য গড়ে দিয়ে গেছিলেন, যেটার কাজ শুরু হয়েছিলো ১৯৬১ সালে। ৪৮-এর পরে মাত্র তের বছরের মধ্যেই প্রথম সুযোগটা দেখতে পেয়ে ছাড়তে পারেনি মেসনরা। বাংলাদেশকে নিয়ে পরিকল্পনা তাদের আজকে থেকে নয়।” থমথমে মুখে বলে আসিফ।

ছোট জলাশয়টা পার করে ওদের দৃষ্টি রাস্তার অন্যপাশে ছাড়িয়ে যায়। একদৃষ্টিতে চমৎকার মনুমেন্টটার দিকে তাকিয়ে থাকে দু-জন। ইরফান ঠিক পনের সেকেন্ডেই বুঝতে পারে আসিফ কি বলতে চেয়েছে।

“মাই গড!” বিড় বিড় করে বলে ছেলেটা।

মাথা ঝাঁকায় আসিফ, “আর্কিটেক্টটিকে চিনবে হয়তো। উনার নাম এদেশে পরিচিত, লুই আই কান। আর আমাদের এতদিন ধরে সাজে বেড়ানো মেসনিক লজ, যেটা তার ডিজাইনে নির্মিত, এই জাতীয় সংসদ ভবন।”

বাইরে থেকে ধীর পায়ে আবারও কেবিনের ভেতরে ফিরে আসলেন ডক্টর খান। হাতে দোলাচ্ছেন মোবাইল ফোনটা। কয়েকবার দাঁড়িতে হাত বুলিয়ে জিয়ার দিকে ফিরলেন। চমৎকার একটা হাসি দিলেন তিনি, পাল্টা হাসলো না জিয়া। চিন্তিত মুখে তাকিয়ে থাকে ডক্টরের দিকে।

“ল্যাবে একটা ফোন দিলাম। রাতে ফিরবো না, কাজেই সিকিউরিটির দিকটা দেখতে হবে আমার অ্যাসিস্টেন্টকে।”

প্রসঙ্গ পাল্টে ফেললো জিয়া, “আপনার কি মনে হয়, মেসনদের উদ্দেশ্যটা ঠিক কি হতে পারে?”

কাঁধ ঝাঁকালেন ডক্টর, “এটা তো জানা কথা। তারা বাংলাদেশকে নিজেদের আওতাতে নিয়ে আসতে চাচ্ছে। ১৯৭১ সালে যে যুদ্ধটা হলো সেটা মেসনদের জন্য একটা চমক ছিলো, সন্দেহ নেই। পৃথিবীর অনেকগুলো দেশের জনুর পেছনে মেসনদের হাত আছে। ১৭৭৬ থেকে যে খেলাটা শুরু করেছিলো তারা, তার ত্রিশ বছরের মাঝেই বেশ কয়েকটা রাষ্ট্র জন্ম নেয়, উঠে আসতে থাকে বেশ কিছু নেতৃত্ব, পরবর্তিতে পৃথিবী এদের মনে রেখেছে। কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাপারটা...এটা হলো সাডেন সিভিল মুভমেন্ট।”

“যেটা মেসনরা ইচ্ছে করে ঘটাতে পারেনি, অথবা চায়নি?” বিছানায় বসে পড়ে জিয়া। কাঁধের ক্ষতটা এখন সেভাবে টের পাচ্ছে না। তবে ছোট্টাছুটি করলে রক্ত বের হতে পারে আবারও। ওকে বসিয়ে রাখার কারণ একটাই।

“অবশ্যই। পাকিস্তান তখনও ছিলো মেসন পার্টলি-ফ্রি কান্ট্রি। এখন তো ভালই ঢুকেছে মেসনরা। পতাকাটা পর্যন্ত প্যাগান সিম্বলে ভর্তি।”

“তবে, ডক্টর, প্রশ্নটা করে বাংলাদেশকে নিয়ে তাদের পরিকল্পনা কী তা জানতে চাইনি। জানতে চেয়েছি, ডক্টর তানভীর জালালকে হত্যা করার কারণ কি হতে পারে? এ থেকে তাদের কি প্রাপ্তি আছে বলে মনে করেন? আমার কল্পনাশক্তি কিছু আসছে না।” ইরফানের কাছ থেকে জানতে পারা তথ্যগুলো মাথার মাঝে নানাভাবে সাজাচ্ছে জিয়া।

জিয়ার সামনে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়েন ডক্টর খানও, “সম্ভবত অন্তর্দলীয় ঝামেলা। অথবা...ডক্টর জালালের ফ্রি মেসনারিতে পদবি...কি তা অবশ্য আমরা জানি না। হতে পারে তিনি এখানকার লজের মাস্টার মেসন ছিলেন। তাকে সরিয়ে তার ছেলেকে বসানোর পেছনে মেসনদের কি যুক্তি আছে জানতে চাবেন না। আমার বিন্দুমাত্র ধারণাও নেই। প্রডিজির জ্ঞানশক্তি বেশি হতে পারে, অভিজ্ঞতা নয়। তবুও বিজয়কে তারা সিলেক্ট করেছে মাস্টার মেসন হিসেবে। স্বাভাবিকভাবেই আগের

মাস্টার মেসনকে সরে যেতে হবে দুনিয়া থেকে। সে কারণেই জালালকে মেরে ফেলে ওরা।”

“হাইপোথিসিস?”

মাখা দোলালেন ডক্টর খান, “হাইপোথিসিস।”

“স্যারের একটা ধারণা আছে, মেসনিক লজ কোথায় হতে পারে।” আশ্তে করে বলে জিয়া।

“তাই নাকি?” অদ্ভুত রকমের একটা কৌতুহল ফুটে ওঠে ডক্টরের চোখে মুখে।

“সেটার খোঁজ করতেই বের হয়েছেন উনি। একটা লং শট অবশ্য।”

আগ্রহে সামনে ঝুঁকে আসেন ডক্টর খান, “কোথায় ওটা, আপনাকে বলেছেন তিনি?”

মাখা নাড়ে জিয়া, “কল্যাম না, লং শট? নিশ্চিত না হয়ে বস কিছুই বলতে চান না।”

আগ্রহ হারিয়ে চেয়ারে হেলান দিলেন ডক্টর খান। দেয়ালের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন তিনি। সেদিকে চোখ ফেরায় জিয়াও। একটা দেওয়াল ঘড়ি। মৃদু টিক টিক শব্দ করছে। ডক্টরের দিকে তাকালো জিয়া।

“কোন কিছুর জন্য অপেক্ষা করছেন?”

বিশ্ময় ফুটে ওঠে ডক্টরের মুখে, “কিসের?”

“কিছু না। ডক্টর তানভীর জালালকে কেন মেরে ফেলা হয়েছে, সে-ব্যাপারে আমার একটা হাইপোথিসিস আছে। সেই হাইপোথিসিসে ডক্টর জালাল মাস্টার মেসন তো ননই, তেমন উঁচু পর্যায়ের কেউ নন এখানে। তবে তাকে সেভাবে দেখানো হয়েছে। তাকে বাধ্য করা হয়েছে পেন্টাকলের মতো গঠনে ল্যাব বানাতে।”

“কেন?”

“যাতে তার মেসনিক সিম্বল মার্কা ল্যাব দেখে মানুষ সন্দেহ করলে ডক্টর জালালকেই করে। আসল মাস্টার মেসন থেকে যেতে পারবেন সন্দেহের উর্ধ্বে।”

সায় দেন ডক্টর খান, “সম্ভাবনা আছে।”

“আরও সন্দেহের উর্ধ্বে চলে যেতে পারবে, যদি ডক্টর জালালের সাথে কোন একটা আবিষ্কার নিয়ে তার ঝামেলা বেঁধে যায় আচমকা।”

জিয়ার কথার তাৎপর্য বোঝেন এবার ডক্টর খান, “কাম অন! আপনি জিনিসটা আমার দিকে ঠেলছেন।”

নির্দয়ের মতো বলে চলে জিয়া, “নিজেকে ঘোষণা দিয়ে ফ্রি মেসনদের বিরোধি বলে চালিয়ে দিয়েছেন। তারপর একেবারে পায়ে পা লাগিয়ে ঝামেলা করেছেন ডক্টর জালালের সাথে। একজন কেমিস্ট হিসেবে একটু বেশিই জানতেন সবকিছু নিয়ে, বিশেষ করে ইতিহাস। বিষয়টা কি একটু চোখে লাগার মতো না?”

দাঁড়িয়ে যান ডক্টর খান, “ইতিহাস আমার প্যাশন। আর হ্যা—একজন মুসলিম হিসেবে ফ্রি মেসনারির বিরোধিতা করি আমি। আমার বিশ্বাস আছে দাজ্জাল নামক

ত্রাস একদিন পৃথিবীর বুকে আসবে। আর তাকে সাহায্য করবে আমাদের আজকের এই মেসনরাই। তখন একটা সাইড আমাকে নিতে হবে, আর সেটা হবে শয়তানের বিপরীত পক্ষ। সে-কারণেই এতকিছু নিয়ে পড়াশোনা করেছি আমি। এজন্য আমাকে একজন মেসন বলে সন্দেহ করতে পারেন না আপনি।”

মুচকি হাসে জিয়া, “সেটাই। আপনাকে নিয়ে কেউ মেসন হবার ব্যাপারে সন্দেহও করতে পারবে না। আর সে-কারণেই আপনাকে আমার আরও বেশি সন্দেহ হয়, ডক্টর। আমার মাথায় এটাই আসছে না, কেন রিয়াজকে মেরে ফেললেন আপনি? চাইলে আমাদের যে কাউকে উড়িয়ে দিতে পারতেন। তা না করে, রিয়াজ কেন?”

“বাঞ্চে বকছেন। রিয়াজের মৃত্যুর পর আমার রিঅ্যাকশন আপনার চোখে পড়ার কথা না। নিজেও গুলি খেয়ে কোঁকাচ্ছেন। না-হলে বুঝতে পারতেন, গুরুত্ব একটা কাজ করার মতো নার্স আমার নেই। অথবা দুঃখেন না, গ্লিভ, মি. জিয়া।”

“সেজন্যই তো নিজে কাজটা না করে আর কাউকে দিয়ে করিয়েছেন।” খোঁচা মারে জিয়া, “আচ্ছা, এখনও কেন আত্মপক্ষ সমর্থন করছেন, বলুন তো? আমাকে এখানে বেশিক্ষণ রাখবেন না নিশ্চয়? খুব বেশি জেনে ফেলছি না আমরা? আমাদের তথ্য দিচ্ছেন কি মনে করে?”

“আমি আপনাদের সাহায্য করছি, ডিটেক্টিভ!” এবার চাপা কণ্ঠে চিৎকার করেন ডক্টর খান।

“আমার সন্দেহ আছে। আপনি সম্ভবত নিরানব্বই ভাগ তথ্য দিয়েছেন ঠিকমত। আর এক পার্সেন্ট মিথ্যে তথ্য দিয়ে আমাদের পরিচালিত করছেন আর কোন দিকে। যদিকে গেলে আমরা আমাদের ক্রিমিনালকে পেয়ে যাবো, মেসনদের রহস্য সমাধান করে ফেলেছি ভেবে বসলো বাজাবো—তবে আপনাদের মূলত কোন ক্ষতিই করতে পারবো না। আগে অনেকবার মেসনরা এভাবে শত্রুর খুব কাছে থেকে তাকে আপাতদৃষ্টিতে বিজয়ি বানিয়েই নিজের কাজ উদ্ধার করেছে। বাংলাদেশকে নিয়ে যা ইচ্ছে করতে পারবেন তখন আপনারা।”

মাথা নাড়েন ডক্টর খান, “বুলেটের শকটা এড়াতে পারেননি মনে হয়। আহত হয়ে ভুল-ভাল বকছেন। নার্স!”

এক পা বাইরে চলে যান ডক্টর ঘরের, “নার্স?”

সাদা অ্যাপ্রন পরা মহিলা হস্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে কেবিনের ভেতরে, জিয়াকে দেখে আঁতকে উঠলো, “পেশেন্ট বসে আছে কেন? তার তো গুরুত্ব থাকার কথা। গুয়ে পড়ুন। হার্ট লেভেলে রাখতে হবে আপনার ক্ষত। নড়াচড়া করবেন না।”

গুলো না জিয়া, “ইনজেকশন বের করছেন কেন? প্রাচীন পদ্ধতি কাজে লাগালেও পারতেন।”

নার্স থামে না, সিরিঞ্জে মেডিসিন ঢোকাচ্ছে সে, “আপনি বেশি অস্থির হয়ে আছেন। আপনার স্নায়ুর জন্য একটা ডোজ দিতে বলে গেছিলেন ডক্টর। বুলেট ওউড সাইকোলজিক্যাল ট্রমারও কারণ হতে পারে।”

“তোমার হাতের উক্টিটার ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে, সুন্দরি। সাইকোলজিক্যাল ট্রমার কারণ হিসেবে ওটাও ইদানিং খুব চলছে!” মুচকি হাসে জিয়া, “থ্যাংকস ডক্টর। আপনাকে বিশ্বাস করেছিলাম। রাখতে পারলেন না। বান্ধবিকে ফোনটা আরেকটু আগে করলে তো স্যার আর ইরফানকেও পেয়ে যেতেন এখানে।”

চট করে হাত দেখেছে নার্স মেয়েটি, জিয়া বলার সাথে সাথেই।

ছোট করে পিরামিড আর চোখ আঁকা আছে ওখানে ঠিকমতই। স্পষ্ট ফ্রি মেননারির চিহ্ন শরীরে নিয়ে আর অস্বীকার করার চেষ্টা করলো না মেয়েটা। আচমকা সিরিজটা ছুঁড়ে মারলো জিয়ার দিকে। একই সাথে নড়ে উঠেছে জিয়াও, হাত থেকে স্যালাইনের সুই খুলে ফেলে সাবধানে এগিয়ে গেলো মেয়েটির দিকে—দু-হাত সামনে বাগিয়ে রেখেছে বস্ত্রারদের মতো।

হঠাৎ সিরিজ ছুটে আসবে তা ভাবেনি ও। একটু সরে যেতে গিয়েই বুঝতে পারে, মনোযোগ হারিয়েছে পুরোপুরি। তারওপর শরীরে জোর পাচ্ছে না। রক্তক্ষরণে এমনতেই দুর্বল হয়ে আছে। আচমকা মেয়েটির পা উঠে যায় ওপরে, শক্ত হিলের একটা জুতো পরে আছে মেয়েটা, নার্সরা এসব পরে না। জিয়ার চোয়ালের ওপর দড়াম করে আছড়ে পড়ল ওটা।

“ঠিক যেমনটা বলেছিলে, প্রাচীন পদ্ধতিতেই।” বিড় বিড় করে মেয়েটি। তারপর ফিরে তাকালো ডক্টর খানের দিকে।

ডক্টরের মুখটা এই মুহূর্তে কেমন জ্ঞানি ফ্যাকাসে হয়ে গেছে!



“অ্যাবসার্ড! এখানে সংসদের অধিবেশনগুলো অনুষ্ঠিত হয়।” অবিশ্বাসের সুর ইরফানের কণ্ঠে।

“ডিজাইন লুই কানের। আভারগাউন্ড সিক্রেট চেম্বার নেই, তা কিভাবে নিশ্চিত হচ্ছে? এই দেখো, লুই আই কান নিজে কি বলেছিলেন বিল্ডিংটা সম্পর্কে।” মোবাইলফোনের স্ক্রিনটা বাড়িয়ে দেয় ওর দিকে।

‘সংসদের অভ্যন্তরীন নকশায় আলোক-প্রদানকারি এক উপাদানের উদ্ভব ঘটিয়েছি আমি। আপনারা যখন একসারি স্তম্ভ দেখতে পাবেন, মনে হবে আলোই তাদের বেছে নিয়েছে। স্তম্ভগুলো আলোর জায়গা করে দেওয়া নিরেট কাঠামো। এখন এটাকে উল্টো করে চিন্তা করে দেখবেন, স্তম্ভগুলো শূন্য আর অনেক বৃহদাকৃতির-তাদের দেয়ালগুলোই আলো বিতরণে সক্ষম, তাহলে শূন্যস্থানগুলো হচ্ছে বিভিন্ন কক্ষ, আর স্তম্ভগুলো হয়ে উঠছে আলোর উৎস, তারা বিভিন্ন আকৃতিতে শূন্যস্থানগুলোকে সাপোর্ট করছে, সেখানে আলো ছড়াচ্ছে। এটাকে আরও উন্নত করে তোলার জন্য কাজ করছি এখন, যাতে সৌন্দর্যের বিচারেও এটি কাব্যিক এক ভূমিকা রাখতে পারে। অন্যভাবে বললে, একটু আগে যে স্তম্ভগুলোর কথা আমি বললাম, তাদের প্রতিশব্দ হবে এই সংসদ। আলো বিতরণ করবে।

এটা নিছক কোন বিশ্বাস নয়, নিছক কোন ডিজাইন নয়, একটি সজ্জের উত্থানের জন্য প্রয়োজনীয় এক কাঠামো...’

মোবাইল স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে চুপ হয়ে যায় ইরফান। দেখা যাচ্ছে, নিজেও ইলুমিনাতি অথবা মিথরাসদের মতোই আলোর দিকে মনযোগ দিয়েছিলেন বেশি। পিরামিডের তিনপাশে পানি রাখা যেমন মেসনিক সিম্বলের সাধারণ গঠন, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের তিনপাশেও তেমন পানি রয়েছে। তার ওপর লুই আই কান একদম পরিস্কার করে বলেছেন, *এটা নিছক কোন বিশ্বাস নয়, নিছক কোন ডিজাইন নয়, একটি সজ্জের উত্থানের জন্য প্রয়োজনীয় এক কাঠামো!* ক্রাইস্টেরিয়াগুলো মিলে যাচ্ছে এখানে।

সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে জাতীয় সংসদ ভবনের ভেতরে যদি কোন মেসনিক রিচুয়ালও চলে, ইরফান অবাক হবে না। অসামান্য সৌন্দর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল বিল্ডিংটাকে দেখে এই মুহূর্তে ওর শরীর হুম হুম করে ওঠে।

“এন্ট্রীস ডোর কোনদিকে হতে পারে? স্বাভাবিকভাবে ঢুকলে নিশ্চয় ওদের সিক্রেট চেম্বার খুঁজে পাওয়া যাবে না। যদি আসলেই ওরকম কিছু থেকে থাকে আর কি।”

“আমি নব্বই ভাগ নিশ্চিত, ইরফান। আর এ এলাকায় অশ্লীলতার ছড়াছড়ি। রাত হলে প্রস্টিটিউশন আর ফ্রি-সেক্স চর্চা চলে জিয়া উদ্যানের আশেপাশে। খুব কাছেই কোথাও অশ্লভ কিছু চলছে, ধর্মের দিক থেকে চিন্তা করলেও এরকম সিদ্ধান্তে পৌছতে পারো।”

“অশ্লীলতার অনেক অর্থ থাকতে পারে, ধর্মিয়ভাবেও,” ছোট্ট করে বলল ইরফান।

“আমার মনে হয়, এখানে আমাদের সাহায্য করতে পারবে সামান্না। তার বান্ধবিকে হত্যা করা হয়েছে—এটা এখন আমারও দৃঢ় বিশ্বাস। শুধু আমাকে দেখতে হবে, এভিডেন্সটা সে কোথা থেকে পেয়েছে। ওদিক থেকে খোঁজা শুরু করবো আমরা। সিম্পল প্ল্যান।”

সাধারণ, কিন্তু কার্যকর—মনে মনে ভাবে ইরফান। অন্ধকার থেকে একটি ছায়ামূর্তিকে এদিকেই এগিয়ে আসতে দেখলো। আসিফের হাতে টোকা দেয় ও, “তোমার ডেট।”

মেয়েটির দিকে ফিরে তাকায় আসিফও, অন্ধকারেও অদ্ভুত আলোময় পরিবেশ এখানে। স্ট্রিট ল্যাম্পগুলো হালকা আলো পৌছে দিচ্ছে এতদূর পর্যন্তও। মেয়েটি লম্বা, একহারা গড়নের শরীর। ভরাট নিতম্বে আঁটসাঁট হয়ে আছে পরনের স্কার্ট, কুচকুচে কালো চুলগুলো দু-পাশ থেকে দুই গোছাতে নেমে এসেছে ফর্সা মুখটার ওপর। নিষ্পাপ একটা মুখ, নোংরামির কোন ছোঁয়া এরকম একটা চেহারাকে স্পর্শ করতে পারে না বলেই প্রথম দেখাতে যে কারও ধারণা হতে পারে, তবে সমাজে মেয়েটির অবস্থান সে ধারণাকে পরমুহূর্তে মিথ্যা করে দেবে।

অসংখ্য কেস আসে হোমিসাইডে। তার মধ্যে অসংখ্য কেস আনসলভড হয়ে থেকে যায়। আজ সারাদিন চিন্তা করার সময় লুই আই কানের প্রতি নজর আটকেছিলো আসিফের। তখন সামান্নার কেসটার কথা মনে পড়েছিলো ওর। ডিপার্টমেন্ট থেকে পুরাতন কেসগুলো সমাধান করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো ওকে, সেজন্য ফাইলগুলো মোটামুটি মুখস্থ হয়ে এসেছে। ভাগ্যকে স্বপ্ন্যবাদ দিয়েছিলো আসিফ। ফলাফল : এই মুহূর্তে একজন সম্ভাব্য সোর্স ওদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

“ডিটেক্টিভ।” হাত বাড়িয়ে দেয় সামান্না।

হাত মেলায় আসিফ, পরিচয় করিয়ে দেয়, “আমি বন্ধু, ইরফান। ইরফান, ও সামান্না।”

মেয়েটি ইরফানের সাথেও হাত মেলায়, তারপর চট করে কাজের কথাতে চলে আসে, “চলুন, ভেতরে যাওয়া যাক।”

প্রহরায় থাকা পুলিশগুলো ওদের তিনজনের ছোট দলটার দিকে সন্দেহের চোখে একবার তাকালো শুধু, কিন্তু কিছু বলল না। যেভাবে থম মেরে পড়েছিলো তারা, সেভাবেই পড়ে থাকলো। ওদের দিকে দ্বিতীয়বার না তাকিয়ে ওরাও ঢুকে পড়ল ভেতরে।

রাতের অন্ধকারে একটা ছমছমে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। যদিকে তাকানো যায় শুধু ঘোরলাগা অন্ধকার। জিয়া উদ্যানের ভেতরের পায়ে চলা পথগুলোর সাথে স্ট্রিট ল্যাম্পের ব্যবস্থা ছিলো, তবে সবগুলো কাজ করে না। তার মাঝেই সামান্য এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওদের।

“এলেনার আসল নাম ছিলো মিথিলা। মেয়েটা পরিশ্রম করতে জানতো। আমাদের পেশাতে বন্ধুত্ব খুঁজে পাওয়া বিরল। এই মেয়েকে একমাত্র বান্ধবি হিসেবে পেয়েছিলাম। এখানে সবাই থাকে নিজের আখের গুছাতে ব্যস্ত।”

সামান্য কথামূল্যের মাঝে মন খারাপ করা একটা ভাব আছে। ওরা কিছু বলে না। মেয়েটা চমৎকার বাচনভঙ্গিতে কথা বলে, বিষয়টা অবাক করে ইরফানকে। মনের কথা যেন পড়ে ফেললো মেয়েটি।

“বাচনভঙ্গি ভাল করার জন্য আমাদের আলাদা ট্রেনিং দেওয়া হয়। না-হলে দামি কাস্টমার মিস করবো আমরা।”

“কিভাবে বুঝলেন?”

“এরকমটা প্রথমবারের মতো হয়নি। অভিজ্ঞতা। তাছাড়া কমনসেন্সও এমনটাই বলে থাকে। ক্লাস দেখলে দামি কাস্টমার আকৃষ্ট হবেই।”

“সেটা না, আমার মাথায় কী চলছিলো সেটা বুঝলেন কিভাবে?”

ইরফানের অবাক হয়ে থাকা মুখের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসে সামান্য, “পুরুষ মানুষের মনের কথা বোঝাই আমাদের কাজ। যে যত দক্ষ, সে তত সফল। যেমন...আমি জানি আপনার গার্লফ্রেন্ড আছে। এবং তার প্রতি আপনি বিশ্বস্ত।”

আসিফ মুচকি হাসলো। প্রথম যেদিন সামান্য সাথে দেখা হয়েছিলো, মেয়েটি তাকে কম চমকে দেয়নি। ইরফান এখন কাতল মাছের মতো ফ্যাকাসে দৃষ্টি দিয়েছে, মুচকি হাসলো সামান্য।

“আপনার দৃষ্টি। আমার বুকে আর পেছনে আটকায়নি একবারও,” ব্যাখ্যা দিল সে, “বিশ্বস্ত পুরুষ চেনা তেমন কঠিন কিছু নয়।”

“চমৎকার।” বিব্রত ভাবটা কাটাতে বিড় বিড় করে বলে ইরফান।

মেয়েটি বুদ্ধিমতি, এমন একটা পেশায় কিভাবে আসলো প্রশ্নটা খোঁচায় ইরফানকে। তবে মুখ থেকে বের করে না ওটা। এই প্রশ্ন নিঃসন্দেহে এই জীবনের অসংখ্যবার শুনেছে মেয়েটি। আরও একবার করে তাকে বিরক্ত করার কোন মানে হয় না। একই সাথে বুঝতে পারছে আসিফ কেন এই মেয়েটির কথা বিশ্বাস করেছে। অ্যাভারেজের চেয়ে বেশি ইন্টেলিজেন্স থাকার কথা এর। প্রথমবারের মতো ইরফানের

মনে হলো, মেয়েটির ক্লু বিফলে না-ও যেতে পারে।

চুপচাপ এগিয়ে যায় ওরা। অন্ধকারে কোথায় জানি একটা কর্কশকণ্ঠি পাখি ডেকে ওঠে। পরিবেশটার রহস্য যেন বাড়িয়ে দিল ওটা। দূরে একটা ক্রশ দেখতে পেয়ে থমকে যায় ইরফান। বিশাল আকারের ক্রশটা সরাসরি ওর দিকেই যেন তাকিয়ে আছে। ফিরে তাকালো সামান্না সামনে থেকে।

“কি হলো?”

“একটা ক্রশ।”

ইরফানের ইঙ্গিত অনুযায়ী তাকিয়ে হাসে মেয়েটা, “দুটো লাইটপোস্ট, আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে। এই অ্যাংগেলে দূর থেকে ক্রশের মতোই লাগে। প্রথম প্রথম আমারও লাগতো। সামনে চলুন, বুঝতে পারবেন।”

আবারও এগিয়ে গেলো ওরা। দু-পাশে সারিবদ্ধ অসংখ্য গাছ ভুতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। বসার জন্য রাখা বেঞ্চগুলো ফাঁকা। কেউ নেই চারপাশে। সামনে আসতেই সামান্নার কথার সত্যতা টের পায় ও। আসলেই ওটা দুটো লাইটপোস্টের মিশেল। ধীরে ধীরে বাউন্ডারি ওয়ালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা, হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলো আসিফ।

বাউন্ডারি লোহার শিক দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সলিড কোন দেয়াল জিয়া উদ্যানের বাউন্ডারি দিতে ব্যবহার করা হয়নি। শিকগুলো থেকে বিশ ফিট দূরেই থেমে যায় সামান্না। তারপর ইঙ্গিত দেয় মাটির দিকে।

“এখানে পেয়েছ তুমি রিংটাকে?” অবাক হয় আসিফ।

“হুম।” জানিয়ে দেয় মেয়েটা দ্বিধাহীনভাবে।

“চমৎকার। এখান থেকে চলে যাও, যত সম্ভব দূরে, অলরাইট? কোন আপডেট পেলে আমি তোমাকে ফোন দেবো।”

“আর যদি ফোন না দেন?” সরাসরি তাকায় মেয়েটা আসিফের দিকে।

“তাহলে বুঝবে তোমার বান্ধবি মিথিলার সাথে দেখা হয়ে গেছে আমাদের। কাম অন, ইরফান।”

হতভম্ব মেয়েটা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে উল্টোদিকে রওনা হয়ে গেছে। পার্কের সীমানার দিকে এগিয়ে যায় আসিফ। ড্রেন সিস্টেমগুলো ধারে ধারেই রাখা হয়েছে। ব্যাগ থেকে লম্বা একটা ফ্ল্যাশলাইট বের করলো ও। এদিকে কোন্সার্ট নেই। সম্ভবত থাকেও না। না-হলে এন্ট্রান্সের সামনে মানুষের ঘোরাঘুরি ভাল চোখে দেখতো না কেউ।

আন্তে করে মাথা ঝুঁকিয়ে হাত ড্রেন লেভেলে ঝামিয়ে লাইটটা জ্বালিয়ে দেয়। সামনে পেছনে শত শত ফুট চলে গেছে এরা। পুরো জিয়া উদ্যানটিকেই বাইরে থেকে ঘিরে রেখেছে। দু-পাশের দেওয়ালের গাঢ় খয়েরি কাদায় মাথা চেহারা দেখে নাক কুঁচকে ফেলে ইরফান। ঠিক নীচ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে পানি, সাথে হাজারো ময়লা। মনে

হচ্ছে দেশের সব ময়লা এদিক দিয়েই যায়। গ্র্যান্ড ড্রেন! আসিফ অবশ্য এদিকে ওদিকে আলো দিয়ে দেখছে, কিন্তু আশাব্যঞ্জক কিছু পেয়েছে বলে মনে হয় না। নর্দমার মতো নোংরা ময়লাগুলো আলোতে চিকচিক করছে। একটা সময় ড্রেনে ঢাকনি দেওয়া ছিলো এখানে, কালের বিবর্তনে সে ঢাকনা হারিয়ে গেছে।

মাথা তুলে আনল আসিফ। মাটিতে বসে পড়েছে ধপ করে। পাশে বসলো ইরফান।

“এবার কি করবে?”

“গাধার মতো কাজ করে ফেলেছি। ভেবেছিলাম এখানেই পাবো ওটাকে।” মাথা নীচু করে বলে সে।

“নিজেকে দোষারোপ করে লাভ নেই। ক্রস কানেকশন করে যথেষ্ট বের করেছে। খিওরি হিসেবে ভালই যায়। একটা মেসনিক লজ এত সহজে খুঁজে পাওয়ার আশা করা মনে হয় উচিত হয়নি।”

দুটো মুহূর্ত চুপ হয়ে বসে থাকে আসিফ। তারপর আন্তে করে উঠে দাঁড়ায় আবার। ফ্ল্যাশলাইটটা তুলে নিয়েছে একহাতে। ড্রেনের দু-পাশে আলো ফেলে দেখায়, “মাটি উঁচু হয়ে এজায়গাটা আড়াল করেছে সবার চোখ থেকে। মিথিলার মৃত্যুর কারণ একটাই দেখতে পাচ্ছি, জায়গাটা সে আবিষ্কার করে ফেলেছিলো। জায়গা বলে শুধু ড্রেন বোঝাচ্ছি না। কোন ধরনের এন্ট্রান্স পেয়ে গেছিলো সে। তাকে এখানেই হত্যা করা হয়েছে, অথবা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ধরে নিয়ে গেছিলো শুধু। কোনভাবে একটু দূরে এয়াররিংটা পড়ে গেলেও খেয়াল করেনি মেসনরা।”

চারপাশে লক্ষ্য করলো আসিফ। এখানকার মতো ড্রেনেজ সিস্টেম আড়াল পেয়েছে এমন আর কোন জায়গা এপাশের দেয়ালে দেখা যাচ্ছে না। এন্ট্রান্স থাকলে এখানেই থাকতে বাধ্য। নতুবা লাফিয়ে লোকজন ড্রেনে নেমে যাচ্ছে, এমন দৃশ্য কেউ সহজভাবে মেনে নেবে না। মেসনদের আন্ডারএস্টিমেট করেছে সে? ইচ্ছে করেই এয়াররিংটা ভুল দিকে ফেলে দেয়নি তো তারা? অসম্ভব নয়।

কিন্তু এটা তো তাদের বেখেয়ালেও ঘটতে পারে?

আবার ড্রেনে ঝুঁকে পড়ল আসিফ। তারপর এক কোণে বসে পড়ে সাবধানে। ভেতরের দেওয়ালে আলো ফেলেই স্কানমশ হলো না এবার, জোরে লাথি মারলো। নোংরা ময়লা-কাদায় পা নষ্ট হওয়ার বদলে ফাঁপা একটা শব্দ হলো শুধু। লাফিয়ে দাঁড়ালো ইরফান। ড্রেনের কাছে বিনা দ্বিধায় চলে এলো আসিফ। এখনও দেওয়ালের ময়লাগুলো চক চক করছে।

“ক্যামোফ্লেজ! ইউ আর ড্যাম রাইট, মি. আসিফ!” ফিস ফিস করে বলে ও।

মুচকি হাসে আসিফ, “একটা মেসনিক লজ এত সহজে খুঁজে পাওয়ার আশা করা আসলেই উচিত হয়নি।”

তারপরই হাত বাড়িয়ে দিল আপাতদৃষ্টিতে জঘন্য ময়লা একটা দেয়ালের দিকে।

সবটুকুই পেইন্টিংয়ের কারসাজি। দেওয়াল হাতড়াতে হাতড়াতে একটা সময় বিরক্ত লাগে ওর। ‘রূপ’ জাতীয় শব্দ তুলে নেমে আসে ড্রেনের নোংরা পানিতে। নবটা চোখে পড়ল এবার। অনেকটা গাড়ির জানালা খোলার চ্যান্টা হাতলের মতো। হালকা টান দিলে একটু বের হয়ে আসা হাতলটা ঘুরিয়ে দিতেই মৃদু ঘড়ঘড়ে শব্দের সাথে খুলে যায় ওটা।

প্রায় সাথে সাথেই নেমে আসে ইরফান। মাত্র হয়ে ওঠা ফোকডটা দিয়ে আসিফ ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেছে—তার ফ্ল্যাশলাইটের আলো দেখা যায়। দ্বিধা ছাড়াই পা বাড়ায় ওদিকে।

“সুইচবোর্ডও আছে দেখছি। এসব ১৯৬১-এর সময়কার কাজ হলে আমি আমার নাম পাল্টে ফেলবো,” ইরফানকে দেখে মৃদু কঠে বলে আসিফ।

“পরে ইন্সটল করেছে।” চারপাশে তাকাতে তাকাতে মন্তব্য করলো ইরফান।

চমৎকার একটা আধুনিক সুড়ঙ্গ বলা যেতে পারে একে। চারফিট প্রস্থের একটা করিডোর। ছাদটা মেঝে থেকে মাত্র আট ফিট ওপরে। কোনমতে দু-জন মানুষ একে অন্যকে পাশ কাটাতে পারবে একপাশে সরে গিয়ে, এভাবেই বানানো হয়েছে এটাকে। আসিফ সুইচে হাত রাখতেই জ্বলে ওঠে ঢেকে রাখা বাল্বগুলো। চোখের লেভেলে আলোগুলো আছে, দেওয়ালের নির্দিষ্ট ফোকডে। সবগুলো বাতি জ্বলে উঠতে হা করে তাকিয়ে থাকে ওরা সামনের দিকে। কয়েকশ ফুট লম্বা এই করিডোর!

“সরাসরি চলে গেছে সংসদ ভবনের ভেতরে।” চাপা গলায় বলে আসিফ।

ইরফান সেটা জানে না বিষয়টা, এমন নয়। তবুও অজান্তেই ওর মুখ থেকে বের হয়ে যায়, “তাই তো দেখছি।”

ব্যাগ থেকে কিছু একটা বের করে আসিফ ওর দিকে ছুঁড়ে মারলো। বাতাসেই ভারি জিনিসটা খপ করে ধরে ফেলে ইরফান। তারপর অবাক হয়ে তাকালো সে।

“গ্রুপ-২৩ তোমার রেগুলার। ভাবলাম, যেটা দিয়ে কাজ করতে কমফোর্ট ফিল করছ, সেটাই তোমার সাথে থাকা উচিত।”

“আজ সারাদিন রিসার্চ ছাড়াও আর কিছু কাজ করেছে তুমি দেখা যাচ্ছে।” মন্তব্য করে ইরফান। আনকোড়া নতুন পিস্তলের মাথায় লাগানো সাউন্ড সাফেসর দেখতে পেরে মুখে অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে উঠেছে ওর। তারপর আসিফের এগিয়ে দেওয়া ইয়ারসেটের একটা অংশ হাতে তুলে নিল সে। এরপর ব্যাগ থেকে বের হওয়া ফ্ল্যাশলাইটটাও কোমরে ঝোলায়। কাঁধে আসিফ অনেকক্ষণ ধরেই ব্যাগ ঝুলিয়ে রেখেছিল। ওটার উপস্থিতির রহস্য এতক্ষণে বোঝা গেলো।

চার ম্যাগাজিন লাগানো বেল্টটা ওর দিকে ছুঁড়ে দেয় আসিফ, “খার্টিন রাউন্ডস। অ্যাটাচমেন্ট নেই। কাউন্ট অন ইট।”

মাথা দোলায় ইরফান। কোমর থেকে শক্ত হাতে নিজের নাইন মিলিমিটার বের করে আনল আসিফ। লম্বা একটা নিশ্বাস নিল বুক ভরে। পুরো দেশে ক্রিমিনাল র‍্যাংক

করা হলে পাশে দাঁড়ানো ইরফানকে প্রথম পাঁচে পাওয়া যাবে। কে ভেবেছিলো, সহকারি হিসেবে এমন একজন মানুষের সাথে কিছুক্ষণের জন্য হলেও একসাথে কাজ করতে হবে?

আলোকিত করিডোরে একটা শব্দও আসতে পারে না বাইরে থেকে, তার মাঝেই মৃদু জ্বুতোর শব্দ তুলে এগিয়ে যেতে থাকে দু-জন মানুষ। গন্তব্য : জাতীয় সংসদ ভবন।

অথবা, বাংলাদেশের একমাত্র মেসনিক লজ।

যে কোন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার জন্য দু-জনেই সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

BanglaBook.org

প্রথমে হালকা একটা আলো চোখে পড়ল, তারপরই উজ্জ্বল আলোতে পৃথিবী ভেসে যায় যেন। চোখ খুলে কিছুই দেখতে পায় না জিয়া। চারপাশে শুধু সাদা আর সাদা। খানিকক্ষণ বাদে টের পেলো, হাত-পা নড়াতে পারছে। অজান্তে একটা স্বস্তির নিশ্বাস বের হচ্ছিলো, মাঝপথে আটকে গেলো সেটা।

হাত-পার নড়াচড়া সীমাবদ্ধ পরিসরে করা যাচ্ছে। শক্ত কিছুর সাথে বেঁধে যাচ্ছে তারপর। বেঁচে থাকার আনন্দটুকু নিমেষে উবে গেলো। স্বস্তির নিঃশ্বাস দীর্ঘশ্বাস হয়ে বের হয়ে আসে অচিরেই। কাঁধের কাছে গুলির ক্ষতে ব্যথা করছে। ব্যান্ডেজ পাল্টে নিতে পারলে ভাল হতো।

“জেগে গেছেন দেখছি।” অদ্ভুত একটা টানে কথাগুলো উচ্চারণ করলো কেউ।

মাথা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকায় জিয়া। চোখে আলো অনেকটা সয়ে এসেছে এখন। তবে এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে সয়ে না এলেই ভাল হতো।

ঘরটা সাধারণ, এবং খুবই ছোট। চোখের আন্দাজে জিয়ার মনে হয় দশ ফিট বাই দশ ফিট হবে। দেওয়ালের ওপর থেকে নেমে আসা শেকলগুলো নির্দয়ের মতো ঝুলে আছে ওপর থেকে। এই মুহূর্তে সেগুলো জড়িয়ে আছে জিয়ার হাত আর পা। এখন শেকলগুলো একেবারে মেঝে পর্যন্ত নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেজন্য মেঝেতে গুয়ে থাকতে পারছে সে। ওপরের দিকে চোখ তুলতে শক্তিশালি এনার্জি বাল্‌বিট চোখে পড়ল প্রথমে। ঘরের আয়তনের তুলনায় একটু বেশিই আলো দিচ্ছে ওটা। তার ঠিক পাশ থেকে ঝুলছে শেকল, গোড়াটা এই মুহূর্তে আলোর উৎসের তীব্রতায় অদৃশ্য।

অন্যপাশের দেওয়ালটা ঘরের অন্যান্য দেওয়ালগুলোর মতোই। সবগুলোই সাদা রঙের ছিলো নিশ্চয় কোন একদিন। তবে আজ সে রঙ নেই। কালের পরিবর্তনের সাথে খয়েরি হয়ে গেছে বলে মনে হয় না। স্পষ্টতই ওগুলো রক্তের ছাপ। চমৎকার দেখতে কিছু ওয়াল-শেফ আছে ওখানে। তার ভেতরে কাঁচের পাল্লা ভেদ করে দেখা যাচ্ছে ‘জিনিসপাতি।’ ওগুলো দেখে সে ঘাবড়ে গেছে এমনটা নয়, এসব প্রতিশ্রুতি ছিলো। প্রথম ধাক্কাটা বরং কণ্ঠের মালিককে দেখে লেগেছিল। ওটা সামলাতে পারেনি এখনও।

“টর্চার চেম্বার। চমৎকার জিনিস। প্রশংসা না করলে একেবারেই ছোট করা হবে।”

মুচকি হাসলেন মিথরাস লজের আরএসএস, কেমেন্ট্র্যান্ট, “প্রশংসা না করলেও আপনাকে ছোট করা হবে, মি. জিয়া। ফিজিক্যালি, মানে সাইজে আর কি। তবে আপনাকে বিচলিত মনে হচ্ছে না।”

“আপনাদের যে ধরণের পবিত্র কাজ-কারবার, তাতে সাইজ রিডাকশন তো খুব



একটা সারপ্রাইজিং এলিমেন্ট হলো না। এক বছর আগে মিথরাস লজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তবে এই চেয়ারের প্রতিষ্ঠা আরও আগের সেটা বোঝা যাচ্ছে। সম্ভবত এই ছোট ঘরে আপনাদের পরিশ্রমের ফসল হিসেবেই আজকে খোলা মাঠে লজ দিতে পেরেছেন?”

“তা একটা কারণ বলতে পারেন। সবাইকেই শান্তি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিলো, কেউ শোনেনি। ইউনুস আলীকে মনে আছে তো?”

“সফল রাজনীতিবিদ...নিখোঁজ রাজনীতিবিদ?” ভেতরে ভেতরে আরেকবার চমকে উঠলো জিয়া।

“এবং গুম হয়ে যাওয়া রাজনীতিক। এ ঘরেই তার ছয় আঙুল কেটে নিয়েছিলাম আমি। আমাদের বিরুদ্ধে ছোক ছোক করতে শুরু করেছিলেন তিনি।” কথাটা বলতে গিয়ে হেসে ফেললেন কেনেথ।

“সাবাশ।” দুর্বল গলায় বলে জিয়া, “একে অন্যকে দোষ দেওয়া ছাড়া তাদের দল আর বিরোধিদল কিছুই করতে পারেনি। তৃতীয়পক্ষের ব্যাপারটা মনে হয় তাদের মাথাতেও আসেনি।”

“ওই শেকলেই ঝুলছেন আপনি, যে শেকলে ঝুলেছিলেন ইউনুস আলী। বাংলাদেশ কাঁপিয়ে দিয়েছিলো তার নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা। তবে তাতেও খুঁজে পাওয়া গেছে তাকে, তা ভাববেন না। খুঁজে পাবেও না কেউ। পদ্মার তলে আছে। পাথরসহ। হাঁড় বেরিয়ে গেছে এতদিনে।”

“সেখানে আমি তো অতি নগন্য মানুষ। সত্যি করে বলবেন, ইজরায়েলি ছিলেন, অথচ চটাং চটাং করে বাংলা বলছেন কিভাবে?”

জিয়ার প্রশ্নটা শুনে থম মেরে যান কেনেথ, “ইজরায়েলি ছিলাম—এরকম বলার অর্থ বুঝলাম না। মনে হচ্ছে, আপনার গুরুর তাই ধারণা? তবে উনার ধারণা সঠিক নয়।”

“খাঁটি বাংলাদেশি বলেই তো আপনার ফেস কাটিং ইজরায়েলিদের মতো?” না হেসে পারে না জিয়া, আক্রমণে যেতে পেরে স্বস্তি বোধ করছে, “নামটা পাল্টালেও তো পারতেন।”

“আমি ইহুদি এবং ইজরায়েলি—সেটা আপনাদের ভুল তা কিন্তু বলিনি। ভুলটা আপনারা করছেন পাস্ট টেন্স ব্যবহার করে। জাতীয়তা আমার যা ছিলো তাই থাকছে। তবে নিজেকে আমেরিকান নাগরিকও বলতে পারি আমি।” ত্রুর দৃষ্টি দেন এবার কেনেথ, “বাংলা খুব একটা কঠিন কিছু না। হিব্রু শেখার চেষ্টা করুন, আপনার প্রতি সবিনয় আহ্বান থাকলো। যদিও অত সময় পাবেন না, তবে যথেষ্ট সময় পেলে আর হিব্রু শেখার চেষ্টা করলে বুঝতে পারতেন কিসের সাথে ডিল করি আমরা। সে তুলনায় বাংলা তেমন কিছু না। এক দশক যথেষ্ট সময়। আর আপনারা...আপনারা বাঙালিরা নিজের ভাষাভাষির মানুষকে এত দ্রুত বিশ্বাস করেন, বলার মতো না। আতিথেয়তাটুকু আমাদের ভালই কাজে এসেছে।”

“খুব বেশিক্ষনের জন্য নয়।” সুন্দর করে হাসলো জিয়া।

“আপনার চারপাশে তাকিয়ে দেখুন! কতক্ষণ সময় আপনার আছে বলে মনে হয়? যার চামচামি করে বেড়ান, সেই আসিফকেও সাইজ করে ফেলা হবে। মানে, আপনাদের বাংলা ভাষাতে তো কথাটা বলার ধরণটা এরকমই, নাকি?” হাসিটা ফিরিয়ে দেন কেনেথ।

“নিজেরাই সাইজ হয়ে যাচ্ছেন না তো?” ভ্রূ নাচায় জিয়া।

ওর ধারণা অনুযায়ী আসিফরা এতক্ষণে মেসনিক লজে হামলা চালিয়েছে। পরিকল্পনা ঠিক থাকলে মিথরাস লজকেও একেবারে দুমড়ে ফেলা হয়েছে এতক্ষণে। অথবা-অচিরেই হবে। পরিকল্পনার পুরোটা জিয়া জানলেও থেকে যেতে হয়েছে ওকে বিশেষ একটা কারণে। ডক্টরের দিকে চোখ রাখতে হত কাউকে।

কেনেথ গ্রান্টকে দেখে মনে হচ্ছে, এই লোক হাসি ছাড়া কথাই বলতে পারে না। এখনও হাসছে সে, “মেসনিক লজ খুঁজে বের করারদিকে ইঙ্গিত দিচ্ছেন তো? ওসব আমাদের জানা আছে। আমরা জানি, আসিফ আর ইরফান ওখানে বাঁপিয়ে পড়বে, আজ অথবা কাল। দু-জনের নামেই আলাদা ফাইল আছে, আর-”

কিছু না বলে তার দিকে শান্ত হয়ে তাকিয়ে থাকে জিয়া।

“দু-জনের ফাইলই যথেষ্ট মোটা, মি. জিয়া। মেসনিক লজ ওরা খুঁজে পাবে এবং ভেতরে ঢুকে পড়বে, এটা আমাদের পরিকল্পনারই অংশ। তাদের জন্য সর্বোচ্চ সম্মাননার ব্যবস্থা করেছি আমরা। ঘাবড়ানোর কিছু নেই, ওদের কেউ খুঁজে পাবে না। ইউনুস আলীর মতোই পরিণতি হতে যাচ্ছে তাদের। আপনার ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে।”

হালকা ঢোক গেলে জিয়া। স্যারের আগমনের কথা আগে থেকেই জানে ওরা!

মিথরাসের হাজার বছর দূরের প্ল্যান করার ক্ষমতা ছিলো, মনে পড়ল ওর। সেখানে এই সামান্য বিষয়টা তারা দেখতে পাবে না, তা কি করে হয়? শত্রুপক্ষকে আন্ডারএস্টিমেট করার জন্য নিজের আঙুল খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে জিয়ার। সারপ্রাইজিং এলিমেন্টের ওপর ভর করে পরিকল্পনাটা করেছিলো আসিফ। এখন দেখা যাচ্ছে পুরো জিনিসটাই ডেড এন্ড। এখান থেকে ওরা আর বের হতে পারবে না।

“ঘাবড়াচ্ছেন কেন? আমরা, মেসনরা অন্তত একটা বেটার ওয়ার্ল্ড উপহার দিতে পারবো বাকিদের। আপনারা কি করতেন, আমাকে বলুন তো? দু-জন হোমিসাইড ডিটেক্টিভের কি দরকার, দেশে হোমিসাইড জিনিসটাই না থাকে? আমাদের তৈরি করা নতুন পৃথিবীতে কোন অরাজকতা থাকবে না, জিয়া, থাকবে না খুনোখুনি। আপনাদের দরকার একরকম ফুরিয়েই গেছে।”

শূন্য একটা দৃষ্টি দেয় জিয়া। কিছু বলার নেই আসিলেই। পরাজিত সৈনিকের আর কোন কিছু বলার থাকে না।

“ভাবছেন তাহলে এখানে আপনাকে জ্যাস্ত ধরে আনার কি দরকার ছিলো? সবার অগোচরে সাদামের ক্লিনিক থেকে আপনাকে হাশিশ করতে তো কম ঝামেলা হয়নি।”

দেয়ালের দিকে এগিয়ে যান কেনেথ গ্রান্ট, “আসলে আমার জীবিত একজনকে দরকার ছিলো। হলিউডের মুভি নয় এটা, লজের ভেতরে ফায়ার ফাইটে আসিফ বা ইরফানের একজনও বেঁচে ফিরতে পারবে বলে আমি মনে করি না। মরা মানুষ কথা বলতে পারে না—খুবই বাজে নিয়ম এ জগতের। কথা বলানোর জন্য আপনাকে ধরে আনা হয়েছে।”

বড় একটা প্রায়ার্সসদৃশ যন্ত্র দেয়ালের পাশে খুলে বের করে আনছেন কেনেথ, ওয়ার-কাটারের বড় ভার্সন। তবে জিয়া নিজের আঙুলগুলো নিয়ে খুব একটা চিন্তা করছে না এখন। মেসনিক লজের ভেতরে এতক্ষণে পৌঁছে যাওয়ার কথা আসিফ আর ইরফানের। কথা হলো, ফায়ার ফাইটের যে ভয়ঙ্কর কথা কেনেথ বলেছেন—সেটা সত্য হলে দুটো পিস্তল নিয়ে মানুষ দু-জন কতক্ষণ টিকবে?

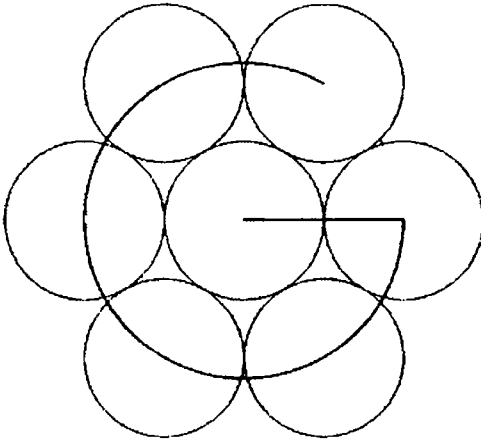
ফিরে তাকালেন কেনেথ, “ওরা ওদিকে সাইজ হতে থাকুক, আপনি ততক্ষণে আমাদের জানাবেন, সব। যতটুকু আপনারা জেনেছেন, অথবা অন্য কেউ জেনেছে।”

BanglaBook.org

করিডোরের শেষ মাথার চকচকে দরজার ওপর আটকে যায় ওদের দৃষ্টি। তারপর সেটা ছাড়িয়ে চোখ চলে গেলো পাশের সুইচবোর্ডের দিকে। এটাও নতুন। একটি মাত্র সুইচ সেখানে। আস্তে করে ওতে আঙুল রাখতেই পেছনের সবগুলো বাতি নিভে যায়। হালকা অন্ধকারে ইরফানের দিকে তাকালো আসিফ।

“এসব লুই আই কান ডিজাইন করে গেছেন বলে মনে হয় না। তুমি প্রস্তুত?”

হালকা মাথা দোলায় ইরফান, শক্ত করে ধরে রেখেছে পিস্তলের বাটটা। হালকা নেমে থাকা নলটা তাকিয়ে আছে দরজার নিচের দিকে। হাটু গেড়ে বসেছে হোমিসাইড ডিটেক্টিভ, পিঠের ব্যাগ থেকে দুটো ছোট ছোট বিস্ফোরক বের করে আনলো। দরজার নবের কাছে লাগাচ্ছে ওদের। টাইমার ঠিক করছে। এক হাত তুলে ওকে থামালো ইরফান।



“নবটা ঘুরিয়ে দেখা যাক আগে?”

ওর দিকে মুখ তুলে তাকালো আসিফ, “এটা বন্ধ থাকতে বাধ্য।”

হাত বাড়িয়ে নব ঘোরালো ইরফান। খুলে গেলো দরজা। চোখ মটকালো সে, “এরা মেসন, মি. আসিফ। হয়তো আগে থেকেই জানতো আমরা আসবো। লক না থাকার আর কোন কারণ থাকতে পারে না। এটা একটা ট্র্যাপ।”

বোমা দুটো খুলে আবারও ব্যাগের ভেতর ঢুকিয়ে রাখলো আসিফ, “অথবা আনঅথোরাইজডভাবে দরজা খোলার জন্য ভেতরের কোথাও অ্যালার্ম বেজে উঠেছে এতক্ষণে।”

“বোমাবাজি করলেও বাজতো,” নিজেকে ডিফেন্ড করলো ইরফান।

“ও নিয়ে ভেবে আর কাজ নেই। ঢুকেই আমরা ঝড়ের আগে আগাবো। খুব একটা দরকার না পড়লে কারও দিকে গুলি ছুঁড়ব না, ঠিক আছে? সম্ভব হলে ওদের কিছু বুঝতে না দিয়েই বেরিয়ে যেতে হবে।”

মাথা দোলায় ইরফান আবার, “একটা চোখ ঈশিতার জন্য রাখবে।”

“সেটা না বললেও রাখতাম। রেডি?”

দরজাটা খুলেই ঝট করে বসে পড়ল আসিফ। দাঁড়িয়ে থাকা ইরফানের লাইন

অফ ফায়ার ক্রিয়ার করে দিতে চায়। কিন্তু দরজার অন্যপাশে কেউ ছিলো না। সাদা আলো জ্বলছে বাইরের হলঘরে—তবে একটা মানুষও নেই।

সাবধানে জুতো পরা পা দুটো ঘরের ভেতরে রাখলো ওরা। আশ্তে করে টেনে পেছনে দরজাটি লাগিয়ে দিল ইরফান।

বড় একটা হলঘরে চলে এসেছে এখন। তিনদিকে তিনটি সিঁড়ি চলে গেছে। একটা ওপরের দিকে। দুটো আরও নিচে। কোনরকম আলোচনাতে না গিয়ে নিঃশব্দে সামনে এগিয়ে যায় ওরা। ওপরে গেলে সম্ভবত মূল সংসদ ভবনে লুকিয়ে রাখা কোন গুপ্ত দরজার দেখা পাবে। ওদিক থেকেই সম্ভবত প্রবেশ করে মেসনরা। ড্রেন ঘাঁটার জন্য তাদের আগ্রহ কাজ না করারই কথা। ব্যাক ডোর হিসেবে ড্রেনের দরজাটি ছিলো সম্ভবত। দুই নিম্নগামী সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলো ওরা।

“ঠিক একঘণ্টা পর ফিরে আসবে এখানে। অলরাইট?” সিঁড়ির মুখে গিয়েও ফিরে তাকিয়ে বলে ইরফান।

“শিওর। ইয়ারসেট টেস্টিং। শুনতে পাচ্ছে?” কানে একটা সেট আটকে বলে আসিফ।

ইরফানও নিজের সেটটা ট্রান্সমিশনে নিয়ে যায়, “তোমার কথা এমনিতেই শুনতে পাচ্ছি। ইয়ারসেটে, আরও পরিষ্কার।”

“এখানেও।” মাথা দোলায় আসিফ সম্ভষ্ট হয়ে। তারপর নেমে গেলো নিচের দিকে।

ঝকঝকে পরিষ্কার সিঁড়িগুলো নিঃসন্দেহে কেউ না কেউ পরিষ্কার করে রাখে। সংসদ ভবনের মাঝে এই দৃশ্য খুবই স্বাভাবিক হওয়ার কথা। তবে আসিফ জানে, এটা সংসদ ভবনের ভেতরে হলেও, প্রকৃত সংসদ ভবনের অংশ নয়। নিঃসন্দেহে সংসদ সদস্যদের খুব বেশি মানুষ জানেন না এর কথা। শুধু তারাই জানেন, যারা নিজেরা ফ্রি মেসনারির সদস্য। সংখ্যায় তারা কয়জন, কে জানে!

মেসনদের দূরদর্শিতার প্রশংসা না করে পারলো না আসিফ। সেই উনিশশ’ আটচল্লিশ সালে এটা তারা হাতে নিয়েছে—পরিকল্পনাটা আজকে কি চমৎকার! এই না তাদের হয়ে কাজ করছে! লুই আই কানকে দিয়ে জাতীয় সংসদ ভবনে ডিজাইন করানোর চিন্তাটা প্রথমে কার মাথায় এসেছিলো তাকে খুঁজে বের করতে পারলে বাংলাদেশের আরেকজন মেসনকে পাওয়া যাবে। এতদিনে মানুষটার বার্ষিক্যে পৌঁছে যাওয়ার কথা।

নেমে আসতে নিজেকে একটা প্রশস্ত করিডোরে আবিষ্কার করলো আসিফ। দুই দিকে সারি দিয়ে চলে গেছে দরজা। একটা থেকে আরেকটার দূরত্ব একেবারে কম নয়। ভেতরের ঘরগুলো যথেষ্টর চেয়ে বড় বলে মনে হয় ওর কাছে। আর এটাই অবশ্য স্বাভাবিক। করিডোরটার দৈর্ঘ্য বিশফিট। ঠিক মাঝখানে চমৎকার একটা স্থাপত্য। কম্পাস আর স্বয়ারের মাঝে বড় করে লেখা একটা “G”।

এটা মেসনিক লোগো-জানে ও। এই এ দিয়ে তারা কি বোঝায় কেউ নিশ্চিত নয়। অনেকের মতে এটা জিওমেট্রি, কেউ বা বলেন নস্টিসিজম (Gnosticism) এর “G” ওটা। হালকা মাথা দোলায় আসিফ। সন্দেহের অবকাশ নেই এখন আর। ঠিক জায়গাতেই এসেছে ওরা। আশেপাশে একটা মানুষকেও দেখা যাচ্ছে না। সতর্ক দৃষ্টি রেখে লোগোটোর কাছে চলে যায় আসিফ। লোগোর ওপরে লেখাটাতে চোখ আটকে গেছে ওর।

“G represents 7”

তারপর নিচেও একই আকারে থাকা লেখাটা একনজর দেখে।

“Seven letters hath Her holiest name; and it is Babylon”

এক পা পিছিয়ে আসে আসিফ। সেভেনের সাথে G-এর সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে দুটো ইংরেজি বর্ণমালার সপ্তম অক্ষর আর ব্যবিলন লিখার জন্য সাতটি আলাদা অক্ষরের প্রয়োজন। ব্যবিলন আর ‘হর হোলিয়েস্ট নেম’ জিনিসটা বুঝলো না আসিফ। এখনও তার অজানা অনেক রহস্য ধারণ করে মেসন সোসাইটি। তাদের কোন একটা হতে পারে। সাত-এর সাথে মেসনিক আচারের কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

স্ট্রাকচারটাকে ভালোমত দেখতে গিয়ে আচমকাই ব্যাপারটা বুঝতে পারে ও। সাত নম্বর লেটারের জন্য না, G লেখার ক্ষেত্রে ‘৭’-এর বিশেষ ভূমিকা আছে। এখানে স্পষ্ট দেখানোও হয়েছে সেটা। G-এর চারপাশের বৃত্তগুলোকে খেয়াল না করার জন্য নিজেকে হালকা চোখ রাঙ্গালো আসিফ। এমনটা অন্য কোথাও দেখা যায়নি।

সাতটি বৃত্তের মাঝেই আটকে আছে একটি অক্ষর-জি।

মেসনারি আর মিথরাস একত্রে নিজেদের কেন সার্কেল বা ‘চক্র’ বলে থাকে তা কিছুটা হলেও স্পষ্ট হয় এখন। তাদের সিঁদুলগুলো কেন যেন বৃত্তের সাথে সঙ্গতিযুক্ত হয়ে থাকে। এর তাৎপর্য আসিফের জানা নেই।

ভাবনাগুলোকে আপাতত চাপা দিয়ে রাখে ও। এসবের উত্তর পরে খোঁজা যাবে। এখন মেয়েটাকে বের করে নিয়ে যেতে পারলে একটা দিক সামাল দেওয়া যেত। সময় ক্ষেপণ না করে সাবধানে প্রথম দরজাটার দিকে এগিয়ে আসে ও। আস্তে করে কান পাতে ভেতরে। কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। দরজার নকশা হাত রাখে আসিফ।

ঠাণ্ডা!

এক মুহূর্ত চিন্তা করে ঘুরিয়ে ফেলে ওটা। ভেতর থেকে বের হয়ে আসে হালকা কুয়াশার মতো একরাশ সাদা বাষ্প।

চট করে ও সরে গেলো দরজার পাশের দেয়ালে। কানের কাছে ধরে রেখেছে

পিস্তল। ত্রিশ সেকেন্ড পরও যখন কোন শব্দ পাওয়া যায় না, হুড়মুড় করে কেউ বের হয়েও আসে না—শরীরটা ছোট করে হাটুর সাহায্যে হালকা এক পাক খেয়ে ভেতরে ঢুকে যায় আসিফ। অস্ত্রধারি কেউ থাকলে সে মানুষের মাঝ বরাবর সেটা তাক করে রাখবে। তার থেকেও নিজেকে ছোট করে প্রবেশের সময় ভড়কে যায় শত্রু-ট্রেনিংটা পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছে ও। ভেতরে ধীরে ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়ায় আসিফ। এত সতর্কতার দরকার ছিলো না।

ঘরের ঠিক মাঝখানে সাদা রঙের এক আসবাব। অনেকটা অপারেটিং টেবিলের মতো চেহারা সেটার। তার ওপর শুয়ে আছে এক তরুণি। পরনে একটা সুতোও নেই তার। মাথার চুলগুলো সম্পূর্ণ কামানো। একই দশা ভ্রূর।

বিস্মিত আসিফ দেখতে পায়, ধীরে ধীরে চোখ মেলছে তরুণি।

\* \* \*

চিতাবাঘের ক্ষীপ্রতায় এগিয়ে যাচ্ছে ইরফান। তবে নিঃশব্দে।

একের পর এক দরজা খুলে নির্দিধায় অস্ত্র মেলে ধরছে ভেতরে। বড় বড় ঘরগুলোর অনেকগুলোই দেখে ফেলেছে। কোন ঘরকে তারা ব্যবহার করছে উপাসনার জন্য, কোন ঘরে আছে বিশাল আকারের ডিসপেন্সে-দেশের বড় কোন পরিবর্তনের জন্য পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে এগুলোর ব্যবহার হতে পারে, অথবা মেসনদের নিজস্ব প্রয়োজনে—ইরফান নিশ্চিত হতে পারে না।

বড় একটা ঘরে রাখা ছিলো অসংখ্য বই। মেসনিক লাইব্রেরি সম্ভবত। লেখকদের মাঝে জর্জ অলিভার, জন সেবাস্টিয়ান ওয়ার্ড, ওয়াল্টার লেসলি, জোসেফ ফোর্ট নিউটন আর অ্যালিস্টার ক্রাউলির নামই ওর ছিলো পরিচিত। আরও অসংখ্য নাম না জানা লেখকের বইয়ের ভারে ঘরটা ডুবে ছিলো। র‍্যাকগুলোর আড়ালে সিক্রেট দরজা খোঁজার জন্য যতটুকু সময় দরকার—ঠিক ততটুকুই দিয়েছে ইরফান। তারপর আবারও ঝড়ের বেগে বের হয়ে এসেছে।

মেসনরা এখানে ছিলো চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে। প্রাচীনত্ব থেকে নতুনত্ব সবকিছুই দেখা যাচ্ছে জাতীয় সংসদের নিচের আভারথ্রাউন্ড সিক্রেট চেম্বারগুলোতে। ইরফান প্রথমে বিস্মিত হচ্ছিলো। দেখতে দেখতে সে ক্ষমতা হারিয়েছে। প্রথম করিডোরের প্রতিটি দরজা খোঁজা শেষ হতেই বাম দিকে মোড় নেওয়া করিডোর ধরে ছুটেছে ও। একের পর এক দরজা খুলে গেছে। প্রতিটা ক্ষেত্রে একটা আক্রমণ ঠেকানোর জন্য ছিলো প্রতিটি শাখা প্রস্তুত। তবে অস্ত্র ব্যাপার-কোথাও কোন মানুষ দেখেনি ও।

মেসনিক লজটা আক্ষরিক অর্থেই বিশাল। প্রকান্ড এই কাঠামোর মাঝে কেউ থাকবে না—সেটা আসলেই অবিশ্বাস্য। ইরফানের মনে হতে থাকে কোন পরিত্যক্ত

স্পেসক্রাফটে চলে এসেছে ও। বাংলাদেশের সাধারণ জনতার মাঝে কেউ জানে না, এমন একটা জায়গাতে আছে সে। অথচ এখানকার অস্থায়ি বাসিন্দারা মনে হচ্ছে একেবারেই উধাও হয়ে গেছে।

প্রবেশপথের তালাবিহীন দরজার কথা মনে পড়ল ওর, মেসনরা কি ওরা ঢোকার সাথে সাথেই জেনে গেছে? নাকি আগে থেকে প্রস্তুত ছিলো ওদের আগমনের ব্যাপারে? আচমকা অনেক অনেক ওপর থেকে হুড়মুড় করে কিছু ভেঙে পড়ার শব্দ হলো। দেওয়ালের সাথে সিঁটিয়ে যায় ইরফান।

একেবারেই আচমকা অনুভূতিটা ঘিরে ধরে ওকে। যেন কেউ ওকে আড়াল থেকে দেখছে। ধীরে ধীরে অনুভূতিটা বাড়ছে। প্রতিটা পিলার, প্রতিটা পেইন্টিং যেন ওর দিকে তাকিয়ে আছে। চারপাশে খুট খুট শব্দ হচ্ছে যেন। ঝট করে ডানে তাকালো ইরফান। উদ্যত পিস্তলটা শক্ত করে চেপে ধরেছে হাতের মুঠোতে। কাউকে দেখা যায় না সেখানে।

তীব্র একটা অনুভূতি ওকে বলতে থাকে, বামদিকে কেউ আছে! এইমাত্র যেদিন থেকে মাথা ঘুরিয়ে নিয়েছে ও—সেখানে কেউ আছে!

শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে এক ডিগবাজি খেয়ে পিলারের আড়াল নেয় ইরফান। বামদিকে অসম্ভব দ্রুতগতিতে ঘুরে গেছে। আরেকটু হলেই গুলি করে দিয়েছিল। শেষ মুহূর্তে বুঝতে পারে করিডোরটা খালি। কেউ নেই কোথাও।

ইরফানের চোখ দুটো শিকারের খোঁজে বন বন করে ঘোরে। আড়াল থেকে তার ওপর নজর রাখা হচ্ছে এই অনুভূতিটা আরও জোরে চেপে বসে চারপাশ থেকে। এদিক ওদিক তাকায় ও পাগলের মতো। কোথাও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। বরং অনেক দূর থেকে অদ্ভুত একটা গুঞ্জন শোনা যায়।

নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করে ইরফান। শক্ত করে হেলান দেয় পিলারের গায়ে। নিজেকে বার বার শান্ত করার চেষ্টা করলো ও। ফিস ফিস করে একটা মাত্র লাইন আউড়ে যাচ্ছে।

“শান্ত হও। এখানে মাথা গরম করলে নির্ধাত মৃত্যু!”

অবাক হচ্ছে ইরফান, এমনটা ওর জীবনে কখনও হয়নি। অসংখ্য ফাঁকা বাসায় কাজ করেছে ও, অন্ধকার রাতে একাকি কাজে নেমেছে এমন অজিঞ্জিতাও কম নয় তার। শরীরের কাছ থেকে এমন বিদ্যুটে প্রতিক্রিয়া কোনদিনও পায়নি। এত থাকতে আজ কেন বিশ্বাসঘাতকতা করছে শরীর? চকিতে প্রস্তুত মাথায় এলো, মেসনরা আড়াল থেকে ওদের দেখতে পাচ্ছে না তো? হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে কেন ও?

নার্ড গ্যাস?

মনের চোখে পেছনে ফেলে আসা ঘরগুলোর কথা মনে করলো ও, এখন পর্যন্ত একটা সিকিউরিটি ক্যামেরা ওর চোখে পড়েনি। অদ্ভুত না? সিক্রেট লঞ্চে এখন সিকিউরিটি ক্যামেরা থাকা তো স্বাভাবিক। এখানে নেই কেন? আর ক্যামেরা না



থাকলে কিভাবে দেখলো ওকে? এমন কি হতে পারে না, ক্যামেরা ছিলো-ওরাই হয়তো লক্ষ্য করেনি। ইদানিং ক্যামেরা লুকোনোর অনেক উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। ক্যামেরায় ওদের দেখে নার্ভ গ্যাস ছেড়ে দেওয়া হলে স্বীকার করতেই হবে, চতুর ডিফেন্স!

গ্যাস থাকুক আর না থাকুক-করিডোর থেকে এখনই সরে যেতে হবে। ইন্দ্রিয়গুলোর নির্দেশ পায় ইরফান। এই স্নায়ুভেজিত অবস্থায় একটা বাচ্চা ছেলেও হাসতে হাসতে খুন করতে পারবে ওকে। নিজেকে রক্ষা করার মতো অবস্থাই নেই এখন ওর। ইরফানের দুই চোখে আটকে যায় সাদা রঙের একটা দরজা। ‘মেন’জ রুম’ লেখা আছে ওপরে।

মাত্র একটা পা এগিয়েছ সেদিকে, দপ করে নিভে গেলো ভেতরের প্রতিটি আলো।

থর থর করে কাঁপছে ফর্সা শরীরটা। নিজেকে একটা কুন্ডলিতে পরিণত করেছে মেয়েটি। প্রথমবার চোখ খুলেই শক্ত করে বন্ধ করে ফেলেছে। পিস্তলটা কোমরে গুঁজে ছুটে যায় আসিফ। শরীর থেকে কোটটা খুলে ফেলেছে।

মেয়েটাকে কোট দিয়ে জড়িয়ে দিতে কাঁপুনি সামান্য কমলো। চোখ খোলার কোন লক্ষণ দেখা যায় না অবশ্য। ঘরের এক পাশে দাঁড় করানো ওয়ারড্রোবটা প্রথমবারের মতো চোখে পড়ল আসিফের। ওদিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে একটান দিয়ে খুলে ফেললো।

কয়েক প্রস্থ কমল ছাড়া আর কিছু নেই। হিমাগারের শীতলতা নিয়ে থাকা এই ঘরটাতে যখন মেসনদের কেউ পা রাখে—তাদের সাময়িক ব্যবহার সুবিধের জন্য হয়তো কমলগুলো রাখা হয়েছে। একটা কমল বের করে আনে ও। তারপর মেয়েটার দিকে ছুঁড়ে দেয়।

আবার তাকিয়েছে তরুণি। এক হাতে টেনে নিয়ে শরীরে জড়ায় চাদরটা। তারপর সাবধানে নেমে আসে মেঝেতে পা দিয়ে। খালি পা। কোন জুতো বা স্যাভেল নেই ওখানে। হালকা কাঁপছে পা দুটোও।

“কে তুমি?” সময় উপযোগি না—হলেও প্রশ্নটা না করে পারে না আসিফ।

মেয়েটা কিছু না বলে বাইরের দিকে হাটে। আবারও পিস্তল উঠে এসেছে আসিফের হাতে। মেসনিক লজের ভেতরে খোলামেলা শুয়ে থাকা মেয়েটি মেসনদের কেউ নয়—এমনটা হতেই পারে না। লম্বা পায়ে তার পাশে চলে আসে ও, পিস্তলটা আড়ালে রেখেই অদ্ভুত তরুণির কাঁধ স্পর্শ করলো।

“একটা প্রশ্ন করেছিলাম।” রক্ষ গলায় বলে আসিফ, “কে তুমি? এখানে কি করছিলে?”

তার দিকে অসহায় চোখ দুটো মেলে দেয় মেয়ে, “আমাকে এখান থেকে বের হতে হবে।”

“তৃতীয়বারের মতো একই প্রশ্ন করতে আমাকে বাধ্য করবে না!” আস্তে করে হাতের পিস্তলটা দেখায় আসিফ।

দৃষ্টি পাল্টে যায় মেয়েটার, “তুমি বাইরের কেউ। না হলে এসব অবান্তর প্রশ্ন করার মানে দেখি না।”

কিছু বলে না আসিফ। মেয়েটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। চুল আর ক্র সেরে গেলে একটা মানুষের আসল চেহারা চেনাটা কঠিন। কাঁধ ঝাঁকায় তরুণি।

“আমাকে ওরা ডায়মন্ড বলে ডাকে।”

“তোমার নাম?” কঠিন গলায় প্রশ্ন করে আসিফ।

“ঈশিতা।”

বিষয়টা আগে থেকে অনুমান করেছিলো আসিফ। তবে তবুও কিছুটা চমকে যায়। ঈশিতার ছবি ইরফান তাকে দেখিয়েছে। তবে এই ঈশিতা আর সেই ঈশিতার মাঝে অনেক পার্থক্য আছে। ওখানে ঘন ক্রু আর মাথা ভর্তি হালকা কোঁকড়া চুলে নিমজ্জিত এক সদ্য তারুণ্যে পা রাখা মেয়েটির সাথে এই শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া চুলবিহীন মেয়ের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া আসলেই কঠিন একটা কাজ।

“নিজের ইচ্ছেতে এসেছিলে তুমি। এখন বের হতে চাইছ কেন?”

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে মেয়েটি। আসিফ আর কথা বাড়ায় না। ইয়ারসেট ট্রান্সমিশন অন করে জানিয়ে দেয়, “ইরফান, তোমার বোনকে পেয়েছি আমি। আনস্টেবল।”

ওপাশ থেকে কোন শব্দ শোনা যায় না। হালকা ভাঁজ পড়ে আসিফের মুখে। দূরত্ব ওদের খুব বেশি হওয়ার কথা না। বেশিক্ষণ হয়নি একে অন্যের থেকে আলাদা হয়েছে। এতটুকু সময়ের মধ্যে রেঞ্জের বাইরে যাওয়া সম্ভব হবে না ইরফানের। এক হতে পারে, মাটির নিচে ওয়েভগুলোর ট্রাভেল করতে কোনধরণের টেকনিক্যাল সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। অথবা, দ্বিতীয় সম্ভাবনাটা মাথায় আসতে কিছুটা চিন্তাতে পড়ে যায় ও, ইরফান হয়তো ওদের হাতে পড়ে গেছে। সেক্ষেত্রে—এইমাত্র মেসেজটা কোন একজন মেসনের কাছে পৌঁছে দিয়েছে ও। তৃতীয় সম্ভাবনা, কোন ধরণের জ্যামার ব্যবহার করছে মেসনরা। লজের ভেতরে হয়তো রেডিও কমিউনিকেশনস নিষিদ্ধ।

“চলো বের হই।” মেয়েটার দিকে ফিরে বলে আসিফ, “এখানে সময় নষ্ট করা যাবে না।”

আসিফকে অনুসরণ করে এগিয়ে আসে মেয়েটা। আবারও আগের করিডোরে পা রেখেছে ওরা। বড় করে লেখা G-টার ঠিক মাঝখানের বৃত্তটা যেন সরাসরি ওদের দিকে তাকিয়ে আছে এক চোখে। জোর করে চোখ সরায় আসিফ ওখান থেকে।

যে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছিলো, সেদিকে চোখ পড়তে চমকে উঠলো আসিফ। ওপরে একটা স্লাইডিং ডোর ছিলো। পুরোটা নেমে এসে পথটা বন্ধ করে দিয়েছে কখন যেন। মৃদু ঘড় ঘড়ে একটা শব্দ শুনেছিলো ও মেয়েটির ঘরে থাকতে—তখনই ঘটনাটা ঘটে গেছে। ইঁদুরকে ফাঁদে ঢুকিয়ে সব পথ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে বেন!

মনের ভুল হতে পারে—অনেক দূর থেকে একটা অস্পষ্ট কান্নার শব্দও যেন শোনা যায়। ঘাড়ের পেছনের চুলগুলো সড় সড় করে দাঁড়িয়ে যেতে চায় আসিফের। সংসদ ভবনকে কয়েকশ’ বার দেখেছে ও, তবে আজ প্রথমবারের মতো একে অশুভ মনে হলো।

“এখানে কতো দিন ধরে আছ?” মেয়েটার দিকে ফিরে তাকায় আসিফ।

“আমাকে ফলো করুন।” আসিফের মনের কথা বুঝতে পেরে বলে ওঠে ঈশিতা। আর কোন উপায় দেখে না আসিফ, “পথ দেখাও।”

ফিরতি পথ ধরে প্রায় ছুটে চলেছে ওরা। করিডোরের গভির থেকে গভিরে রওনা হয়ে যায়।

\* \* \*

“ইরফান, তুমি কোথায়?” আচমকা কানের কাছে গর্জে ওঠে ইয়ারসেটটা।

শান্ত কণ্ঠেই জবাব দেয় ও, “টয়লেটে আটকে গেছি। নার্ভের ওপর কোন ধরনের অ্যাটাক করেছে ওরা। বি কেয়ারফুল।”

“হুম, টের পেয়েছি একবার। যাই হোক, গভিরে ঢুকে যাও। একশ গজ মতো দূরে গেলে পথ দুটো আবার এক হবে। মিট মি দেয়ার।” হাঁফাতে হাঁফাতে বলে আসিফ।

“ছুটছো নাকি?” সতর্ক হয়ে যায় ইরফান, “ঈশিতাকে নিয়ে তারপর বের হব আমি। নার্ভ গ্যাসের ভয়ে থেমে যাওয়ার জন্য ঢুকিনি এখানে। চাইলে তুমি বের হয়ে যাও। ওকে ছাড়া আমি যাচ্ছি না।”

“ও আমার সাথে। প্রথমবারেই জানিয়েছিলাম। কোথায় ছিলে?”

কিছুক্ষণের জন্য থেমে গেলো ইরফান। ঈশিতাকে পেয়ে গেছে আসিফ? হঠাৎই উজ্জ্বলিত মনে হয় নিজেকে। স্বস্তির এক অনুভূতি।

“গ্রেট জব, আসিফ! তবে, ইয়ারসেটে কিছু শুনিনি আমি। এই প্রথম শুনছি। সুইচে চাপ দিয়েছিলে তো?”

“কিছু সমস্যা হতে পারে তখন। হোয়াটেভার-পেছনের দরজা আটকে দিয়েছে ওরা। অন্যপাশ দিয়ে বের হতে হবে। নাউ, রান লাইক হেল!”

“পেছনের দরজা পর্যন্ত যাওয়ার অবস্থা এমনিতেও ছিলো না আমার। সঙ্গিসাথি পেয়ে গেছি মনে হয়। তোমরা বের হয়ে যাও। আসছি আমি। আমার জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই।”

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় ইরফান। ফাঁকা বাথরুমে ঢুকেই রুমাল ভিজিয়ে নাকে আটকে নিয়েছিলো ও। হঠাৎ শ্ল্যুতে চেপে বসা আতঙ্ক আর উদ্বেগ কিছুক্ষণের মাঝেই সরে গেছে। এখন আবার ঠাণ্ডাভাবে চিন্তা করতে পারছে। সেই সাথে মৃদু কিন্তু অস্পষ্ট একটা শব্দ শুনেছে দরজার বাইরে। সাবধানে কোমর থেকে ফ্লিশলাইটটা খুলে নেয় ও। শুয়ে পড়েছে বাথরুমের মেঝেতে। ঈশিতা যদি আসিফের হাতে থাকে, আর কোন চাপ নেই ওর মাথায়। শান্ত থেকে শেষ লড়াইটা উপহার দিতে পারবে ওদের।

বাইরের পদশব্দগুলো খুবই মৃদু নড়াচড়া করছে। শব্দ থেকে বাইরে কয়জন থাকতে পারে বোঝার চেষ্টা করলো। তিন...অথবা চারজন। সংখ্যায় আরও বেশি হতে পারে। তবে নড়াচড়া থেকে চারজনের বেশি মনে হচ্ছে না। বাকিরা হয়তো অতিরিক্ত সাবধানি।

শক্ত হাতে পিস্তলটা ধরে রেখে অপেক্ষা করতে থাকে ও। দরজা খুলে যাওয়ার

সাথে সাথে আক্রমণ চালাতে হবে। ওদের চোখে নাইটগ্লাস থাকার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছে ইরফান। এজন্যই লাইট বন্ধ করে অন্ধকারে আক্রমণ চালাতে চেয়েছে শত্রুপক্ষ। অন্ধকারের সুবিধেটার সাথে নিতে চেয়েছে একটু আগে নার্ত গ্যাসের মাধ্যমে উত্তেজিত মস্তিষ্কের দুর্বলতার সুযোগ।

সময় গড়িয়ে যেতে থাকলেও বাইরে দরজা খোলার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। পায়ের শব্দের বিরাম নেই। আরেকটা ট্রিক?

মেঝে থেকে উঠে এসে সাবধানে দরজার নবটা টেনে খুলে ফেললো ইরফান, ফ্যাশ মারল বাইরে।

কেউ নেই।

সাবধানি পায়ে হেটে আবার আগের করিডোরে ফিরে এসেছে ও। ভৌতিক নিষ্ঠুরতা চারপাশে। একটা সুঁই পড়লেও শব্দ শোনা যাবে। একটু আগের জুতো ঘষার শব্দ স্রেফ উধাও হয়ে গেছে যেন। নার্ত গ্যাসের প্রতিক্রিয়া ছিলো ওটা? দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দেয় ইরফান। স্বস্তির এ নিঃশ্বাস।

এই সময় চারপাশে নরক ভেঙে পড়ল। ঘরের চারপাশ থেকে গুলির শব্দ ভেসে আসল একইসাথে। সেই সাথে বাতাসে বুলেট কেটে যাচ্ছে একের পর এক! বারুদের ঝাঁঝালো গন্ধে ভরে গেছে ঘর। আর সহ্য করতে পারে না ইরফান-আঁধারে ফ্যাশলাইট ঘুরিয়ে ট্রিগার টানতে শুরু করলো সে-ও। গলা থেকে বের হয়ে এসেছে আর্তনাদ।

ঠং-জাতীয় এক শব্দের সাথে বুঝতে পারলো ম্যাগাজিনের শেষ বুলেটটাও খরচ করে ফেলেছে ও।

\* \* \*

ঈশিতার হাত ধরে ছুটতে ছুটতে বহুদূরে কোথাও গুলির শব্দ শুনতে পায় আসিফ।

ইয়ারসেট কানের সাথে চেপে ধরে কয়েকবার ইরফানকে ডেকে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। ঈশিতার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে পরিস্কার মৃত্যুভয়। তবুও অবিচল গতিতে ছুটছে মেয়েটা। তার সাথে তাল মিলিয়ে ছুটলো আসিফ। আগে এই মেয়েটাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যেতে হবে বাইরে। তারপর ইরফানের চিন্তা করা যেতে পারে।

ইরফান নিজের রাস্তা করে নিতে পারবে আশা করা যায়। অথবা-এতক্ষণে হয়তো ইরফানের সাহায্যের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। ছেলেটার জন্য কেমন জানি একটা দায়িত্ব অনুভব করছে আসিফ। অনুভূতিটা সম্পর্কে সচেতন হতে অবাকই হলো সে। পরিস্থিতির প্যাঁচে পড়ে একসাথে কাজ করতে হচ্ছে বটে এখন, তবে তাই বলে একজন ঘাঘু অপরাধির জন্য মমতা অনুভব করাটা আসিফের জন্য বিলাসিতা ছাড়া আর কিছু না।

“মেসনারিতে যোগ দিয়েছিলে কেন? এখন তো বের হয়ে যাওয়ার জন্য তোমার উৎসাহের কমতি দেখছি না।” প্রশ্নটা করবে না ভেবেও করেই ফেলে আসিফ।

জবাব না দিয়ে সামনের দরজাটা দেখায় ঈশিতা, “প্রথমে যে দুটো সিঁড়ি দিয়ে আপনারা নেমেছিলেন, সেটা থেকে দুটো করিডোর বের হয়েছিলো। একটা দিয়ে ছুটে এসেছি আমরা এখান পর্যন্ত। অপর করিডোরটাও এখানে ইন্টারসেক্ট করবে একে অন্যকে।”

মেয়েটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। দৌড়ের গতি কমে গেছে এই মুহূর্তে ওর। আসিফও গতি কমালো। সামনের বড় দরজাটা কাছে থেকে কাছে চলে আসছে। আর কিছুক্ষণ পরেই ইরফানের সাথে দরজার ওপাশে দেখা হওয়ার কথা। ভেতরের একটা অংশ আসিফকে দরজা পেরোতে মানা করছে। অদ্ভুত একটা অনুভূতি! কোন যুক্তি নেই, কোন কারণ নেই, তবুও মনে হতে থাকা—এটা করা উচিত হবে না!

কাঁধ ঝাঁকিয়ে অনুভূতিটা ঝেড়ে ফেলে দেয় আসিফ। দৌড়ে পার হয়ে গেলো চৌকাঠ। সাথে সাথে দপ করে জ্বলে ওঠে সবগুলো আলো!

“শিট!” আসিফ স্ল্যাংটা দিয়ে শেষ করতে পারলো না, একাধিক গুলির শব্দ ভেসে আসে, কোনটা কোথা থেকে বোঝার উপায় নেই। তীব্র আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে গেছে ওর। পরমুহূর্তে নিজেকে দরজার পেছনে আবিষ্কার করলো আসিফ।

নেহায়েত রিফ্লেক্সের বশে উল্টো দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো, তারপর গড়িয়ে সরে এসেছে আড়ালে। একই কারণে এযাত্রা বেঁচে গেছে আসিফ। দেওয়ালে হেলান দিয়ে হঠাৎই খুব দুর্বল মনে হলো নিজেকে। পেটের কাছটা গরম লাগছে—টের পেয়ে আস্তে করে ওখানে একটা হাত দেয় ও। গরম রক্তে ভরে যায় হাতের আঙুলগুলো।

একটা পেটের পাশে, আরেকটা কাঁধে। এ দুটোই গুণতে পারে আসিফ। দুটো বুলেট! দুই ক্ষত থেকেই বের হয়ে আসছে রক্তের ধারা। জীবনীশক্তি কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে সেই সাথে।

আঘাত পেলে প্রথমেই চেষ্টা করবে রক্তক্ষরণ বন্ধ করার। মনে রাখবে—ওটাই তোমাকে চালিয়ে নেবে বেঁচে ফেরার মতো কোন একটা অবস্থানে। অথবা, এক পাইন্ট রক্ত ক্ষরণ ঠেকাতে না পারার কারণে অবশ্যই পড়ে থাকতে হবে মৃত্যুর জন্য।

ট্রেইনিংয়ের সময় ওদের সেলফ মেডিয়েশন শেখাতে থাকা ইন্সট্রাকটরের গলাটা কানের পাশে বেজে ওঠে আসিফের। এই মুহূর্তে রক্তক্ষরণ বন্ধ করার কোন উপায় নেই। পেছনের ওরা গুলি করে মনে হয় দেওয়াল উড়িয়ে দেবে। কানে তাল ধরে যেতে থাকে ওর। ধীরে ধীরে সাইলেন্সারটা খুলে ফেলে দেয় মাটিতে। এর আর দরকার নেই আপাতত। অযথা রেঞ্জ কমানো ছাড়া যন্ত্রাংশটা আর কোন কাজে লাগছে না।

আর ঠিক যে মুহূর্তে সবকিছু চুপচাপ হয়ে যায় বিদ্যুতবেগে লাফ দেয় আসিফ, দরজার এপাশ থেকে ওপাশে চলে যায় গড়িয়ে। দরজা পেরুনের সময়টায় অনেককিছু

করে ফেলেছে। চেম্বারের শেষ প্রান্তে ওপরে ওঠার একটা সিঁড়ি আছে—সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা হালকা সাবমেশিনগানধারির কপালের একাংশ উড়ে যায়। তার দিকে চোখ ফেরানোর আগেই ছোট্ট সিংহমানব মূর্তির আড়াল থেকে নাক বের করে রাখা পিস্তলবাজের এক গাল ফুটো করে ঢুকে যায় আরেকটা বুলেট। এবং বাকিরা আবারও শুরু করে বুলেটবৃষ্টি।

অন্যপাশে হেলান দিয়ে বড় করে দম নেয় আসিফ। বাকিদের অবস্থান দেখে ফেলতে পেরেছে এর মাঝে। টাকমাথা আছে ডুপ্লিকেট মোনালিসা পেইন্টিংয়ের নিচে। ঘরের বড় টেবিলটা উল্টে কাভার নিয়েছে কালো টি-শার্ট। নিজের শরীর থেকে শার্টটা খোলে আসিফ। রক্ত পড়া বন্ধ করতে হবে ওকে।

নিয়মমাফিক এখন কিছুক্ষণ ওপাশ থেকে গুলি আসার কথা। সহজে কেউ পা বাড়াবে না এপথে। সময়টা কাজে লাগিয়ে হালকা ব্যান্ডেজ বাঁধতে হবে ওকে।

জীবিত বের হতে হবে ওকে এখন থেকে। তাই অন্য চিন্তাটা জোর করে মাথা থেকে বের করে রাখার চেষ্টা করে ও। শত্রুদের অবস্থান দেখার সময় আরেকটা জিনিসও স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে আসিফ।

ঈশিতার শরীরটা রক্তের ছোটখাটো একটা পুকুরের মাঝে পড়ে আছে। সম্ভবত প্রথম ওয়েভের বুলেটবৃষ্টির একটা তার গলায় লেগেছিলো। ধর থেকে প্রায় আলাদা করে দিয়ে গেছে মেয়েটার মাথা।

“আমার কিছু প্রশ্ন ছিলো।”

লম্বা প্রায়স্‌টা একপাশের ইলেকট্রিক হিটারে রেখেছেন কেনেথ গ্রান্ট-সেদিকে তাকিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল জিয়া।

ঘুরে তাকালেন কেনেথ, “কথা বলে আয়ু কিছুটা বাড়াতে চাইছেন? তা বাড়াতে পারেন। আমার আপত্তির কি আছে? আপনার যদি ধারণা থেকে থাকে সামান্য সময় পেলে আপনাকে উদ্ধার করতে কেউ চলে আসবে, ভুল করছেন। বাইরে আর এমন কেউ নেই আপাতত।”

মুচকি হাসলেন কেনেথ, চেহারা দেখে মনেই হলো না সামান্য কিছু সময় পরেই একজন মানুষকে অসম্ভব কষ্ট দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছে এই লোক। লোকটার মস্তিষ্কের সূক্ষ্মতা সম্পর্কে সন্দেহে পড়ে যায় জিয়া। সাইকোপ্যাথদের মাঝে অনেক ওপরের কোন র্যাংকে এর স্থান হবে। যদি তাদের মধ্য র্যাংক সিস্টেম চালু থাকে তবেই আরকি! নিজের আসন্ন ভবিষ্যৎ মাথা থেকে সরিয়ে ফেলে কণ্ঠটা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলো ও।

“মেসনিক লজ। শয়তানের উপাসনা। দাজ্জাল পৃথিবীতে আসলে তাকে সাহায্য করার ইচ্ছে, মিথরাস লজ বা অর্ডো টেমপ্লি ওরিয়েন্টেসে হাজারো রকম ধর্মীয় আচার পালন-এসবের কি কোন মূল্য আছে আপনাদের কাছে? জ্ঞানে-বিজ্ঞানে আপনারা সারা পৃথিবীতে অনেক ওপরের দিকে আছেন-এসব বুলশিটে বিশ্বাস করছেন আপনারা, এটা আমি মনে করি না, স্যার।”

“বিশ্বাস?” হতচকিত একটা ভাব ফুটিয়ে তোলেন কেনেথ নিজের মুখে, “বিশ্বাস জিনিসটা তো আপনার থাকতেই হবে। আপনি আজ এখানে কেন জানেন? কারণ আপনার বিশ্বাস আপনাকে এখানে টেনে এনেছে, মি. জিয়া। আপনার গুরু আসিফ আর তার সহযোগি ইরফান এখন মেসনিক লজে মারা যাচ্ছে কেন জানেন? তাদের বিশ্বাস সেখানেই নিয়ে গেছে তাদের। আর জানেন, কেন আর কোন মানুষ আমাদের খুঁজে কেন পায়নি এতদিনেও? কারণ, তাদের বিশ্বাস ছিলো আমাদের খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। আজ আমরা এখানে, তার কারণও ওই বিশ্বাস। বিশ্বাস না থাকলে কোন কিছু করাই সম্ভব নয়।”

“তার মানে, সত্যিই আপনারা মনে প্রাণে শয়তানকে বিশ্বাস করছেন। তাহলেও আমি বলবো, বিজয়ের মতো একটা বাচ্চা ছেলেকে যেসি যুক্তিতে আপনারা মেসনিক লজের মাস্টার বানানোর সিদ্ধান্ত নেন? অভিজ্ঞতার বিচারে এই ছেলে একদম কাঁচা। যতই জ্ঞান থাকুক-অভিজ্ঞতার মূল্য কি আপনারা দেবেন না? তাছাড়া, একজনকে মাস্টার মেসন হতে হলে কেন কুমারি বলি দেওয়া লাগবে?”



জিয়ার দিকে এমন একটা দৃষ্টি দিলেন কেনেথ, যেন কোন শিশু বোকার মতো যুক্তি দিয়ে ফেলেছে।

“বিশ্বাস হলো মোটিভেশন। একটা মোটিভেশন যদি না থাকতো আজকে এই পর্যায়ে আসতে পারতো না মিথরাস অথবা ফ্রি মেসনারি। মোটিভেশনের পাশে জ্ঞান আর ক্ষমতার দরকার আছে। তবে জ্ঞান আর ক্ষমতার পেছনেও আছে ওই মোটিভেশন। আমাদের একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। নির্দিষ্ট বিশ্বাস কাজ করছে একই সাথে। যদি আপনার মনে হয় কোন একটা বিষয়ে আপনার বিশ্বাস খাঁটি, আপনি সেটা অবশ্যই সফলভাবে শেষ করবেন, শেষ করার জন্য মোটিভেশন থাকবে আপনার। নতুবা থাকবে না। সম্ভবদ্ব্যতা-আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। আর এই শক্তি এসেছে আমাদের বিশ্বাস থেকে। এক্সকিউজ মি।”

একটা সিগারেট বের করলেন কেনেথ গ্র্যান্ট। পকেটে আবার সিগারেটের প্যাকেটটা ঢুকিয়ে রেখে আগুন জ্বালালেন ওটার মাথাতে। ধীরেসুস্থে একবার ধোঁয়া ছেড়ে ফিরে তাকালেন জিয়ার মুখের দিকে।

“বিজয়কে ইপসিসিমােস স্তরে উঠতেই হবে, মি. জিয়া। এটাই তার অভিজ্ঞতা অর্জনের একমাত্র কোয়ালিফিকেশন। তাকে প্রমাণ করতে হবে-তার বিশ্বাসের জন্য সে যা প্রয়োজন মনে করে তাই করতে পারে। শয়তান আছে কি নেই, এসব আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়, আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের ডেডিকেশন। যে তার লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য নিঃশঙ্কোচে এক কিশোরিকে জবাই করতে পারে, তার মানসিক দৃঢ়তা সাধারণের চেয়ে কয়েকশ’ গুণ বেশি হতে বাধ্য। এরকম একজনের হাত ধরেই আসতে পারে অসংখ্য সফলতা।”

মাথা দোলায় জিয়া, “অসপেক্ষের ভবিষ্যৎবাণীও তাহলে সিরিয়াস কিছু নয়। তিনি শুধু ক্যালকুলেশন করে ভবিষ্যতের জন্য বেটার ডিসিশন দিতে পারেন। আর আগে থেকে অনেকেই তার প্রফেসিকে সত্য মনে করে এসেছে-এতে সাধারণ মেসনরা অভ্যস্ত। এই ‘বিশ্বাস’ কাজে লাগিয়ে বিজয়কে মাস্টার মেসন হিসেবে নির্ধারণ করেছেন আপনারা। মেসনরা বিশ্বাস করে বিজয় বাংলাদেশের মেসনিক অবস্থানের প্রভূত উন্নয়ন ঘটাবে। তাদের বিশ্বাস প্রেরণা যোগাচ্ছে বিজয়কে, সে তার লক্ষ্যে অটুট মনোবল নিয়ে পৌছে যাবে। মোটকথা বিশ্বাসে কাজ উদ্ধার হচ্ছে আপনাদের। তাই না?”

“এভাবেও দেখতে পারেন। তবে বেশিরভাগ মেসনই এতকিছু দেখেন না। তারা তাদের বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যায়, অন্ধ সেই বিশ্বাস। প্রশ্ন করেন না তারা রিচুয়াল নিয়ে। তবে এতে ক্ষতির কিছু আমি দেখি না। আমাদের প্রয়োজন ওয়ান ওয়ার্ল্ড অর্ডার প্রতিষ্ঠা করা। সদস্যরা কি মনে করে কাজ করছে সেটা বড় কোন বিষয় নয়। প্রথমে প্রয়োজন মোটিভেশন।”

“আগে মেসনিক লজের মাস্টার ছিলেন নিশ্চয় প্রফেসর তানভীর জালাল? তাকে সরিয়ে দিলেন কেন আপনারা? নাহলে বিজয়কে জায়গাতে বসানো যেত না, এরকম কিছু?”

“তানভীর জালাল তার নাম নয়। নামটি ছিলো তানভীর আহমেদ। এই নামেই স্কুল আর কলেজ পার হয়েছে তার।”

“জালাল নামটি আসল কোথা থেকে?” অবাক হয় জিয়া।

“পরে তিনি নামটি পাল্টেছেন। এই নামে বই লেখেন তিনি। সবাই ধরেই নিলো ওটুকু তার নিকনেম। পুরো নাম তানভীর আহমেদ জালাল। পরবর্তিতে তিনি ভুল ভাঙালেন সবার। বাবার নামে ‘জালাল’ অংশটুকু ছিলো বলে ঘোষণা দিলেন। নাম নিয়ে বিতর্কের অবসান ঘটল এভিডেন্সের পর। তবে বিষয়টা সেরকম ছিলো না।” ধোঁয়া দিয়ে অর্ধবৃত্ত আর পূর্ণ-বৃত্ত ঐকে দিতে দিতে আলোর উৎসের দিকে তাকালেন কেনেথ গ্র্যান্ট।

“নিজেকে অ্যালকেমিস্ট ভাবার জন্য নামটুকু যুক্ত করেছিলেন তিনি? যাতে কেমিস্ট পরিচয়ের আগে শুধু আল যোগ করে দিতে পারেন?” একটা উপসংহারে আসতে চায় জিয়া। কেনেথের হঠাৎ চুপ হয়ে যাওয়াতে সম্বুস্ত নয়।

“না, ওরকম একটা ছেলেমানুষি কেন করবেন তিনি? জিউইশ অ্যাকাডেমি অব লাইটের সদস্য তিনি। ইহুদিদের দ্বারা পরিচালিত একটা সংগঠন। সেখানে অ্যালকেমিস্ট হিসেবে কাজ করতেন। এখানে সব বিষয়ের ওপরই পন্ডিতরা আছেন। জ্ঞানের দিকে আমরা এত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি এদের কারণেই। এরা শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকেন না, নিজের মতো আরও কয়েকজন তৈরি করে দিয়ে যান। ডক্টর তানভীরের কার্ডে এভাবেই লেখা থাকতো—Jewish Academy of Light, Alchemist।”

আদ্যক্ষরগুলো ‘জালাল’ শব্দটা গঠন করছে! বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাতে সামলাতে প্রশ্ন করল জিয়া, “ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি অ্যাকাডেমি?”

“বুঝলেন কিভাবে?”

ব্যখ্যা দিল জিয়া, “অ্যাকাডেমি ছেড়ে দিলেও পরিচয়টা ছাড়েননি তিনি, এটা দেখানোর জন্য নাম নিয়ে এত নাটক করা হয়েছে। শো-অফ।”

একমত হলেন কেনেথ, “অ্যাকাডেমির দিকপালরা অসম্বুস্ত হয়েছিলেন তানভীরের ওপর। হয়তো তাদের সম্বুস্ত করতে এমনটা করেছিলেন তিনি। বোঝাতে চেয়েছিলেন মনে প্রাণে জিউইশ অ্যাকাডেমি অব লাইট পরিবারের সদস্য তিনি। জানার তো আর কোন উপায় নেই। তবে তাদের অসন্তোষ নিয়ে টিকতে পারতেন না তিনি। অ্যাকাডেমির দিকপালদের ইশারায় তাকে মেনসনিক লজ থেকে বের করেও দেওয়া হতে পারতো।”

“কিছুটা প্রভাব তো পড়েছে। মাস্টার মেনসন অসুস্থান থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিলো তাকে। রিপ্রেস করতে তার নিজের ছেলেকেই ব্যবহার করা হয়েছে। বিজয়কে সিলেক্টেড ওয়ান হিসেবে একারণেই কি নির্বাচিত করা হয়?”

“সেটা বৃহত্তর স্বার্থে। বিজয় মাস্টার মেনসন হলে আর চল্লিশ বছরের মাঝেই বাংলাদেশের প্রতিটা সুঁই নড়াচড়া পর্যন্ত আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো। ছেলেটা

বাইট। তাছাড়া এই জেনারেশনের সাথে সে চমৎকারভাবে খাপ খাওয়াতে পারবে।  
পাবে জনপ্রিয়তা আর গ্রহণযোগ্যতা। পাবলিক সাপোর্ট বিজয়ের দিকে থাকবে।  
তাকে নিয়ে আমাদের প্ল্যানটা এখানে চল্লিশ বছরের। তানভীর ততদিন বাঁচতে নাও  
পারতেন। বাঁচলেও কতটা কর্মক্ষম থাকতেন সেটা সন্দেহের ব্যাপার ছিলো। লং টার্ম  
এই প্ল্যানে বার বার নেতৃত্ব পাল্টানো যাবে না। একমাত্র পথ এটাই ছিলো। একমাত্র  
ক্যাভিডেটও ছিলো বিজয়। প্রডিজি ঘরে ঘরে জন্মায় না এদেশে।”

“ছেউ একটা দেশকে অধিকার করতে আপনাদের এত কষ্ট করা লাগছে,  
বিষয়টা আমার কাছে হাস্যকর লাগলো। আমার জানামতে পাকিস্তানকেও অনেক  
আগেই কজা করে ফেলেছেন আপনারা। সেখানে বাংলাদেশকে নিয়ে এত ঝামেলায়  
কেন?”

“কারণ, আপনারা প্রবলভাবে ইজরায়েল বিরোধি। এখনও ইজরায়েলকে রাষ্ট্র  
হিসেবে স্বীকৃতি দেননি আপনারা। বাংলাদেশের জন্মটাও আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী  
হয়নি ঠিক।”

“ইজরায়েলকে আমরা স্বীকৃতি দেবও না। আপনারা কোন রাষ্ট্র নন, দখলদার  
এক বাহিনী ছাড়া আর কিছু বলার নেই আপনাদের সম্পর্কে। খুনির দল গঠন করে  
ক্ষমতার জোরে নিজেদের রাষ্ট্র গঠন করেছেন কেবল!”

“রাষ্ট্র নয়।” মুচকি হাসলেন কেনেথ, “আজকের পৃথিবীতে সবাই রাষ্ট্রভিত্তিক  
চিন্তা করে বলে বাকিদের অধিকার করা আমাদের জন্য কোন কঠিন কাজ ছিলো না।  
দেখতেই তো পাচ্ছেন—আমেরিকা গণতান্ত্রিক দেশ, ইংল্যান্ড রাজতান্ত্রিক, ইজরায়েল  
এখন দখলদার নীতি মেনে চলা ধর্মাত্মক এক স্থান। তবুও কেন আমরা একসাথে কাজ  
করছি? কেন আমরা গাজায় হাজার হাজার মুসলিম মেরে সাফ করে দিলেও আমেরিকা  
আমাদের বিরুদ্ধে টু শব্দটাও করে না? এসব প্রশ্ন সাধারণ জনতা করবেই, তবে উত্তর  
পাবে না। তারা দেখতে পায় রাষ্ট্রভিত্তিক চিত্র। কিন্তু একটু ভাল করে খেয়াল করলেই  
বুঝতে পারতো—আমরা সবাই মিথরাস অথবা মেসন। পৃথিবীটা নানা রাষ্ট্রের নামে  
থাকলেও ক্ষমতা আমাদের হাতেই। কারণ, আমরা কোন রাষ্ট্রের নাগরিক নই, শপথ  
গ্রহণের সময় সেটাই শপথ করি আমরা। পুরো পৃথিবীর যে কোন সদস্য আইকে  
আমরা সমর্থন দেই। রাষ্ট্রভিত্তিক নই, আমরা আমাদের সোসাইটি ভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিয়ে  
থাকি। ওয়ান ওয়ার্ল্ড অর্ডার হলো পৃথিবীব্যাপি একটা পরিকল্পনা। বাংলাদেশ যতই  
ছোট হোক, পৃথিবীর বাইরের কিছু তো নয় এটা। কাজেই আমাদের পরিকল্পনায়  
এদেশটিও ছিলো।”

“সব ক্ষমতাশীল দেশগুলো আপনাদের হাতে থাকলে এত ঝামেলার তো কারণ  
দেখি না। চাইলেই প্রভাবিত করতে পারেন বাংলাদেশ সরকারকে। নিজেদের ইচ্ছে  
মতো চালাতে পারেন।”

“চালাতে পারি না, চালাচ্ছিও। তবে এটা অধিকার হলো না। এরকম কিছু দেশ  
আছে যাদের আমরা নিয়ন্ত্রণ করি, কিন্তু অধিকার করতে পারিনি। এদের মাঝে

আপনারা একটি। অধিকার করতে পারিনি, তার অর্থ যেকোন দিন আপনারা বেকে বসতে পারেন। আর আমরা লড়াই করে পৃথিবী জয় করতে আসিনি, মি. জিয়া।”

একটু হাসে জিয়া, “তা তো বটেই। আপনারা আছেন পেছনে ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা করে একটা একটা করে রাষ্ট্রকে অধিকার করতে। ষড়যন্ত্র ছাড়া গত কয়েক হাজার বছর ধরে তো কিছু করেছেন বলে মনে হয় না। একেকটা ষড়যন্ত্রের সাথে একেকটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে নিজেদের লোক বসিয়েছেন। আইনের-ঐতিহ্যের পরিবর্তন এনেছেন।”

“সবার ভালোর জন্য। আমাদের হাতে পৃথিবীটা থাকলে আমরা জ্ঞানে এগিয়ে যাবো খুব দ্রুত, আমাদের উন্নতি হবে কল্পনাভীত। আমাদের বলতে এখানে মানবজাতির বোঝাচ্ছি, মি. জিয়া। এমন কিছুতে বিশ্বাস রাখা দরকার যাতে মানবজাতির উন্নয়নে তা কাজে লাগে। আজকের যুগে প্রচলিত সব ফালতু বিশ্বাস আমরা মুছে দেব।”

“অসম্ভব কি এতটুকু দেখে যেতে পারেননি, আপনারা নিজেরাও মুছে যেতে পারেন এর ফলে?” ব্যঙ্গের হাসি দেয় জিয়া।

কেনেথের চোখ রাগে জ্বলে উঠলো। সিগারেটে জোরে কয়েকবার টান দিয়ে একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর এগিয়ে গিয়ে লম্বা প্রায়ার্সটা তুলে আনেন হিটার থেকে। গরমে লাল হয়ে গেছে ওটার সামনের অংশ। চোখা মাথাটা দিয়ে ধরে যে কোন আঙুল অনায়াসে টেনে খোলা যাবে। এতক্ষণ আয়েশ করে সিগারেট-আড্ডার পেছনে কারণ ওটাই, গরম করতে সময় লাগছিলো।

গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলো জিয়া, “আপনি জানতে চেয়েছিলেন, আর কে কে জানে আপনাদের ব্যাপারে। আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ জানতো না কিছু।”

“জানতো। তবে তাদের ব্যাপারে আপনি জানেন, আমরাও জানি। ব্যবস্থা সবারই নেওয়া হবে। এখন আপনি শুধু কনফার্ম করবেন। আমাদের ব্যাপারে কারা জানে তা নিয়ে আমাদের আগ্রহ নেই, মি. জিয়া। আমাদের জানা দরকার লজ লোকেশন আর কারা জানে। মুখ খুলবেন না সহজে, এটা আমার জানা আছে। তবে কতক্ষণে খুলছেন সেটাই দেখার বিষয়।”

শক্ত চোয়ালে গনগনে প্রায়ার্সের দিকে তাকিয়ে থাকলো, “আমি জানি, আর কেউ জানে না। আর সবচেয়ে বড় কথা কি জানেন? আপনাদের লজের লোকেশন যারা জানে তাদের একটা লিস্ট আমার কাছে থাকলেও আমার থেকে সেটা পেতেন না আপনি। আপনাদের সহযোগিতা করার কোন ইচ্ছে আমার নেই।”

জিয়ার কথা লোকটার কানেই ঢুকলো না যেন, “আপনার থেকে কিছু চাইনি আমি, মি. জিয়া। কোন প্রশ্ন করিনি এখনও। কথা বের করার সবচেয়ে ভাল উপায় শরীর থেকে কিছু অঙ্গ কেটে আলাদা করে ফেলা। কাটাকাটির আগে কোন প্রশ্ন করা উচিত নয়। সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছু করা হয় না।”

বিস্ফোরিত চোখে প্রায়সর্টার এগিয়ে আসা দেখে জিয়া। প্রথমবারের মতো অবর্ণনীয় আতঙ্ক চেপে ওকে চারপাশ থেকে চেপে ধরলো। যন্ত্রটা আবার হিটারে নামিয়ে রেখে দেওয়ালের সুইচবোর্ডের একটা সুইচ বোর্ড চেপে ধরলেন তিনি।

ঘরঘরে শব্দ করে শেকলটা টেনে ধরছে জিয়াকে। নিজের অজান্তেই দাঁড়াতে বাধ্য হলো ও। তারপর টানের প্রচণ্ডতায় ধীরে ধীরে ভেসে ওঠে শূন্যে। দু-হাতের শেকলে টান পড়ছে, সিলিংয়ের কাছে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে। পা দুটো মাটি থেকে উঠে গেছে, তবে বেশি দূর যেতে পারে না। মেঝের সাথে আটকে রাখা শেকলে টান খেলো।

শরীর টানটান হয়ে আছে—কোথাও একটা মেকানিজম ঘড় ঘড় শব্দের সাথে টেনেই চলেছে জিয়াকে। ছটফট করে বের হয়ে যেতে চেষ্টা করে ও। শব্দ জিঞ্জির-কারাগার থেকে মুক্তি চাইছে, কিন্তু একচুল সরতে পারলো না। শরীর টানটান হয়ে ওঠার সাথে সাথে কাঁধের ক্ষতটা আবারও খুলে গেছে। চোখ ঘোলা হয়ে আসতে শুরু করেছে জিয়ার, তীব্র আতঙ্কে, এতটা আতঙ্কের মুখোমুখি ওকে কখনও হতে হয়নি। ঘোলা দৃষ্টিতেই দেখতে পায় আবারও প্রায়সর্টা হাতে তুলে নিয়েছেন কেনেথ।

মাথা সামান্য ঝুঁকে আছে, এগিয়ে আসলো যেন স্বয়ং নরকের পিশাচ। কোন দ্বিধা ছাড়াই জিয়ার পায়ের আঙুলের দিকে এগিয়ে নিলো গনগনে প্রায়সর্। ডান পায়ের কড়ে আঙুলে গরম ভাপ টের পেল জিয়া। ধাতব গরম যেন ছুঁয়ে যাবে চামড়ায়।

পরমুহূর্তে প্রচণ্ড গরম চোয়ালদুটো চেপে বসে আঙুলে। শব্দ হাতে চাপ দিয়েছেন কেনেথ—‘কচ’জাতীয় একটা শব্দের সাথে কেটে আলাদা হয়ে গেলো আঙুল। পরমুহূর্তে ওখান থেকে ভ্যাকুয়াম দিয়ে টেনে ধরলো যেন কেউ! তীব্র বেগে বের হয়ে এসেছে রক্ত। তারপরই আসল যন্ত্রণা। আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে যেন আঙুলের গোড়াতে।

ঘর কাঁপিয়ে চৌচিয়ে ওঠে জিয়া।

একজন যোদ্ধার ইন্দ্রিয়গুলোর ওপর বিশ্বাস রাখাটা জরুরি। মেননিক লজের অদৃশ্য শত্রুরা এখন দৃশ্যমান, তবে ইন্দ্রিয়কে মিথ্যা প্রমাণিত করে দিয়েছে তারা। প্রাথমিক আক্রমণটা ছিলো সাইকোলজিক্যাল, তবে মরণস্বাভি। সাউন্ডবক্সের সাহায্যে প্রথমে জুতোর শব্দ, পরে গুলির শব্দ বাজিয়ে আক্ষরিক অর্থেই ইসটিংক্টের ওপর থেকে বিশ্বাস সরিয়ে নিয়েছে শত্রুপক্ষ।

সত্যিকারের প্রথম বুলেটটা যখন এসেছিলো একেবারেই টের পারনি ও। বিক্ষিপ্তভাবে নড়েচড়ে শব্দের উত্থস্টাকে খুঁজছিলো, সম্ভবত এই কারণেই মিস করেছে গানম্যান। তবে কনুইয়ের কাছের জলুনিটুকু কোন সাউন্ড ইফেক্টের কাজ নয়, এটা বুঝতে সমস্যা হয়নি ইরফানের।

শত্রুপক্ষ সম্ভবত প্ল্যানের বাইরে কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। আড়ালে থেকে ভড়কে দেওয়াই হয়তো ওদের পরিকল্পনা ছিলো। কিন্তু এখন আড়াল থেকে বের হয়ে আসতে হয়েছে তাদের। সাউন্ড ইফেক্ট থেকে সাময়িক মুক্তির জন্য এমন একটা ঘরে ইরফান ঢুকে পড়েছিল, সশরীরে তারা বের না হয়ে পারেনি।

তিনজন মেননকে গুলি করে হত্যা করেছে সে, তারপর বেশ কিছুক্ষণ ব্যয় করেছে সে ঘরে।

বামহাতের জলুনি অগ্রাহ্য করে হাতে কেসিংটা নিয়ে তখন থেকেই ছুটছে সে। চারপাশে ভারুয়াল গানশটের বিরাম নেই। তারমাঝেই থেকে থেকে আসছে আসল বুলেটগুলো। কোনদিক থেকে গুলি আসছে, ইরফানের জানা নেই। কানের ওপর ভিত্তি করে একজন যোদ্ধা তার আক্রমণের উত্থস্ট খুঁজে বের করে। এখন সেটা করা যাচ্ছে না। চারপাশে আলো নেই, অনেক আগেই অন্ধকার হয়েছে, তারপর আলো ফিরে আসেনি আর। অন্ধ লড়াইয়ে পড়ে গেছে ও। চোখ-কান বেঁধে যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে যেন তাকে! সাউন্ডবক্সের গুলির শব্দ আর আসল গুলির শব্দের মাঝে ফারাক নেই এখন।

এক পিলারের নিরাপদ আড়ালে এসে অন্য পিলারে যাওয়ার জন্য কিছু অনুমাননির্ভর কাভার ফায়ার করছে সে। তারপর রাস্তা করে নিচ্ছে শরীরটি নিরাপদ দূরত্বের দিকে। লম্বা হলঘরটিকে এভাবে প্রায় পার করে এসেছে, তখনই প্রথমবারের মতো শত্রুপক্ষের কাউকে দেখতে পেল ইরফান।

কুঁজো হয়ে এগিয়ে আসছিলো মানুষটা। তখনই দশ করে আলো জ্বলে উঠলো চারপাশে। ওর জানা থাকার কথা না, আসিফ একটা দরজা টপকেছে এইমাত্র। নিমেষে লক্ষ্য স্থির করে শত্রুর কপাল বরাবর একটা বুলেট পাঠিয়ে দেয় ইরফান। তারপরেই পেছনের দিকে ছয় নম্বর পিলারের আড়ালে শরীর ঢেকে নিতে থাকা লোকটার ডান পায়ের মাঝে ঢুকিয়ে দেয় নতুন ম্যাগাজিনের দ্বিতীয় বুলেটটা।

ভার্চুয়াল গান ফায়ারের মাঝে মিশে গেলো আহত লোকটার আত্মনাদ ॥ কেসিটা  
বল করে নামিয়ে রেখেছিলো ইরফান—এক হাতে ওটা আবারও তুলে নিলো ॥ পেছনে  
দিকে হটে গিয়ে পরের পিলারের দিকে এগুতে এগুতে আড়াল থেকে বের হওয়া  
একটা নাকের দিকে আরেকবার গুলি ছোঁড়ে ও । সমূহ বিপদ বুঝে সুড়ঙ্গ করে আবার  
আড়ালে চলে যায় নাকটা । কাউকে লাগলো না বুলেট ।

পেছনের পিলারে এসে কেসিটা আবার খটাস করে নামিয়ে রাখে ইরফান ॥ শত্রু  
পক্ষ দু-পাশ থেকেই আসতে পারে । নিজের পেছনে একটা চোখ রাখছে সৌজন্য ॥  
দেখি হওয়ার কারণও ওটাই । আরও আগেই পথ বের করে পিছু হটতে পারতো  
ও—কিন্তু এখানে তাড়াহুড়া করে শেষ মুহূর্তে গুলি খেতে চায় না ।

“এখানে আসো, জলদি! হ্যাভিং অ্যা সিচুয়েশন হিয়ার ।”

কানের পাশে গর্জে ওঠে আসিফের কণ্ঠটা । দ্রুত ট্রানমিশন বাটন চেপে ধরে  
ইরফান, “আসছি ॥ পাঁচ মিনিটের মধ্যে ।”

ওপাশ থেকে প্রচণ্ড একটা ‘বুম’ শব্দের সাথে সাথে ভেসে আসে আসিফের কণ্ঠ,  
“যুদ্ধ চলছে নাকি ওখানে? ডোনট গেট ইয়োরসেলফ শট । এদিকটা মাত্র ক্রিয়ার  
করলাম ।”

আসিফটা নির্ঝাঁপে স্কেনেড ছুঁড়েছে! টাইমারযুক্ত বোমাদুটোর একটাও হতে পারে ॥  
এতকিছু সাথে করে এনেছে, অঞ্চল শুকে একটা-দুটো দিলে কি ক্ষতিটা হত?  
অকারণেই আসিফের ওপর অভিমানে ছেয়ে যায় ইরফানের মন । একটা স্কেনেড  
এখানে চার্জ করতে পারলে পেছনে লেগে থাকা জনগণকে একেবারে ধ্বংস করে দেওয়া  
যেত ।

মনের ক্ষোভটা অন্যপাশ থেকে এক হাত বের হওয়া শত্রুর দিকে দুটো বুলেট  
পাঠিয়ে দিয়েই মোটাতে হলো শুকে । তারপর কেসিটা তুলে নিয়ে প্রাণপনে দৌড় দেয়  
উল্টোদিকে । কানের পাশ দিয়ে আরেকটা বুলেট যাওয়ার সাথে সাথে ভার্চুয়াল  
গানফায়ারের শব্দ থেমে যায় । লক্ষিয়ে আরেকটা পিলারের আড়ালে চলে এসেছে ও ॥

আচমকা সব শব্দ থেমে যাওয়ার সাথে সাথে বড় বেশি নীরব বলে মনে হয়  
পরিবেশটা । কেসিটা আবার নামিয়ে রেখে এক ঝটকা দিয়ে আড়াল থেকে বের হয়ে  
এলো ইরফান । চারের মতো এক পিলার থেকে আরেক পিলারের দিকে এগিয়ে  
আসছিলো শুদের একজন—এক গুলিতে হাটুর বাটি ছুটিয়ে দিল মানুষটার ॥ যন্ত্রণাকাতর  
একটা চিৎকার ছেড়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে লোকটা, অন্য আরেকজন সুযোগ ধরে নিয়ে  
সাথে সাথে বের হয়ে আসলো ।

এই বুলেটের সাথে দ্বিতীয়জনের মগজ আর বুকের অংশে পেছনের দেয়ালটা  
ভরে গেলো । নাক মুখ কুঁচকে আরেক কালো কোটের দিকে পরের গুলিটা ছুঁড়লো ও ॥  
লক্ষিয়ে আড়ালে ফিরে গেলো মানুষটা । কোনদিকে না তাকিয়ে কেসি টুলে নিয়ে  
আবারও পেছনের দিকে ছুটলো ইরফান । ডান দিকে মোড় নিচ্ছে লম্বা হলুদবস্ত্রের মতো  
করিডোরটা ॥

কানের পাশ দিয়ে আরেকটা 'বিইং'জাতীয় শব্দের সাথে সাথে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে ছুটতে থাকা ধাওয়াকারীদের একজনকে দেখতে পেল ও। মাত্র একটা বুলেটের সাহায্যে ছিটকে তাকে মাটিতে ফেলে দিল তাকে। হাটুর নিচে লেগেছে গুলি। প্রাণপনে বাকিদের আবারও একেকটা পিলারের আড়ালে চলে যেতে দেখে মুচকি একটা হাসি ফুটলো ওর মুখে।

হাসিটা স্থায়ি হয় না। শট কাউন্ট করে ও সবসময়। ম্যাগাজিনে থাকার কথা আর পাঁচটি মাত্র বুলেট। ওদিকে কোমরে আছে একটা ম্যাগাজিনে তেরটা। আঠারোটা বুলেট নিয়ে কতদূর যেতে পারবে আর সেটা ভাবতেও চায় না সে। টিকে থাকতে হবে যতক্ষণ পারা যায়।

সামনে বদ্ধ দরজাটার ওপর ডান পা তুলে দড়াম করে একটা লাথি মারলো কজার ওপর। ছিটকে খুলে যায় ওটা। মাত্র বিশ ফিট লম্বা ঘরটা খালি। বামদিকে একটা দরজা চলে গেছে সংসদ ভবনের আরও ভেতরে। সামনের দরজাকেই বেছে নেয় ও। ডানদিকে মোড় নিতে নিতে অনেকদূর এসেছে ও করিডোর ধরে। এদিকে দিয়ে বের হলে আসিফকে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

আরেক লাথিতে দরজার নব ভেঙে পরের ঘরে পা রেখেই থমকে দাঁড়ালো ইরফান। দেখার অযোগ্য চেহারা হয়েছে এখানকার দেওয়ালগুলোর। কালো রঙ ধারণ করেছে অনেক স্থানে। আর তার সাথে সঙ্গ দিচ্ছে লালচে রঙিন একধরনের নোংরা রঙ। মানুষের রক্ত আর অন্যান্য দেহাবশেষ লেন্টে থাকার চিহ্ন।

বদ্ধ ধরে থেনেড ফাটার কুফল। পড়ে থাকা লাশগুলো মোটামুটি অক্ষতই আছে। লো লেভেলে স্প্রিন্টার কম ট্রাভেল করে—জানা আছে ওর। তবে দাঁড়িয়ে থাকা কেউ এক খণ্ডে অবশিষ্ট নেই। ঘরের অন্যপাশে আধশোয়া অবস্থায় দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছে ডিটেক্টিভ আসিফ আহমেদ।

পেটের কাছে আর কাঁধে দুটুকরো করে ছিড়ে বেঁধেছে পরণের শার্টটা। দুটো টুকরোই রক্তে একেবারে ভিজ়ে আছে এখন। ছোট একটা দৌড় দিয়ে তার কাছে পৌঁছে যায় ইরফান। আসিফের পাশে নামিয়ে রাখলো কেসিং।

নিজের কাঁধ নিজে ব্যাভেজ করাটা কঠিন। ক্ষত থেকে কাপড়টা খুলে ফেলে নিজের শার্টটা ছিড়ে দুইটুকরো করে ও। তারপর এক টুকরো যত্ন করে বেঁধে দিল আসিফের কাঁধে। পেটের ক্ষতের ওপর আরেকটা অংশ শক্ত করে আটকে দিল। তারপর বামহাতটা নিজের বাম হাতে আটকে টেনে তোলে আসিফকে।

“আমার কাঁধে ভর দাও। বের হই এখান থেকে। ঈশিজি কোথায়?” প্রথমবারের মতো প্রশ্নটা আসে ইরফানের মাথায়। চারপাশে তাকিয়ে বোনকে খুঁজলো ওর দুই চোখ। তারপরই চোখ আটকে যায় মেঝেতে পড়ে থাকা দোমড়ানো শরীরটার দিকে।

আসিফকে আচমকা ছেড়ে দিয়ে সেদিকে ছুটে যায় ছেলেরা। নিজের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে আসিফের। বোনকে বের করে নিয়ে যেতে এই মানুষটা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এতদূর এসেছে। সামান্য একজন কিডন্যাপার হয়ে এমন



একটা কাজ করে দেখিয়েছে, যা এদেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীও করে দেখাতে পারেনি। সেই বোনের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছিলো আসিফের হাতে। ব্যর্থ হয়েছে সে। বোনকে খুব ভালবাসতো ইরফান, তার ব্যাপারে বলার সময় গর্বে ঝলমল করতো ওর চেহারা। মেয়েটাকে প্রায় দ্বিখন্ডিত অবস্থাতে পড়ে থাকতে দেখে তার অনুভূতি কেমন হচ্ছে?

আসিফ কল্পনা করতে পারে না। আসলে, করতে চায় না কল্পনাও। চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকলো শুধু। পিস্তলটার ওজন মনে হচ্ছে কয়েক টন। চোখ মেলতে ইরফানকে দেখতে পেল। মেয়েটির পাশে বসে আছে। এদিকে পেছন ফিরে আছে সে-আসিফ তার অভিব্যক্তি দেখতে পায় না। ছেলেটাকে স্বাস্থ্য দিচ্ছে কিছু বলতে যাবে, এসময় বিকট শব্দে একটা দরজা খুলে গেলো। একটু আগে ইরফান ওদিক দিয়েই ঢুকেছে।

ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়ল দু-জন মানুষ। হাতে অস্ত্রগুলো ছাতের লাইটের কল্যাণে ঝলকানি দিচ্ছে। নিমেষে ইরফানের দিকে পিস্তল উঁচিয়ে ধরলো একজন। তাকেই প্রথম ধরে নেয় আসিফ। শত্রুর চোয়াল ভেদ করে একটা বুলেট চলে যেতে দেখে মনের ভেতরে কোথাও একটা শান্তি অনুভব করলো। এরাই কি মেয়েটাকে ধীরে ধীরে এই পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়নি?

দ্বিতীয় মানুষটা আরও দ্রুত রিঅ্যাক্ট করে-চোখের পলকে আসিফের দিকে ঘুরেই টেনে দেয় ট্রিগার। গুলির শব্দটার সাথে সাথে কুঁকড়ে যায় আসিফ। তারপর অবিশ্বাস চোখে নিয়ে হুড়মুড় করে মানুষটাকে পড়ে যেতে দেখলো। ডানদিকে ফিরে ইরফানকে সাইলেন্সার পিস্তলটা নামিয়ে নিতে দেখলো ও।

“চলো-এখান থেকে বের হই। ওদিকে একটা কন্ট্রোল রুমে আছে। ঢোকার পথটা ওরা বন্ধ করে দিয়েছে বটে-তবে কারেন্ট সাপ্লাই যখন ফিরিয়ে দিয়েছে-আবার খুলে নিতে পারবো।” আসিফের কাছে এগিয়ে এসে শান্ত কণ্ঠে বলে ইরফান, “মেসনদের আন্ডারএস্টিমেট করাটা আমাদের উচিত হয়নি।”

ইরফান আসিফের অক্ষত হাতটা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে ওকে সাপোর্ট দিচ্ছে এখন। লক্ষ্য করে মাথা নাড়লো আসিফ, “ওকে তুলে নাও। আমি নিজেই টেনে নিতে যেতে পারবো। আমাকে নিয়ে ভাবার দরকার নেই।”

“কাকে?” থমথমে মুখে তাকায় ইরফান, “পড়ে থাকা মেয়েটি সশিতা নয়। আমাদের আরেক দফা বোকা বানানো হয়েছে, ডিটেক্টিভ। মেয়েটি ছিলো আরেকটি ট্র্যাপ। আপনাকে এ পর্যন্ত টেনে আনার কাজে তাকে ব্যবহার করেছে মেসনরা।”

অন্যহাতে আবারও কেসিংটা তুলে নিলো ইরফান।

যেদিক দিয়ে ঢুকেছিলো সেপথটা খোলা পেয়ে হালকা স্বস্তি অনুভব করলো ওরা। কন্ট্রোল রুমে ঠিকমত পৌঁছেছিলো ঠিকই, কিন্তু কোন লিভার কোন দরজার জন্য নির্দেশিত—তা ওদের বোঝার কথা নয়। ঈশিতার নকলকে উদ্ধারের পরই প্রবেশপথ বন্ধ পেয়েছিলো আসিফ। অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কয়েকটা গেট খুলে দিয়েছে ওরা, কন্ট্রোল রুম থেকে বের হয়ে এসেছে তারপর।

দুটো ভিন্নপথে এগিয়েছিলো ওরা ঢোকার সময়। তাদের সংযোগের অংশটাতে একটা দরজা দেখেছিলো ইরফান। সম্ভবত জাতীয় সংসদ ভবনের প্রেসিডেন্সিয়াল প্রাজার ভেতরে উন্মুক্ত হয়েছে ওটা। দরজার ওপাশে থাকতে পারে গ্যালারি, পেভমেন্ট বা কোন বাথরুমের ভেতরে অংশ। খুলে দেখার ঝামেলায় যেতে চায় না ওরা। মেসনদের অবশিষ্টাংশের সাথে লড়াই করার মতো সামর্থ্য বা মানসিক শক্তি—কোনটাই অবশিষ্ট নেই এখন ওদের মাঝে। যে পথে ঢুকেছিলো সে পথে ফিরে যেতে চাইছে এখন।

কন্ট্রোল রুমে ঢুকে একটা ব্যাপার বোঝা গেছে, আসিফ অথবা ইরফানের অবস্থান তারা কিভাবে বুঝতে পেরেছিলো তা এখন পরিষ্কার। কোথাও কোন ক্যামেরা দেখেনি ওরা—কারণ, দেওয়ালের বাইরে কোন ক্যামেরা আসলেই ছিলো না। ক্যামেরাগুলো স্থাপন করা হয়েছে দেওয়ালের ভেতরে। থার্মাল ক্যামেরা। জীবন্ত প্রাণীর শরীর থেকে বের হওয়া তাপের রেডিয়েশন ক্যাচ করে ওগুলো। তারপর একটা থার্মাল ইমেজ ফুটিয়ে তোলে। একারণেই পুরোটা সময় ওদের অবস্থান তারা জানতো। ওদের সাথে ইঁদুর-বেড়াল খেলা খেলতেও কোন সমস্যা হয়নি।

“শালারা কিভাবে বুঝল ডানদিক দিয়েই আমি ঢুকবো? ডানদিক দিয়ে তুমি নামলে নিশ্চয় মেয়েটার ব্লাফ ধরে ফেলতে। আস্ত একটা ফেইক ঈশিতা প্ল্যান্ট করে রেখেছে ভাবতেও পারিনি,” বিড় বিড় করে আসিফ। টলছে ওর দুটো পা-ই।

“সম্ভবত রাইট আর লেফট উইংয়ে ওই চেম্বার দুটো ইন্টারকানেক্টেড। তুমি ডানদিক বেছে নিতে মেয়েটাকে ওপাশের চেম্বারে পাঠিয়ে দিয়েছে ওরা। দুটো ঘর পাশাপাশি যেহেতু, মাঝখানের দেওয়ালে গোপন দরজা না খোঁজাই যায় না। খালি একটা ঘরে সিক্রেট দরজা খোঁজার কথা আমার মাথাতে ছিলো না। পুরো লজটাই সিক্রেট একটা লোকেশনে। তার ভেতরে সিক্রেট ডোর খুঁজবে কে! আর সেঘরে ঈশিতাকে পেয়ে গিয়ে তোমার খুশি হয়ে যাওয়ার কথা। কোন সিক্রেট ডোর খোঁজার কথা না তোমার। ক্যালকুলেটেড রিস্ক নিয়েছে মেসনরা।” কথা বলার ফাঁকে একবার পেছনের দিকটা দেখলো ইরফান।

কেউ ওদের ধাওয়া করছে না। আশ্বে করে সরু করিডোরের দরজাটা খুলে ফেলে ও। একমাত্র সুইচটা অন করে লম্বা করিডোরটাকে আলোকিত করলো। জিয়া উদ্যানের দিকে চলে যাওয়া প্যাসেজটা আবারও দেখা গেলো। সবগুলো আলো জ্বলে আসিফকে নিয়ে সে-পথে এগিয়ে যায় ইরফান। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত থেকে যাচ্ছে ওদের গতিপথ ধরে।

“হঠাৎ আক্রমণ থেমে যাওয়াটা আমার কাছে সুবিধের লক্ষণ মনে হচ্ছে না, ইরফান। ওপাশে ওরা অপেক্ষা করছে মনে হয়।”

“দেখা যাবে। আর কোন উপায় নেই। এদিক দিয়েই যেতে হবে আমাদের।”

ইঞ্চি ইঞ্চি করে আগাচ্ছে ওরা, এমনটাই মনে হয় আসিফের। পেটের কাছটা এতক্ষণ গরম হয়ে ছিলো, এখন এমন ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। লক্ষণ ভাল নয়, ও নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানে। আর কিছুক্ষণ পর চোখ উল্টে যেতে পারে, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে যেতে পারে তারপর। কিন্তু এগিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায়ও নেই এখন।

সকাল থেকে এই পর্যন্ত যথেষ্ট ধকল গেছে শরীর আর ব্রেইনের ওপর দিয়ে। আর কতক্ষণ নিতে পারবে-সেটা দেখার বিষয়। প্রথমে যথেষ্ট মাথা ঝাটিয়ে মেসনিক লজ লোকেশন যৌক্তিকভাবে বের করেছে ও। বাইতুল মোকাররমের কাছেই জিপিও। তাকে হাতের ডানে রেখে প্রাচীর ধরে এগিয়ে গেলে পুরনো মেসনিক লজটা পাওয়া যায়। সেখানে গেছিলো ও। পুরানা পল্টন স্ট্রিটের পাশে ভূমি অধিদপ্তরের ছোট প্রাচীন বিল্ডিংটা দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হয়েছে শুধু। এটা মেসনিক লজ এখন আর নেই। এককালে ছিলো। তবুও কর্তব্যরত অফিসারের সাথে কথা বলে নিশ্চিত হয়েছে-লোকটার ও ব্যাপারে আইডিয়া পর্যন্ত নেই।

তারপর রাজউকের সাইট থেকে গ্যান বের করেছে। চোখে পড়ার মতো স্থাপত্যগুলোকে বেছে নিয়েছে, তাদের নির্মাণকালকে রেখেছিলো '৪৮ থেকে '৭১-এ। লুই আই কানের সঙ্গে জাতীয় সংসদ ভবনকে পেয়ে একেই লজ হিসেবে সন্দেহ করেছিলো সে। চেক করে দেখার সময় আসিফ পায়নি। ছুটেতে হয়েছে সেমিনারে। রিয়াজুল করিমের হত্যাকাণ্ড বড় ধরনের এক ধাক্কা ছিলো। জিয়া সেখানে গুলি খাবে সেটাও পরিকল্পনার অংশ ছিলো না। আহত জিয়াকেই বাধ্য হয়ে ডক্টর খানের ওপর চোখ রাখতে বসাতে হয়েছে। আবার ছুটে আসতে হয়েছে এখানে। লাভের লাভ হয়েছে একটাই-জাতীয় সংসদ ভবনের নিচে বানিয়ে রাখা লুই আই কানের গোপন বেজমেন্ট মেসনিক লজ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু, বের করতে পারেনি ঈশিতাকে। লজের ভেতর জিয়া মেয়েটাকে রাখেনি। ওরাও সারপ্রাইজ দিতে এসে সারপ্রাইজড হয়ে গেছে ইরফানের হাতের কেসিংটার দিকে আরেকবার তাকালো। কী আছে ওখানে? একটা সিপিইউ খুলে নেওয়ার পেছনে কিডন্যাপার ছেলেটার যুক্তি থাকতে বাধ্য। মেসনদের রেজিস্টার্ড ফাইল বের করতে পারলে বাংলাদেশের মেসনদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে দেখাতে পারবে ওরা এটাকে।

“সিপিইউটা চালিয়ে দেখেছ?” নিচু কণ্ঠে জানতে চায় আসিফ।

“সময় পাই নি। তবে আর্কাইভস রুম থেকে এটা নিয়ে বের হওয়ার পরই ওরা প্রথমবার চোখের সামনে আসে।”

“সহজ প্র্যান। নার্ভে প্রেশার দিয়ে আমাদের প্রেসিডেন্সিয়াল প্রাজার দিকে তাড়িয়ে এনে অ্যামবুশ করতো ওরা। তুমি আর্কাইভস রুমে সিপিইউ খোলা শুরু করায় প্র্যানটা ভেঙে গেছে ওদের। একদল তোমার দিকে সরে গেছে, আরেকদল আমার দিকে। নাহলে হয়তো দু-জনই এতক্ষণে লাশ হয়ে যেতাম...কি এমন সিপিইউ খুলে বসেছিলে?”

“একটা নয়। যতগুলো সিপিইউ ছিলো-সবগুলোর হার্ডড্রাইভ খুলে এই কেসিংয়ে ভরে বের হয়ে এসেছি। এটা সিপিইউ নয়, আসিফ। শুধুই একটা কাতার। এই মুহূর্তে আমার ব্রিফকেসের কাজ দিচ্ছে।” মুচকি হাসে ইরফান, “ওদের ভয়ের কিছু এর ভেতরে না থাকলে এভাবে মরিয়া হয়ে আক্রমণ করতো না নিশ্চয়?”

“কাজের কাজ করেই এসেছ দেখছি।” প্রশংসার সুরে বলে আসিফ।

শেষমাথায় চলে এসেছে ওরা। দরজাটা খুললে ক্যামোফ্লাজ ডোরের অন্যপাশটা উন্মুক্ত হবে। ও পথে ড্রেন হয়ে আবার জিয়া উদ্যানে ফিরে যেতে পারবে তারা। আরেকবার করিডোরটা দেখে নিয়ে সুইচ চেপে লাইটটা বন্ধ করে দিল ইরফান। ড্রেন ভর্তি আলো দেখিয়ে কাছেপিঠে থাকা কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করা আর পিঠে একটা ‘শ্যুট মি’ সাইন নিয়ে ঘুরে বেড়ানো একই কথা।

ক্যাঁচকোঁচ শব্দ ছাড়াই খুলে যায় দরজা। আঙুলে করে মাথা বের করলো ওরা। বাইরে অনেক ওপরে তারাগুলো জ্বল জ্বল করছে এখন। তবে তার চেয়ে বেশি প্রভাব ফেলল গন্ধ। নোংরা একটা গন্ধে ভরে আছে জায়গাটা। ময়লা পানিতে জ্বুতো ভিজিয়ে আসিফকে নিয়ে মাত্র সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে ইরফান-ওপর থেকে উজ্জ্বল ফ্ল্যাশলাইটের আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে গেলো।

“চমৎকার। এতদূর আসার জন্য তোমাদের অভিনন্দন জানাতেই হয়।” আলোতে অন্ধ হয়ে গেছে ওরা-কণ্ঠটা বলে চলেছে, “ছোট্ট একটা প্রশ্ন ছিলো। লজের অবস্থানের কথা আর কে কে জানে?”

কাণ্ঠহাসি দেয় ইরফান, “কথোপকথনের জন্য জায়গাটা ঠিক ‘ইয়ে’ নয়। ওপরে এসে আমরা এসব নিয়ে আলোচনা করতে পারি কি?”

“ওপরে লাশ ফেলার ইচ্ছে আমার নেই। ড্রেনে ফেলতে পারলে জনতার চোখ কম আটকাতো। তোমাকে বয়ে নেওয়ার ইচ্ছে আমার নেই ইরফান। তোমার রেপুটেশন সম্পর্কে আমার খুব ভাল ধারণা আছে। একটু আগের তাগবের কথা বাদই দিলাম। আমি আসিফের কো-অপারেশন চাচ্ছি। ডিটেক্টিভ হয়তো জানেন না, আপনার জন্য ফ্রি মেসনারিতে একটা পজিশন ঠিক করেছি আমরা। চমৎকার এই মেধাকে দেশের উপকারে কাজে লাগানোর সুযোগ আপনি পাবেন, শুধু বলে দিন আর কে কে এই লজের ব্যাপারে জানে? আপনাকে উঠিয়ে নিয়ে আসবো আমরা।”

“এরচেয়ে তুমিও নেমে যাও না নিচে।” ভিন্ন ধরনের একটা কণ্ঠ পেছন থেকে ভেসে আসতে চমকে উঠলো ফ্ল্যাশলাইট ধরে থাকা মানুষটা।

পরক্ষণেই ছড় ছড় করে গরম তরল ছুটে এলো ইরফানের মুখে। হাত দিয়ে তুলে নিশ্চিত হলো, তাজা রক্ত এগুলো। ধপ করে ড্রেনে একটা লাশ আছড়ে পড়ল। গলা কাটা মাঝবয়সি এক মানুষ। ওপরের দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আসিফ। কণ্ঠটা আবার শোনা গেলো।

“দ্রুত উঠে আসুন। সারা রাত এখানে দুইটা লাশ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো না।”

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে ড্রেনের ওপরে উঠে এসে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আসিফ। নামার সময় একেবারেই সুস্থ ছিলো ও। অথচ, এখন দ্রুত মেডিকেল সাপোর্ট দরকার। নিজের শরীরের ভেতরে থাকা বুলেটগুলোর চেয়েও অবাক লাগে ওর সামনে কালো পোশাকে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটার দিকে তাকিয়ে। ফ্যাকাসে একটা মুখ লোকটার-সেখানে ভয়ডরের চিহ্নমাত্র নেই। চোখে যন্ত্রণার ছাপ। যেন মারাত্মক আহত একজন মানুষ ইচ্ছেশক্তির জোরে দাঁড়িয়ে আছে কেবল।

মানুষটা ইরফানের সাথে হাত মেলালো। নাক কুঁচকে তার দিকে তাকায় আসিফ।

“এই ভাঁড়টা কে?”

“ভাঁড়ামি তো আপনাদের মধ্যে দেখছি। দু-জনই নেংটু হয়ে আছেন কি মনে করে?”

খালি গায়ে দাঁড়িয়ে থাকা আসিফ আর ইরফান আক্ষরিক অর্থেই ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে এগিয়ে এলো ইরফানই, “ইনি হলেন মি. সৈকত। নাম শুনেছেন আগেই, ইভার ভাই। সৈকত, এ হলো ডিটেক্টিভ আসিফ আহমেদ।”

“পরিচয়পর্বটা গাড়ির কাছে গিয়ে করলে ভাল হতো না?” গর গর করে ওঠে সৈকত।

পড়ে থাকা লাশগুলোর দিকে একবার তাকায় আসিফ। তারপর ইরফানের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললো, “ড্রেনে আমার পর তুমি নেমেছিলে। মোবাইল থেকে একটা ছোট্ট মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছিলে সৈকতকে?”

লাশগুলোর দিকে তাকালো ইরফানও, “ভাগ্যিস।”

কাঁধ ঝাকিয়ে ওদের সাথে বেড়া টপকাল আসিফ। ক্ষতগুলো টনটক করে ওঠে। রাস্তাতে শান্তভাবে পার্ক করে রাখা গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেলো।

হতাশায় মাথা নাড়লো কয়েকবার। গত সপ্তাহে দুটো কেস এসেছিলো ওর হাতে। তানভীর জালাল আর জোড়া-খুনের কেস। কেসদুটোর প্রাইম সাসপেক্ট যে দু-জন ছিলো, তাদের সাথেই এখন কাজ করতে হচ্ছে ওকে। স্বেচ্ছায়! নিয়তির পরিহাসে।

“গ্রেট! সিমপ্লি-ইট’স গ্রেট!” বিরক্তিতে নাক কুচকে মন্তব্য করলো ডিটেক্টিভ আসিফ আহমেদ, “খালি গায়ে আর কতক্ষণ থাকবো? একটা টোয়েন্টি ফোর আউয়ার্স ওপেন শপিং মলের কাছে রেখো তো গাড়িটা।”

তৃতীয় আঙুলটা কেটে ফেলার পর জিয়ার মুখ থেকে আর চিৎকার শোনা যায় না। দ্বিতীয় আঙুল আলাদা করে ফেলার পর থেকেই তীব্র যন্ত্রণায় ঠোঁট বেয়ে রক্ত পড়ছিলো। এবার কেমন যেন বোধশূন্য হয়ে এসেছে। নেতিয়ে পড়তে চাচ্ছে শরীরটা। সেটাও সম্ভব হচ্ছে না, আঙুলটা দিয়ে শেকলে বেঁধে নির্দয়ভাবে বুনিয়ি রাখা হয়েছে তাকে।

চকচকে একটা হাসি এখনও লেগে আছে কেনেথ গ্রান্টের মুখে। কুঁচকে থাকা মুখের চামড়া আরও কুঁচকে যায় সে হাসিতে।

“কথা বলছেন না কেন, মি. টিকটিকি? ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন নাকি?”

জিয়া শুধু একটা চোখ খুলতে পারলো। দৃষ্টিতে মিশে আছে একাধারে তীব্র ক্রোধ আর ঘৃণা। হালকা ঠোঁট নড়লো কিন্তু কোন শব্দ বের হয় না সেখান থেকে।

“আরেকটু জোরে বলুন। শুনতে পাই না।” মাথা নাড়েন কেনেথ, “আর কে কে জানে আমাদের ব্যাপারে?”

“তোমরা জাহান্নামে যেতে পারো,” বিড় বিড় করে উচ্চারণ করে জিয়া।

হতাশ মুখে আবার প্রায়ারসের দিকে হাত বাড়ালেন কেনেথ। হিটারে প্রায়ার্স গরম হচ্ছে, তৃতীয় আঙুলটা খুলে ফেলার পর ঠাণ্ডা হয়ে গেছিলো। গনগনে লাল মাথাটুকু দেখে চোখ বন্ধ করে ফেললো জিয়া। আরও একবার যন্ত্রণা সহ্য করার জন্য অবশিষ্ট মানসিক দৃঢ়তা একত্র করে প্রস্তুত হচ্ছে।

মৃদু শব্দ করে দরজাটা ঠিক সেসময় খুলে গেলো। তরুণ একজন ভেতরে ঢুকলো। হাতে মোবাইল ফোন। এর সাথে আগেও দেখা হয়েছিলো ওদের। মিথরাস লজে পথ দেখিয়েছিলো সে। তরুণের চেহারায় কিছু একটা আছে, যে কারণে তাকে ঠিক বাংলাদেশি মনে হয় না। কেনেথের চোখে মুখে বিরক্তির ছাপ পড়ে।

“এরাশ! আমি ব্যস্ত!”

“স্যার—এটা আপনি শোনা দরকার,” ব্যস্ত চেহারা নিয়ে বলল তরুণ।

একপাশে প্রায়ারস সরিয়ে রেখে মোবাইলটা ধরেন কেনেথ, “হ্যালো।”

“মি. কেনেথ গ্র্যান্ট!” ওপাশে উচ্ছ্বসিত একটা কণ্ঠ শোনা যায়।

কানে ফোনটা চেপে ধরেন কেনেথ, “বলছি। আপনি?”

“নাম শুনে থাকবেন হয়তো। একবার দেখা হয়েছিলো তো।” বুনিতে গলে পড়ছে ওপাশের কণ্ঠস্বরটা, “আমি ডিটেক্টিভ আসিফ আহমেদ।”

কেনেথের হিসেব মেলে না। লোকটা এখনও বেঁচে থাকে কী করে? মেসনিক লজে সে ঢুকতে পারে, এমন সম্ভাবনা ছিলো। সম্ভাব্যতার পরিমাণ ছিলো যথেষ্ট। ঢুকে পড়লেও সমস্যা হওয়ার কথা না, যথেষ্ট প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিলো তাকে জামাই-অভ্যর্থনা দেওয়ার জন্য। তারপরও কিভাবে বেঁচে ফিরতে পারে একজন মানুষ?

“এই নম্বর পেলেন কোথায়?” চোখমুখ থেকে বিষম্বাসভর ছাপটা কাটাতে পারলেন না কেনেথ।

“বুঝুন তাহলে।” হালকা হাসে ওপাশে আসিফ।

“ডাটাবেজ...আমাদের ডাটাবেজে অ্যাকসেস পেয়ে গেছেন আপনি!”

নিজের চুল ছিড়ে ফেলতে ইচ্ছে হয় কেনেথ গ্র্যাণ্টের। ছেলের নির্দেশ দেওয়া ছিলো আর্কাইভস রুমটা সিকিউরড রাখার জন্য। একজন ফিউজিটিভ ডিটেক্টিভ যদি মেসনিক লজের মতো প্রটোক্টেড একটা বিন্ডিং থেকে আর্কাইভস খুঁজে বের করে ফেলতে পারে তাহলে নিজেদের নিরাপত্তা আর থাকছে কোথায়? বাংলাদেশে আরও এক হাজার বছরের মাঝে ঘাঁটি বসানোর স্বপ্ন দেখাও এখানে শেষ হয়ে যাবে। একবিংশ শতাব্দীতে এদেশে আর ফিরে আসা সম্ভব হবে না।

এখন পর্যন্ত যেটুকু কাজ ওরা বাংলাদেশে করেছে, তার লগ রাখা হয়েছিলো আর্কাইভসে। বাইরে কোথাও নয়, শুধুমাত্র মেসনিক লজের অফলাইনড কম্পিউটারগুলোতে। আর, একেকটি লগ যথেষ্ট তথ্য সমৃদ্ধ। নিজেরা তো ডুবে যাবেই, বাংলাদেশে যারা এতদিন তাদের সাহায্য করেছিলেন, তারাও ডুবে। ডাটাগুলো অবশ্যই এনক্রিপ্টেড অবস্থায় ছিলো। তবে আসিফের কণ্ঠ শুনে বোঝা যাচ্ছে, দক্ষ কারও সহায়তায় ডিক্রিপ্ট করিয়ে ফেলেছে ওসব।

মনে কথা পড়তে পারলো যেন আসিফ, “সতের বছর বয়স্ক একজন হ্যাকার আছে আমাদের এই ঢাকা শহরে। বিশ্বাস করবেন না, আপনাদের সিকিউরিটি প্রটোকল ভাঙতে ওর সময় লেগেছে মাত্র দেড় ঘণ্টা। সব কিছুই ডিসপ্রেতে দেখতে পাচ্ছি আমরা। আরে আরে-জেনারেল জাহিদ ফরমানের দেখছি পার্সোনাল ন্যায় আছে একটা!”

আসিফের উচ্ছ্বাসের কারণটা খুব ভাল করেই জানেন কেনেথ। ন্যায়গুলো আসিফ আগেই দেখেছে। শুধুমাত্র তাকে চাপ দেওয়ার জন্য এখন বলে যাচ্ছে একে একে।

“চমৎকার। পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেলিম রিজভীও দেখছি আপনাদের একজন, লজ পারমিট পাচ্ছিলেন না যখন, প্রচুর খেটেছেন তিনি! চিফ হুইপের নামও দেখতে পাচ্ছি। ব্যাপার কি? বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর তাওহীদ খানের সাথে যে ইউনুস আলীর গুম রহস্যের একটা কানেকশন দেখা যাচ্ছে! গভর্নর মশাই যখন প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন, তখনই আরও কয়েকটি লজের পারমিশন পাগিয়েছেন দেখি! এগুলোর ব্রু-প্রিন্টই খুঁজছিলো তাহলে ইরফান! আহা-মেগনরা তো দেখছি লোক সুবিধের নয়!” জিভ দিয়ে সমবেদনার শব্দ করলো আসিফ, মোবাইলের অন্যপ্রান্তে।

“ফোন দেওয়ার কারণটা কি জানতে পারি?” থমথমে গলায় বলেন কেনেথ, “আপনার নিশ্চয় একটা প্রস্তাব আছে? টাকার ব্যাপার হলে বলতে পারেন, অ্যামাউন্ট নিয়ে ভাববেন না। ক্ষমতা চান? তাও পাবেন। কেমন লাগবে যদি নিজেকে আর একমাসের মাঝে কমিশনারের চেয়ারে আবিষ্কার করেন?”

শুকনো হাসি দিল আসিফ, “আমি আবার সেকেলে মানুষ, মি. কেনেথ। কেনাবেচার বদলে বিনিময় প্রথায় আমার বিশ্বাস বেশি। ডায়মন্ড ওখানে কখনই ছিলো না, তাই না?”

কেনেথের গলার সুর পাল্টাল না, “সেসব এখন অপ্রাসঙ্গিক আলাপ, মি. আসিফ। তা, বিনিময় প্রথাই চলুক তাহলে। ঈশিতাকে ফিরে পাচ্ছেন আপনি। ডাটাবেজ থেকে যা সরিয়েছেন—তার সবকিছু আমি ফেরত চাই, এখন থেকে এক ঘণ্টার মাঝে। আমাদের দেখা হচ্ছে মহাখালীর টিঅ্যান্ডটির মাঠে।”

সরাসরি আপত্তি জানালো আসিফ, “এক ঘণ্টার মাঝে কেন? তাছাড়া মহাখালী যাওয়ার মতো কিছু ভেতরে অনুভব করছি না এখন।”

“এক ঘণ্টার মাঝেই। চাই না কপি করে আরেক জায়গাতে রেখে দিন আপনি আমাদের ডাটা। তারপর দুনিয়াময় ছড়িয়ে বেড়াবেন আর আমরা আঙুল চুষবো এমনটা ভাববেন না। এক ঘণ্টার মাঝেই দিতে হবে। নতুবা কোন ডিলে আমি আসতে চাই না। রাজি থাকলে আপনাদের দাবি জানাতে পারেন।”

একটু থমকে যায় আসিফ। কিছুক্ষণ চিন্তা করে মাথা দোলায়।

“আপনাদের উদ্বেগের কারণটা আমি বুঝতে পারছি। আমি রাজি থাকতে পারি, তবে আমাদের দাবির সাথে একমত হতে হবে আপনাকেও।”

“শুনছি আমি।” শান্ত কণ্ঠে বলেন কেনেথ গ্র্যান্ট।

“প্রথমত আমার সহকারি ডিটেক্টিভ জিয়া, ইরফানের বোন ঈশিতা আর আমাদের সবার পরিচিত মুখ ডক্টর খানকে ফিরে চাই আমরা। অক্ষত। দ্বিতীয়ত ওদের ডেলিভারি দেবেন আপনি নিজে। চাই না সুইসাইডাল কোন ম্যানিয়াক পাঠিয়ে আমাদের সবাইকে ওপরে তুলে দেন।”

দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার কেনেথ, “আমি নিজে আসতে পারি। তবে, অন্যদের ব্যাপারে... অক্ষত, মানে... যতটুকু অক্ষত আছে তাদের, ততটুকু পেতে পারেন।”

“ওরা বেঁচে আছে কি না—সে ব্যাপারে আমাকে নিশ্চিত হতে হবে। আগে ফোনে তাদের কণ্ঠ শোনাবেন আপনি।”

চুপ হয়ে থাকলেন কেনেথ।

“ঈশিতাকে ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছে হওয়ার কথা না আপনাদের। তবে ভেবে দেখুন, আপনাদের হাতে দুটো অপশন খোলা আছে। এক—আগের প্রার্থনে স্থির থেকে ঈশিতাকে বলি দেওয়া। বিজয়কে মাস্টার মেসনের পদে বসিয়ে মেসনিক লজের হর্তাকর্তা বানানো। আর পরের দিন চোখ মেলে দেখা সার্বভৌমত্বের সব চ্যানেলে প্রচারিত হচ্ছে আপনাদের সুকীর্তির কথা। দলে দলে লোক হানা দেবে আপনাদের সাধের লজ্জে। অর্থাৎ এই অপশন ফলো করে আপনাদের কোন লাভ হচ্ছে না মনে হয়। আর দুই—আমার প্রস্তাব মেনে নেওয়া। বিজয়ের ইপিসিসিমাস স্তরের প্রমোশন আরেকটা মেয়েকে খুঁজে বের করার আগ পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখা। আর আমার হাত থেকে সবগুলো এভিডেন্স নিয়ে যাওয়া। কোনটা আপনাদের জন্য লাভজনক বলে মনে করেন?”



“তিনজনকেই ফিরে পাচ্ছেন আপনারা। এক ঘণ্টার মাঝে মহাখালী চলে আসুন। ভোরের আলো ফোটার আগেই মেয়েটাকে পেয়ে যাবেন। আপনার সহকারি আর বুড়া হাবড়াও থাকছে সেখানে।” ফোনকলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলেন তিনি। পরমুহূর্তে একপাশের দেওয়ালে ছুঁড়ে মারলেন ফোনটা।

পেছনে জিয়াকে ফেলে রেখে ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে, পিছু নেয় এরাশ, “আপনাকে ডেকেছে যেহেতু—এটা একটা ট্র্যাপ হতে পারে।” ফোনের কথাবার্তা শুনেছে একপক্ষেও, আইভান এরাশের দুশ্চিন্তার কারণ বোঝেন কেনেথ।

“ওরা এখন পলাতক আসামি। ওদের কথায় আমাদের দিকে আঙুল তুলবে না কেউ। তাছাড়া, এত সময় তারা পাচ্ছে না। মেসনিক লজ থেকে বের হয়েছে, এর বেশিক্ষণ হয়নি। মাত্র এক ঘণ্টার মাঝে আমাদের বিরুদ্ধে কোন শক্ত পক্ষ দাঁড় করানোর মতো অবস্থান তারা তৈরি করতে পারবে না।”

দ্রুত মাথা ঝাঁকায় এরাশ, “বন্দিদের ছেড়ে দিচ্ছেন ভাল কথা, তাই বলে ডায়মন্ডকে? বিশ্বাসিরা হতদ্যম হয়ে পড়তে পারে, স্যার।”

“কেউ মুক্তি পাচ্ছে না ওখানে। মাঠটার পাঁচশ মিটার দূরে একটা বিল্ডিং আছে।” সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে বললেন কেনেথ, “স্লাইপারকে ফোন করে বল ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির টপফ্লোরে পজিশন নিতে। পারমিট যা লাগে আমি এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি। ঈশিতা বাদে বাকিদের শূট করে ফেলে দেবে ও, মেয়েটাকে আর এভিডেন্স নিয়ে ফিরে আসবো আমরা।”

ঘড়ির স্ক্রিনে ডিজিটগুলো জানাচ্ছে চারটা বাজতে আর মাত্র তিনমিনিট বাকি। কোথাও একটা বোকা কাক ডেকে উঠলো একবার, তারপর সব চুপচাপ। এদিকে বাড়িম্বরের ফাঁকে ফাঁকে গাছপালা ভালই আছে। রাতের অন্ধকারে অদ্ভুত এক ছায়াঙ্কেরা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তারা।

কর্কশ কর্কে একটা প্যাঁচা ডেকে উঠতে দু-হাত পকেটে ঢুকিয়ে কাঁপুনি এড়ালো আসিফ। চাকাতে আজও কিছু প্যাঁচা টিকে গেছে নাকি? আসিফের জানা ছিলো না। অবশ্য শরীরের কাঁপাকাঁপি প্যাঁচার ডাকে হচ্ছে না। ফোনে হাসিমুখে কথা বলেছে প্রয়োজনের দাবিতে। শরীরের অবস্থা মোটেও এই মুহূর্তে ঠাণ্ডা একটা মাঠে দাঁড়িয়ে থাকার মতো নেই। রক্তক্ষরণে প্রচুর দুর্বল হয়ে পড়েছে ও, তাছাড়া আরও ব্যাপার আছে।

শরীরের ভেতর থেকে বুলেট বের করার মতো সময় ও পায়নি। সাদামের ক্লিনিকে গিয়ে জিয়া আর ডক্টরের অনুপস্থিতি দেখে রিসেপশনিস্ট মেয়েটার জবানবন্দি নিয়েছিলো ওরা। বুঝতে বাকি থাকেনি, ওদের দু-জনকে আটকে ফেলেছে চক্রের লোকজন। দ্রুত সেখান থেকে বের হয়ে তরুণ হ্যাকার কিশোর পারভেজের সাথে যোগাযোগ করেছিলো আসিফ। লজ থেকে পাওয়া ড্রাইভের প্রটোকল ভেঙেছে সে ছেনেই। চক্রের বিরুদ্ধে তার পাশে দাঁড়ানোর মতো একজনকেই সাথে পেয়েছে-ইরফানকে। কথাটা এভাবেও বলা যায়, জিয়া আর ডক্টর খানকে উদ্ধার করার মতো ওরা ছাড়া এখন আর কেউ নেই। কাজেই শারীরিক যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করতে হয়েছে ওকে। আরেকজনের থাকার কথা ছিলো, তবে ইরফানের চোখের আড়াল পেতেই তাকে ভিন্ন কোথাও আটকে ফেলেছে আসিফ। নিজস্ব পরিকল্পনা ধরে এগিয়েছে সে। বিশ্বাসের সুযোগ নেই, সাথে সাথেই মিথরাস লজের আরএসএসকে ফোন দিতে বাধ্য হয়েছে আসিফ।

হাতঘড়িটা আবেকবার দেখলো ও, সময় বলছে কেনেখ গ্র্যান্টের দেওয়া সময়সীমা শেষ হয়ে গেছে। নির্ধারিত সময়ের পনের মিনিট আগেই শেষে গেছিলো আসিফ। এটা ওর জন্যেই সুযোগ। গড়বড় করা যাবে না কোনকিছু। রাত তিনটার চাকার রাষ্ট্র একেবারেই খালি ছিলো বলে রক্ষে। সময় বেশি লাগানি এখানে পৌছতে।

দূরে হেডলাইটের আলো দেখতে পেয়ে নিজের টার্মিনাল দশার দিকে নজর দিল আসিফ। কয়েক সেকেন্ডের মাঝেই চেহারা থেকে শ্বাস ধরনের যন্ত্রণার ছাপ সরিয়ে ফেললো। কেনেখ গ্র্যান্টের মতো লোককে নেগোশিয়েসনের কোন সুযোগ দেওয়া যাবে না। যাদের নিয়ে ফিরে যাওয়ার কথা তাদের একজনও অনুপস্থিত থাকলে ড্রাইভগুলোর একটাও দেওয়া হবে না তাকে।

গাড়িটা টিঅ্যাভটির শান্ত এলাকাতে মৃদু গুঞ্জন তুলে এগিয়ে এলো। একটা ভ্যান।  
আন্তে করে মাঠের এক পাশে থেমে গেলো ওটা। কেউ নেমে এলো না ভেতর থেকে।  
আসিফের এগিয়ে আসার অপেক্ষা করছে যেন।

ধীরে ধীরে নড়ে ওঠে আসিফ। গাড়ির দিকে শান্ত পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। খুট-খাট  
শব্দ করে দরজাগুলো খুলে যায়। ধীর পায়ে বের হয়ে আসলেন কেনেথ গ্র্যান্ট, ওটো  
লজের প্রধান। মানুষটা কি চক্রকে নিয়ন্ত্রণ করছে? আসিফের এই প্রশ্নের উত্তর জানা  
নেই।

“এ পর্যন্ত আসতে পেরেছেন যখন, বোঝাই যাচ্ছে সহকারিকে একটু বেশিই  
ভালবাসেন।” তেলতেলে একটা হাসি ফুটিয়ে বললেন কেনেথ, মানুষটার চেহারার  
সাথে হাসিটা একেবারেই গেলো না, “তারপর বলুন-মিথরাস লজে রেইড দিয়ে কি  
পেলেন?”

মাথা নিচু হয়ে গেছে আসিফের, “ভালোমতই জায়গাটা ক্লিন করেছিলেন আপনি,  
কিছু পাওয়া যায়নি ওখানে। এসব নিয়ে এখন কথা বলার কোন যুক্তি দেখি না।  
আমাদের বিনিময় প্রথার ব্যাপারে কথা চলতে পারে। এক্সকিউজ মি, উড ইউ  
মাইন্ড—”

আসিফের হাতে বের হয়ে আসা সিগারেটটার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন  
কেনেথ, নিজেও একটা দামি সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। লাইটার বের করে  
আগুন এগিয়ে দিলেন আসিফের দিকে। অর্ডো টেম্পলি ওরিয়েন্টিসে রেইড দিয়ে  
একজন মানুষকেও খুঁজে পায়নি র‍্যাভ। একটা অবৈধ ডকুমেন্ট অথবা দ্রব্য পর্যন্ত না।  
কিছু প্রাচীন আর্টিফ্যাক্ট আছে ওখানে। প্রাচীন মিশরিয় মূর্তিগুলো লিগালি কেনা আছে  
অর্ডো টেম্পলি ওরিয়েন্টেশের জন্য। তবে ওটা শুধুই ডাইভারশনের জন্য অ্যারেঞ্জ  
করেছিলো আসিফ। সেটা কেনেথ জানেন না। তিনি স্বস্তির সাথে একরাশ ধোঁয়া  
ছাড়লেন।

“ট্রেড করতে চেয়েছিলেন, আমাকে সশরীরে আসতে বলেছিলেন। সবই আমি  
মেনে চলেছি। তবে আপনি মেনেছেন বলে মনে হয় না। আমার ড্রাইভগুলো  
কোথায়?” কুঁতকুঁতে চোখ মেলে আসিফের মুখের দিকে সরাসরি তাকালেন কেনেথ।

চারপাশে তাকায় আসিফও, “তাই তো-আপনার ড্রাইভ কোথায়?” আবার ঘুরে  
তাকালো কেনেথের দিকে, যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এভাবে বলল, “আমার  
অ্যাসিস্ট্যান্ট, আপনাদের ডায়মন্ড আর ডক্টর খান-তারাও তো নেই দেখছি। কি  
ভেবেছিলেন? আপনার ড্রাইভ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব, আর এখানে আমার কপালে  
একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিয়ে সবকিছু নিয়ে কেটে পড়বেন?”

বুক ভরে ধোঁয়া টানল আসিফ। তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন কেনেথ,  
“আপনাকে আগেই বলেছিলাম-কপিজনিত কোন রিস্ক আমি নেবো না। এখানে আপনি  
কথা বলে সময়ক্ষেপন করছেন। আর খুব কাছেই হয়তো ড্রাইভ কপি করা হচ্ছে,  
তাই না?”

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মুচকি হাসলো আসিফ, “মোটোও না। ড্রাইভ যখন ফেরত পাবেন তখন তার অবস্থানও দেখতে পারবেন। তখন এটাও নিশ্চিত হতে পারবেন, কপি করার ইচ্ছে আমাদের নেই। যাদের নিয়ে আসার কথা ছিলো আপনার, তাদের চেহারা দেখান। ড্রাইভের চেহারাও আমরা দেখাবো। অতর্কিতে ড্রাইভার ব্যাটা গুলি করবে, সেটা মেনে নেওয়া আমার জন্য আবার একটু কঠিন।”

এদিক ওদিক তাকালেন কেনেথ, “তাই তো। ইরফানকে দেখছি না যে কোথাও, ঘাপটি মেরে পড়ে থাকার কাজটা তাকেই দিয়েছেন মনে হচ্ছে। পরিচিত হওয়ার ইচ্ছে ছিলো তার সাথে। টাফ গাই। এবং ভাল মানের একজন চোর।”

ঘাড় বাঁকা করে তাকায় আসিফ, “চোর?”

ধোঁয়াতে নিজেকে ডুবিয়ে ফেলেন কেনেথ, “মিথরাস লজে আমার শ্যালক এসে ঢোকেনি সেদিন ড্রাইভ সরাতে।”

“আপনি মূলত হিব্রুভাষি, সেজন্য সমস্যা হচ্ছে মনে হয়। বাংলাতে সাধারণত আমরা ‘শালা’ই বলে থাকি।” মন্তব্য করে আসিফ।

“ভাবছেন, মিথরাস লজের ড্রাইভগুলো চেয়ে বসিনি কেন?” নিজে থেকেই বললেন কেনেথ, “কারণ ওগুলোর ফিজিক্যাল বা ইন্টারনাল ভ্যালু দেখি না। খোলামেলা একটা লজের মাঝে থাকা কম্পিউটার ক্র্যাক করলে কিছু পাবে, এমনটা মনে করাটা ইরফানের জন্য ভুল ছিলো।”

“মেসনিক লজের হার্ডড্রাইভে ডাটা রাখাটা ছিলো আপনাদেরও ভুল।” পাল্টা খোঁচা দিল আসিফ, “না-হলে আজকে এখানে আপনাকে আসা লাগত না আর।”

“কাম অন-মেসনিক লজের ব্যাপারে কারও জানার কথা ছিলো না। হেডকোয়ার্টারে ডাটাবেজ থাকবেই। ডাটাবেজ সংরক্ষণের জন্য আমাদের ভুল হয়নি। হারিয়েছি; সেটা আমাদের সিকিউরিটি সিস্টেমের ব্যর্থতা।”

“এর আগে কোন অনুপ্রবেশকারি মনে হয় নার্ভ গ্যাস এড়িয়ে যেতে পারেনি?” সিগারেটের আগুনটা পর্যবেক্ষণ করতে করতে বলল আসিফ।

“এর আগে কেউ ঢুকতেই পারেনি লজে। এদেশের কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি তাদের পার্লামেন্ট বিল্ডিংয়ের বেজমেন্টে এমন কিছু সিক্রেট চেম্বার থাকতে পারে।”

“লুই আই কান একদম ফ্রিতে কেন কাজ করে দিয়েছেন, সেটা এখন স্পষ্ট।” ঠোঁটে সিগারেটটা আটকে হালকা বিকৃত কণ্ঠে বলল আসিফ।

“একদম ফ্রিতে না। তবে তাকে পুরো টাকাটা পরিশোধ করেনি তোমাদের সরকার। এজন্যই মেসনদের শাসনের দরকার আছে। আমাদের ওয়ার্ল্ড অর্ডার অনুযায়ী কোথাও কোন দুর্নীতি থাকবে না। দেশগুলোসহ পুরো পৃথিবীটাই এগিয়ে যাবে সমৃদ্ধির দিকে।”

আস্তে করে পায়ের ভর আরেক পায়ে সরিয়ে কাছের মসজিদটার দিকে তাকালো আসিফ। আরেকটু পর ফজরের নামাজের মুসল্লিরা চলে আসতে শুরু করবে। কেনেথের দিকে সরাসরি ঘুরে দাঁড়ালো এবার।

“আপনার মেসনিক লেকচার আর কারও জন্য তুলে রাখুন প্লিজ। ওরা কোথায়? আমাদের হাতে বেশি সময় নেই।”

“আমার ড্রাইভ?” দৃঢ় গলায় বলেন কেনেথ।

“চেহারা দেখালেই আমি ছোঁ মেরে কেড়ে নিচ্ছি না আস্ত তিনজন মানুষকে।” তিন্ত কণ্ঠে বলল আসিফ, “কাজেই তারা যদি গাড়ির ভেতরে থেকে থাকে, আমাকে কনভিন্স করুন ওরা বেঁচে আছে।”

দুই সেকেন্ড ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন তিনি আসিফের দিকে। তারপর নিচু গলায় বললেন, “নিয়ে এসো ওদের।”

ভ্যানের দরজা খুলে গেলো সাথে সাথে, কেনেথের কলারে মাইক্রোফোনের উপস্থিতি সম্পর্কে আসিফ একেবারে নিশ্চিত হয়ে গেলো এবার। লাফিয়ে নেমে আসল যে মানুষটা—তাকে দেখেই চিনল আসিফ। এফবিআই এজেন্ট অ্যাডামস। চকচকে পিস্তলটা হাতেই আছে, নলটা সরাসরি তাকিয়ে আছে আসিফের দিকে। তার পাশেই তিনজন বন্দির পেছনে দাঁড়িয়ে আছে পঞ্চম আরেকজন। তাকে দেখে চওড়া হাসি ফুটল আসিফের মুখে।

“ফরহাদ ভাই যে! ডক্টর খান বেশ কয়েক বছর ধরে মেসনদের নিয়ে লেগেছেন। তার ওপর চোখ রাখার জন্য কাউকে তো লাগে! লিস্টে ডক্টরের নাম তুলে ফেলেছ কয়েক বছর আগেই, অ্যা?”

“কথা না বলে ড্রাইভগুলো দেখান,” হিস হিস করে ওঠেন কেনেথ।

“চমৎকার একটা আলাপ জমাচ্ছি, তাড়া কিসের?” কেনেথের দিকে তাকিয়ে এটুকু বলে আবার ফরহাদের দিকে ঘুরল আসিফ, “মি. ফরহাদ, ডক্টর খানের আদেশ তো শুনেছিলেন। ‘চুরি’ করে ঢুকেছিলেন ডক্টর তানভীর জালালের ল্যাবে। কেন?”

“ছোট টিকিটিকটাকে গুলি কর, ফরহাদ।” চট করে হুকুম দেন কেনেথ।

“থামুন।” দ্রুত বলে আসিফ, “ড্রাইভগুলো আছে বেড়াটার ওপাশে।” বাড়িগুলো কাছেই। তাদের সামনের গাছগুলোকে বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। সেদিকে ইঙ্গিত করলো আসিফ, “কষ্ট করে নিয়ে আসুন, প্লিজ।”

অ্যাডামসকে ব্যাপারটা জানাতে সেদিকে এগিয়ে গেলো লোকটাকে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ড্রাইভ ভর্তি কেইস হাতে নিয়ে বের হয়ে আসল মোটরকার হাসি দিলেন কেনেথ গ্র্যান্ট। “জানতে চেয়েছেন যখন, ডিটেক্টিভকে বলে দাও ফরহাদ, ঠিক কি করেছিলে তুমি।”

অস্বস্তিতে পড়ে গেছে ফরহাদ, চুরির জন্য গর্বিত মনে হচ্ছে না তাকে। তবুও উত্তর দিতে দেরি করলো না, “ডক্টর জালালের বাসায় হানা দেওয়ার নাটকটা করেছিলাম যাতে একটা ডায়েরি ডক্টর খানের নামে থাকে। ইচ্ছে করেই ক্যামেরায় নিজেকে আটকে ফেলেছিলাম। ডক্টর খান এতে দমে যাবেন ভাবলেও, তিনি অবশ্য দমেননি।”

“বিশ্বাসঘাতক!” হিস হিস করে বলেন ডক্টর খান পাশ থেকে।

তাদের দিকে একবার করে তাকায় আসিফ। ডক্টর ভালই আছেন। এক ধরনের ঘোরে আছে ঈশিতা। চমৎকার চুলগুলো কাঁধের আশেপাশে বিন্যস্ত হয়ে আছে। সাধারণ একটা সাদা জামা পরিয়ে রাখা হয়েছে তাকে। সন্যাসিনীদের মতো দেখাচ্ছে তাকে। তবে শারীরিকভাবে একেবারে ফিট সে। সম্ভবত এখনও মেসনদের দীক্ষায় দীক্ষিত।

জিয়া দাঁড়িয়ে আছে হালকা কুঁজো হয়ে। ভাল করে তার দিকে তাকাতেই শরীর জুড়ে রাগের একটা হক্কা টের পায় আসিফ। ছেলেটার পায়ের ব্যাভেজ রঙে ভিজে লাল হয়ে আছে। ব্যালাগ করতে সমস্যা হচ্ছে তার। এজন্যই দাঁড়িয়ে থাকার মাঝে হালকা অস্বাভাবিকতা। তবে দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণাটা সহ্য করে নিচ্ছে তরুণ গোয়েন্দা।

“তাহলে, মি. কেনেথ, একটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন। এসব বুজরুকির অর্থ কি? শয়তানে পূজো আর ভবিষ্যতে দাজ্জাল নামক একচোখা কেউ আসতে যাচ্ছে, এসব খিওরিতে কি আপনাদের বিশ্বাস সত্যিকারের?”

ঘাড় নাড়ালেন কেনেথ, “বিশ্বাসটাই মোটিভেশন। সুইসাইডাল অ্যাটাক করে টেররিস্টরা। সেটা আসে একটা বিশ্বাস থেকে। টেররিস্টদের সাথে কাউন্টার-টেররিস্ট ফোর্সও সহজে পেরে ওঠে না কেন জানেন? তারা বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে চলে না। শৃঙ্খলা তাদের মূলমন্ত্র। আর যতদিন পর্যন্ত জীবনভর চলার মতো একটা বিশ্বাস আপনার না থাকছে, শৃঙ্খলা-শিক্ষা এসব বিষয় ততটা ইফেক্টিভ না।”

“তারমানে কোনকিছুর বিশ্বাস আপনাদের নেই সেভাবে। অথচ মোটিভেশন পাওয়ার জন্য বিশ্বাসটুকু ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে নিম্নস্তরের সদস্যদের মাঝে?” সন্দিহান কণ্ঠে জানতে চায় আসিফ।

“তা কেন? আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস আছে শয়তানের প্রতি। অল্পবয়সে এত জ্ঞান অর্জন করাটা মানুষের পক্ষে সম্ভব না। শয়তানের সাহায্য আমাদের লাগেই। তাকে ভক্তি করি আমরা, শ্রদ্ধা করি। তবে মেসনিক লজের প্রধান হতে হলে বিজয়কে একারণেই ইপসিসিমাস ধাপে উঠতে হবে, এমনটা নয়।”

“তাহলে?”

“ইপসিসিমাসে ওঠা সহজ কোন কাজ নয়। সারাজীবন সাধনা করেও অনেকে উঠতে পারেন না সেখানে। পিচ্চি ছেলেটা যখন এত অল্প বয়সে ওই পর্যায়ে নিজের যোগ্যতাতে যেতে পেরেছে, তার ওপর আমরা ভরসা করতে পারি। এটা একটা টেস্ট বলে ধরে নিতে পারেন আপনি। পাশাপাশি প্রভুর সরাসরি অনুগ্রহও সে পাবে। তার জন্য সর্বোচ্চে স্তরে ওঠার সাধনা হলো কঠিন ট্রেনিংয়ের মতো। তার সফলতা অথবা ব্যর্থতার ওপর নির্ভর করে আমরা বুঝতে পারবো, সে পণ্ডিত হয়েছে কী না।”

“বুঝলাম। তাহলে, একেবারে বাধ্যতামূলক কিছু না ওটা। তবে এই মুহূর্তে বিজয়ের চেয়ে ভাল ক্যামিভেট আপনাদের হাতে নেই, সেটাই ফ্যাক্ট। প্যানটা নিশ্চয় ভবিষ্যতের জন্য? ২০৩০ অথবা ২০৪০ সালের দিকে বাংলাদেশ অধিকার করবেন আপনারা পুরোপুরিভাবে?” অনুমান করলো আসিফ।

“২০৩২ ছিলো প্ল্যান। তবে এখন আর নেই। যত দ্রুত সম্ভব অ্যাকশনে যাচ্ছি আমরা। বিজয়কে নিয়ে হোক অথবা তাকে ছাড়া। মিথরাস লজ নিয়ে মানুষের আত্মহটা ঠিক সুবিধের দিকে নয়। প্রজেক্ট ফেইলড। পেছনে একমাত্র কারণ আপনি, মি. আসিফ। আপনিই ওদিকে ফোকাস নিয়ে গেছেন অনেকের। যে বুদবুদ তুলেছেন তা স্তিমিত হওয়ার আগে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। মেসনিক লজের অবস্থানও আর গোপন থাকবে না মনে হচ্ছে।”

না শোনার ভান করলো আসিফ, “ওসি গৌরব তো সম্ভবত আপনাদের পকেটেই।”

“ফিফথ ডিগ্রিতে আছে সে। তবে ভেতরের অনেকেই জানে না বিষয়টা।”

কেনেথের এ কথাটি আসিফের কানে আটকাল। একটু বেশিই তথ্য দিচ্ছেন না তিনি? এর অর্থ একটাই হতে পারে! এসব তথ্য কাউকে বলার জন্য বেঁচে থাকবে না ও। শিরশির করে ওঠে আসিফের মেরুদণ্ড। তবে কথা চালিয়ে গেলো সে, “আর আপনি টেনথ ডিগ্রিতে। আরএসএস তথা রেক্স সামাস স্যাংকটিসিমাশ হলো মিথরাইক টেনথ ডিগ্রি।” সিগারেটে আরেকটা টান দেয় আসিফ, “ডানা বাতশিভা মারা যাওয়ার আগে লিখেছিলো XO। বুঝতে আমার দেরি হয়েছে, তবে মেয়েটির মৃত্যুর জন্য আপনিই দায়ি। আসলে, সে লিখেছিলো X<sup>0</sup>।”

ঠাণ্ডা একটা হাসি হাসলেন কেনেথ, “আপনি ব্রিলিয়ান্ট। যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়েও বেশি। রিক্রুট করতে পারলে সম্মানিত বোধ করতাম নিজেকে। তবে আমার মনে হয় সে সুযোগ আপনি আমাদের দেবেন না। ডানার ব্যাপারে ধারণাটা একান্তই আপনার। আর ওটা আপনার সাথে কবরেই যাচ্ছে।”

মুখটা একটু নামিয়ে আনেন তিনি, শোনা যায় কি যায় না এভাবে বললেন, “শ্যুট দেম।”

কাঁপতে থাকা জিয়া বিস্ফোরিত চোখে দেখতে পেল ঘুরে যাচ্ছেন কেনেথ গ্র্যান্ট। একই সাথে রক্তের ছটা ছিটকে এসে জিয়ার মুখের একাংশ ভিজিয়ে দেয়। পৃথিবী হয়ে এসেছে ওর, তার মাঝেই আরেকটা দৃশ্য দেখে রক্ত হিম হয়ে গেলো জিয়ার।

পড়ে গেছে আসিফ।

BanglaBook.org

এক ধাক্কা দিয়ে মেইনটেনেন্স ডোর খুলে ফেলেছে ইরফান। ছাদের মেঝেতে বিছানো আছে কম্বল। তার ওপর থেকে বিদ্যুৎবেগে উঠে আসল ক্ষীণদেহী একজন মানুষ। চোখের পলকে ছোট একটা পিস্তল বের করে ফেলেছে সে। সাইলেন্সারযুক্ত গুলিটাকে বার দুই ব্যবহার করলো ইরফান, প্রতিপক্ষের হাত থেকে ছিটকে ছোট পিস্তলটা দূরে চলে গেলো। শত্রুপক্ষের স্লাইপার এতে দমে গেলো না, আবারও এগিয়ে আসতে চলেছে সে।

এক নজরে অবস্থানটা বুঝে নিলো ইরফান। টিঅ্যান্ডটি ফিল্ডের মাত্র সাড়ে পাঁচশ মিটার দূরে আকাশ ছোঁয়ার প্রচেষ্টায় দাঁড়িয়ে আছে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি। বিল্ডিংটার ছাদ থেকে ভাল মানের একজন স্লাইপার অনায়াসে মাঠের নাগাল পেতে পারবে। তবে পুরো মাঠ কোন স্লাইপার কাভার করতে পারবে না। প্রতিবন্ধকতা আছে। নিচে শত্রুদের একেবারে ঠিক জায়গায় দাঁড় করানোর দায়িত্ব নিশ্চয় কেনেথ গ্র্যান্টের। ইরফান এটাকে সম্ভাবনা হিসেবে দেখেছিলো, তবে আসিফ ছিলো নিঃসংশয়। আগেও স্লাইপার অ্যাটাক হয়েছে, তার বিশ্বাস ছিলো আরও একবার হবে আজ রাতে।

এই মুহূর্তে ওর সমস্যা অবশ্য কেনেথ নন। স্ক্যাপা যাঁড়ের মতো ছুটে আসছে স্লাইপার। হাত থেকে পিস্তল পড়ে যাওয়ার কারণে সামান্যতম বিচলিতও নয়, ছোট একটা ছুরি কোথা থেকে যেন বের করে ফেলেছে।

ইরফান এ দফায় গুলি করার চেষ্টা করলো না। জিঘাংসায় নাক কুচকে রাখা শত্রুর ছুরির আঘাতটুকু পিস্তলের নলের ওপরে নিয়ে নেয়। হালকা নিম্নমুখি করে পিস্তল ধরে থাকার কারণে আঘাতটা পেছলে চলে গেলো বাইরের দিকে। সাথে সাথেই এক পা এগিয়ে এসে মানুষটার পেটে একটা ভয়ানক ঘুসি বসিয়ে দেয় ও।

সুন্দর চুলগুলো নাচিয়ে গুঙ্গিয়ে উঠেছে স্লাইপার মেয়েটা, এক পা পিছিয়ে এসে বাতাসে বৃণচাপ কেটে পা চালান ইরফান। লক্ষ্য-মেয়েটির চোয়াল। তবে ব্যাপারটা আগেই বুঝে গেলো প্রতিপক্ষ, কমব্যাট ট্রেনিং এই মেয়ের ভালই আছে। ঝুপ করে বসে পড়ে ইরফানের পা লক্ষ্য করে নিচ দিয়ে পা চালান সে।

ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাচ্ছে ইরফান, তার মাঝেই দেখতে পেল মেয়েটি ছুরি নিয়ে আরও একবার বুকের ওপর লাফিয়ে পড়ার সুযোগ খুঁজছে। দড়াম করে ছাদের মেঝেতে পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে সে আর দেরি করলো না। নিমেষে খুব কাছে চলে এসেছে, লক্ষ্য এবার ইরফানের গলা। এক পৌঁছে দুই টুকরো করে দিতে চাচ্ছে ওটাকে।

মেঝেতে শক্ত একটা ধাক্কা দিয়ে ইরফান নিজের ডান দিকে গড়িয়ে যায়। অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দেয় মেয়েটাকে। একই সাথে খেয়াল করলো চালিয়ে দেওয়া



ছুরিটা লক্ষ্যকে খুঁজে না পাওয়ায় আততায়ী হতাশ হয়নি। বরং ছয় ফিট দূরে পড়ে থাকা পিস্তলটার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে এই মুহূর্তে।

জিনিচটাকে চিনতে পারে ইরফান। নিজেরই গ্লুক-২৩ ওটা। ভারসাম্য হারানোর সময় হাত থেকে ছুটে গেছিলো খুব সম্ভব! এই মুহূর্তে মেয়েটি থেকে ছয় ফিট দূরে বটে পিস্তলটা, ইরফান থেকে ওটার দূরত্ব কম করে হলেও দশ ফিট। উল্টো দিকে গড়িয়ে যাওয়াতে প্রাণ বেঁচেছিলো একটু আগে, এখন সেটাকে একেবারেই সাময়িক সমাধান বলে মনে হতে থাকে ওর। মেয়েটা পিস্তলের নাগাল পেয়ে গেছে।

মেয়েটির চেহারাটা খুবই সুন্দর। তবে এই মুহূর্তে কমনীয়তা বলে কিছু নেই সেখানে। জিঘাংসা বিকৃত করে দিয়েছে ওটা। জঘন্য সুন্দর মুখটা ফিরে তাকিয়েছে ইরফানের দিকে। সেই সাথে তুলে ধরছে ওর নিজেরই পিস্তল। বাঁকা হয়ে গেলো ও। হাতের আঙুলগুলো পায়ের কাছে হাতড়াচ্ছে। নিজের বাম গোড়ালির নাগাল পেতেই বিদ্যুত খেলে যায় ওর শরীরে।

গলার মাঝে বিঁধে যাওয়া থ্রোইং নাইফটা অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে দেখার চেষ্টা করলো মেয়েটি। দু-বার। পর্যাণ্ড অ্যাঙ্গেল পাচ্ছে না, বৃথাই চেষ্টা করছে। পিচকিরির মতো ছুরিটার ফাঁক দিয়ে রক্ত ছিটকে পড়ছে, সেটা পেরিয়ে ছুটে আসতে দেখলো ইরফানকে। কোনরকম দ্বিধা না করে শূন্যে শরীর ভাসিয়ে দিয়েছে ছেলোটো, জুতোর ডগা স্পর্শ করেছে গঁথে থাকা ছুরিটা। শরীরের ভর এবং তার ছুটে আসা বেগের ফলে যে ভরবেগ উৎপন্ন হলো তাতে স্রেফ দু টুকরো হয়ে যায় তরুণির মাথা।

আরেকবার মাটিতে আছড়ে পড়ল ইরফান। পিঠের ক্ষতটি থেকে নতুন করে রক্তপাত শুরু হয়েছে, টের পেল। আলাদা হয়ে যাওয়া মাথাটার পাশে আছড়ে পড়ে ওর নিজের মাথাও। মৃত্যুর সাথে সাথে আবার নিজের কমনীয়তা ফিরে পেয়েছে মেয়েটি। বিষণ্ণ একটা দৃষ্টি লেগে আছে খোলা চোখদুটোতে। এক আঙুল দিয়ে ওদুটো বন্ধ করে দিল ইরফান।

“গুডবাই, ডানা বাতশিভা।” আন্তে করে মেয়েটার কান থেকে ইয়ারসেটটা খুলে নিতে নিতে বলল ও।

\*\*\*

ফরহাদের চেহারার অর্ধেকটা উড়ে যেতেই আসিফ মাটির দিকে ঝাঁপ দিয়েছে। হিপ হোলস্টার থেকে নিমেষে নিজের পিস্তলটা বের করে ফেলেছে ও। এজেন্ট অ্যাডামসও নিজের পিস্তল ড্র করেছে, একটামাত্র গুলি করলো আসিফ। বিকট শব্দ হলো গুলির।

লোকটার চোখ দুটো কপালের দিকে উঠে গেলো, জিয়ার মনে হলো কপালের তৃতীয় চোখটার সাথে তারা একাত্মতা ঘোষণার চেষ্টা করছে এই মুহূর্তে। তারপর প্রাণহীন দেহটা সশব্দে মাটিতে আছড়ে পড়ে।

নিজের জায়গাতে জমে গেছেন কেনেথ গ্র্যান্ট। তার দিকে স্থির করে নিজের

পিস্তলটা ধরে রাখলো আসিফ। অন্যহাতে মোবাইলটা বের করে ফেলেছে। ওর কাছে থাকা ইয়ারসেটগুলোর রেঞ্জ ছিলো তিনশ মিটার। এখান থেকে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির বিল্ডিংটার দূরত্ব এত অল্প না। মোবাইল ছাড়া গতি নেই। সেই সাথে একগাদা নির্দেশ দিল বাকিদের।

“জিয়া, ড্রাইভগুলো সরিয়ে ফেলো। ডক্টর, লাইন অব ফায়ারে পড়বেন না। দূরত্ব বজায় রাখুন এই নরকের কীট থেকে। ঈশিতা, নাইস টু মিট ইউ।” খেয়াল হয় ওপাশে ইরফান ফোনকলটা রিসিভ করে ফেলেছে, “ইরফান, নেমে এসো। এদিকে সব কিছু নিয়ন্ত্রণে আছে এখন।”

ফোনের ওপাশ থেকে ইরফানের ভারি গলাটা শোনা যায়, “দেখতে পাচ্ছি। ঈশিতাকে বের করে আনার ক্ষেত্রে তোমার সাহায্যের কথা আমার মনে থাকবে, আসিফ।” দীর্ঘশ্বাস ফেললো ইরফান ছোট করে, “তবে এটাই আমাদের শেষ যোগাযোগ হচ্ছে। নেমে এসে দেখা করতে পারবো না আমি। কারণটা তোমার জানা আছে।”

ওপাশে ফোনটা আচমকা কেটে গেলো। বিভ্রান্তের মতো কান থেকে নামিয়ে এনে ওটার দিকে তাকিয়ে থাকে ও। ছেলেটাকে দোষ দিতে পারলো না। এখানে একা আসেনি আসিফ। সৈকত ছেলেটা তার সাথেই ছিলো। এই মুহূর্তে দূরে পার্ক করে রাখা গাড়িটার ট্রাংকের ভেতর আটকে আছে সে। দু-হাতে লাগানো আছে হ্যান্ডব্রেক।

ইরফান যথেষ্ট স্মার্ট ক্রিমিনাল, স্লাইপার স্কোপে সৈকতকে না দেখেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছে ও। নেমে আসার পর তার সাথে কোলাকুলিতে মেতে উঠবে না আসিফ, সেটা তার জানা হয়ে গেছে। নিজের পরিণতি সৈকতের মতো দেখতে চাবে না ইরফান, সেটাই স্বাভাবিক।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কোমর থেকে হাতকড়া বের করে আনলো আসিফ। যেটা সে করেছে তা তাকে করতেই হতো। সৈকত ছেলেটা ক্লাস নাইনের একটি মেয়েকে খুন করেছে। ভিক্টিম মেসন হোক অথবা না হোক, বেআইনি খুনের শাস্তি তাকে পেতে হত। আইনের লোক হিসেবে সেটা এড়িয়ে যেতে পারে না আসিফ। একবার তার জীবন রক্ষা করেছে সৈকত, তারপরও সে এড়িয়ে যেতে পারে না।

জিয়ার দিকে ছুঁড়ে দেয় ও হাতকড়াটা, “মি. কেনেথ গ্র্যান্টকে আটকে ফেলো, প্লিজ।”

লোকটা আসিফের হাতের পিস্তলটা অগ্রাহ্য করে ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এখনও। ধীর পায়ে তার দিকে এগিয়ে গেলো আসিফ। মাত্র দুই ফিট দূরে এসে থেমে গেছে। জিয়ার হাতের কাজ ততক্ষণে একটা ছোট ক্লিক শব্দের সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়। লোকটার চোখের দিকে তাকিয়েই পরের বাক্যটা উচ্চারণ করলো আসিফ।

“নাকি আপনাকে রিয়াজুল করিম বলে ডাকলে বেশি খুশি হতেন?”

“এটা কিভাবে সম্ভব হলো?” হিটলার টেবিলে রীতিমত থাবড়ে উঠলেন এবার।

মুচকি হাসতে গিয়েও চেপে যায় মেডিকেল এক্সামিনার তোফায়েল। ‘বিগ বস’-এর এই উত্তেজিত চেহারা সে আগে কখনও দেখেনি। সব সময় হাসিমুখে থাকেন যে মানুষটি, তার মাঝে এরকম ছেলেমানুষি উত্তেজনা দেখে থেকে থেকে কেন জানি হাসি পাচ্ছে তার।

সাতটি দিন পার হয়ে গেছে ওদের অভিযানের। সাতদিনের মাঝে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। হাতে থাকা সব তথ্য নিয়ে সেরাতে ডিটেক্টিভ রেজার মতো মিডিয়ার কাছে ছোটেনি আসিফ। হানা দিয়েছিলো কমিশনার শাহেদ জামানের বাড়িতে। রাত বিরেতে অস্ত্রসমেত আসিফকে দেখে প্রথমে ক্ষেপে উঠেছিলেন তিনি। তারপর সঙ্গি হিসেবে তিন আঙুল কাটা জিয়া, বিধ্বস্ত ডক্টর খান আর সব ঝামেলার কেন্দ্রবিন্দু ঈশিতাকে দেখে তার উত্তেজনা সীমা ছাড়িয়ে গেছিলো। চোখ কপালে উঠে যেতেই বাকি ছিলো, যখন জেনেছিলেন ট্রাংকে করে আসিফ তার দ্বিতীয় কেসের প্রধান আসামি সৈকত আর প্রথম কেসের নাটের গুরু রিয়াজুল করিমকেও ধরে নিয়ে এসেছে!

তাকে সব খুলে বলেছিলো ওরা। কিভাবে মেসন আর মিথরাসরা এগিয়ে এসেছে দেশটার সর্বময় নিয়ন্ত্রণ হাতে তুলে নেওয়ার জন্য-গুরু থেকে বুঝিয়ে বলেছিলো তাকে। শুনেই এর বিরোধিতা করেছিলেন তিনি। দেশটাকে আর যার হাতেই তুলে দেওয়া যাক, একদল ধর্মান্ত ফ্যানাটিকের হাতে দেওয়া যায় না। ওখান থেকে জেনারেল রাফসান স্বপ্নীল আর জেনারেল সাখাওয়াত তানিমের সাথে যোগাযোগ করেন তিনি। জেনারেল জাহিদ ফরমানের পুরো ষড়যন্ত্রটা উন্মোচন করে দেওয়ার জন্য একটা গোপন মিটিংয়ের জন্য জোরালো আবেদন জানান।

হার্ডড্রাইভ থেকে যাদের নাম পেয়েছে ওরা-এ দু-জন তাদের মাঝে ছিলেন না। জাহিদ ফরমানের সিনিয়র দু-জন জেনারেল তারা, তাদের টপকে চিফ অব আর্মি স্টাফ হয়েছিলেন জাহিদ। কাজেই দ্বিধাহীনভাবে তাদের বিশ্বাস করেছে আসিফ। ভোর হয়ে গেছিলো ততক্ষণে। সকাল আটটাতে আর্মির দু-জন জেনারেলের সাথে রুদ্ধদ্বার একটা বৈঠক করেন শাহেদ জামান, নিজের বাসাতেই উপস্থিত ছিলো সেখানে আসিফ, জিয়া আর ডক্টর খানও। ঈশিতা তখন মিসেস জামানের তত্ত্বাবধায়নে।

পরিকল্পনা করতে সময় নিলেন, তবে বাস্তবায়নে মোটেও দেরি করলেন না জেনারেল রাফসান আর জেনারেল সাখাওয়াত। প্রথমই নিজস্ব দুটো বাহিনী নিয়ে জেনারেল জাহিদ ফরমানকে ঘরোয়াভাবে বন্দি করে ফেললেন। তারপর কোন ধরণের আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই জেনারেল সাখাওয়াত নিজের হাতে তুলে নেন আর্মির কমান্ড। এরপরই দ্রুত দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রির সাথে।

ঘটনার গুরুত্ব প্রধানমন্ত্রিকে বোঝাতে লেগে গেলো তিনটি ঘণ্টা। সেখান থেকে প্রেসিডেন্টকেও পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়। একই সাথে পদচ্যুত করা হলো পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে। চিফ হুইপকে খুঁজে পাওয়া গেলো না কোথাও। ড্রাইভে পাওয়া লিস্ট ধরে ধরে প্রতিটি মানুষকে নিয়ে আসা হয়েছিলো জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। আর্মিদের ছয়টি প্র্যাটুন পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিলো জাতীয় সংসদ ভবনের বেজমেন্টে।

মেসনদের ব্যাপারে এত দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার কারণেই হয়তো জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেলার সময় বা সুযোগ কোনটাই পায়নি তারা। ওখান থেকে প্রতিটা লাশ উদ্ধার করে মর্গে নিয়ে আসা হয়। সেই সাথে লিখিত এবং সফটকপি ডকুমেন্টসগুলো বাজেয়াপ্ত করে সরকার। মিথরাস আর ফ্রি মেসনারি-সজ্জাদুটোকে চিরকালের মতো নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এদেশে। সেই সাথে বাতিল করা হয় ফ্রি মেসন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের বিজনেস পারমিট।

আমেরিকা তাদের এফবিআই এজেন্টের মৃত্যুর যথার্থ কারণ দাবি করে পরের দিন। মৃত অসপেক্ষ আর ধৃত রিয়াজুল করিমের ব্যাপারে সাথে সাথে ইজরায়েলের সাথে যোগাযোগ করে বাংলাদেশ। এদেশে ইজরায়েলি অপারেটিভরা কি করছিলো সে প্রশ্ন করা হলে অদ্ভুতভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয় ইজরায়েল। একই সাথে আমেরিকাও কেমনজানি চুপসে যায়। একজন রাষ্ট্রদূত পাঠিয়ে দেয় তারা সাথে সাথেই। প্রাইভেট জেটে করে মানুষটা দেরি না করে পৌছে যায় এখানে। তারপর আরও একটা রুদ্ধদ্বার বৈঠক তার সাথে হয়, উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আর বর্তমান আর্মি চিফ জেনারেল সাখাওয়াত তানিম।

রাষ্ট্রদূতের গলা এবার হয়ে গেলো মাখনের চেয়েও নরম। সে আমেরিকার পক্ষ থেকে বিনীত দাবি জানালো, তারা রিয়াজুল করিম এবং এরাশকে এখান থেকে নিয়ে যেতে চায়। যেহেতু মানুষগুলো ইজরায়েলের নাগরিক কাজেই বাংলাদেশের উচিত ইজরায়েলে তাদেরকে ফেরত পাঠানো। রিয়াজের বিচার (!) ইজরায়েল এখন নিজেই করতে নাকি ইচ্ছুক। তাছাড়া আর সব ইজরায়েলি নাগরিকদেরও মৃতদেহগুলোও সসম্মানে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়াটা আমেরিকা একটা উপকার বলেই মনে করবে। মৃতদের তো নিজ মাটিতে শোয়ার অধিকার আছে, নাকি? ইজরায়েলের সাথে যেহেতু বাংলাদেশের সরাসরি যোগাযোগ করার সম্ভাবনা নেই (বাংলাদেশ তাদের রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি), আমেরিকা এই হস্তান্তরের ব্যাপারে সহায়তা করতে সানন্দে ইচ্ছুক।

এতটুকু মেনে নেওয়া হলে তারা এফবিআই এজেন্ট ইস্যু নিয়ে ভবিষ্যতে আর কোন ঝামেলা করবে না। বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের মতোই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা হবে।

দাবিটা জোরালো ছিলো। সেই সাথে ছিলো মেনে না নেওয়ার মতো। রিয়াজুল করিমের আসল নাম কেনেথ গ্র্যান্ট কি না সেটা বাংলাদেশ সরকার তখনও জানে না। ধারণা করা হলো মানুষটি ছিলো মোসাদের এজেন্ট। তবে নিশ্চিত করার কোন উপায়

কারও কাছে ছিলো না। তার ব্যাপারে জানার চেয়ে অজানা তথ্যই বেশি। এদিকে আমেরিকা এবং ইজরায়েলের মতো কঠিন প্রতিপক্ষকে সামলে ফেলার মতো শক্তি আসলেই বাংলাদেশের নেই। বাস্তবতা এরকমই। সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, তাদের দাবি মেনে অপরাধি দু-জনকে ইজরায়েলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, মধ্যস্থতা করবে আমেরিকা।

জেনারেল রাফসানের বিরুদ্ধে যান। তার মতে এই ইস্যুতে গোটা পৃথিবীর দিকে তুলে ধরা উচিত মেসন আর মিথরাসের দুনিয়াব্যাপী ষড়যন্ত্রের কথা। অন্যরা সচেতন হওয়ার সুযোগ পাবে তাতে। কিন্তু বিষয়টা সেদিকে ফেরানোর মতো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না জেনারেল সাখাওয়াত আর প্রধানমন্ত্রী। এই মুহূর্তে আমেরিকার সাথে একটা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার অর্থ একটাই—আত্মরক্ষা। আমেরিকা শান্তিযুদ্ধ (!) ঘোষণা করলে অসংখ্য নিরপরাধ বাংলাদেশি নাগরিককে বাজে একটা পরিণাম ভোগ করতে হবে। ফলাফলটা অবশ্যস্ভাবি।

কাজেই টানা চারদিন বাকবিতণ্ডার পর বাংলাদেশ সরকার রাজি হলো মৃতদের হস্তান্তর করতে। জীবিত রিয়াজুল করিমের যোগ্য বিচারের দাবি রেখেই আর কিছু পার্শ্বদাবি জুড়ে দেওয়া হয়। পঞ্চাশটি ফাইটার প্লেন চলে আসল আমেরিকা থেকে, পরের দিনই। শুভেচ্ছা উপহার। বাংলাদেশের সাথে ইন্ডিয়ার পানি চুক্তি আর ট্রানজিটের সব অন্যায় দাবিগুলোকে সংশোধন করার জন্য চাপ দিতে শুরু করলো কোন তৃতীয় শক্তি। ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশিদের হ্যারাসমেন্টের ঐতিহ্য ছিলো আমেরিকায়। সে ঐতিহ্য এবার ভেঙে গেলো। প্রবাসি বাংলাদেশিদের জন্য সুবিধেজনক অনেকগুলো শর্ত জুড়ে দিল বাংলাদেশ সরকার। নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও কি কি শর্ত জানি চুকিয়ে দিলেন, আমেরিকা সরকার একটি শর্তেরও বিরুদ্ধাচরণ করলো না।

সারা পৃথিবীতে জঙ্গিদমন অভিযান চালানোর জন্য আমেরিকার মাথা চিরকালই উঁচু হয়ে আছে। এই পর্যায়ে এসে নিজেদের জঙ্গিবাদি প্রমাণ মুছে ফেলার জন্য যে কোন শর্তে তাদের আপত্তি নেই। এভাবেই বাংলাদেশ ছাড়লো নাটের গুরু রিয়াজুল করিম।

লোকটাকে হারানোর খবর পেয়ে আসিফের মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো। একই সাথে ও জানতে পারে জাতীয় সংসদের বেজমেন্টে পাওয়া গেছে ডিস্ট্রিক্ট রেজা আর দ্বিতীয় এফবিআই এজেন্টের লাশ। ওদের ওপর হামলা পরিকল্পনা সম্ভবত এই দু-জনই করছিলো। ইরফানের গুলিতে নিহত হয়েছে দু-জনেই। মেসন আর মিথরাসদের ষড়যন্ত্র নস্যাত করে দিয়ে তাদের বাংলাদেশ থেকে বের করে দেওয়া গেছে, এটুকুই শুধুমাত্র সান্ত্বনা।

আর আজকে তাকে চেম্বারে ডেকে এনে অভিযান কাহিনী শোনার জন্য আবদার জুড়ে দিয়েছেন ডিপার্টমেন্ট হেড। এই মুহূর্তে কিছুটা বিভ্রান্তি মুখে ফুটিয়ে কমিশনার শাহেদ জামানের দিকে তাকিয়ে আছে ও। মানুষটার প্রশ্ন ঠিক বুঝতে পারেনি।

“মানে, আমি বলতে চাচ্ছি—রিয়াজুল করিম নামধারি মানুষটিই ছিলো আমাদের অর্ডো টেম্পলি ওরিয়েন্টিসের প্রধান। বিষয়টা তুমি কিভাবে ধরে ফেললে?”

মাথা নাড়ে আসিফ, “এটাই স্বাভাবিক ছিলো। প্রফেসর তানভীরের সাথে থাকার কারণে সে ছিলো সন্দেহের উর্ধ্বে। কাছেই মিথরাস লজ, সে জায়গার প্রধান হিসেবে নিজেকেই রাখতে চাবে তার পর্যায়ে একজন অপারেটিভ। তবে রিয়াজুল করিম নামে মিথরাস লজের প্রধান হিসেবে সে আত্মপ্রকাশ করেনি সে। ছদ্মবেশ নিয়ে এমন একজন মানুষ হিসেবে মিথরাস লজ প্রধান হয়েছিলো, যাকে খুঁজলে কেউ পাবে না। কারণ, কেনেথ গ্র্যান্ট বলে কোথাও কেউ নেই। ছিলো একজন। মিথরাসদের উচ্চপর্যায়ের একজন সাধক ছিলেন কেনেথ গ্র্যান্ট, তবে তিনি মারা গেছেন অনেকদিন হয়ে গেলো। গত শতাব্দির মানুষ ছিলেন তিনি। তার নাম নেওয়ার পাশাপাশি রিয়াজুল করিম আরেকটি ছোট কাজ করলো। বাংলাদেশি পরিচয় নিয়ে ঢুকে পড়ার সবচেয়ে সহজ উপায় ছিলো একজন মৃত বাংলাদেশির পরিচয় মেরে দেওয়া। ডেথ সার্টিফিকেটের সাথে বার্থ সার্টিফিকেট এদিক ওদিক করে ফেলেছে সে। নিজের নাম কোন এক অজ্ঞাত মৃত শিশুর নামের সাথে পাল্টে নিয়েছে। মুখের ওপর কিছু সার্জারীর দরকার ছিলো। চেহরার গঠনটা বাংলাদেশিদের মতো না-লে বড় রকম সমস্যাতে পড়ে যেতে পারতো মানুষটা।”

“সেটা আমি জানি।” দ্রুত মাথা নাড়েন শাহেদ জামান, “সবচেয়ে সহজ ট্রিকটা তারা এখানে কাজে লাগিয়েছে। একটি শিশুর ডেথ সার্টিফিকেটকে বার্থ সার্টিফিকেটে পাল্টে ফেলা। তবে আমার প্রশ্ন হলো, কিভাবে সন্দেহ করলে তুমি, কেনেথ গ্র্যান্টই রিয়াজুল করিম?”

“প্রথমত ঝাড়া একদিন মেসন আর মিথরাসদের সম্ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছি আমি, তখনই এই কেসের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মানুষের ব্যাপারে খোঁজ নেই। মজার ব্যাপার হলো ডানা বাতশিভার কোন বার্থ সার্টিফিকেটই পাইনি। অথচ তার বায়োতে লেখা ছিলো মেয়েটি জার্মানির ফ্রিটজ ক্লিনিকে জন্মেছে। তাদের ফাইল ঘেঁটে যখন কোন তথ্য পেলাম না, সন্দেহটা জেগে উঠলো। রিয়াজুল করিমের ব্যাপারেও একই জিনিস আবিষ্কার করে থেমে থাকতে পারলাম না। ডেথ সার্টিফিকেট খুঁজে সেদিনের একটি মৃত্যুর রেজিস্টার করা দেখলাম হসপিটালে। শিশুটির নাম রিয়াজুল করিম। আমাদের পরিচিত রিয়াজের বার্থডে সব কাগজে যেটা লেখা আছে, সেদিনই মারা গেছিলো হতভাগা এই শিশু। সেই আমলের থ্যালাসেমিয়া-সম্পর্কিত ডেথ সার্টিফিকেট পড়ে তেমনটাই মনে হয়েছে আমার।”

“কিন্তু ঠিক কিভাবে ধরলে ওরা দু-জন একই মানুষ?” আগের প্রশ্নে ফিরে যান শাহেদ জামান, সেই সাথে জুড়ে দেন নতুন একটা, “ডানার সুইসাইডের নাটকটাও স্পষ্ট না আমার কাছে।”

“আসছি সে কথাতে। তবে রিয়াজ নামধারি এজেন্টটি ধরা পড়েছে নিজের ভুলেই। লাই ডিটেকশন এড়ানোর জন্য এদের ট্রেনিং ছিলো। প্রফেসরের বাসায়

প্রথমদিন যখন রিয়াজের সাথে আমার কথা হয়, তখন সে নিজেকে স্বাভাবিক রেখেই প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলো। উত্তরগুলো, বলাই বাহুল্য, মিথ্যে। একই কাজ সে আবারও করেছে সেমিনারে। সেখানে নিজের মৃত্যু সাজানোর নাটকটা করার সময় মিথ্যা বলতে হয়েছে তাকে—একই ভাবে রিঅ্যাক্ট করেছে তার মুখের পেশিগুলো। আমার ধারণা ছিলো মানুষটা সত্য বলছে। কারণ, আমাকে তার বলা প্রতিটা কথাই তখন পর্যন্ত ছিলো মিথ্যা। আর স্বাভাবিক মিথ্যুক মানুষের মতো মুখভঙ্গি তার ছিলো না। ট্রেনিং থেকে নিশ্চয় তাকে সেসব এড়িয়ে চলতে শেখানো হয়েছে।”

মাথা দোলাল পাশে বসে থাকা তোফায়েল। লাই ডিটেকশনে মুখের পেশি আর অন্যান্য অঙ্গের নড়াচড়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খেয়াল করতে হয়। চোখের মণির নড়াচড়া, কপালের কাছে হালকা কুণ্ডল, গালের কাছে হাত উঠে যাওয়া, অযথাই শরীরের কোন অংশ চুলকানো, যেমন, নাক, ইত্যাদি একজনের কথায় লুকিয়ে রাখা মিথ্যাকে প্রকাশ করে দেয়। সত্য থেকে বক্তার প্রতিক্রিয়া করে দেয় আলাদা। তবে আসিফের মতো অনুযায়ি রিয়াজুল করিম এগুলোকে এড়িয়ে গেছিলো প্রথম থেকেই।

“তাহলে তার মিথ্যা কিভাবে ধরলে?” অধৈর্যের মতো জানতে চান শাহেদ জামান।

“নিজস্ব কিছু লক্ষণ তৈরি করে ফেলে একজন ভাল মিথ্যুক। ধরুন আমি সব গুলো স্বাভাবিক লক্ষণ এড়িয়ে গেলাম। তখন আমার মাঝে নতুন ধরনের একটা লক্ষণ আপনি দেখতে পাবেন। যদিও আমি শান্তভাবেই মিথ্যাটা বলবো—কিন্তু মিথ্যা বলার কারণে আমার প্রতিক্রিয়াতে একধরনের পরিবর্তন আসবেই। সেটা খুবই অন্যরকম, লাই ডিটেকশনের পয়েন্টগুলোর মতো নয়। কারণ, আমি লাই ডিটেকশনে কেমন পেশি পর্বতন আসা উচিত সেটুকু জানি। তবে, আমার প্রতিক্রিয়াটি হবে আমার নিজস্ব ধরনের।”

“তার মানে, নতুন একটা প্যাটার্নে মুখের পেশির পরিবর্তন হচ্ছে সাবজেক্টের। যেটাকে ন্যাচারেলি আমরা লাই মুভ বলি না?” মন্তব্য করে তোফায়েল।

“এক্স্যাকটলি। আর রিয়াজুল করিমের সাথে যখন তার ছদ্মবেশ ছাড়া শেষবার দেখা হলো—তখন তার কথাতে আমি একটা পরিচিত প্যাটার্ন লক্ষ্য করতে পেরেছিলাম, জিয়া গুলি খায় এসময়। তাকে নিয়ে ফিরে আসার সময় মাথায় আঘাত হানে স্মৃতিগুলো। আগেও ওরকম পরিবর্তন কারও মধ্যে দেখেছি আমি, এমন একটা প্যাটার্ন দেখেছিলাম।”

“মিথরাস লজে, রেক্স সামাস স্যাংকটিসিমাস কেনেথ গ্র্যান্টের মুখে।” দাঁত কেলিয়ে হাসলেন শাহেদ জামান স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে। “তবুও আমি বলবো, শুধুমাত্র লাই ডিটেকটশন ট্রেনিংয়ের মাধ্যমেই আস্ত দুটো মানুষের এক আইডেন্টিটি বের করে ফেলাটা বেশ বড় একটা অগ্রগতি তোমার।”

বিনয়ের হাসি দেয় আসিফ, “শতভাগ নিশ্চিত আমি ছিলাম না, সরাসরি কেনেথকে প্রশ্ন করার পর সেটা হতে পেরেছিলাম। আর ডানার আত্মহত্যার নাটকও

দরকার ছিলো, স্যার। ডক্টর জালালের কেসটা খুব দ্রুত ক্লোজ করা তাদের দরকার ছিলো। একটা মার্ডার কেস ক্লোজ করার জন্য অবশ্যই একজন মার্ডার দেখাতে হবে আপনাকে, তারা মার্ডারার হিসেবে প্রেজেন্ট করেছিলো ডানাকে। কেসটা ক্লোজ না করলে আমাদের তদন্তে কেঁচো থেকে সাপ বের হয়ে আসতে পারে, এ ভয় তাদের ছিলো।”

“সাপ ঠিকই বের হলো শেষ পর্যন্ত!” আনমনে মাথা দোলালেন কমিশনার, “তোমাকে জেনেশুনে মিথরাস লজে কথা বলতে ডাকলো কেন রিয়াজ? ধরা পড়ার সম্ভাবনা আরও বেড়ে গেলো না তার?”

দু-পাশে মাথা নাড়লো আসিফ, “মাত্র কয়েক মিনিটের বৈঠককে হুমকি বলে মনে করেনি লোকটা। এক মিটিংয়ে আমার ধারণাতে যদি মিথরাস আর মেসনদের মধ্যে পার্থক্য করে দিতে পারে, তাহলে তাদেরই লাভ। এভাবেই ভেবেছিলো ও।”

কিছুক্ষণের জন্য নীরবতা নেমে এলো ঘরের মধ্যে। তোফায়েল এখনও শান্তমুখে বসে আছে, ডেস্কের দিকে তাকিয়ে আছে আসিফ। গত কয়েকদিন ধরে ঘুমাতে পারেনি ও, তার ওপর আছে ক্ষতর যন্ত্রণা। ব্যাভেজের ভেতরে ভীষণ চুলকাচ্ছে ওটা। শার্ট ছিঁড়ে ফেলে মনের সুখে চুলকানোর জন্য হাঁসফাঁস করছে ওর ভেতরটা। উসখুশ করছেন কমিশনারও, কিছু একটা বলবেন বলবেন করেও বলছেন না। তার দিকে প্রশ্নবোধক একটা দৃষ্টি বুলিয়ে দিল আসিফ।

“ব্যাপারটা স্ট্রেঞ্জ।” হতাশ কর্তে বললেন শাহেদ জামান, “যেখান থেকে সবকিছুর শুরু সে কেসটাই তো অসমাপ্ত থেকে গেলো। ডক্টর জালালের মার্ডার কেসটা শেষ পর্যন্ত সমাধান করা গেলো না। খুনটা ওদের মধ্যে কে করেছিলো তা আমরা কোনদিনও জানতে পারবো না।”

মাথা নাড়ে আসিফ, “ওটা মার্ডার কেসই ছিলো না, স্যার।”

“মানে?” তোফায়েল আর কমিশনার দু-জনই চমকে ওঠেন এবার।

“আমার মতামত যদি জানতে চান...ডক্টর তানভীর সুইসাইড করেছিলেন।”

BanglaBook.org



আরাম করে চেয়ারটাতে হেলান দিয়েছে আসিফ। ঘরের আর দু-জন শ্রোতার অবশ্য এতটা মানসিক শান্তি নেই। আসিফের কাছ থেকে একটা ব্যাখ্যা শোনার অপেক্ষায় উদগ্রীব হয়ে আছে তারা।

অন্য চেয়ারটাতে জিয়ার বদলে তোফায়েলকে বসে থাকতে দেখে আসিফের বুক থেকে অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এলো। জিয়া হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে চতুর্থ দিনে। কিন্তু বাসায় চুপচাপ একমাস শুয়ে থাকতে বলা হয়েছে তাকে। ডিপার্টমেন্টে ফিরে আসার জন্য ব্যস্ততা দেখাচ্ছিলো সে, এক ধমকে আসিফ তাকে থামিয়ে দিয়েছে।

জিয়ার পরিণতির জন্য যারা দায়ি ছিলো তাদের কিছুই করতে পারেনি ওরা। এই অক্ষমতাটুকু আসিফকে প্রতিদিন তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। হয়তো আজকে তাদের ব্যর্থ করে দেয়া গেছে, আগামিকাল আবারও এদেশে জাঁকিয়ে বসার চেষ্টা করবে না সে নিশ্চয়তা কে দেবে?

“ইজরায়েল থেকে মোট চারজন অপারেটিভ এসেছিলো বাংলাদেশে। আজকে নয়। তারা এদেশে আসে পনের বছর আগে। ডক্টর তানভীর জালাল বাংলাদেশি ছিলেন জাতীয়তাতে। তবে পনের বছর আগে তার সাথে জুটি বাঁধা রিয়াজুল করিম, সাধারণ মেসনদের চোখে নিখুঁত ভবিষ্যৎবক্তা অসপেক্ষ, অসপেক্ষের ব্যক্তিগত সহকারি এরাশ, অ্যাসাসিন ডানা বাতশিভা। তাদের সাথে ডক্টর জালাল প্রথমে খুশি মনেই যোগ দিয়েছিলেন। তরুণ বয়সে অক্সফোর্ড লজে মেসনিক দীক্ষা নিয়েছিলেন মানুষটা। তার মেসন ক্যারিয়ার একেবারে সামান্য নয়। বিনা দ্বিধাতে তাকে এজন্যই বসিয়ে দেওয়া হয়েছিলো বাংলাদেশের একমাত্র লজের মাস্টার মেসন হিসেবে। কেনেথ গ্র্যান্ট নিযুক্ত থাকলেন মিথরাস লজের মাস্টার হিসেবে। চক্রের দায়িত্ব ছিলো তার, সেজন্য গ্র্যান্ড মাস্টারও বলা হতো তাকে।”

“তোমার কথা ঠিক থাকলে, তানভীর জালাল আত্মহত্যা করলেন কেন? প্রথম প্রশ্ন এটাই করেন শাহেদ জামান।

পাল্টা প্রশ্ন করে আসিফ, “আল সাবিতকে চেনেন? ফুয়েতের ওআইসি অর্গানাইজেশন হেড?”

অবাক হলেও প্রশ্নটার উত্তর দিলেন কমিশনার, “চিনতে না কেন? সজ্জন মানুষ। ইসলামিক দেশগুলোর জন্য তার ভাল কিছু করার প্রায়শ আছে। পৃথিবীজুড়ে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করতে পারে সেগুলো। ফিলিস্তিনিকে নিয়ে তার ‘ডিএইচ’ নামক একটা অপারেশনও আছে বলে গুজব শোনা যায়। তাদের সমস্যার সাহায্যে আসতে ডিএইচ প্রজেক্ট কাজে আসতে পারে বলে মনে করে ওআইসি। তবে

জিনিসটা নিয়ে ঠিক কথা বলতে চায় না কেউ। যাই হোক, আমি অন্তত ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা করি তাকে। এখানে ডক্টর জালাল কিভাবে ফিট করছে?”

“গত পনের বছরে অন্তত তিনবার তাকে এই আল সাবিতের সাথে দেখা গেছে। তাদের মধ্যে যোগাযোগ ছিলো।”

“বলতে চাইছো, ডক্টর জালাল ওআইসির পক্ষে কাজ করছিলেন?” ক্র কঁচকে যায় কমিশনার শাহেদের, “মেসনরা কি টের পায়নি সেটা?”

“আমাকে প্রশ্ন করলে আমি বলবো-পেয়েছে। তবে নিঃসন্দেহে ডক্টর জালাল তাদের বুঝিয়েছেন কাজটা করা হচ্ছে মেসনদের স্বার্থে। ওআইসি এখনও মেসনমুক্ত। মুসলিমদের মাঝে মেসনিক প্রভাব বেশ ভাল পরিমাণে ঢুকিয়ে দিতে আজকের আধুনিক মেসনরা পেরেছে। তবে ওআইসিতে তারা ঢুকতে পারেনি এখনও। ডক্টর জালাল মেসনদের ওআইসিতে ঢুকিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন খুব সম্ভব।”

“অনেকটা ডাবল এজেন্টদের মতো...হুম। অথচ কাজ করছিলেন হয়তো ওআইসির হয়েই...তাহলে কি ডক্টর জালাল প্রথম থেকেই এই উদ্দেশ্য নিয়ে মেসনিক ওখ নিয়েছেন?”

“সম্ভাবনা আছে।” মাথা দোলায় আসিফ, “তবে যেটা আমাকে ভাবাচ্ছে, ডক্টর জালালের মৃত্যুটা কি এড়ানোর মতো ছিলো না? বৈঁচে থাকলে মেসনদের বিরুদ্ধে আরও অনেক কিছু করতে পারতেন। নিজের ছেলেকে পর্যন্ত বিলিয়ে দিয়েছিলেন, তাকে তো মেসনরা ঘৃণাঙ্করেও সন্দেহ করতো না।”

একটা আঙুল তোলেন শাহেদ জামান, চিন্তাতে কপাল ভাঁজ হয়ে আছে তার, “যদি এমনটাই হয় ঘটনা তাহলে নিশ্চয় মেসনদের নজরদারিতে পড়ে গেছিলেন ডক্টর জালাল। নিজের মৃত্যু ঘটিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন তিনি। আজ তিনি মারা না গেলে ফ্রি মেসনারি ধীরে ধীরে বাংলাদেশকে গ্রাস করে ফেলতো। চেয়েছিলেন কারও ফোকাস পড়ুক ব্যাপারটার ওপর, সুইসাইডটি ছিলো একটি মেসেজ। বিষয়টা আমাকে ওপরের লেভেলে জানাতে হবে। এগুলো সত্য হলে ডক্টরকে ন্যাশনাল হিরোর মর্যাদা দেওয়া দরকার।”

“উনার স্যাক্রিফাইস ছিলো অনেক উঁচুমানের। নিজের ছেলের ভবিষ্যত অন্ধকারে ঠেলে দিতেও দ্বিধা করেননি তিনি, নিজের জীবনও বিলিয়ে দিয়েছেন।” অনেকক্ষণ পর মন্তব্য করে তোফায়েল, “বিজয়ের ব্যাপারটা পূর্বপরিকল্পিত ছিলো নিঃসন্দেহে। এতে তিনি মেসনদের থেকে বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা আরও বেশি করে পেয়েছেন।”

“তবুও চেইন ইন কমান্ডে সম্ভবত রিয়াজই ওপরে ছিলো। এখানে সে ডক্টরকে অ্যাসিস্ট করতে আসেনি। মেসনিক স্বার্থরক্ষাই তার মিশন ছিলো, ঠিকভাবে বলতে গেলে-চক্রের স্বার্থ রক্ষা।” মন্তব্য করেন শাহেদ জামান।

“এতকিছুর পর লোকটাকে হেটে যেতে দেওয়া ঠিক হয়নি। অবশ্যই তাকে বিচারের মুখোমুখি করা উচিত ছিলো।” ক্রোধ জমে আসিফের কণ্ঠে, জিয়াকে আবার মনে পড়ে গেছে ওর।

“বাংলাদেশের স্বার্থ আমাদের ভাবতে হবে, আসিফ। আমেরিকার ক্ষমতাকে ছোট করে দেখার কিছু নেই। ওরা চাইলে পুরো বিষয়টাই অন্য দিকে ঘুরিয়ে আমাদের এখানেও বাহিনী পাঠাতে পারতো। ইরাকের ব্যাপারটাই ধরো—জঙ্গিবাদী তত্ত্ব বা তেলের খনির দিকে নজর দেওয়ার জন্য আমেরিকার মূল নজর ওখানে ছিলো না। ওয়ান ওয়ার্ল্ড প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইরাক ছিলো একটা বাঁধা। ইরাক দখল করে চল্লিশটার মতো মেসনিক লজ প্রতিষ্ঠা করেছিলো ওরা, গুঁড়িয়ে দিয়েছিলো দেশটাকে। বাংলাদেশের পরিণতি ইরাকের মতো হলে ভবিষ্যতে কিছু করার সম্ভাবনাও আমরা হারাতাম। এখানে আমাদের কূটনৈতিক চাল দিতে হয়েছে।”

চুপ হয়ে যায় আসিফ। কথাটা অগ্রাহ্য করার উপায় নেই। এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্য নিয়ে মেসনমুক্ত দেশগুলোর সাথে পরবর্তি যোগাযোগ করতে হবে। মেসনদের ওপর মরণ আঘাত করা যাবে পরে, সময় আর সুযোগ বুঝে। এখন মাথা গরম করে সিদ্ধান্ত নিলে নিজেদের ক্ষতি ছাড়া ভাল কিছু হবে না।

“ইরফানের যে গল্পটা শোনালেন, স্যার—” নিস্তব্ধতা ভাঙে তোফায়েল, “বিজয় তাকে প্রথমবার ব্রুপ্রিন্টের কথা বলে যেখানে পাঠিয়েছিলো সেখানে কেন তাকে আক্রমণ করা হলো?”

“ফিউচার মাস্টার মেসনের নিরাপত্তার প্রশ্ন ছিলো ওটা।” সাথে সাথেই উত্তর দেয় আসিফ, “‘ব্রুপ্রিন্ট’ ছিলো একটা কোড। অতি উত্সাহি কেউ কি খুঁজতে পারে, তা জানা ছিলো রিয়াজ আর বিজয়ের। আগেই ব্যাকআপ প্ল্যান করে রেখেছিলো তারা। কেউ বিজয়কে সরিয়ে নিলে তাকে ব্রুপ্রিন্ট নিয়ে মুখরোচক তথ্য দিতে হবে। তারপর জনৈক খালিদের ঠিকানা ধরিয়ে দেওয়া হবে। মেসনরা ফোনকল পেলেই বুঝতে পারবে কলারই শত্রু। ইরফান না বুঝেই ফাঁদে পা রেখেছিলো প্রথমবার। বিজয়ের দেওয়া নাম্বারে ফোন দিয়ে খালিদের সাথে মিটিং অ্যারেঞ্জ করতে চেয়েই নিজেকে এক্সপোজ করে ফেলে ও। মেসনদের আভারএস্টিমেট করাটা তার উচিত হয়নি।”

“ঈশিতার সাথে ডক্টর তানভীর জালালের ছবি পাওয়া গেছিলো।” মন্তব্য করেন শাহেদ জামান, “মেয়েটির সাথে গোপন মিটিং কেন করেছিলেন তিনি?”

“নিশ্চয় বিষয়টার গুরুত্ব বুঝিয়ে তাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, মেসনদের বিরুদ্ধে। বিজয়কে মেসনিক লজের দায়িত্ব দেওয়ার ঘটনাটা তিনি ঠিক করেন। সেই সাথে রক্ষা করতেন ঈশিতাকে।”

“ছবিটা তুলেছিলো ফরহাদ। মেসনদের আরেকজন এজেন্ট।” তুড়ি বাজালেন শাহেদ জামান, “এখান থেকেই মেসনরা সন্দেহ করলো ডক্টরের আর কোন উদ্দেশ্য আছে। তিনি যে পজিশনে ছিলেন সেখান থেকে সামান্য একজন ডায়মন্ডের সাথে কথা বলতে যাওয়ার কথা তার ছিলো না। নজরদারিতে পড়ে যান তিনি, কাজেই সুইসাইড ছাড়া শেষ মুহূর্তে বাইরের পৃথিবীকে ইশারা দেওয়ার আর কোন উপায় তার ছিলো না।”

“হতে পারে।” মাথা নাড়ে আসিফ। এভাবে সে-ও ভেবে দেখেনি, “তবে সত্যি

বলতে কি-ঘটনাটা ঠিকমত জানার কোন উপায় নেই।”

“সুইসাইড করার আগ মুহূর্তে ইনসুলিনের সিরিঞ্জ তিনি কোথায় লুকিয়েছেন সেটা আমি বুঝিনি, স্যার,” তোফায়েল বলল।

“ল্যাবের নিচ দিয়ে ড্রেনেজ সিস্টেম চলে গেছে। লুকিয়ে রাখা কিছু ঢাকনি ছিলো, প্রথমবার সবারই চোখ এড়িয়ে গেছে ওগুলো। ওদিক দিয়ে ফেলে দেওয়া যায় সিরিঞ্জ। ডক্টর ছাড়া সে-রাতে আর কেউ ল্যাবে ছিলো না। কারণ, তিনি খুন হননি। এব্যাপারে আমি নিরানব্বই পার্সেন্ট নিশ্চিত। তিনি একা ঢুকেছেন এবং একাই কাজটি করেছিলেন। আমরা সবাই হয়েছি বিভ্রান্ত। মেসনরা বুঝে গেছিলো অবশ্য। মনোযোগ অন্য দিকে সরাতে ডানার মৃত্যুর নাটক তাদের সাজাতে হয়েছিলো।”

“মেয়েটির লাশ তোমরা উদ্ধার করেছিলে। পাল্‌স পাও নি। কিভাবে সম্ভব?”

মুচকি হাসে তোফায়েল, “একজন মানুষকে সাময়িকভাবে মৃত বানিয়ে ফেলা আজকের দিনে কঠিন কিছু নয়, স্যার। কেসটা তখন ছিলো ডিটেক্টিভ রেজার হাতে। সে তো আর আমার কাছে বডি পাঠায়নি পরীক্ষার জন্য।”

“শুধু ওই একটা বডিই নয়, ক্রিস্টিনার বডিও দ্রুত সরিয়ে ফেলেছিলো সে। আনোয়ারের বডিও আমাদের কাছে কয়েক ঘণ্টার বেশি ছিলো না। ‘রিয়াজের বডি’ তো ডিপার্টমেন্টেই আসেনি। ওরা ছড়িয়েছিলো, আমরা উধাও করে দিয়েছি সে লাশ।” বিরক্তির সাথে বলল আসিফ, রেজাকে বিশ্বাস করে এতদূর নিয়ে আসাটাই উচিত হয়নি ডিপার্টমেন্টের।”

“ভালো কথা, ক্যামেরাগুলোতে দুটো গ্যাপ আবিষ্কার করেছিলো জিয়া।” হঠাৎ মনে পড়ায় বলেন শাহেদ জামান, “ওটা কি ছিলো?”

“অবশ্যই ডানা বাতশিভা। মার্ভেলাস স্লাইপার। সে-রাতে ঢাকাতে চলে গেছিলো মেয়েটা। গাড়ি নিয়ে বের হওয়ার আর ঢোকার সময়ের ভিডিওগুলো ফিরে এসে ডিলেট করে দিয়েছিলো। ডায়মন্ডের দিকে কোন পুরুষ হাত বাড়ালে তার একমাত্র শাস্তি, মৃত্যুদণ্ড। সে দণ্ড কার্যকর করতেই ঢাকা সফর তার। কলেজ শিক্ষক আনোয়ারকে টপ ফ্লোর থেকে মাটিতে নামানোর জন্য ওঁত পেতে ছিলো মেয়েটা। বাংলাদেশে আসা চারজনের ছোট গ্রুপটার একমাত্র অ্যাসাসিন ছিলো এই মেয়ে।”

বিস্মিত শাহেদ হাত তোলেন, “এক সেকেন্ড, খুনটা করেছিলো সৈকত। ছাদ থেকে ফেলে দিয়েছিলো সে তাকে।”

“এমনকি সৈকত নিজেও তাই মনে করে। অথচ যে পিস্তল সে ব্যবহার করতো, সেটি নাইন মিলিমিটার নয়। নাইন মিলিমিটার হোল দেখে আমাদের ধারণা হয়েছিলো কাজটা করা হয়েছে পিস্তল দিয়ে। কিন্তু বুলেটটা বের হয়েছে আসলে স্লাইপার রাইফেল থেকে। ঠিক যে মুহূর্তে আমাদের ভ্যাম্প বয় কেমিস্ট্রি টিচার আনোয়ারকে ধাক্কা দিয়েছে, সে মুহূর্তেই গুট করেছি ডানা। মেসনিক রুল প্রতিষ্ঠা করেছে সে। মাথার উপরিভাগের ক্ষত দেখে আমাদের বুলেটের ডেপথ বোঝার উপায় ছিলো না, শুধু ক্যালিবার হিসেবে নাইন মিলিমিটার সনাক্ত করেছিলো মেডিকেল টিম।”

“ভিএসএস ভিন্টোরেজ!” বিড় বিড় করে ওঠেন শাহেদ জামান, “নাইন বাই থার্টিনাইন মিলিমিটার রাউন্ডস! তবে ওটাই নিশ্চয় মেয়েটার একমাত্র অস্ত্র ছিলো না?”

শাহেদ জামানের প্রশ্নটা বোঝে আসিফ। ভিএসএস ভিন্টোরেজ একটি বিল্ট ইন সাইলেন্সার রাইফেল। ওটা দিয়ে রিয়াজের মৃত্যুর নাটক সাজানো সম্ভব ছিলো না। গুলির শব্দ ইচ্ছে করেই শোনানো হয়েছে তখন।

“অবশ্যই না। তাছাড়া শেষ অ্যাটম্পট নেওয়ার সময় আমি ছিলাম টিঅ্যাভটি মাঠে। ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি থেকে জায়গাটার দূরত ৫৭০ মিটারের মতো। ভিএসএস ভিন্টোরেজের রেঞ্জ মাত্র ৪০০ মিটার। ব্যারেট এম হান্ড্রেড সেভেন ছিলো মেয়েটার কাছে তখন। একই কাজ ফাঁকা গুলি চালানোর সময় সে করেছিল-রিয়াজের মৃত্যু হয়েছে ভেবেছিলাম আমরা।”

“ইজি ট্রিকস। গুলিতে কাপড়ের একাংশ নড়িয়ে দেওয়ার মতো ইন্টারনাল এয়ার শট করে মাটিতে আছড়ে পড়া। ব্লাডপ্যাচ সময়মত ফুটো করে রক্ত দেখানো। পেছনে এফবিআই তাকে দারুণভাবে সাপোর্টও দিচ্ছিলো। তোমরা ঠিকমত লাশটা চেক করতে পারেনি। কিন্তু, যেটা বুঝতে পারছিলাম না এখানে, রিয়াজের নিজের মৃত্যু সাজানোর দরকার ছিলো কতটা?”

“আমরা তার ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছিলাম, স্যার। খুব দ্রুত অ্যাকশনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো ওরা তখন। একবার মিথরাস লঞ্চে নিজেকে ছদ্মবেশে প্রেজেন্ট করেছে, এরপর আবার ঘন ঘন দেখা করতে সে চায়নি। দু-জন যে একই মানুষ-আমরা সেটা বুঝে গেলে তাদের প্ল্যানটা পুরোই ভেঙে যেত। সিন থেকে একেবারেই নিজেকে সরিয়ে ফেলার সহজ উপায়টা ছিলো মৃত্যুর নাটকটা সাজিয়ে ফেলা। ইজরায়েল থেকে আসার পর নিজেদের যে চরিত্র তারা এদেশে দাঁড় করিয়েছে তার খুব একটা মূল্য আর ছিলো না। একটা ক্লাইম্যাক্সের দিকে যাচ্ছিলো ওরা।”

“এফবিআই এজেন্টদের বিরুদ্ধে কথা বলার পরিস্থিতিতে তুমি ছিলে না তখন। আগেই ফিউজিটিভ বানানো হয়েছিলো তোমাদের।” মাথা দোলান শাহেদ জামান, “তাছাড়া, তোমাদের ব্যবস্থা করার ব্যাপারে ওদের চেষ্টার কমতি ছিলো না। খরচের খাতায় থাকায় তোমরা রিয়াজের মৃত্যু নিয়ে খোঁড়াখুঁড়ির সময় পাবে না, এটাই ছিলো তাদের ধারণা। তবে ডানার লাশের কাছে X<sup>0</sup> লিখার অর্থ কি ছিলো? তোমাদের কু দিলে তাদেরই ক্ষতি না?”

“এটা স্যার টিপিকাল মেসনিক হৈয়ালি। ডক্টর খান একবার বলেছিলেন, মেসনরা নিরাক্ষর শতাংশ সঠিক তথ্য দিয়ে থাকে, এক শতাংশ ভুল তথ্য দেয় তারা। ফলাফলস্বরূপ, তাদের শত্রুরা নিজেদের বিজয় মনে করতে শুরু করে, অথচ আল্টিমেটলি তারাই জেতে সবক্ষেত্রে।”

“এই মুহূর্তে আমরাও কিন্তু নিজেদের বিজয় মনে করছি,” একটু হেসে বলল তোফায়েল। “তবে জাহিদ ফরমান কেন আপনাদের রিকমেন্ড করেছিলো সেটা আমার বোধগম্য নয়।”

“স্বাভাবিক,” জবাব দিল আসিফ, “প্রফেসর জালাল মারা যাওয়ার পর তিনিও বিভ্রান্ত হয়ে গেছিলেন। মেসনদের পরিকল্পনার সম্পূর্ণ বাইরের একটা ঘটনা ঘটে গেছিলো। মেসনবিরোধি কোন শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে কি না তা জানতেন না জাহিদ ফরমান। তদন্ত হোক তিনিও চেয়েছিলেন। বেস্ট রেজাল্ট পাওয়ার জন্য বেস্ট রেকর্ড আছে এমন একজন ডিটেক্টিভ খুঁজলেন তিনি। আমাদের টিমকে পছন্দ হয়েছিলো হয়তো উনার।”

“কিন্তু পরে যখন টের পেলেন প্রফেসর সুইসাইড করেছেন আর তোমরা কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বের করতে শুরু করেছো, তখন তোমাদের নামে হুনিয়াও জুড়ে দিলেন তিনি,” মাথা দুলিয়ে বললেন শাহেদ জামান।

“তা দিলেন। তবে, আমরা এখনও বেঁচে আছি। জিয়ার আঙুলের ওপর দিয়েই গেছে শুধু। মেসনদের বিরুদ্ধে নামার পর এর চেয়েও খারাপ অবস্থা হয়েছে অনেকেরই।”

“ভালো কথা, জিয়াকে টোপ হিসেবে ব্যবহারের কথাটা কখন মাথায় আসে তোমার?” চট করে প্রশ্নটা করেই ফেললেন কমিশনার।

“সেমিনারে আমরা যাবো সেটা জেনে গেছিলো মেসনরা। আমরা যখন ডক্টর খানের বাসাতে ডিনার করছিলাম, ডেজার্ট আনার ছলে ফরহাদ সরে গিয়েছিলো। জানিয়ে দিয়েছিলো ও তখনই। রিয়াজের চেহারা নয়, প্রতিক্রিয়া দেখে খটকা লাগে আমার। আরএসএসের সাথে মিল খুঁজে পাচ্ছিলাম ভঙ্গিতে। বিষয়টা অদ্ভুত। সব মিলিয়ে ধরেই নিলাম আমাদের মাঝে লিক আছে কেউ। ডক্টর খান অথবা ফরহাদের কাজ-বোঝার জন্য খুব একটা বুদ্ধিমান হওয়ার প্রয়োজন নেই। এটা পরীক্ষা করতেই জিয়াকে রেখে আসি ডক্টরের তত্ত্বাবধায়নে। আমরা মেসনিক লজের লোকেশন আবিষ্কার করে ফেলেছি—এমন একটা তথ্য ছড়িয়ে দেওয়ার পর খোলা ক্লিনিকে আমাকে বা জিয়াকে পেলে সবকিছুর পেছনে যে আছে সে চেহারা দেখাবেই, আমার বিশ্বাস ছিলো। ডক্টর খান আমাদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক হলে তিনি ফোন দিয়ে মেসনদের ডেকে আনতে পারতেন। জিয়া ডক্টরকে ফোন করতে দেখে সেরকমটাই ভেবেছিলো।”

“অথচ, ক্লিনিকে ডক্টর খান সত্য কথা বলেছিলেন। তার সহকারিকে ফোন করেছিলেন তিনি। তখন ফরহাদ তার কাছ থেকে কৌশলে ঠিকানা জেনে নিয়েছিলো। তারপর বন্ধুদের জানিয়ে দিতে ছুটে এসেছিলো ওরা।” সত্য মিলিয়ে নিলেন কমিশনার, “মন্তু ঝুঁকি নিয়েছিলে। হার্ড ড্রাইভে কিছু যদি না পেতে? যদি ওরা সবকিছু অনলাইনে আপলোড করে রাখতো কোথাও এনক্রিপ্ট করে? জিয়াকে উদ্ধার করতে কিভাবে?”

“প্রথমত স্যার, আমার বিশ্বাস ছিলো হার্ডড্রাইভেই কিছু পাবো। কারণ, মেসনিক লজটা নিজেই একটা সিক্রেট লোকেশন। তার মাঝে ডাটাবেজের জন্য আলাদা সিকিউরিটি প্রটোকল দেওয়া আছে। এতকিছুর পর ড্রাইভে ডাটা রাখতে সংকোচবোধ

করার কথা না মেন্দনের।” একটু বিরতি নেয় আসিফ, “দ্বিতীয়ত জিয়ার জুতোতে একটা জিপিএস ট্রান্সমিটার ছিলো।”

হেসে ফেললেন শাহেদ জামান, “তেনন ঝুঁকি তো নাওনি তাহলে। মহাখালীতে আনার নাটক করার দরকার ছিলো কী?”

গাল চুলকালো আসিফ, “ঝটিকা হামলা করে ওকে উদ্ধার করতে গেলে হোস্টেজ সিচুয়েশনে পড়ে যেতাম। ওই সিচুয়েশন একটু ঝামেলার হয়ে যায়। জিয়া বা ডক্টরকে মেরে ফেলতে পারতো ওরা। তাছাড়া, ঈশিতাকে ওভাবে পাওয়া যেত না। অবশ্য রিয়াজুল করিম টোপ না গিললে ও পথেই এগিয়ে যেতে হতো আমাদের।”

নড়ে বসলেন শাহেদ জামান, “ভালো কথা, একজনকে ডায়মন্ড হিসেবে ঠিক করে ফেললে কি তাকেই উৎসর্গ করা লাগে? কি ছাঁচড়া নিয়ম এসব? ঈশিতা ওতে জড়ালো কি করে?”

“বিজয় ছেলেটাকে আমাদের যতই অপছন্দ হোক স্যার, তার বয়সি মেয়েদের চোখে সে স্বপ্নপুরুষ। ঈশিতা জড়িয়ে গেছিলো প্রেমের টানে। তবে বিজয়ের জন্য ক্রো-মেনন নামক মেন্দনের ছোট একটা শাখাতে দীক্ষা নিয়েছিলো। তবে সুইসাইডাল টাস্কের জন্য সজ্জানে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলো বলে আমার মনে হয় না। মেয়েটার শরীরে প্রচুর পরিমাণে ড্রাগস ব্যবহারের চিহ্ন পাওয়া গেছে। আপাতত রিহ্যাবে আছে সে। বিজয়কে আরেকটাতে পাঠানো হয়েছে। বাবার উল্টোদিকে গেছে এই ছেলে। মেন্দনের জন্য সে সত্যই নিবেদিত।”

“দুঃখজনক। সৈকত ছেলেটার সাথে তো কিছুক্ষণ ছিলে, তাকে ভ্যাম্পায়ার বলে বেশ ভালই রটানো হয়েছে। ঘটনা কি বলবে? এই শতাব্দিতে এসেও কল্পকথায় বিশ্বাস করতে হবে আমাদের?”

মুচকি হাসে আসিফ, “এটা আমি বলবো না। আপনি আমার কাছে সব শুনতে চেয়ে ডেকে পাঠিয়েছেন যখন, জানতাম প্রশ্নটা করবেন। সাথে করে এজন্যই তোফায়েলকে নিয়ে এসেছি। ওর মুখেই শুনুন।”

“কাম অন, ডক্টর। এনলাইটেন মি!” মুখ বেশ শক্ত করে ফেললেন শাহেদ জামান। আসিফ বহু কষ্টে হাসি চেপে রাখলো। হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের প্রধানকে এখন যা লাগছে না দেখতে!

খুক করে কাশল তোফায়েল, “ছেলেটাকে ট্রাংক থেকে ডিটেক্ট করে আসিফ যখন বের করছিলেন, আমি ওখানে ছিলাম। বাইরে তখন ঝলমলে ঝোঁদ। ডালা তুলতেই হাতকড়া পরানো মানুষটা যন্ত্রণাতে চেঁচাচ্ছিলো। রোদ তার শরীরের যেখানে যেখানে পড়েছে প্রতিটা কোষ পুড়িয়ে দিয়েছে ভালোমত তাত্ত্বিকভাবেই। একজন ভ্যাম্পায়ারের মতোই রোদে বের হলে শরীরের চামড়া তার পুড়ে যায়, স্যার। আমি সাক্ষি।”

শাহেদ জামানের চোখ আক্ষরিক অর্থেই ছানাবড়া হয়ে গেছে!

“মানুষের রক্ত খেতে আমাদের সাবজেক্টের খুবই ভাল লাগে। বিষয়টা সে কখনই

অধীকার করেনি। রসুন দেখলে ছেলেটা ভয় পায়। আয়না সহ্য করতে পারে না। আর দাঁতের আকৃতি তার একেবারেই অন্যরকম। চোখা চোখা দাঁত তার। প্রতিটা দাঁতই। মানুষের মুখের ভেতর মোট চারটা দাঁত হয়ে থাকে চোখা। তবে সৈকতের বত্রিশটাই ক্যানাইন।”

দু-হাত একত্র করে তাকিয়ে থাকেন শাহেদ জামান। আহহ ফুটে উঠেছে তার চোখেমুখে।

“আর দশজন ধরেই নেবে হয় অতিমাত্রায় টোয়াইলাইট বা ভ্যাম্পায়ার ডায়েরিজ দেখে এই ছেলে। সেখান থেকে নিজেকে ভ্যাম্পায়ার ভাবে। অথবা তারা ধরে নেবে ভ্যাম্পায়ার প্রজাতিটা শুধুই মিথ্য নয়। সত্যিকার অর্থেই পৃথিবীতে আছে তারা। তবে আমি কোনটাই ভাবতে পারলাম না। একমাত্র সত্যের দিকে যদি আমরা মুখ ফেরাই, ছেলেটা অসুস্থ। তার সাহায্য দরকার এখন।”

তোফায়েলের মনের পর্দায় ভেসে উঠলো সৈকতের চেহারাটা। এখনও ডিপার্টমেন্টের সেলে আটকে আছে সে। গত কয়েকদিন এত বেশি ব্যস্ততা গেছে, তাকে জেরা করার মতো একজন অফিসারও পাওয়া যায়নি। আবার নিজের প্রসঙ্গে ফিরে আসলো সে।

“তার যে রোগটা আছে তাকে আমরা বলি জেরোডার্মা পিগমেন্টোসাম। সংক্ষেপে এক্সপি। এতে আক্রান্ত যারা-তাদের সূর্যের পিগমেন্ট সহ্য করার ক্ষমতাই রাখেন না। সমস্যাটা জিনগত। আলোতে আসলে ইনারা অসুস্থ হয়ে পড়েন। রোদে আসলে পড়ে ফোঁস্কা।”

“তাহলে, সূচালো দাঁতের কি ব্যাখ্যা? জেরোডার্মা পিগমেন্টোসামের কারণে নিশ্চয় কারও দাঁত চোখা হয় না?” প্রশ্নটা না করে পারলেন না শাহেদ জামান।

“এটাও জিনগত সমস্যা। হাইপোহাইড্রাটিক এক্টোডার্মাল ডিসপ্লাসিয়া। আক্রান্ত রোগির দাঁত হয়ে যায় সূচালো। আরও দুঃখজনক ব্যাপার হলো, আমাদের সাবজেক্টের একই সাথে পোফিরিয়া আর জেরোডার্মা পিগমেন্টোসাম আছে। ব্যাপারটা দুর্বল। পোফিরিয়ার জন্যও অল্প সময়ে ফোঁস্কা পড়ে শরীরে। আর পোফিরিয়ার সবচেয়ে ভয়ানক লক্ষণ হলো-মানুষের রক্ত খেতে ইচ্ছে করে। সম্ভবত ভ্যাম্পায়ার খিওরির জন্মদাতা এই পোফিরিয়া রোগ, স্যার। রোগি অবলীলায় রক্ত খেতে পারে, উপভোগ করে তারা। হিমোগ্লোবিনে অস্বাভাবিকতা দেখা যায় এতে। উপশম করতে রোগির রক্ত পান করার ইচ্ছে জাগে।”

কমিশনারের চেহারাটা হয়েছে দেখার মতো, একটু সন্নিহিত ঝুঁকে আসেন তিনি, “রসুন আর আয়না কেন ভয় পায় ওই ছেলে?” এমনভাবে উচ্চারণ করলেন তিনি যেন ছেলেটার ও দুটো জিনিস ভয় পাওয়া সম্পূর্ণই তোফায়েলের দোষ!

“অ্যালিয়ামফোবিয়া, স্যার,” মিন মিন করে বলল তোফায়েল, “রসুনভীতি। আর একই সাথে ইসোপট্রোফোবিয়াও আছে, আয়নাভীতি বলা চলে এটাকে।”

“ব্যাটা তো দেখছি রোগের ডিক্সা! একে যত তাড়াতাড়ি ইন্টেরোগেট করে



বিদেয় করো তো, আসিফ। আমি ফাইল রেডি করি নতুন করে। এবারের রিপোর্টে ডক্টর তানভীরকে অবশ্যই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। আর আসিফ...ব্যাড লাক! ইরফানকে হাতের কাছে পেয়েও ধরে রাখতে পারিনি!”

বস উঠতে বলছেন ওদের-বুঝতে সমস্যা হয় না আসিফ বা তোফায়েলের। কোন কথা না বলে উঠে পড়ল ওরা। দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলে বের হয়ে আসলো। এখানে “চললাম, স্যার,” বলার কারণেও বিশ মিনিট ধরে ঝাড়ি খাওয়া লাগতে পারে। হাসিখুশি মানুষটা যখন রিপোর্ট লিখেন তখন একেবারেই অসামাজিক হয়ে ওঠেন। আসিফের ধারণা, ‘হিটলার’ নামটা ওখান থেকেই এসে জুটেছে ইনার কপালে।

“তাহলে সৈকতকে আপনারা একটা মার্ডারের জন্য চার্জ করছেন?”

“হুঁ। আনোয়ারকে ডানা হত্যা করেছিলো, ওটার জন্য অ্যাটেম্পট টু মার্ডারের চার্জ করা যেতে পারে তাকে। তবে ক্রিশ্চিনার মার্ডারটা সে আসলেই করেছে। এখানে আমার হাত পা বাঁধা, তোফায়েল। মেসনদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলো ছেলেটা। তবে আইন অবশ্যই আইনের পথে চলবে। অপ্ৰাপ্তবয়স্কা একটি মেয়েকে নিরস্ত্র অবস্থায় জবাই করেছে এই ছেলে। তার ভাগ্যটা এখন বিচারকই নির্ধারণ করবেন।”

মাখা দোলাল তোফায়েল। আসিফের দ্বিধার কারণটা বুঝতে পারছে। শুনেছে, মেসনিক লজের বাইরে একবার স্যারের প্রাণ বাঁচিয়েছে এই সৈকত। তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে হয়েছে আসিফকে, তবে সেজন্য বস নিজেকে ক্ষমা করতে পারছে না।

জুনিয়র একজন অফিসারকে ডেকে সৈকতকে ইন্টেরোগেশন চেয়ারে পাঠাতে বলল আসিফ। নিজের পুরনো ডেস্ক দেখেও মনের মাঝে কোনরকম শান্তি অনুভব করছে না এখন। জিয়া নেই। ছেলেটার অভাব বোধ করার পেছনেও কোন যুক্তি নেই, তবে হালকা অপরাধবোধ আছে। আগের মতো ফিল্ডে সে কাজ করতে পারবে কি না জানে না আসিফ। অথচ তাকে টোপ হিসেবে ব্যবহারের সিদ্ধান্তটা তার নিজেরই ছিলো। সময়মত জিয়ার সাহায্যে ও আসতে পারেনি।

মানুষকে দশটা আঙুল ফুঁর্তি করার জন্য দেওয়া হয় না। ওগুলোর প্রত্যেকটাই ভারসাম্য রক্ষা করতে কাজ করে। পায়ের তিনটি আঙুল হারিয়ে জিয়া সেটা ক্ষতটা সাবলীলভাবে করতে পারবে সে ব্যাপারে আসিফের কোন ধারণাই নেই। জিয়ার বদলে আর কাউকে এনে বেশিদিন কুলোতে পারবে কি না তা-ও জানে না ও। মনের মতো একজন সহকারি না থাকলে তদন্ত করে শান্তি আছে?

ডেস্কটপটা মাত্র অন করেছিলো, দড়াম করে দরজাটা খুলে যায়। কাঁচের বানঝনানির শব্দে কেঁপে ওঠে ছোট রুমটা। চমকে ফিরে তাকিয়ে একটু আগে পাঠানো জুনিয়র অফিসারকে দেখতে পেল আসিফ। রীতিমত হীফাচ্ছে।

“সৈকতের সেল খালি, স্যার। ভেতরে কেউ নেউ। পালিয়েছে সাসপেক্ট! পুরো ডিপার্টমেন্ট লক ডাউন করে দিচ্ছি আমরা। আপনি একটু আসবেন?”

চেয়ার ঠেলে দরজার দিকে রওনা দিল আসিফ। অল্লবয়সি গোয়েন্দা পেছনে

পেছনে কিছুটা দৌড়ে কিছুটা হেটে অনুসরণ করে তাকে। দূরে কোথাও অ্যালার্ম বাজার শব্দ হচ্ছে। পিস্তল বের করে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ছে ডিটেক্টিভ আর স্টাফগণ। সেল থেকে বের হয়ে পালিয়ে যাওয়া সাসপেক্ট বিপজ্জনক হতে পারে।

কান দিকে না গিয়ে সরাসরি সৈকতকে যে সেলে রাখা হয়েছিলো সেদিকে রওনা দেয় আসিফ। থমথমে মুখে লিফটে করে নেমে আসে ও, দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যায় ছোট ছোট ঘরগুলোর দিকে। পাল্লাটা এখন খোলা। আন্তে করে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

একমাত্র লোহার খাটটার নিচে ঝুঁকে বসার আগে মোবাইলের ফ্ল্যাশটা জ্বালিয়ে নেয়। তারপর উঁকি দিল ভেতরে। নিচে কেউ নেই। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘরটার চারপাশে তাকিয়ে অন্তর্ধান রহস্য বোঝার চেষ্টা করলো। ওপরের ভেন্টিলেশনের জন্য রাখা ফোকরে কাপড়ে মোড়ানো কিছু একটা নজরে এলো। হাত বাড়িয়ে নাগাল পাওয়া গেলো না। তবে খাটের ওপরে উঠে দাঁড়াতে হাতে পেতে সমস্যা হলো না আর।

মোড়কটা খুলতে চকচকে পিস্তলটা বের হয়ে আসে। একটা আনকোড়া গ্লক-২৩। সাইলেন্সারসহ। আমানত ফিরিয়ে দিয়েছে ছেলেটা।

সেই সাথে রেখে গেছে ছোট একটা কাগজের টুকরো : থ্যাংকস, বন্ধু!”

কী আশ্চর্য! একজন খুনের আসামি পালিয়ে যাওয়ার পরেও ডিটেক্টিভ আসিফের মুখে আজ বিরক্তির ছাপ দেখা যায় না। অদ্ভুত রকম একটা হাসি ফুটে উঠেছে সেখানে। বিস্ময় আর তিক্ততার সাথে মেনে নেওয়ার মতো একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে কারও মুখে এরকম একটা হাসিই ফুটে ওঠে।

মেরুন রঙের গাড়িটা ‘আর কফি হাউজ’-এর সামনে থেমে গেলো। শান্ত পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেলো আসিফ। কালো কোট আর সাদা শার্টের সাথে মানিয়ে গেছে চমৎকার কালো সানগ্লাসটা। কপালে পড়ে থাকা চুলগুলো রোদ লেগে চিক চিক করছে। ড্রাইভিং সিটের জানালায় এসে কনুই বাঁধিয়ে ভেতরে তাকায় ও। ছোট একটা হাসিতে ঠোঁট হালকা বেঁকে আছে।

“গুড মর্নিং, ডক্টর।”

“গুড মর্নিং। উঠে বসুন, প্রিজ। আজকে স্টিয়ারিং থাকছে আমার হাতে।” চোখ টিপলেন ডক্টর রমিজ খান।

পাশের দরজাটা খুলে উঠে পড়ে আসিফ, “জরুরি তলব যে?”

“ব্যস্ত ছিলেন বোধহয়? অত্যন্ত দুঃখিত।”

“ঠিক তা নয়। সৈকতকে ডিপার্টমেন্ট থেকে বের করে নিয়ে গেছে ইরফান। এই আর কি।”

“বলেন কি? আপনার সাথে দেখা হয়েছিলো?” গাড়ি থামিয়ে দেওয়ার জোগাড় করেন ডক্টর খান।

মাথা নাড়ে আসিফ, “না, হয়নি। তবে ফেরত দিয়ে গেছে আমার একটা জিনিস। বিষয়টা অদ্ভুত। সৈকতকে উদ্ধার করতে আসাটা।”

“নীতি মেনে চলে আপনার এই ক্রিমিনাল।” মুচকি হাসেন ডক্টর।

ইরফান যে মি. সালেহীন নয়—সেটা রিয়াজুল করিমের হাতে শেষবার বন্দি হওয়ার পরই জানতে পেরেছেন ডক্টর। তবে সেজন্য ছেলেটার ওপর বিন্দুমাত্র রাগ নেই তার। আপাতত ফ্রি মেসনারির সাথে লড়াইয়ে জয়ের পেছনে ইরফানের ভূমিকাটাই তাকে ইরফান-ভক্ত বানিয়ে দিয়েছে।

আসিফ তার মতো করে ভাবছে না। একসাথে কাজ করতে হয়েছে পরিস্থিতির দায়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই পারস্পারিক সহযোগিতার প্রয়োজন ছিলো। তবে তার অর্থ এই না ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে তাকে অ্যারেস্ট করবে না ও। আইন তার পথেই চলবে। একটা ভাল কাজ একজন মানুষের সারাজীবনের ভুল কাজগুলোর ক্ষমার জন্য কখনই যথেষ্ট নয়।

“চমকে দেওয়ার মতো কিছু আছে বলেই ভর দুপুরে ডেকেছি। সময়টা নষ্ট হবে না আপনার। গ্যারান্টি দিতে পারি,” কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন ডক্টর।

“সেটা আমি অনুমান করেছি।” চোখ থেকে সানগ্লাস সরিয়ে ফেলে আসিফ, “আমরা কোথায় যাচ্ছি?”

“জিয়ার বাসাতে। আমাদের লাঞ্ছের দাওয়াত আছে আজ। জানেন কি?”

“আমাকে বলল কোথায়? সম্ভবত আপনার ঘাড়ে আমাকে ধরে আনার দায়িত্বটুকু চাপিয়ে দিয়েছে ও?” একটু হেসে জানতে চায় আসিফ।

“অবস্থাদৃষ্টে তো সেটাই মনে হচ্ছে। আমাকে কিন্তু আপনি আপডেট দেন নি। গত কয়েকদিন যে তুর্কি নাচন নাচালেন সবাইকে, তারপর কি কি হলো?”

আরেকবার সবকিছু খুলে বলার প্রস্তুতি নেয় আসিফ মনে মনে। এত কথা একসাথে আবারও বলতে হবে-ভাবতেই পানির পিপাসা পেয়ে যায় বেচারার।

\*\*\*

কাঁটাচামচে করে গরুর টুকরোটা মুখ পর্যন্ত উঠিয়েও নামিয়ে ফেলে জিয়া। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে ডক্টর খানের হাতে থাকা একগাদা প্রিন্টেড পৃষ্ঠার দিকে। আসিফ অবশ্য উত্তেজনা দেখাচ্ছে না, তবে ভেতরে ভেতরে কৌতুহলে মারা যাচ্ছে সে। আস্তে করে হেলান দিয়েছে ডাইনিং টেবিলে। অন্যপাশে জিয়া একাই তিনটা চেয়ার নিয়ে বসেছে। একটাতে বসে আর দুটোতে পা তুলে দিতে হয়েছে তাকে। ডাক্তারের নির্দেশ। একমাত্র নিরুত্তাপ ব্যক্তি এখানে ডক্টর খান। সাবধানে ডাইনিং টেবিলের ওপর রাখলেন তিনি সাদা সাদা কাগজগুলো।

“লেট মি গেস! গীতাজুলী-দ্বিতীয় পর্বের পান্ডুলিপি?” শুকনো গলায় জানতে চায় আসিফ।

“ভালো বলেছেন। ডক্টর তানভীর আহমেদের লেখা শেষ বইটির পান্ডুলিপি এটা। এক অর্থে গীতাজুলীর পর বাংলাদেশে এই বইটিই সবচেয়ে বেশি বিক্রি হতে যাচ্ছে।” থমথমে মুখে ওদের দিকে তাকান ডক্টর খান, “এমনকি সারা বিশ্বেও।”

আস্তে করে উঠে দাঁড়ায় আসিফ, পান্ডুলিপিটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো কিছুক্ষণ :

*Men, Mithras & Masons-Interactions* By Tanveer Ahmmed

“ইন্টারঅ্যাকশন...” অনুবাদ করলো আসিফ, “মিথস্‌ক্রিয়া। অসাধারণ!”

সায় দেন ডক্টর খান, “যে কাজটা আমরা করতে পারতাম না সেটাই করেছেন ডক্টর তানভীর। পৃথিবীজুড়ে মিথরাসের পতন এক বইয়ের ধাক্কাতে নিশ্চিত করে গেছেন। কাল সারা রাত পড়েছি বইটা। আপনাদের দু-জনকে একসাথে জানানোর ইচ্ছে ছিলো। মি. জিয়াও কিছু একটার গন্ধ পেয়ে একেবারে লম্বা দাঁড়িয়ে দিয়ে ফেললেন।”

“পেলেন কোথায়?” জানতে চায় জিয়া।

“এটার উত্তর দেওয়ার আগে ডিটেক্টিভ আসিফের সাথে আমি একটু খেলতে চাই। ব্যাপারটা আর কিছু না, আপনার ব্যাপারে জিয়ার কাছে অভিযোগ শুনেছি একটা।”

“কি সেটা?” হাসি চেপে জানতে চায় আসিফ।

“জিয়া সবচেয়ে বেশি একটা উপদেশই পেয়েছে আপনার কাছে, ভাল গোয়েন্দা হতে হলে নাকি কখনই আগ বাড়িয়ে চিন্তাভাবনা করতে হয় না। শুধু দেখে যেতে হয়। হাত পা গুটিয়ে দেখে যাওয়ার ব্যাপারটা জিয়ার মাথায় ঠিক ধরে না। তার মতে, দেখাদেখির পাশে কিছু অ্যাডভান্স চিন্তা করা দরকার। আর একটু অ্যাকশনে যাওয়ার প্রয়োজনও আছে। কিন্তু সবসময় আপনি একটা ক্রাইম-সিনে দাঁড়িয়ে দেখার ওপরই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এটাই নাকি আপনাকে ডিপার্টমেন্টের বেস্ট বানিয়েছে।”

“দেখাটাই জরুরি, ডক্টর। আপনাকে আগে মাথার ভেতর ডাটা ঢোকাতে হবে। তাহলে অ্যাডভান্সে কি ভাবতে হবে একটা সময় এমনিতেই বুঝতে পারবেন। আমাদের লাইনে এটাই সেরা পদ্ধতি। অন্তত আমার মতে।”

“সেটাই। কাজেই, আমি চাইছি আপনিই জিয়ার প্রশ্নের উত্তর দেবেন। আমার কাছে কিভাবে ডক্টর তানভীরের পান্ডুলিপি আসতে পারে?”

উত্তরটা দিতে কোন সময় নিলো না আসিফ, “ডক্টর তানভীর জালাল...সরি, নামের ওই অংশটা আমরা নিশ্চয় আর ব্যবহার করছি না। ডক্টর তানভীর আহমেদের আংটি। তাই না?”

আসিফকে এক হাত নিতে পারবেন ভেবে একটা হাসি ফুটেছিলো ডক্টর খানের মুখে, দপ করে নিতে গেলো ওটা, “ভুল কিছু বলেননি। ওটার ওপরে ডক্টরের ফিঙ্গারপ্রিন্ট খোদাই করা ছিলো। সেফ ডিপোজিটে রাখা পান্ডুলিপিটা তোলার জন্য ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যবহার করার কথা ডক্টরের। তবে শুধু আঙটিটিই আমার ক্ষয়ারের অফিসে পাঠাননি তিনি, কাগজে কলমে আমাকে লিগাল নমিনি বানিয়ে সিগনেচার করে রেখেছেন। কাজেই পান্ডুলিপিটা তুলে আনতে সমস্যা হয়নি।”

“আপনি তাকে যে কারণে ঘৃণা করতেন, স্যার, আপনাকে ঠিক সে কারণেই বিশ্বাস করেছেন ডক্টর তানভীর আহমেদ,” বিষম মুখে বলে আসিফ।

“তা ঠিক। লজ্জাবোধ করছি। তবে তিনি তো আর নেই। অন্তত তার লিগেসিটা ঠিকমত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বটা পানিতে ফেলবো না।”

কাঁটাচামচের গরুর টুকরোটা অবশেষে মুখে তুলল জিয়া, “কিভাবে বুঝলেন, স্যার? আঙটির ব্যাপারটা?”

দেখাদেখি গরুর বাটিতে হামলা চালায় আসিফও, “খুব বেশি ঘটনাশ্রদ্ধাই গেছে গত কয়েকদিনে, বুঝলে? ডক্টরের কেসটা নিতে না নিতেই ঝড়ের মতো ঘটনার মোড় পাল্টাতে থাকলো। মেসনদের প্রভাব, ডক্টরের অ্যালকেমি নিয়ে প্যাশন, তারপর বিজয়ের কিডন্যাপ এবং হঠাৎ করেই কেস হ্যান্ডওভার। এরপরে ভ্যাম্প বয় সৈকত আর তার সাথে মেসনদের কানেকশনের দেখা পেতে না পেতেই ইরফানের সাথে টক্কর লেগে গেলো। সেখান থেকে মিথরাসদের ব্যাপারে জানতে না জানতেই তুমি কিডন্যাপড হয়ে গেলে। তাই সবদিকে সমানভাবে এগিয়ে যেতে পারিনি বলে মনে হতে পারে, কিন্তু পর্যবেক্ষণে খুঁত আমার ছিলো না। এখন পর্যন্ত ক্রাইম-সিনের প্রতিটি বস্তুর যৌক্তিক ব্যাখ্যা পেয়েছিলাম। আঙটি উদ্ধাও রহস্যটুকু বাদে। ধাঁধার শেষ টুকরো আর কি।”

একটা হাত দিয়ে দাঁড়ির ভেতরে চুলকালেন ডক্টর খান, “অ্যালকেমি নিয়ে ডক্টরের গবেষণার দিকেও অনেকেই আগ্রহ দেখিয়েছেন। ওসবের ওপর কিছু লেখা আছে উনার। তার বাসা থেকে উদ্ধার করে হয়েছে সেগুলো। উনার নামে রি-রাইট করে ছাপানো হবে সবগুলোই। বিজ্ঞানকে আরও অনেক কিছু দিয়ে যেতে পারতেন ডক্টর। একদল মানসিক বিকারগ্রস্ত লোকের জন্য পারলেন না।”

মন খারাপ করা পরিবেশটা একেবারে আচমকাই নেমে আসে ঘরের ভেতর। আরেকজন তানভীর আহমেদ বাংলাদেশে কত বছর পর জন্ম নেবেন তা নিয়ে ভাবছে ওরা। সেই সাথে ডক্টরের আত্মত্যাগের প্রতি আসছে অবিচল এক শ্রদ্ধা।

নীরবতা ভাঙলেন ডক্টর খান, “মিথরাইক বিলিফ আমাদের দেখিয়েছে, টেন কম্যান্ডমেন্টস বহুকাল আগে থেকেই চলে আসছে। জিশুর নিজস্বতা সেখানে নেই। তারা অনেক ভয়ঙ্কর সত্য কথা বলে গেছিলো। আপনার বিশ্বাস কি কিছুটা হলেও টলে গেছিলো সব জেনে?”

মুচকি হাসলো আসিফ, “মোটোও নয়। আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস আমার আছে। টেন কম্যান্ডমেন্টস ঈসা যেভাবে দিয়েছিলেন সেটাকেও আমি কারচুপি বলবো না। জানেন কি, সূরা আল-আন’আমের ১৫১ আয়াতে এরকম বিধিনিষেধ মুসলিমদেরও দেওয়া হয়েছে? এখন, আমি কি বলবো, প্রাচীন মিশরিয়দের বুক অব ডেড থেকে ওসব চুরি করে মনের মতো লেখা হয়েছে কোরআনে?”

“সেটা না ভাবার পেছনে আপনার যুক্তি?” চোখে হাসি ডক্টরের, আসিফের কথা বুঝতে পারছেন তিনি।

“সহজ। আমাদের মহানবীসহ প্রতিটি নবী এবং রাসূলই এসব বিধিনিষেধ প্রচার করে গেছেন। সব মিলে যাচ্ছে কেন, এ প্রশ্ন আপনি আমাকে করবেন এখন। মিলে যাওয়ার কারণ, আল্লাহর আদেশ প্রচার করেছেন নবীগণ। তারা মনগড়া কোন কিছু বলে বেড়াননি। আল্লাহর অসংখ্য আদেশ ছিলো, যেগুলো যুগে যুগে সবার জন্য প্রযোজ্য। প্রথম নবী আদমকেও তিনি এই দশটি আদেশ-নিষেধ করে থাকতে পারেন। কেউ কারও কথা চুরি করেছে সেটা ভাবার প্রশ্নই আসে না। আল্লাহ সবার জন্য একধরনের আদেশ দিতেই পারেন, আদেশের ধারাও একটার পর একটা একইভাবে সাজানো থাকাই স্বাভাবিক। না, আমার বিশ্বাস টলে যায়নি, স্যার। বরং আরও ঘনীভূত হয়েছে। দশটা কথার মধ্যে সিরিয়ালে ওলোট-পালোট থাকলেই বরং অবাক হতাম।”

“ঠিক তাই ভেবেছি আমিও।” একমত হলেন ডক্টর, আরেকটা ব্যাপার, প্যাগান ধর্মে প্রথম দুটো কম্যান্ডমেন্ট পাল্টে যাওয়ার পেছনে আপনার কি ব্যাখ্যা?”

সরল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো আসিফ, “নবী এসেছিলেন, নবী চলে গিয়েছিলেন। যুগে যুগে নবীর মৃত্যুর পর অন্ধকারের পথ বেছে নিয়েছে মানুষ, বিকৃত করেছে আসমানী কিতাব। মিথরাস ধর্মের গুরুর আগেও নবী এসেছিলেন পৃথিবীতে,

তারা আল্লাহর কথা প্রচার করেছিলেন। কিছু মানুষ নিজেদের মতো বিকৃত করেছে তার কথা। মিথরাসের জন্য এভাবেই হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।”

কোল্ড ড্রিংকসের গ্রাস হাতে তুলে নিলেন ডক্টর, “হতে পারে। কিন্তু, আমরা কোনদিনও নিশ্চিত হয়ে এটা বলতে পারবো না।”

আন্তে করে দেয়াল ঘড়িটা দেখলো জিয়া। আলোচনায় এতক্ষণ সে খুব একটা অংশ নেয়নি। শয়তানি হাসি মুখে নিয়ে আসিফের দিকে তাকালো সহকারি, “স্যার, তিনটায় আপনার একটা প্রেস কনফারেন্স ছিলো না?”

এই একটি কথায় একেবারে নেতিয়ে পড়ল আসিফ, “ওহ্!”

মোটরসাইকেলের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রুহান। ভার্শিটিতে ভর্তি হওয়ার পর বাবা প্রথম বার্থডে গিফট হিসেবে দিয়েছেন বাইকটা। ড্রাইভ করার মাঝে স্বাধীনতা বলে একটা জিনিস আছে, বিষয়টা পুরোপুরি উপভোগ করে সে।

এখন অবশ্য রুহানের ক্র বিরক্তিতে কঁচকে গেছে। এখানে দাঁড়িয়ে এখন পর্যন্ত চারটা সিগারেট টেনে ফেলেছে, এখনও অরুনীর দেখা পাওয়া যায়নি। মেয়েটা আগে কোনদিন দেরি করতো না। দিন দিন কেমনজানি পাল্টে যাচ্ছে।

কলেজের সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছে গার্লফ্রেন্ড, কয়েকদিন পর ভার্শিটিতে উঠে যাবে। এখনও দায়িত্বজ্ঞান হলো না কিছুই। মনে মনে হতাশ হয় রুহান। আর কয়েক বছর পর এই মেয়েকে সামলানো ঝামেলার হবে!

ঠিক তখনই গোট থেকে ওদের বের হতে দেখা যায়। অরুনীর সুন্দর চুলগুলো এখন ঘন ঘন মাথা ঝাঁকানোর সাথে তাল মিলিয়ে দুলছে। একটা অল্লবয়সি ছেলের সাথে হাসতে হাসতে কথা বলছে ও এখন। ছেলেটাকে খুঁটিয়ে দেখলো রুহান এখন থেকে। সুন্দর চেহারার এক কিশোর।

ক্লাসিক প্রেবয়!

মুখ বাঁকিয়ে এতটুকুই ভাবতে পারলো ও। বয়সে নাহলেও অরুনীর তিন বছরের জুনিয়র হবে, অথচ কি সাবলীলভাবেই না কথা বলছে। সেই সাথে চোখে অদ্ভুত রকমের এক দীপ্তি, মেয়ে পটানোর ওপর এর কয়েকটা পিএইচডি ডিগ্রি না থেকেই যায় না! ছেলেটা নিশ্চয় পনের বছর বয়সে কলেজের সেকেন্ড ইয়ারে পড়বে না? অরুনীর সাথে তার কি? অবশ্য আরও বয়স্ক কেউ হতে পারে এ। কিছু ছেলের চেহারাতে শিশুসুলভ একটা ভাব থেকেই যায়। এজন্যই প্রেমের বাজারে এদের দাম থাকে বেশি।

ছেলেটা এখন বিদায় নেবার ভঙ্গিতে অরুনীর কাঁধে চাপড় মারছে। রুহানের পিণ্ডি জ্বলে যায়। অরুনী এদিকে এগিয়ে এসে যখন ঝলমলে একটা হাসি উপহার দেয় ওকে, পাল্টা হাসতে পারলো না আজ।

“সরি বেবি, দেরি হয়ে গেলো। ছেলেটা নতুন এসেছে আমাদের কলেজে। বোর্ড রেজিস্ট্রেশন করা ছিলো অন্য কলেজের নামে। গাজীপুরে ছিলো ওরা, ট্রান্সফার নিয়ে আমাদেরটাতে ঢুকেছে। এখান থেকেই এইচএসসি দেবে, কক্সবাজার জমা দেওয়ার সময় সমস্যা পড়েছিলো—তাই হেল্ল করলাম। দেরি করার জন্য খুব রাগ তুমি?”

এক নিঃশ্বাসে কৈফিয়ত দিয়ে বড় বড় চোখ মেলে নিষ্পাপ একটা চাহনি নিয়ে তাকিয়ে থাকলো অরুনী। হেসে ফেললো রুহান। কপালে আলতো করে একটা চুমু খায় মেয়েটার, “রাগ না। চলো, ক্যাফে ডি মারিয়াতে যাই। খিদেয় মরে যাচ্ছি।”



মোটরসাইকেলে উঠে বসতে অরুনীও চেপে বসে পেছনে। একহাতে বয়ফ্রেন্ডকে আলতো করে জড়িয়ে থাকে।

“বয়স খুবই কম ওই ছেলেটার, জানো! এখনও ষোল হয়নি। খুবই ট্যালেন্টেড!”

বিরক্তিতে রুহানের ঞ্চ কুঁচকে গেছে, তবে মেয়েটিকে বুঝতে দিল না সেটা।  
“ইন্টারেস্টিং! নাম কি ওর?”

“বিজয়। বিজয় আহমেদ।”

ইঞ্জিন স্টার্ট দিল রুহান।

বিজয় আহমেদ।

নামটা মনে রাখতে হবে ওকে।

---